রাহুল সাংকৃত্যায়ন

জীবন ও মূল্যায়ন

প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী

কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী
কলকাতা

অপার সহিষ্ণুতায় জীবনের ঝড়ঝঞ্ঝা
বহন করে বাবার জ্ঞানসাধনার
পথ যিনি প্রশস্ত করেছিলেন
আমার সেই মা
প্রয়াত হেনা চক্রবর্তীর স্মৃতিতে
বাবার এই গ্রন্থখানি উৎসর্গিত হল।

সূচীপত্র

ভূমিকা

মহাপন্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন বিংশ শতাব্দীর বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের অন্যতম। এমন বহুবর্ণময় গতিশীল জীবন, এত বিপুল জ্ঞান ও কর্মের সমন্বিত ব্যক্তিত্ব বিশ্ব ইতিহাসে বিরল। ভাবতে আশ্চর্য লাগে-অসহনীয় কষ্টকে স্বেচ্ছায় বরণ করে যিনি সারাজীবন উড্ডীন পাখির মতো নিরন্তর দেশ বিদেশে পর্যটন করে বেড়িয়েছেন সমাজ ও সভ্যতা, মাটি ও মানুষকে জানা ও চেনার জন্য, এই ধরিত্রির রূপরসকে উপভোগ ও উপলব্ধির জন্য তিনিই আবার বিশ্বের জ্ঞানভান্ডারকে আত্মসাৎ করার দুর্মর চেষ্টায় সমাহিত থেকেছেন। আবার, তাঁর লেখনীর নিরন্তর প্রবাহও শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত দুরন্ত গতিতে অব্যাহত থেকেছে।

উত্তর প্রদেশের সামন্ততান্ত্রিকতার নিগড়বদ্ধ তন্দ্রাবিষ্ট এক গ্রামের বন্ধন ছিন্ন করে বালক বয়সেই তিনি বেরিয়ে এসেছিলেন বিশ্বভুবনের মুক্ত আকাশে বিচরণের দুর্মদ আকাঙ্ক্ষা বুকে নিয়ে। নিশ্চিন্ত সাবলীল জীবন, আত্মীয় পরিজনের অগাধ স্নেহ ভালবাসা তাঁকে বাঁধতে পারেনি। এই বিস্ময় বালকের স্বেচ্ছায় কপর্দকশূন্য হয়ে ভারত পর্যটন যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনি রোমাঞ্চকর। ভারতের এমন কোনো ঐতিহ্যশালী, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থান নেই যা তিনি পরিক্রমা করেননি। হিমালয়ের প্রতি তাঁর ছিল অপার প্রেম। ভারতের প্রকৃতি ও সমাজের অনন্ত বৈচিত্র্যকে তিনি উপলব্ধি করেছেন; আর একের পর এক গ্রন্থে এবং নিজের সুবৃহৎ আত্মকথা—*আমার জীবন যাত্রা*-র পাঁচটি খন্ডে তার লিপিচিত্র এঁকে গেছেন।

তাঁর এই পরিব্রাজনবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল এক সর্বগ্রাসী জ্ঞানলিপ্সা। যেখানে যখন গিয়েছেন সেখানকার ভাষা তিনি শিখেছেন। ৩৬টি ভাষা তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। এই স্বশিক্ষিত মহাপন্ডিত অজস্র বিষয়ে অগাধ পান্ডিত্য অর্জন করেছিলেন শুধু নয়, সেই সব বিষয়ে অবিস্মরণীয় গ্রন্থসমূহ রচনা করে গিয়েছেন।

ভারতের প্রাচীন যে-সংস্কৃতি দেশের স্মৃতি থেকে প্রায় হারিয়ে গিয়েছিল, তা পুনরুদ্ধারের যে দুরূহ সংকল্প স্বউদ্যোগে তিনি এককভাবে মাথায় তুলে নিয়েছিলেন তার তুলনা বোধহয় পৃথিবীতে আর নেই। প্রায় নিঃসম্বল অবস্থায় দুর্গম পথ অতিক্রম করে চার চার বার তিনি তিব্বতে গিয়েছেন। এমনকী প্রথমবার যেতে হয়েছিল আত্মগোপন করে। সব মিলিয়ে প্রায় তিন বছর তাঁকে তিব্বতে থাকতে হয়েছে বৌদ্ধ দর্শনের মহামূল্যবান পুঁথির রত্নভান্ডার উদ্ধারের জন্য প্রায় দুষ্প্রবেশ্য বিহারগুলিতে প্রবেশের অনুমতি সংগ্রহ করতে, ধুলা ময়লার পাহাড় মন্থন করে অমূল্য সংস্কৃত পুঁথির এক বিশাল ভান্ডার আবিষ্কার ও সংগ্রহ করে আনতে। কোনো কোনো গ্রন্থের শত শত

পৃষ্ঠার অনুলিপি সেখানে বসে তাঁকে করতে হয়েছে নিজের হাতে। সবই একক প্রচেষ্টায়। বিপুল সংখ্যক পুঁথি ছাড়াও বহু প্রাচীন চিত্রপট ও অন্যান্য সামগ্রী তিনি ভারতে এনেছেন। বিভিন্ন সংগ্রহশালায় তা সংরক্ষিত রয়েছে। এই সব পুঁথির পঞ্জীকরণ, সম্পাদনা, অনুবাদ তিনি কিছু কিছু করেছেন। আজও বিভিন্ন স্থানে নানা পন্ডিত ব্যক্তি তা করে চলেছেন।

এত পরিব্রাজন, অধ্যয়নের মধ্যে তাঁর লেখনীও চলেছে দুর্বার বেগে সারা জীবন ধরে। যখনই তাঁর পায়ের গতির সাময়িক বিরতি ঘটেছে তখনই ছুটেছে কলম বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে। উপন্যাস, গল্প, নাটক, সাহিত্য সমালোচনা, ভ্রমণ কাহিনী, জীবনী, আত্মজীবনী, শব্দকোষ, দর্শন, পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস, রাজনীতি ইত্যাদি কোনো কিছুই তাঁর রচনাবৃত্তের বাইরে ছিল না। অনেকগুলি ভাষায় তিনি লিখেছেন, কিন্তু হিন্দি ভাষার প্রতি তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। হিন্দি ভাষা ও সাহিত্যকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছেন তিনি। তাঁর *মধ্য-এশিয়ার ইতিহাস* গবেষণা ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির মূল অনুসন্ধানে এক অনালোকিত দিগন্ত উন্মোচিত করেছে।

নিরন্তর গতিশীল এই মানুষটির জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পরিধি যত প্রসারিত হয়েছে তাঁর চৈতন্যের জগতেও ঘটেছে নানা রূপান্তর, বিশ্বাস ও জীবনযাত্রাও হয়েছে পরিবর্তিত। পর্বে পর্বে নিজেকে ভেঙে চুরে নতুন করে গড়ে তুলেছেন তিনি। কেদারনাথ পান্ডে হিসেবে শুরু করেছিলেন জীবন, যৌবনারম্ভে তিনি হয়ে গেলেন বৈরাগী সাধু বাবা রামউদার দাস, তা থেকে হলেন আর্য সমাজের প্রচারক। পরবর্তী পর্বে বুদ্ধের জীবন তাঁকে আকৃষ্ট করে, বৌদ্ধদর্শনে তিনি নিমজ্জিত হন এবং হয়ে ওঠেন বৌদ্ধ ভিক্ষু রাহুল সাংকৃত্যায়ন। কিন্তু প্রথমাবধি তাঁর চিত্তাকাশ লাঞ্ছিত মানবতার প্রতি মমত্বে ভালবাসায় আচ্ছন্ন ছিল। বৌদ্ধ দর্শনের পথ বেয়ে নিপীড়িত মানুষের মুক্তির অন্বেষায় তিনি শেষ পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন মার্কসবাদী দর্শনে। তিনি হলেন বিহারে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। ১৯৩৬ সালে তিনি পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন এবং ১৯৩৬ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরূপেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়ে যেমন কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন তেমনি কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেছেন। মার্কসবাদী দর্শন ও কমিউনিস্ট রাজনীতি সম্পর্কে নানা পুস্তক রচনা করে তিনি সাম্যবাদী আন্দোলনকে পরিপুষ্ট করেছেন।

এই অনন্যসাধারণ মনীষীর বৈচিত্র্যময় জীবন মুগ্ধ করেছিল ইতিহাসবেত্তা অধ্যাপক প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তীকে। অধ্যাপক চক্রবর্তী কেবল ইতিহাসের একজন প্রাজ্ঞ ও ছাত্র-বৎসল অধ্যাপকই ছিলেন না, তাঁর জ্ঞান ও চিন্তার পরিধিও ছিল সুবিস্তৃত। তাঁর *ফরাসী বিপ্লব ও য়োরোপের যুদ্ধ ঃ প্রথম দশমাস* গ্রন্থ দুখানি ইতিহাস গবেষণায় উল্লেখযোগ্য সংযোজন। বিশেষভাবে স্মরণীয় তাঁর দীর্ঘ গবেষণার ফসল—*দি মার্জিনাল মেন*। পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারাদের জীবন, সংগ্রাম ও সংগঠনের ইতিহাস নিয়ে এমন মহাকাব্যিক গ্রন্থ আর রচিত হয় নি। বইখানিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'রবীন্দ্র পুরস্কার' দিয়ে অভিনন্দিত

করেছেন। রাহুল সাংকৃত্যায়নের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে তিনি রাহুল-গবেষণায় মগ্ন হন। অতি দ্রুত হিন্দি ভাষায় পাণ্ডিত্যও অর্জন করেন। রাহুল সাংকৃত্যায়ন শতবার্ষিকী কমিটির উদ্যোগে যোগ দিয়ে রাহুলের *মেরি জীবনযাত্রা*-র প্রথম খণ্ড অনুবাদে অংশগ্রহণ করেন। এই সময় তিনি রাহুল সাংকৃত্যায়নের একখানি বিস্তৃত জীবনী রচনায় মনোনিবেশ করেন। তার জন্য রাহুলের তিব্বত থেকে সংগৃহীত পুঁথিপত্রের একটি অংশ যেখানে সংরক্ষিত আছে, পাটনার সেই জয়সওয়াল ইনস্টিটিউটে যান। রাহুলের জীবন ও কীর্তি সম্পর্কিত যাবতীয় বই নথিপত্র অধ্যয়ন করেন। দীর্ঘ সময় রাহুলে নিমজ্জিত থেকে তিনি প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠার রাহুল জীবনী রচনা করেন। কিন্তু ২০০০ সালে তাঁর মৃত্যুর পূর্বে এই মূল্যবান বইটি নানা কারণে মুদ্রিত হতে পারেনি। তাঁর পুত্র শ্রীকল্যাণ চক্রবর্তী পুস্তকটি মুদ্রণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। কোথাও কোথাও পাণ্ডুলিপির অস্পষ্টতার জন্য দু-একটি ভুলত্রুটি থেকে যেতে পারে। সুধি পাঠকরা দৃষ্টি আকর্ষণ করলে পরবর্তীকালে তা সংশোধন করা যাবে।

রাহুল সাংকৃত্যায়নের *ভোলগা থেকে গঙ্গা*, *মানবসমাজ*, *বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ* ইত্যাদি অনেকগুলি বই বহুদিন যাবৎ বাঙালি পাঠকের কাছে আদৃত। সাম্প্রতিককালে তাঁর *আমার জীবনযাত্রা* (৫ খণ্ড) অনেকেই পড়েছেন। কিন্তু তাঁর বিশাল রচনা সম্ভারের (যার পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫০,০০০-এর বেশি) বিরাট অংশ আজও যেমন বাংলায় অনূদিত হয়নি তেমনি তাঁর বৈচিত্র্যমণ্ডিত ও বেগবান জীবন ও কীর্তির সামগ্রিক কাহিনী বাংলা ভাষায় অপ্রকাশিত রয়ে গেছে। তাঁর কৃতির নিরপেক্ষ ও অন্তর্ভেদী মূল্যায়নও বাংলায় হয়নি। অধ্যাপক চক্রবর্তী গভীর শ্রদ্ধা নিষ্ঠা ও অধ্যাবসায়ের সঙ্গে এই কাজটি সম্পন্ন করেছেন।

আশা করি গ্রন্থখানি সাদরে গৃহীত হবে।

রহড়া
উত্তর ২৪ পরগণা

অচিন্ত্যকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রথম পর্ব

জীবন

প্রথম অধ্যায়

শৈশব

অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী, জীবনব্যাপী অবিশ্রান্ত পরিব্রাজনে অতুল অভিজ্ঞতার রত্নখনি—কঠোর পরিশ্রম ও দুর্নিবার অধ্যবসায়ে প্রাচীন ভারতের প্রায়-অবলুপ্ত জ্ঞান ও মনীষাকে যিনি পুনরুদ্ধার করেছেন, হিন্দি ভাষা ও সাহিত্যকে যিনি বিপুল সম্ভারে সমৃদ্ধ করেছেন, একাধারে ভারততত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক, ঔপন্যাসিক এবং লাঞ্ছিত মানবতার মুক্তির সংগ্রামে নিবেদিত-প্রাণ রাহুল সাংকৃত্যায়নের শৈশবে নাম ছিল—কেদারনাথ পাণ্ডে। উত্তরপ্রদেশের আজমগড় জেলার একটা অখ্যাত গ্রাম পন্দহাতে ১৮৯৩ সালের ৯ এপ্রিল তাঁর জন্ম। পন্দহা তাঁর মায়ের পিতৃগৃহ। এই পন্দহাতেই তাঁর শৈশব অতিবাহিত হয়েছে দাদু ও দিদিমার অগাধ স্নেহ ও ভালোবাসায়। রাহুল তাঁর আত্মজীবনী *মেরী জীবনযাত্রা*-য় লিখেছেন—'বস্তুতঃ দিদিমাকে আমি যতটা ভালোবাসতাম, মাকে ততটা বাসতাম না। আসলে মার ভালোবাসা আমি কি-ই বা পেয়েছি?' দিদিমাকে তিনি মা বলে ডাকতেন। দিদিমা ছিলেন অত্যন্ত পরিশ্রমী, নির্বিবাদ, কোমল হৃদয়া, স্বল্পভাষী মহিলা। শুধু আত্মীয়স্বজনরাই দিদিমার আতিথ্য পেত, তাই নয়, পথচলা পথিক ও ভিখারিরা হামেশাই তাঁর আতিথেয়তা লাভ করত। রাহুল লিখেছেন—'জীবনের প্রথম পাঁচ বছর দিদিমা আমাকে কেবল লালনই করেন নি, আমাকে তৈরিও করেছিলেন।'

রাহুলের পিতৃগৃহ ছিল ঐ জেলারই গ্রাম কনৈলায়। যেহেতু তাঁর মা কুলওয়ান্তি ছিলেন মা-বাবার একমাত্র সন্তান তাই তিনি বাপের বাড়িতেই বেশির ভাগ থাকতেন। রাহুল তাঁর মায়ের বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে—ফর্সা, লম্বা চওড়া, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মহিলা; প্রকৃতিতে তিনি ছিলেন শান্ত, স্নিগ্ধ-স্বভাবা, কোনও বিবাদ-বিরোধের মধ্যে থাকতেন না।

যে-মাতামহের স্নেহসিক্ত সদাসতর্ক আচ্ছাদনে রাহুলের বাল্যকাল অতিবাহিত হয়েছে সেই রামশরণ পাঠক ছিলেন ছ ফুট লম্বা, সবলবাহু শক্ত সমর্থ মানুষ। জমিজমা গরু মোষ ছিল তাঁর। বালক কালে গরু মহিষ চরানোতে থাকতেন মশগুল হয়ে। যৌবনে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেহে তাঁর অসাধারণ শক্তির ঝলক দেখা দিল; কুস্তি শিখতে লাগলেন। কী করে কী জানি তাঁর মনে এল দেশভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা। ১৮ বছর বয়সে বাবার কিছু টাকা পকেটস্থ করে বাড়ি ছেড়ে পালালেন। কোথায় যাবেন কী করবেন কিছুই ঠিক নেই। ঘুরতে ঘুরতে একদিন হায়দ্রাবাদের জালনা শহরে এসে হাজির হলেন। সেখানে সেই সময় সৈন্যবাহিনীর এক ঘাঁটি ছিল। সেই বাহিনীতে পাঠকের জেলার অনেক সেপাই এমনকি জনৈক সুবেদার-মেজরও ছিলেন। তাঁদের সঙ্গী হয়ে একদিন গেলেন এক কুস্তির আখড়ায়। সেখানে তাঁর কুস্তির রোখ চেপে গেল। ১৮/১৯ বছরের

ছেলে তিনি; এক দশাসই কুস্তিগিরকে মাটিতে চিত করে ফেললেন। তা দেখে পল্টনের কর্নেল ইংরেজ-সাহেব ছুটে এসে তার পিঠ চাপড়ে দিলেন, পুরস্কৃত করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ফৌজে ভর্তি করে নিলেন। দেহ প্রচণ্ড শক্তিশালী, বন্দুক চালনায় অব্যর্থ-লক্ষ্য পাঠক অল্পদিনের মধ্যেই ইংরেজ-সাহেবের নিজস্ব আর্দালি হয়ে গেলেন এবং কাজের ফাঁকে ফাঁকে সাহেবের সঙ্গে হায়দ্রাবাদ, মালাওয়া ও নাগপুরের জঙ্গলে শিকার করে বেড়াতে লাগলেন। বাঘ শিকারের জন্য রামশরণ অনেক পুরস্কারও পেয়েছিলেন। এভাবে রামশরণ শীতকালে সাহেবের সঙ্গেও বাঘ শিকার করতে যেতেন। গরমে সিমলায় মৌজ করতেন।

রামশরণের খেয়ালই হয়নি কখন দশ বছর কেটে গেছে। এ সময়টা তিনি ব্রহ্মচারী হয়ে বসে থাকেননি। তিনি একটি স্ত্রী অর্থাৎ একটি চির-রক্ষিতা রেখেছিলেন। তার একটি ছেলেও হয়েছিল। ঘরে স্ত্রী আছে, কিন্তু সেখানে যাওয়া হয় না। অতএব কর্মস্থলে আর একটি স্ত্রী রাখতে হত। উত্তরের সেপাইদের এই ধরনের একটি উপনিবেশই গড়ে উঠেছিল জালনাতে।

বস্তুত জালনা পাঠকের নিজের বাড়ির মতোই হয়ে গিয়েছিল। তিনি পেনশন নেওয়ার আগে হয়তো ঘরেও ফিরতেন না। হঠাৎ একদিন পেনশন নিয়ে ঘরে ফিরে যাওয়া এক সুবেদার-মেজরের কাহিনি শুনে তিনি ফৌজ থেকে নাম কাটিয়ে বাড়ি ফিরে আসেন। কেদারনাথের যখন জন্ম হয় তার আগেই পাঠক ঘরে ফিরে এসেছিলেন। দাদু ও দিদিমার স্নেহে লালিতপালিত হয়েছিলেন কেদারনাথ। কনৈলাতে বাবা-মার কাছে কেদারনাথ বিশেষ যেতেন না। মা বছরের বেশ কিছুটা সময় পন্দহাতেই কাটাতেন। দিদিমার কাছেই কেদারনাথের ছেলেবেলাটা কেটেছিল। একটু বড় হওয়ার পর দাদু রামশরণ পাঠক সন্ধ্যার পর দিদিমাকে ও তাঁর সাত-আট বছরের নাতিকে নিজের ফৌজি জীবনের ও শিকারের কাহিনি শোনাতেন। কামঠী, ধুলিয়া, অমরাবতী, নাসিক প্রভৃতি জায়গার কাহিনি যেখানে যা দেখেছেন তা সুন্দর করে গল্পের মতো করে বলতেন। এই সব জায়গাতে পাহাড় কেটে তৈরি করা যে ভাস্কর্য দেখেছিলেন তার কাহিনি শোনাতেন। তিনি বলতেন পাহাড় কেটে বানানো এই সব মহল বিশ্বকর্মার হাতে তৈরি। তিনি তা বানিয়েছিলেন দেবতাদের জন্য। দেবতাদের খবর দিয়ে ফিরে এসে দেখলেন যে অসুররা সেখানে এসে তাদের বাসস্থান তৈরি করে নিয়েছে। চারদিকে বোতলের টুং-টাং হচ্ছে এবং অসুররা সেখানে মৌজ করছে। বিশ্বকর্মা রেগে শাপ দিলেন—যাও, তোমরা সব পাথর হয়ে যাও। তারপর স্ত্রীকে তিনি গম্ভীরভাবে বলতেন, আজও সেই রাক্ষসগুলো হয়তো হাতে বোতল ধরে আছে, নাচছে, মুখভঙ্গি করছে, দেখে বোঝাই যায় না পাথরের মূর্তি। পাঠকের বর্ণনা বিস্ময়করভাবে শিল্পীর কৃতিত্বকে ফুটিয়ে তুলত। সাত-আট বছরের নাতিটির মুগ্ধ হৃদয়ে এই সব কাহিনি যে গভীর ছাপ এঁকে দিয়েছিল তা কখনোই মুছে যায়নি। বালক কেদারনাথের ভূগোল ও মানচিত্রের প্রতি আকর্ষণ এবং ভ্রাম্যমান জীবনের প্রথম অনুপ্রেরণা হয়তো এসেছিল রামশরণ পাঠকের এই কাহিনি শোনার সময়।

রামশরণ পাঠক নিজের অজ্ঞাতসারে কেদারনাথের মনকে গড়ে তুলেছিলেন, আর দিদিমা জগরাণি তাঁকে লালনপালন করেছিলেন।

দশ-বারো বছর বয়সে পিতা গোবর্ধন পাণ্ডের কাছাকাছি আসেন কেদারনাথ। বছরে এক সপ্তাহ কী দেড় সপ্তাহ মার সঙ্গে কনৈলা গিয়ে দূর থেকে তাঁকে দেখতেন কেদারনাথ। স্বাস্থ্যবান গোবর্ধন পাণ্ডে লেখাপড়া বিশেষ করেননি। তিনি লিখতে ও পড়তে পারতেন মাত্র। ভগ্নাংশ, গুণ, ভাগ, সুদকষা ও জমিজরিপের কাজ শিখে নিয়েছিলেন। পূজা-আহ্নিক নিয়ে তিনি অনেকটা সময় কাটাতেন। তাই তাঁকে গ্রামের লোক 'পূজারি' বলে ডাকত। দীর্ঘ, হৃষ্টপুষ্ট, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল শরীর ও ফর্সা রঙ, শান্ত প্রকৃতির মাকে তাঁর অস্পষ্টভাবে মনে পড়ত। মা বেশিদিন বাঁচেননি। মাত্র আঠাশ-ঊনত্রিশ বছর বয়সে তাঁর মার মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু মায়ের মৃত্যুতে কেদারনাথের মনে ততটা যন্ত্রণা হয়নি, কেননা তাঁর জন্যে দিদিমার স্নেহের কোল ছিল।

জ্ঞান হবার পর থেকেই কেদারনাথ স্থায়ীভাবে দাদুর কাছে থাকতেন। দাদু এমনভাবে কেদারনাথকে আগলে রাখতেন যে তাঁর গায়ে আঁচড়টুকুও লাগত না। সেইজন্য হয়তো তিনি ছেলেবেলায় তার সঙ্গীদের তুলনায় দুর্বল ছিলেন। যখন কেদারনাথের পাঁচ বছরের মতো বয়স তখন দাদু তাঁকে পন্দহা থেকে মাইলখানেক দূরে রানি-কি-সরাই-এর মাদ্রাসায় ভর্তি করেছিলেন। দিদিমা আপত্তি করেননি, কারণ দাদু সতমীর ছেলে মদ্ধুকে সঙ্গে দিতেন; দুপুরে খাওয়া-দাওয়াব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন শিক্ষক মহাবীর সিং-এর বাড়িতে। এই সবই দিদিমা যাতে আপত্তি না করেন তার জন্যে। দিদিমা যখন বললেন যে, এত অল্প বয়সে ও কী শিখবে, তখন দাদু বললেন বসে তো থাকতে শিখবে। দাদু ভুল করলেন। কেদারনাথ অন্য সব কিছুই শিখলেন, বসে থাকতেই শিখলেন না। দাদু ক্রমাগত এমনভাবে কেদারনাথকে সব বিপদ থেকে আড়াল করতে চেয়েছিলেন যে কেদারনাথের ভাষায়—'তিনি তার জীবনকে জেলখানা বানিয়ে দিয়েছিলেন।'

দাদুর ইচ্ছা ছিল যে কেদারনাথ লেখাপড়া শিখে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হবেন, তাই তিনি তাঁকে মাদ্রাসায় ভর্তি করেছিলেন। মাদ্রাসায় সে হিন্দি নয়, উর্দু শিখবে। তারপর মিশন স্কুলে ইংরেজি শিখে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হবে। কেদারনাথ তাঁর বিস্তৃত পাঁচ খণ্ডের *মেরী জীবনযাত্রা*-র মধ্যে ছেলেবেলার কথা লিখেছেন। তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের কথা, মদ্ধু, দলসিংগার, যাগেশ, অন্যান্য বন্ধু ও রানি-কি-সরাইয়ের শিক্ষকদের কথা, বিশেষ করে বাবু পত্তর সিংহের কথা লিখেছেন। বাবু পত্তর সিংহ নির্মমভাবে ছেলেদের ঠ্যাঙাতেন। পত্তর সিংহের ভয়ে ছেলেরা কাঁপত। বাবু পত্তর সিংহের নানা মুদ্রাদোষ জেনে নিয়ে ছাত্ররা তাঁকে ম্যানেজ করার চেষ্টা করত। *মেরী জীবনযাত্রা*-য় কেদারনাথ (রাহুল) তার একটি বর্ণনা দিয়েছেন। 'বেশিরভাগ সময় তিনি চেয়ারে বসতেন না; খাটিয়াতে বসে পড়াতেন। আর পড়াতে পড়াতে ঘুমিয়ে পড়তেন। ঘুমিয়ে পড়ার পর ক্রমশ মাথার চুল এলোমেলো হয়ে যেত। আমরা বুঝতে পারতাম, তাঁর রাগের পারা সবচেয়ে চড়ে যাওয়ার সময় হয়েছে। তার ওষুধও আমরা জানতাম। তাঁর ঐ অবস্থা দেখে ছেলেদের

একজন হুঁকোর খোলের জল পালটাত, আরেকজন কলকেতে অঙ্গার দিয়ে নতুন ছিলিম তৈরি করে আনত। পত্তর সিংহ হেসে এক হাতে মাথার চুলে হাত বুলাতেন, অন্য হাতে নারকেলের হুঁকো ধরতেন।' ছেলেদের পেটাবার সময় তিনি মুখে ছড়া কাটতেন। ছড়া শুনলে হাসি পেত। যে হাসত তাকে তিনি তৎক্ষণাৎ বলতেন 'হাসছ, এদিকে এস তো কী? এখানে রেন্ডী নাচ হচ্ছে? আচ্ছা, হাস।' ছড়ির বর্ষণ শুরু হত।

কেদারনাথ শ্রুতিধর ছিলেন বলা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন—'চার মাসের পড়াশোনার জন্য আমার বার মাস নষ্ট হত।' অর্থাৎ এক বছরের পড়াশোনা কেদারনাথের শেষ হয়ে যেত চার মাসে। হাতে অনেক সময় থাকত তাঁর। গ্রামের মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়াতেন। নানা রকমের গ্রাম্য খেলা খেলতেন। গ্রামের পুরনো পুকুর, বটগাছ, মাঠ-ঘাট, খেত ক্রমশ তাঁকে গ্রাম্য ধরিত্রীর সন্তানে পরিণত করেছিল। পৃথিবী পরিক্রমা, জ্ঞানার্জন, পাণ্ডিত্য, বিদগ্ধ মানুষের সঙ্গ কেদারনাথের মন থেকে গ্রাম্য জীবনের প্রতি ভালোবাসা মুছে দিতে পারেনি। যতদিন বেঁচেছিলেন এই কেদারনাথ— রামউদার দাস— রাহুল সাংকৃত্যায়ন গ্রাম্য বালকই ছিলেন।

১৯০২-এ কেদারনাথের উপনয়ন অনুষ্ঠান হয় বিন্ধ্যাচলে। বিন্ধ্যাচল থেকে ফিরে আসার পথে বেনারসে কেদারনাথ কাউকে না বলে চকবাজারে কয়েক পয়সায় পাঁচ-সাতটা বই কিনতে গিয়েছিলেন। তাতে বাড়িতে হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল। কেদারনাথ লিখছেন— 'এক অর্থে আমার সাহসিক যাত্রার ক-খ এখান থেকে শুরু হয়েছিল।

১৯০৬-এ কেদারনাথের মা মারা যান। এ সম্পর্কে *মেরী জীবনযাত্রা*-য় তিনি লিখেছেন— 'মনে এক অদ্ভুত অবসন্নতা আসছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও চেঁচিয়ে কাঁদিনি, চোখেও জল আসেনি। .... আমার বিশ্বাসই হয়নি যে, আমার মা আর ফিরে আসবেন না।'

রানি-কি-সরাইয়ের পড়াশুনা এই বছরেই হয়ে যায়। এরপর দাদু তাঁকে নিজামাবাদের মিডল স্কুলে ভর্তি করে দেন। সেখানে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল এক ঠাকুরবাড়িতে। কিন্তু সেখানে তিনি বেশিদিন থাকেননি। সেখান থেকে তিনি বোর্ডিঙে চলে যান।

কেদারনাথ স্কুলে উর্দু পড়তেন, হিন্দি পড়তেন না। কিন্তু হিন্দিটা নিজেই শিখে নিয়েছিলেন। গণিতে তাঁর অসামান্য অধিকার ছিল। রানি-কি-সরাইয়ে উর্দু পাঠ্য-পুস্তকের 'নওয়া জিন্দা বাজিন্দার' একটা শের তাঁর মনে এমন সোনালি রঙ ধরিয়েছিল যে ক্রমাগতই তা কেদারনাথের কানের কাছে গুনগুন করত। শেরটি হল—

'সৈর কর দুনিয়াকি গাফিল জিন্দগানী ফির কঁহা?
জিন্দগী গর কুছ রহী তো নওজওয়ানী ফির কঁহা?'

ইতিপূর্বেই ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল, ছেলেবেলায় দাদু যে গল্পের জাল বুনতেন তা শিশু কেদারকে দেশভ্রমণের দুঃসাহসিক অভিযানের স্বপ্নে বিভোর করত। এই শের পড়ে কেদারের মন উথাল-পাথাল হয়ে গেল। তাঁর চৈন চলে গেল, নীঁদ হারাম হল। সেই যে বাজিন্দার শের কানের কাছে গুনগুন করতে শুরু করল তা আর থামেনি। *মেরী*

জীবনযাত্রা-য় রাহুল এই শের সম্পর্কে লিখেছেন—'এই শের আমার মন ও ভবিষ্যতের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল।' তিনি মাঝে মাঝেই লিখেছেন, 'এই শের আমার জীবনের মন্ত্র।'

১৯০৪-এ কেদারনাথের বিয়ে দেওয়া হয় নিজামাবাদ জেলার আইরৌলী গ্রামের এক ধনী ব্রাহ্মণের সুন্দরী কন্যা সন্তোষীর সঙ্গে। কেদারের বয়স তখন এগারো। সন্তোষী কেদারের চেয়ে পাঁচ বছরের বড় ছিল। বিয়ের পর কেদারের বন্ধুরা তাঁকে খ্যাপাত। বলত, 'তোর বুড়ি স্ত্রী মিলেছে।' এতে কেদারের দুঃখ হত। তিনি পন্দহা থেকে কনৈলায় বিশেষ যেতেন না। গেলেও স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতেন না, কথা বলতেন না। এই বিয়ে সম্পর্কে রাহুল *মেরী জীবনযাত্রা*-য় লিখেছেন, 'এগারো বছর বয়সের এই ব্যাপারটাকে আমি তামাসা বলেই মনে করেছিলাম। ..... এগারো বছর বয়েসে অবোধ অবস্থায় আমার পরিবারের আমাকে বেচে দেওয়ার কোনো অধিকার ছিল না। আমার গুরুজনেরা যখন বিয়ে সম্পর্কে আমার কর্তব্য বোঝাতে আসতেন, তখন তাঁদের আমি এই উত্তরই দিতাম। ....আমি এই বিয়েকে বিয়ে বলে মনে করিনি।'

এই প্রসঙ্গে রাহুল পরে লেখেন, 'যদি বয়স্ক ব্যক্তিরা তাদের দায়িত্বের কথা না ভেবে এক অবোধ ছেলেকে ফাঁদে ফেলে দেয়, তবে এটা আশা করা কী উচিত যে শিকার ঐভাবে ফাঁদে পড়ে থাকবে?' তিনি আরো লিখেছেন, '১৯০৯-এর পর আমি কদাচিৎ বাড়ি যেতাম। ১৯১৩-তে তাও শেষ হয়ে যায়।' ১৯১৭-র পর প্রতিজ্ঞা করে ১৯৪৩ পর্যন্ত রামউদার আজমগড় জেলার মাটিতে পা পর্যন্ত রাখেননি। '....আমার মনে হয় এই বিয়ের জন্য সমাজের বদলে আমাকে দায়ী করা ঠিক নয়। আমি একে কখনো বিয়ে বলে মনে করিনি। এর দায়িত্বও আমার বলে মেনে নিতে পারিনি।'

প্রথম উড়ান

দিদিমার মৃত্যুর পর পন্দহাতে দাদু একা থাকতেন। কেদার অত্যন্ত আম ভালোবাসতেন। তাই পাকা আমের মরশুমে বোন রামপ্যারীকে নিয়ে কেদার কনৈলা থেকে পন্দহা চলে আসেন। সেখানে একদিন এক গামলা ঘি মেঝেতে ঢেলে দিয়ে দাদুর ভয়ে কেদার বলদ বিক্রির বাইশ টাকা নিয়ে বাড়ি থেকে উধাও হলেন। *মেরী জীবনযাত্রা*-য় উধাও হয়ে যাওয়াকে 'প্রথম উড়ান' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ছোটো পাখি যেমন নীড় ফেলে উড়ে চলে যায় কেদারও তেমনি তাঁর পন্দহার নীড় থেকে প্রথম উড়লেন। বিপুলা এই পৃথিবীর কোনো ধারণাই ছিল না কেদারের। তবুও ভেতরে একটা আলোড়ন চলছিল। বাজিন্দার শের তাঁকে স্থির থাকতে দিচ্ছিল না। নীড় ভেঙে চলে যাওয়াই এই পাখির নিয়তি। অতএব পাখি পালাল। ট্রেনে চেপে সোজা হাওড়া চলে এলেন। ইতিপূর্বে তিনি বেনারস শহর দেখেছিলেন। ভেবেছিলেন কলকাতা সেইরকমই একটা শহর। কিন্তু হাওড়া স্টেশনে এসে কেদার কলকাতার বিপুল চেহারা দেখে থমকে দাঁড়ালেন। তারপর তাঁরই মতো ঘর পালানো ছেলে মহাদেবপ্রসাদকে নিয়ে কলকাতায় ঝাঁপ দিলেন।

'কস্তি খোদা পে ছোড় দে—লঙ্গরকো জোড় দে।'

কেদারের আগেই মহাদেবপ্রসাদ কলকাতায় এসেছিলেন এবং মাসিক আট আনায় একটি মাচান ভাড়া করেছিলেন। সেখানে পালিয়ে-আসা আরেকটি ছেলেও থাকত। মহাদেবপ্রসাদের সঙ্গে কেদার সেই মাচানে চলে গেলেন। মহাদেবপ্রসাদ ছাড়া অন্য যে ছেলেটি আগেই মাচানে থাকত সে নেপাল-তরাইয়ের রাখাল ছিল। বিয়েও করেছিল এরই মধ্যে। সে রান্না করত। আর কেদার ও মহাদেবপ্রসাদ কাজ খুঁজতে বেরোতেন। এরপর আরো দুজনকে মাচানে নিয়ে আসা হয়েছিল। স্থির হয়েছিল যে এখানে 'আমি' ও 'আমার' কথাগুলো থাকবে না। যার কাছে পয়সা থাকবে তার পয়সায় সবাই খাবে। যারই চাকরি হোক না কেন তার রোজগার সকলের খরচার কাজে লাগবে। বলা যেতে পারে, এই কয়জন মিলে একটা 'কমিউন' তৈরি করেছিলেন। দুজন-দুজন করে চাকরির খোঁজে বেরোতেন। কুলির কাজ খুঁজতে লাগলেন কেদার কয়লার ডিপোতে, খিদিরপুর ডকে ও অন্যান্য জায়গায়। কিন্তু কাজ মিলল না। কুলির কাজ করার মতো শরীর তখনও তৈরি হয়নি কেদারের। অতএব কুলির কাজ মিলল না। কোনো কাজই মিলল না। কিন্তু কাজের খোঁজে ঘোরাঘুরি করার সময় দেওয়ালের পোস্টার পড়তে পড়তে বাংলা বর্ণমালা শিখে ফেললেন কেদার। দৈবক্রমে ফরসা ধুতি, কোট, গোল ফেল্টের টুপি পরা বিন্দাপ্রসাদ পাঠকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। পাঠকজি কেদারকে তাঁর আস্তানায় নিয়ে গেলেন। ছয় হাত লম্বা চার হাত চওড়া একটা ঘব। পাঠকজি তাঁকে তাঁর ঘরেই থাকতে দিলেন। কেদারের কাজ ছিল পাঠকজির মোরাদাবাদী হুঁকাকে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে রাখা, ঘর পরিষ্কার-করা, নিচের কল থেকে জল ভরে আনা এবং পাঠকজিকে দুই-এক ছিলিম তামাক সেজে দেওয়া।

পাঠকজির ছেলে মোরাদাবাদের রেলের কেরানি। পাঠকজি কলকাতায় ব্যবসা করতেন। ব্যবসা এক সময় ভালো ছিল। এখন আর তা নেই। পাঠকজির সঙ্গেই খেতে যেতেন কেদারনাথ। কেদারনাথের সরযু পারিয়া ব্রাহ্মণের সংস্কার এখনো যায়নি। পাঠকজির ছোঁয়া ও গৌড় ব্রাহ্মণের হোটেলে খাওয়া তাঁকে দ্বিধার মধ্যে ফেলেছিল। কিন্তু পাঠকজি তাঁকে এই সব সংস্কার থেকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। ধীরে ধীরে পাঠকজি তাঁকে বাঙালি ব্রাহ্মণের হোটেলেই নয়, মুসলমান ও খ্রিস্টান হোটেলেও খেতে মানসিকভাবে প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এভাবে পাঠকজির কাছে চুপচাপ বসে থাকতে কেদারের ভালো লাগছিল না। শেষ পর্যন্ত উড়ান শেষ হল। পাখি আবার দাদুর নীড়ে ফিরে এল।

দ্বিতীয় উড়ান

ফিরে এসে কেদারনাথ আবার নিজামাবাদের মিডল স্কুলে ভর্তি হয়ে মিডল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। কিন্তু ভেতরে বাজিন্দার শেরের গুনগুন চলছিল। অতএব দ্বিতীয়বারের উড়ানও প্রায় অনিবার্য ছিল। ফিরে এসে কেদার ওমরপুরের পরমহংস বাবার কুটিরে

যাতায়াত করতেন এবং তাঁর শিষ্য হরিকিরণ দাসের সঙ্গে ধর্মালোচনাও করতেন। কিন্তু দ্বিতীয় উড়ান তাঁকে হিমালয় নিয়ে যায়নি। তিনি আবার কলকাতায় পাঠকজির কাছেই চলে গিয়েছিলেন। তিনি কলকাতায় প্রথমে মার্কাম্যানের চাকরি এবং পরে বেনারসের সুঁঘনী সাহুর কলকাতার দোকানে চাকরি নেন। তাঁর কাজ ছিল প্রতি সপ্তাহের জমাখরচ বেনারসের সুঁঘনী সাহুর কাছে পাঠানো ও চিঠিপত্র লেখা।

এবারের উড়ান বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। রাত্রিতে পাঠকজির ওখানে ফেরার সময় সিদ্ধি মেশানো বরফি খেয়ে তাঁর এমন নেশা হয় যে, তাঁকে হাসপাতালে যেতে হয়েছিল। হাসপাতালে তিনি ধীরে ধীরে সেরে ওঠেন। অবশ্যি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার সময় তাঁর কিছুটা আপশোশ হয়েছিল। কেননা একটি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান নার্সের সঙ্গে কিছুটা ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল তাঁর।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে কেদারনাথকে আবার পন্দহাতে ফিরতে হল। আর নতুন করে পড়াশোনার প্রশ্নই ছিল না, কেননা পরমহংসজিকে দর্শন করে ইতিপূর্বেই তাঁর ওপর বৈরাগ্যের ভূত সওয়ার হয়েছিল। পরমহংসজি কখনো কাউকে উপদেশ দিতেন না, কিন্তু তাঁর শিষ্য হরিকিরণ দাস দিতেন। হরিকিরণ দাসের সঙ্গে হিন্দিতে বিচারসাগর, বিচারচন্দ্রোদয় এবং অষ্টাবক্র গীতার মতো গ্রন্থের হিন্দি টীকা পড়ার ফলে তাঁর 'চোখের আবরণ' প্রায় কেটে গিয়েছিল। তিনি বুঝলেন—

'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।'

ইতিমধ্যে কেদারনাথ তাঁর চালচলন, জীবনযাত্রার পদ্ধতি প্রায় সম্পূর্ণ পালটে ফেলেছিলেন ঃ এখন তিনবার স্নান ও আহ্নিক, স্বপাক আহার, হাতে সর্বদা কুশাসন, ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও হরিকিরণ বাবার সৎসঙ্গ ও সংস্কৃত শেখার প্রবল আগ্রহ। কেননা সংস্কৃত না শিখে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করার কোনো উপায়ই ছিল না। বছওয়লে থাকতেন কেদারের পিসেমশাই। সেখানে যাগেশও থাকতেন। যাগেশ কেদারের পিসতুতো ভাই ও ছেলেবেলার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। কেদারের সংস্কৃত পড়ার প্রবল আগ্রহ দেখে গোবর্ধন পাণ্ডে, রামশরণ পাঠক ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনরা আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। কাশী যেতে না দিয়ে সংস্কৃত পড়ার জন্য কেদারকে তাঁরা বছওয়লে সংস্কৃতের পণ্ডিত পিসেমশাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

তৃতীয় উড়ান

কেদারের মন এখন অন্তর্মুখ। বেদান্ত, ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থের স্বাধ্যায় ও সৎসঙ্গ করে সারাদিন কাটাতেন কেদার। কিছুকাল আগে হরিকিরণ বাবা বদ্রিনাথ ঘুরে এসেছিলেন। হরিকিরণ দাসের উত্তরাখণ্ডে ভ্রমণের বর্ণনা, অরণ্যবাস, সবুজ দেবদারু, শীতল জলের ঝরনা, শুভ্র তুষার কিরীটী নগাধিরাজ হিমালয়ের আহ্বান নিয়ে এল কেদারের কাছে। হঠাৎ একদিন কেদার আবার বেরিয়ে পড়লেন হিমালয়ের জন্যে। এই যাত্রায় হিমালয়ের সঙ্গে তাঁর যে গভীর প্রেম হল তা সারা জীবন ধরে তাঁকে নেশাগ্রস্ত করে রেখেছিল। পাখি আবার

উড়ল। ইতিপূর্বে উড়ানের পাখা ছিল টাকা। কিন্তু এবার পাখি উড়ল বৈরাগ্যের সম্বল নিয়ে—

'কা চিন্তা মম জীবনে যদি হরির্বিশ্বম্ভরো গীয়তে।'

হিমালয়

এই বালক যোগী একটি লাউয়ের কমণ্ডুলু ও আধপোয়া গুড়ের ডেলা নিয়ে যাত্রা করলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল অযোধ্যা হয়ে হরিদ্বার যাবেন 'পায়দলে'। হরিদ্বারের পথে বেরিয়ে কেদার দেখলেন যে মাঝেমাঝেই সাধুদের কাফিলা (যূথবদ্ধ সাধুদের গোষ্ঠী) যাচ্ছিল। এরকম একটি কাফিলার সঙ্গে কেদার যোগ দিলেন। ফলে কেদারের আহার নিদ্রার আর চিন্তা রইল না। অন্যান্য সাধুরা যে কাজ করতেন কেদারও তাই করতেন। আর কাফিলার প্রধান যে সাধু তিনি কেদারের মতো ছেলেকে চাইতেন। কেদার সঙ্গে থাক, ভবিষ্যতে সে হয়তো তাঁকে গুরু হিসাবে বরণ করে সাধু হয়ে যাবে। মাঝে মাঝে কেদারকে জিগ্যেসও করতেন, 'সাধু হয়ে যাচ্ছ না কেন?' কেদার বলতেন, 'সাধু হয়ে যাব, তবে তার আগে সংস্কৃত শিখে বেদান্ত পড়ব।' এভাবে কেদার হরিদ্বারে এসে পৌঁছোলেন। হরিদ্বারে কয়েকদিন থেকে খোঁজাখুঁজি করার পরে দেখা গেল যে সেখানে সংস্কৃত জানে এমন কোন পণ্ডিতই নেই। অতএব আবার এক সাধুর সঙ্গে হিমালয়ে রওনা হলেন কেদার। এই সাধু মালবীবাবা। মালবীবাবার যে বর্ণনা *মেরী জীবনযাত্রা*-য় আছে তা পড়লে মালবীবাবা চোখের সামনে ভেসে ওঠেন ঃ

'মালবী বাবা দেখতে দুবলা-পাতলা। পঞ্চাশের ওপর বয়েস। কিন্তু চলাফেরা ও কাজ করার ব্যাপারে তিনি আমার চেয়ে অনেক বেশি মজবুত। দুই একটা চড়াই-উতরাইয়ের পর যখন আমার দম বেরিয়ে যেত তখন তিনি হাতে লাঠি, পিঠে বিছানা ও বগলে ঝোলা নিয়ে ধীরে ধীরে চলতে থাকতেন। দিনে গন্তব্যস্থলে পৌঁছোবার পর যখন আমরা কোনো ধর্মশালা বা চটিতে উঠতাম, তখন আমি শুয়ে পড়তাম। তিনি কাঠ যোগাড় করতেন, আগুন জ্বালাতেন ও রান্না করতে লেগে যেতেন। কিছুটা বিশ্রামের পর লজ্জিত হয়ে আমি উঠে দাঁড়াতাম এবং তাঁর কাজে সাহায্য করতাম। ধর্মশালা বা চটিতে সদাব্রত থেকে আহার্য ও কম্বল পাওয়া যেত।'

দেবপ্রয়াগ পৌঁছোবার পর ঠিক হল যে শুধু কেদার-বদরিই নয়, গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রীও যাওয়া হবে। এবার কঠিন চড়াই ও পাকদণ্ডির রাস্তা ধরে এগোতে হল। পথে বৃষ্টি হল, যেখানে গিয়ে রান্না করার সময় হল সেখানে ধর্মশালা বা চটি ছিল না। কিন্তু তাতে মালবীবাবার অসুবিধা হবার কথা ছিল না। মালবীবাবা ছিলেন 'রম্‌তারাম'। এই রম্‌তারাম সাধুদের কাজ শুধু দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানো। তাই তাঁর কাছে রান্নার কাঠ থাকত, গুড় থাকত। দু-এক সন্ধ্যার জন্য আটা, আলু, মরিচ, মশলা তাঁর ঝোলায় সর্বদা থাকত। তাওয়া, থালা, ডেকচি থাকত। বেদান্ত-বৈরাগ্য অবশ্য ততটা ছিল না। আশ্রয় কেদারের হিমালয় যাত্রা সহজ করে দিয়েছিল।

দেবপ্রয়াগ থেকে টেহ্‌রী। টেহ্‌রী থেকে ধরাসু। দেবপ্রয়াগ থেকে ধরাসু পর্যন্ত কোনো ঘটনা ঘটেনি। ধরাসুতে যমুনার নীল জল ও পা থেকে মাথা পর্যন্ত সবুজে মোড়া বিশাল পর্বতের ছায়া প্রকৃতিকে বড় স্নিগ্ধ ও মনোরম করে রেখেছিল। সেখানে ডেরা বাঁধার পর ফর্সা রঙ, টিকালো নাক, উজ্জ্বল চোখ, মুখে ঘন কালো মাঝারি মাপের দাড়ি, মাথায় কালো চুলের জটা নিয়ে এক ব্যক্তির আবির্ভাব হল। মালপত্র বিশেষ কিছু নেই। একটি পশমিনার কমলা রঙের লম্বা কুর্তা, কম্বল, ঝোলা, পিতলের কমণ্ডলু, একটা গামছা, দুটো ল্যাঙট ও কাঠের একটি লাল ডাণ্ডা ছিল, *মেরী জীবনযাত্রা*-য় তার চমৎকার বর্ণনা রয়েছে ঃ 'শুদ্ধ হিন্দিতে তিনি অতি দ্রুত কথা বলছিলেন ঃ আমি হরিদ্বার থেকে আসছি না, এখান থেকে পশ্চিমে রামপুর-কুলু-চম্বা-জম্মু-কাশ্মীর আমার বিচরণ ভূমি। এই বলে শুরু করে তিনি ক্রমাগত কথা বলতে লাগলেন। তাঁর ঝোলায় গাঁজার কলকে, দেশলাই ও গাঁজা। মালপত্রের দরকার নেই। একটা কমণ্ডলুই যথেষ্ট। ভিক্ষা করে খান। ব্রহ্মচারীর কথা উৎকর্ণ হয়ে কেদার শুনছিল। এইতো পাওয়া গেছে বাজিন্দার মতো মানুষ। হালকা হাওয়ার মতো ঘোরাফেরা করেন। সঙ্গে কিছু নেই। শুধু কল্‌কে থাকলেই হল। পিতলে মোড়া কাঠের লম্বা কল্‌কেটা রুমালে জড়িয়ে টান দিয়ে তিনি হাঁক দিলেন, 'লেনা হো শংকর। .....আ যা কৈলাসকে রাজা।' দম দিয়ে মালবীবাবার দিকে কল্‌কেটা এগিয়ে দিলেন। 'বুড়ো বাবা এসো। দম লাগাও। রুটি হতে থাকবে, গোটা রাতটাই তো আমাদের' দম দিয়ে চরস ও গাঁজার খোঁজে তিনি পাহাড়ে চলে গেলেন।'

চলতে চলতে তিন জন যমুনোত্রীতে পৌঁছে গেলেন। যমুনোত্রী উঁচু পাহাড়ে ঘেরা একটি ছোট মতো জায়গা। এই পাহাড়ের একটা দিক খোলা। সেখান থেকে কয়েকশো ফুট উঁচুতে বরফ থেকে সদ্যোজাত দুটি জলধারা নেমে এসে কিছুটা এগিয়ে এক হয়ে গিয়েছিল। বাঁদিকের জলধারার বাঁয়ে কিছুটা দূরে পাহাড়ের গোড়ায় হাত দেড়েক লম্বা ও ততটা চওড়া একটি কুণ্ড। এই হল যমুনোত্রীর তপ্ত কুণ্ড। কুণ্ডের গরম জলে রান্না করে খাওয়া তীর্থযাত্রীরা ধর্মাচার বলে মনে করে। 'আমরাও গামছায় আলু বেঁধে কুণ্ডের জলে ফেলে দিলাম। লুচি ভাজার জন্য যেমন কড়াইয়ে লেচি ছেড়ে দেওয়া হয় আমরাও তেমনি ছোট ছোট রুটি তৈরি করে গরম জলে ছেড়ে দিলাম। রুটি সেঁকা হয়েছে বোঝা যেত যখন জলের তলা থেকে রুটি ওপরে ভেসে উঠত।'

'যমুনোত্রীতে আমি বাজিন্দা ব্রহ্মচারীর সঙ্গ নিলাম। মালবীবাবার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হল।' এই হিমালয় যাত্রার কাহিনি কেদার ত্রিশ বছর পরে জেলে বসে লিপিবদ্ধ করেছিলেন (২৩-৪-৪০)। এই কাহিনি লেখার সময় তাঁর কোনো ম্যাপ ও কোনো নোট ছিল না। শুধু অসামান্য স্মৃতিশক্তির ওপরে নির্ভর করেই *মেরী জীবনযাত্রা*-র প্রথম খণ্ডটি লিখেছিলেন।

এভাবে দুজনে এগোতে লাগলেন। সঙ্গে আরেকটি লোকও জুটেছিল। ব্রহ্মচারী রান্নাবাড়ার ধার ধারতেন না। যে গ্রামে থাকতেন সেই গ্রাম থেকেই আহার্য যোগাড় করে নিয়ে আসতেন।

গঙ্গোত্রী গিয়ে নতুন অভিজ্ঞতা হল কেদারনাথের। তিনি দেখলেন গঙ্গোত্রীতে সাধুরা বড় বড় কাঠের গুঁড়ি দিয়ে ধুনি জ্বালিয়ে তার চারদিকে বসেছে ঃ কারুর মাথায় লম্বা পিঙ্গল জটা, নগ্ন দেহে বিভূতি, মালা ও ল্যাঙট। কারুর ল্যাঙট আবার লাল। কারুর ঘাড় পর্যন্ত বাদামি চুল নেমে এসেছে। কানে স্ফটিকের রিঙ, কারুর ন্যাড়া মাথা ও গায়ে লম্বা কুর্তা। বেশভূষায় ভেদ থাকলেও একটা ব্যাপারে কোনো ভেদাভেদ ছিল না। তা হল গাঁজার রুমাল ও কল্‌কে। এই রুমালটি গরম কল্‌কেতে জড়িয়ে দম দিতে হত। তখন কেদার গাঁজার কল্‌কেতে দম দিতে শেখেননি। কিন্তু বড় উৎসুক হয়ে তিনি দেখছিলেন যে এক হাত থেকে আরেক হাতে গাঁজার কল্‌কে যাচ্ছে, বিচিত্র ভঙ্গি ও আওয়াজ করে দম দেওয়া হচ্ছে, গাঁজার কল্‌কের আগুন ফুরোবার আগেই নতুন কল্‌কে তৈরি হচ্ছে। সব সাধুই ঝোলা থেকে গাঁজা বার করে দিতে উৎসুক। এ ব্যাপারে প্রায় প্রতিযোগিতা লেগে গিয়েছিল। কেদার শুধু তাকিয়ে দেখছিলেন। সাধুরা ব্রহ্ম-বেদান্তের চর্চা করছিলেন না, গভীর পরিতৃপ্তিতে একটার পর একটা কল্‌কে উড়িয়ে দিচ্ছিলেন। ধুনিতেই সদাব্রতের আটা দিয়ে টিক্কর সেঁকা হচ্ছিল। আর নানা রকমের খোশগল্প চলছিল। সাধুদের এই স্বচ্ছন্দ, বেপরোয়া, উদার ও উদাসীন জীবনযাত্রা বেশ লাগছিল কেদারের। বেদান্ত বা ব্রহ্ম নিয়ে এই সাধুরা মাথা ঘামাচ্ছিলেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেদার এঁদের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হচ্ছিলেন। সাধুদের এই অনায়াস ভারহীন জীবনের নিশ্চিন্ততা হয়তো কেদারের হৃদয়ের কোনো একটি তন্ত্রীকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল।

কেদার ও ব্রহ্মচারী গঙ্গোত্রী থেকে কেদারনাথের পথ ধরেছিলেন। কিন্তু এই পথে কেদার ব্রহ্মচারীর সঙ্গে বেশি দূর যেতে পারেননি। কেননা কেদারের জ্বর হওয়ায় ব্রহ্মচারী তাঁকে ফেলে চলে গিয়েছিলেন। কেদার এতে আপশোশ করেছিলেন; কিন্তু ক্ষুণ্ণ হননি। রমতা সাধু ও বহতা জল থেমে থাকে না। সবই তো প্রারব্ধের ভোগ। প্রারব্ধের ভোগ কে খণ্ডাবে। এই তো নিয়ম। কিন্তু কেদারের ভাগ্য ভালো, কোটার এক শেঠ লোকজন নিয়ে কেদারনাথের দিকে যাচ্ছিলেন। কেদার তাঁর পাচক হয়ে তাঁরই সঙ্গে কেদারনাথ যাত্রা করলেন। পাচকের কাজটা কেদার পছন্দ করে নিলেন, কেননা তা না হলে তাঁকে ভিক্ষা করতে হত। কোটার এই গৃহস্থ তীর্থযাত্রীদের দলের সঙ্গে তিরযোগী নারায়ণ হয়ে আবার কেদারনাথের প্রধান সড়কে আসতে হল। গৌরীকুণ্ড এসে এই যাত্রীগোষ্ঠী থামল। রাতটা গৌরীকুণ্ডে কাটিয়ে গরম জলেব ঝরনায় স্নান করলেন কেদারনাথ। ধর্মশালায় নেপালের কোনো এক রানি ছিলেন। সব লোক তাঁর কাছে ভিক্ষা চাইতে যাচ্ছিল। দেখাদেখি কেদারনাথও গেলেন। সসংকোচে আস্তে আস্তে কয়েকবার বললেন, 'রানিজী কিছু মিলবে।' রানিজী কেদারকে কি দিয়েছিলেন কেদারের মনে পড়ে না। রাহুল লিখছেন, 'জীবনে দীনের মতো ভিক্ষা করার এই আমার প্রথম ও শেষ প্রয়াস।'

গৌরীকুণ্ড থেকে চড়াই দিয়ে তাঁরা লামবগড়ে পৌঁছোলেন। লামবগড় থেকে

কেদারনাথ পাঁচ-ছয় মাইল। কিন্তু লামবগড় থেকে রাস্তা মন্দাকিনী নদীর ডান দিকে। শুধু চড়াই আর চড়াই। শেষ পর্যন্ত মন্দাকিনীর পুল পেরিয়ে কেদারনাথ। কেদারনাথে গিয়ে কেদার কালী কমলীওয়ালার ধর্মশালায় ওঠেন। কেননা তাঁর সঙ্গের গৃহস্থ শেঠরাও এই ধর্মশালায় উঠেছিলেন। পাচকের কাজ ও শেঠেদের নির্দেশ মতো চলা কেদারের পছন্দ হয়নি। এই জীবন তো বন্দি জীবনের মতোই। কেদারের পছন্দ ছিল সাধুদের মতো বেপরোয়া পথ চলা। সুতরাং কেদার পাচকের কাজ ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন। ইতিমধ্যে কালী কমলীওয়ালার ধর্মশালার সদাব্রতের অধ্যক্ষ ধর্মদাসের দৃষ্টি পড়েছিল কেদারের ওপর।

ইতিপূর্বে কেদার যাগেশকে কেদারনাথে আসার জন্য চিঠি দিয়েছিলেন। একদিন হঠাৎ যাগেশ এসে উপস্থিত হলেন। কয়েকদিন সেখানে থাকার পর স্থির হল যে, কেদার ও যাগেশ বদরিনাথ হয়ে হরিদ্বার চলে যাবেন। সেখানে বাবা ধর্মদাসও যাবেন এবং কেদার ও যাগেশের সংস্কৃত শেখার বন্দোবস্ত করে দেবেন। তারপর তাঁদের তাঁর চেলা করে নেবেন।

কেদারনাথ থেকে গুপ্তকাশী এবং গুপ্তকাশী থেকে উখীমঠ। শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত যোশীমঠ হয়ে তাঁরা বদরিনাথে এসে কালী কমলীওয়ালার ধর্মশালায় উঠলেন। বদরিনাথের মোহন্ত ধর্মদাসের চেলা হওয়াটা ভালো চোখে দেখেননি। আসলে পারস্পরিক ঈর্ষা ছিল। তিনি বললেন ধর্মদাস তো লেখাপড়া জানেন না। তিনি শুধু তোমাদের চেলা করে নেবেন। তারপর বলবেন, মাথা মুড়িয়ে দিয়েছি। ভিক্ষে করে খাও। শেষ পর্যন্ত যাগেশও হরিদ্বারে যেতে রাজি হলেন না। অতএব তাঁরা রামনগরের পথে বেনারসে ফিরে চললেন। তাঁরা বেনারসে সংস্কৃত শেখার জন্য উতলা হয়ে উঠলেন। অতি দ্রুত উতরাইয়ের পথে নেমে গেলেন তাঁরা। *মেরী জীবনযাত্রা*-য় রাহুল লিখেছেন, 'যেদিন রামনগরে পৌঁছোলাম সেদিন আমরা একদিনে চল্লিশ মাইল হেঁটেছিলাম।'

দ্বিতীয় অধ্যায়

জ্ঞানান্বেষণ

বেনারসে পড়াশোনা ঃ চক্রপাণি ব্রহ্মচারী

বেনারস পৌঁছে তাঁরা কোথায় উঠবেন তা নিয়ে খোঁজাখুঁজি করছিলেন। তুলসীঘাটে পৌঁছে তাদের সঙ্গে বেঁটেখাটো মধ্যবয়সি চক্রপাণি ব্রহ্মচারীর সঙ্গে দেখা হল। তাঁর মুখে বসন্তের দাগ, কপালে ত্রিপুণ্ড্র, বিভূতি, গলায় বড় বড় রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে গঙ্গাজলভরা তামার ঘটি; কেদার পাঠশালা খুঁজছেন শুনে তিনি বললেন, 'আমার সঙ্গে এস।'

ব্রহ্মচারীর সঙ্গে কেদার ও যাগেশ মোতীরামের বাগানে চলে গেলেন, মোতীরামের বাগান ব্রহ্মচারীর আশ্রম। কিন্তু এখানে পাঁচ-সাত দিনের বেশি থাকতে পারেননি কেদার ও যাগেশ। ইতিমধ্যে কেদারের বাবা খবর পেয়ে গিয়েছিলেন। তিনি এসে তাঁদের ধরে নিয়ে গেলেন। স্থির হল কেদার বছওয়লে পিসেমশাইয়ের কাছে থেকে সংস্কৃত শিখবেন।

১৯১০-এর অক্টোবরের শুভ মুহূর্তে সরস্বতীর পূজো করে কেদার 'লঘু কৌমুদী' পড়তে শুরু করলেন। কিন্তু সেখানে আড়াই মাসের বেশি পড়াশোনা করা হল না। কেদার প্রয়াগে প্রদর্শনী দেখতে চলে গেলেন। তারপর কী ঘটেছিল কেদারের মনে নেই। কিন্তু ১৯১১-র মার্চে কেদার নিশ্চিতরূপে বেনারসের মোতীরামের বাগানেই ছিলেন। মোতীরামের বাগানে এবং ব্রহ্মচারী চক্রপাণির আশ্রিত হয়ে কেদারের সংস্কৃত শিক্ষা শুরু হল। আরো কিছু ছাত্রকে ব্রহ্মচারী রাখতেন। খাওয়া হত এক মাড়োয়ারি শেঠের সত্রে। এই সত্রে ছাত্রদের যোগ্যতার ভিত্তিতে দান করা হত এবং পরীক্ষার পর ছাত্রদের বেছে নেওয়া হত। মাসের খরচ বাবদ ছাত্রদের গম, ডাল, নুন, দেশলাই ও আগুন জ্বালানোর কাঠ দেওয়া হত। আরো ছাত্র ছিল সেখানে; বহু ছাত্র খেতে পেত। সাধারণভাবে বলা চলে যে কাশীতে সংস্কৃত শিক্ষার্থী ছাত্রদের থাকা খাওয়া ও শিক্ষা লাভের জন্য কোনো খরচই লাগত না। *মেরী জীবনযাত্রা*-য় ব্রহ্মচারী চক্রপাণি ও তাঁর গরু কৃষ্ণা, মংগনীরাম ব্রহ্মচারী ও অন্যান্য ছাত্রদের অনুপুঙ্খ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। চক্রপাণির কেদারের প্রতি বিশেষ স্নেহ ছিল ; কারণ কেদার মেধাবী, পরিশ্রমী ও বিনয়ী ছাত্র ছিলেন। ব্রহ্মচারী মংগনীরামকে কেদার অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর সারা শরীরে একটা গেরুয়া গামছা থাকত। নিরাকাঙ্ক্ষ, অকৃত্রিম, বিদ্বান, বেদান্ত-উপনিষদবিদ মংগনীরামের স্পর্শ যাঁরা পেতেন তাঁরা আলোকিত হতেন। কেদার যখনই মংগনীরামের কাছে যেতেন তখনই তাঁকে প্রণাম করতেন। তিনি বলতেন 'নারায়ণ'।

ব্রহ্মচারীর সঙ্গে মোতীরামের বাগানে এসে কেদার বুঝতে পারলেন যে ছাত্রদের

কাছাকাছি রাখা এবং তাদের পড়াশুনার সুযোগ করে দেওয়া চক্রপাণিজির ব্যসনের মতো ছিল। তাঁর অনেকটা সময় কেটে যেত গরু কৃষ্ণার সেবায়। মোতীরামের বাগানের ছাত্রদের কথা অনুসারে, কৃষ্ণা রাজভোগ ভোগ করছিল। তার কাছে চক্রপাণি ব্রহ্মচারী তাঁর পূর্বজন্মের ঋণ শোধ করছিলেন। ঘাস-ভূষি-তুষ ছাড়া তার রোজ দু-তিন সের অন্ন মিলে যেত। তার বোতলের মতো ঝকঝকে শরীরের কোথাও হাড় দেখা যেত না; রোম ছিল ভৈরবজির কালো রেশমের গলার সুতোর মতো। সকালে উঠেই কৃষ্ণার দানাপানি দিয়ে ও দুধ দুইয়ে ব্রহ্মচারী গঙ্গায় (তুলসীঘাটে) স্নান করতে চলে যেতেন। সেখান থেকে ফিরে এসে আসনে বসে চোখে চশমা এঁটে (ঐ সময়ে তাঁর বয়স ৪৫-এর বেশি ছিল) কিছু পূজা-পাঠ করতেন। সম্ভবত নর্মদেশ্বরের দুয়েকটা স্তোত্র তাঁর পূজার অন্তর্গত ছিল। তারপর ফুলের সাজি নিয়ে তিনি উত্তরদিকের শিবালয়ে শিবের মাথায় ফুল-বেলপাতা (বাগানে অনেক বেলগাছ ছিল) চড়াতেন। অবশেষে সুর করে গোস্তোত্র পড়ে কৃষ্ণার মাথায় চন্দনের টিকা ও ফুল দিতেন। তারপর তিনি কৃষ্ণার সামনের পায়ের খুরে মাথা রেখে প্রণাম করতেন। নর্মদেশ্বরের আরতি করার সময় কৃষ্ণারও আরতি করা হত। কৃষ্ণাকে এত ভক্তি ও সেবা করার পরও কখনো কখনো দানাপানি দেওয়ার সময়, বিশেষত দুধ দোয়ার সময় সে পা চালিয়ে দিত। ব্রহ্মচারীরও রাগ চড়ে যেত এবং দুয়েকটা ডাণ্ডা ঝেড়ে দিতেও তাঁর বাধত না। কেদারের মনে হয়েছিল যে দেবতাও যদি চব্বিশ ঘণ্টা তাঁর সঙ্গে থাকতেন তা হলে তাঁকেও এই ধরনের ব্যবহারের মুখোমুখি হতে হত।

কেদার 'লঘু কৌমুদী' দিয়ে পড়াশোনা শুরু করলেন। বেদের অধ্যয়ন শুরু করলেন এক গুজরাতি বৈদিক ব্রহ্মচারীর কাছে। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে চক্রপাণি ব্রহ্মচারী কেদারের স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখতেন। মোতীরামের বাগানের ছাত্রদের মাসে কম করেও দশ দিন নিমন্ত্রণে যেতে হত। বেদপাঠক বলে কেদারের নিমন্ত্রণ হত বেশি। নিমন্ত্রণের অর্থ সাধারণ ডাল রুটি খাওয়া নয়। লুচি, ক্ষীর, হালুয়া, মালপোয়া, লাড্ডু, জিলিপি, নানা ধরনের মিষ্টি, দই, রায়তা আরও অন্যান্য অনেক খাবার দেওয়া হত।

প্রাণ বাজি রেখে তান্ত্রিক সাধনা

এ সময়ে কেদার অত্যন্ত শিবভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। গলায় বত্রিশটি বড় রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে ভস্মের ত্রিপুণ্ড্র। রুদ্রাষ্টাধ্যায়ীর অনেক অধ্যায় ও মহিম্ন স্তোত্র তাঁর মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। গঙ্গাস্নান, বিশ্বনাথ দর্শন তো ছিলই। এদিকে তান্ত্রিক মন্ত্রতন্ত্রের প্রতিও কেদার শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠেছিলেন। কোনো মন্ত্র অথবা দেবতার সিদ্ধির জন্য নেপালিবাবা স্বামী পূর্ণানন্দজিকে তিনি ধরেছিলেন। পূর্ণানন্দজি তাঁকে নয় দিনে নয় লক্ষবার সিংহবাহিনী দুর্গার মন্ত্র জপ করতে বললেন। পূর্ণানন্দের কথা অনুযায়ী- ক্রীং হ্রীং ক্লীং মন্ত্র রুদ্রাক্ষের মালায় নয় লক্ষ বার নিয়ম অনুযায়ী জপ করলে সিংহবাহিনী দুর্গা-ভক্তের সামনে আবির্ভূতা হবেন। তখন তাঁর কাছে ধর্ম, অর্থ, মোক্ষ, কাম এই চার ফল চেয়ে নেওয়া

যাবে। অবশ্য জপ করতে হবে যথাবিহিত অনুষ্ঠান করে। ঘরের মধ্যিখানে ষট্‌কোণ তৈরি করে তার কেন্দ্রে ওঁ এবং ছয় কোণে 'ক্রীং হ্রীং ক্লীং ফট স্বাহা' লিখতে হবে। ভোরে অন্ধকার থাকতে গঙ্গাস্নান ও ধূপ দিয়ে চক্রের পূজো করতে হবে। তারপর নয় লক্ষবার জপ করতে হবে। কেদার তাই করতে শুরু করলেন। চক্রপাণি ব্রহ্মচারী শুধু একবার কৃষ্ণার এক সের দুধ জ্বাল দিয়ে এবং তাতে এক ছটাক ঘি মিশিয়ে দিয়ে যেতেন। রাত্রিতে কয়েক ঘণ্টা ঘুম ছাড়া অখণ্ড জপ চলত। সন্ধ্যায় একবার চক্রপাণি ব্রহ্মচারী আসতেন দুধ নিয়ে। তখন তাঁর সঙ্গে দেখা হত; কথা নয়। তিনি ছাড়া অন্য কোনো মানুষের সঙ্গে দেখা হত না। এভাবে আটটি দিন ও রাত কেটে গেল। নবম দিনের সূর্যাস্ত থেকেই কেদারের বুক দুরু দুরু কাঁপছিল। জপ শেষ করে পূজো করার জন্য কেদার অন্যান্য সামগ্রীর সঙ্গে ধুতুরার ফলও এনেছিলেন। কিন্তু জপ শেষ করার পরেও জগদম্বা দেখা দিলেন না। কেদারের মনে হল তিনি সঠিকভাবে আচার অনুষ্ঠান করতে পারেননি বলেই মা দেখা দিলেন না। তাই অনেক চিন্তাভাবনা করে স্থির করলেন যে তিনি এ জীবন আর রাখবেন না। দুটো ধুতরো ফলের বীজ মিছরির সঙ্গে বেটে গিলে ফেললেন। তারপর ছাদে গিয়ে শুয়ে রইলেন। এতে কেদারের মৃত্যু অনিবার্য ছিল। কিন্তু একটি লোক ছাদে এসে অজ্ঞান অবস্থায় তাঁকে দেখে তাঁকে নামিয়ে নিয়ে যান এবং তারপর অনেক লোকজন মিলে তাঁর জ্ঞান ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করেন। ভাগ্যক্রমে পরদিন যাগেশ এসে যায়। জ্ঞান ফিরতে দু-তিন দিন লেগেছিল। কিন্তু চোখ ভালো হতে অনেক সময় লেগেছিল। *মেরী জীবনযাত্রা*-য় রাহুল লিখছেন, 'এভাবে প্রাণকে বাজি রেখে আমি মন্ত্র সাধনা করেছিলাম।'

কেদারকে কিছুদিন স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য বাড়ি যেতে হল। বাড়ি থেকে সুস্থ হয়ে ফিরে এসে কেদারের দেবদেবী মন্ত্রতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস অনেকটা শিথিল হয়ে গিয়েছিল। ফিরে এসে কেদার আবার লেখাপড়ায় মন দিলেন। ঐ সময়ে বড় পণ্ডিত, সূক্ষ্ম তার্কিক ও নাস্তিক রাম অবতার শর্মা আসায় ছাত্রমণ্ডলী ও পণ্ডিতমহলে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। কেদার একদিন তাঁর কথা শুনতে গিয়েছিলেন। রাহুল *মেরী জীবনযাত্রা*-য় বলেছেন যে তাঁর কোনো স্থায়ী প্রভাব তাঁর ওপর পড়েনি। কেদার স্থির করেছিলেন সংস্কৃতের সঙ্গে ইংরেজিও পড়বেন। তাই ইংরেজি স্কুলে নাম লিখিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর অর্থকৃচ্ছ্রতা চলছিল। এ সময়ে কেদারের কাছে একটি নতুন প্রস্তাব এল। ছাপরার কাছে পরসার বৈরাগী মঠের মোহান্ত বেনারসে এসেছিলেন মন্দিরের জন্য পাথর কিনতে। কেদারকে দেখে তাঁর খুব পছন্দ হল। তিনি কেদারকে শুধু তাঁর শিষ্যই নয়, মঠের মোহান্ত পদের উত্তরাধিকারী করে নিতে চাইলেন। কেদার ভাবলেন পরসা মঠের মোহান্তের উত্তরাধিকারী হিসাবে তিনি লেখাপড়া করার সুযোগ পাবেন। পরসায় চলে গেলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

পরসা ঃ বৈরাগী সাধু রামউদার দাস

কেদার পরসায় এসে মন্ত্র দীক্ষা নিয়ে বৈরাগী সাধু হয়ে গেলেন। নাম হল রামউদার দাস। পরসায় কেদারের কাজ হল ঘোড়ায় চড়ে অথবা ফিটনে ঘুরে বেড়ানো, পূজা-আর্চা অথবা সাধুদের বিশেষ বুলি শেখা। কিন্তু সংস্কৃত ও বেদান্ত শেখার কোনো নাম-গন্ধই ছিল না পরসা মঠে। মঠে তাঁর জন্য আরামের ব্যবস্থা ছিল। তাঁকে স্নান করানোর, পা টেপার, তেল মাখাবার চাকর ছিল। বেশভূষাও ছিল রাজপুত্রের মতো; মেরজাই, সূক্ষ্ম কাজ করা শান্তিপুরি ধুতি, দিল্লি-অলা লাল জুতো। রোদে বেরোলে চাকর মাথায় ছাতা ধরত।

মোহান্তজি নিজের সম্প্রদায়ের আচার-ব্যবহার কেদারকে শেখাতে লাগলেন। আর সত্যি অনেক কিছু শেখারও ছিল। পায়খানা করার সময় মাথায় হাত দিয়ে বসা চলবে না। পায়খানা সেরে ফেরার পথে ডান হাতে লোটা ধরা চলবে না। হাত ধোয়ার সময় বাঁ হাত মাটি দিয়ে পাঁচ বার ধুতে হবে। তারপর ডান হাত পাঁচ বার মাটি দিয়ে ধুতে হবে এবং শেষে পাঁচবার দুই হাত ধুতে হবে। পা-ও মাটি মাখিয়ে ধুতে হবে। মাটিতে এক আঁজলা জল ফেলে তবে লোটা মাটিতে রাখতে হবে। ছুরি নয়, চাকু বলতে হবে। সবজি কাটা নয়, 'অমনিয়া করনা' বলতে হবে। এই ধরনের একটি আলাদা শব্দসূচি তাঁকে শিখে নিতে হল। কেননা অনেক বাবুশাহী বা গৃহস্থবুলি সাধুদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। রাহুল লিখছেন, 'এই সময়েই এই মহাকাব্য শুনেছিলাম—বারহ বরষ রহে সাধু কী টোলী, তবে পাওয়ে এক টুটহী বোলী।'

তাছাড়া তাঁকে আরো কিছু শিখতে হয়েছিল। কোনো নতুন মঠে অথবা সাধুর কাছে গেলে আসল-নকল বোঝার জন্য ধাম-ক্ষেত্র বিষয়ক জ্ঞান সম্পর্কে প্রশ্ন করা হত। এই সব প্রশ্নোত্তর যা গুরুজি রামউদারকে শিখিয়েছিলেন তা হল ঃ

'আপনার স্থান কোথায়, মহাত্মা?'

'পরসা।'

'আপনার গুরু মহারাজের নাম কি?'

'শ্রীশ্রীশ্রীলক্ষ্মণদাসজী মহারাজ।'

'কোন আখড়া আপনার'?

'দিগম্বর।'

'কোন দ্বারা?'

'সুরসুরানন্দ।'

এরপর রামউদার একেবারে টাকশালি (খাঁটি) সাধু হয়ে গেলেন। বিনা পয়সায় ভারত পর্যটনের এই ছিল সে যুগের সাধুদের চাবি-কাঠি।

সাধু হওয়ার পরও রামউদারের কী ধরনের ঈশ্বরানুরাগ ছিল তা বোঝা যাবে তাঁর পূজার পদ্ধতি থেকে। *মেরী জীবনযাত্রা* থেকে তাঁর পূজার কিছুটা তুলে দেওয়া যাচ্ছে ঃ

'কখনো কখনো পূজার ভার আমার ঘাড়ে এসে পড়ত। মন্দিরের সবগুলি শালগ্রামকে একত্র করলে তাদের ওজন হত পাঁচ মন। তাই পাঁচ মন শালগ্রামকে বড় থালায় দুই কলস জলে একটা একটা করে ধোয়া আমার সাধ্যাতীত ছিল। সৌভাগ্যবশত স্নান ও শৃঙ্গারের সময় মন্দিরের দরজায় পর্দা টাঙানো থাকত। আমি প্রত্যেকটি শালগ্রামকে আলাদা না ধুয়ে এক অঞ্জলি জলে ডুবিয়ে রাখতাম। তারপর কোনো রকমে তাদের ওপর চন্দন তুলসি দিয়ে রাখতাম।....আমার কাছে শালগ্রামগুলি কালো কালো মসৃণ পাথরের বেশি কিছু ছিল না। তাড়াতাড়ি পর্দা সরিয়ে দিলে সন্দেহ হতে পারে তাই একটি শালগ্রামের সঙ্গে আরেকটিকে লড়িয়ে দিতাম (ঠোকাঠুকি করতাম)।'

কেঁদার পরসায় এসেছিলেন সংস্কৃত ও বেদান্ত পড়তে। কিন্তু অল্পদিনেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, পরসায় আর যাই হোক লেখাপড়া হবে না। রামউদার এখানে মঠের জমিদারির তত্ত্বাবধান করতেন ঘোড়ায় বা ফিটনে চড়ে। ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াতেন এবং প্রয়োজন হলে মঠের জন্য কেনাকাটা করতে যেতেন। রামউদার পরসা মঠে এসেছেন জানতে পেরে তাঁর বাবা ও বছওয়ল-এর পিসেমশাই এলেন এবং তাঁকে কয়েকদিনের জন্য কনৈলা নিয়ে যাওয়ার অনুমতি আদায় করে নিলেন। অতএব কয়েকদিনের জন্য রামউদারকে কনৈলা যেতে হল। এ সময় থেকেই পিতা-পুত্রের মধ্যে লুকোচুরি খেলা শুরু হয় বলা যেতে পারে। রামউদার যাতে বাড়ি থেকে পালিয়ে না যেতে পারে, সেজন্য নানা ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রথমত তাঁর ওপরে সতর্ক দৃষ্টি ছিল। তার ওপর পিসেমশাই পরামর্শ দিয়েছিলেন যে গ্রাম্য জীবন কেদারের ভাল লাগে না বলেই সে বারবার বাড়ি থেকে পালাচ্ছে। তাঁকে শহুরে জীবনের সুখসুবিধা দিতে হবে। তাহলে সে আর পালাবে না। বাবা কেদারকে ঘরে ধরে রাখার জন্য ভালো খাওয়া-দাওয়া, সাজ-পোশাকের ব্যবস্থা করে দিলেন। সারা বছর বসে খেতে পারা যায় এতটা সম্পত্তি দিতে চাইলেন। কেদার জানতেন যে তাঁর বাবা তাঁকে একেবারেই বুঝতে পারেননি। তাই ঐহিক সুখের লোভ দেখাচ্ছেন। রাহুল লিখেছেন, 'তাঁর কথা শুনে আমার রাগ হয়নি। আমার শুধু মনে হয়েছিল যে আমার মনের কথা তাঁকে বোঝানো কত কঠিন। জ্ঞানেরও যে খিদে থাকতে পারে, বিস্তৃত জগৎকে দেখারও যে খিদে থাকতে পারে, শিক্ষিত, বিদগ্ধ সমাজে থাকারও যে খিদে থাকতে পারে যা পেটের খিদের চেয়ে হাজারগুণ বেশি এবং যা সদা অতৃপ্ত থেকে যায় এই সব কথা আমি তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করতাম। কিন্তু কনৈলায় তাঁর চোখের সামনে থাকলেই তিনি এই সব কথা মানতে রাজি ছিলেন।'

অতএব কনৈলা থেকে পালিয়ে পরসায় চলে গেলেন রামউদার। কিন্তু পরসায়

থাকাও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ 'আমার পক্ষে পরসায় বাস বৌদ্ধিক অনশন।' তাই আবার বাজিন্দার গুনগুন শুরু হল। আবার পলায়ন।

ভারত পরিভ্রমণ

এবার কেদার ট্রেনে পুরী চলে গেলেন। তাঁকে পুরী নিয়ে গেলেন উকিল যোগেশ্বরী-শরণ। তিনি পুরী, রামেশ্বর ও দ্বারকা দর্শনের জন্য বেরিয়েছিলেন। পুরী যাওয়ার সময় কেদারকে তাঁর সঙ্গে নিলেন। পুরী থেকে কেদার ট্রেনে যেতে চাইছিলেন না, কিন্তু উকিল সাহেব তাঁকে প্রায় জোর করেই ট্রেনে মাদ্রাজ নিয়ে গেলেন। অবশ্য কেদার বিনা টিকিটেই গেলেন। মাদ্রাজ থেকে আবার রাত্রিতে উকিল সাহেবের সঙ্গে কেদার রওনা হয়ে গেলেন। তিনি কেদারকে তাঁর সঙ্গে ট্রেনে যাওয়ার জন্য জবরদস্তি করছিলেন। এবার কেদার সৈদাপটের টিকিট নিয়েছিলেন। গাড়ি ছাড়ার পর চেকার সৈদাপটের টিকিট দেখে কেদারকে ট্রেন থেকে নামিয়ে দিলেন। কেননা গাড়ি সৈদাপটে থামবে না। কেদার উকিল সাহেবের হাত থেকে রক্ষা পেলেন। অন্য প্লাটফর্ম থেকে ট্রেন ধরে রাত্রি দশটা-এগারোটা নাগাদ সৈদাপটে পৌঁছোলেন কেদার।

কেদার শুনেছিলেন যে দক্ষিণের তীর্থস্থানগুলিকে 'দিব্যদেশ' বলা হয়। তাদের সংখ্যা কয়েকশো। এইসব তীর্থস্থানে রামানুজপন্থী সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনীদের বাস। এখানে অনেক উত্তর ভারতের সাধুও থাকতেন। এভাবে পায়ে হেঁটে চলতে চলতে কেদার তিরুমিশীতে শ্রীহরিপ্রপন্নাচার্যের কাছে পৌঁছে যান। দক্ষিণে উত্তর-ভারতীয় সাধুদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে প্রভাবশালী ছিলেন। শ্রীহরিপ্রপন্নাচার্য বালিয়া জেলার লোক। বালিয়া ছাপরা জেলার কাছাকাছি, তাই কেদার ও শ্রীহরিপ্রপন্নাচার্যের মধ্যে পারস্পরিক আত্মীয়তার বোধ জন্মেছিল। শ্রীহরিপ্রপন্নাচার্য কেদারকে যেতে দিলেন না। তাঁকে তিরুমিশীতে থেকে ন্যায়, বেদান্ত, মীমাংসা ও কাব্য পড়তে বললেন। কিছুকাল কেদার তিরুমিশীতে থেকে গেলেন এবং তিরুমিশীর সংস্কৃত পাঠশালায় পড়াশোনা করতে লাগলেন। হরিপ্রপন্নাস্বামী চাইছিলেন কেদার তিরুমিশীতেই থেকে যাক এবং শেষ পর্যন্ত হরিপ্রপন্নাস্বামীর শিষ্য হয়ে তিরুমিশীর মোহান্ত হোক। এ সময়ে শ্রীরঙ্গম থেকে তিরুমিশী এলেন নব্য ন্যায়ের বড় পণ্ডিত শ্রীভাগবতাচার্য। তাঁর কাছে কিছুদিন ন্যায় পড়লেন কেদার। শ্রীভাগবতাচার্যের স্নেহ পেয়েছিলেন তিনি। তিনি হরিপ্রপন্নাচার্যের প্রস্তাব সমর্থন করলেন। শেষপর্যন্ত বাধ্য হয়ে হরিপ্রপন্নাস্বামীর কাছে কেদারকে বাসুদেব মন্ত্র (ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়) নিতে হল।

তিরুমিশীতে মাস তিনেক ছিলেন কেদার। অঘ্রান মাস নাগাদ তিরুমিশী থেকে তিনি তিরুপতির কাছে তিন্নানুরের মহোৎসবে রওনা হলেন। কেদারের দক্ষিণের তীর্থ-পর্যটন শুরু হল।

কেদার তিরুপতির বৈরাগী মোহান্তরাজের মঠে উপস্থিত হলেন। তিরুপতি থেকে বালাজীর পর্বত আট-দশ মাইল দূরে পাহাড়ের ওপর। তিরুপতির বৈরাগী সংস্থার

মূলমঠ বালাজীতে। মঠের বাইরের ভাগে একটি কুটিরে কেদার জায়গা পেলেন। পাশের ঘরে একজন আত্মভোলা সাধুর সঙ্গে দেখা হল কেদারের। প্রকৃত ঘুমক্কড় (ভবঘুরে) ছিলেন এই সাধুটি। তিনি রোজ দু-চার ক্রোশ দূরে জঙ্গলে চলে যেতেন। কোমরে জড়ানোর কাপড়, কমণ্ডলু, একটা শিক, গাঁজার কলকে, রুমাল ও দেশলাই তাঁর ঝোলায় থাকত। তিনি মোরাদাবাদের মতো কোনো শহরের বাসিন্দা ছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি 'কৃষ্ণ কন্‌হাইয়া তুমহীতোহো' বলে গান ধরতেন। তাঁর যাযাবর মন কেদারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এনে দিল। বিকেলে অনেক দূরে বেড়াতে চলে যেতেন কেদার ও এই সাধু। এ পর্যন্ত কেদার গাঁজা ও রুমাল এড়িয়ে চলেছেন। কিন্তু তিনি আর এই দুটিকে এড়িয়ে চলতে পারলেন না, কেননা তা হলে তো এই সাধুর সঙ্গে তাঁর মজার সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যেত। তিরুমিশীতে বাসুদেব মন্ত্র নেওয়া সত্ত্বেও কেদারের দ্বিধা ছিল। তিরুমিশীতে আর ফিরে যাবেন কিনা তা নিয়ে তিনি ভাবছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি স্থির করলেন যে তাঁর পক্ষে তিরুমিশীতে ফিরে যাওয়া উচিত হবে না কেননা দক্ষিণ দেশ তাঁর কর্মস্থল হতে পারে না। ইতিমধ্যে তিনি পরসার মোহান্ত মহারাজকে টাকার জন্য টেলিগ্রাম করেছিলেন। টেলিগ্রাম মানিঅর্ডারে টাকা এসে গিয়েছিল।

বালাজীতে কয়েকদিন থেকে তিরুপতি ফিরে এলেন কেদার। আবার যাত্রা শুরু হল। এখন আর তিনি ভিখিরির মতো চলছিলেন না। সঙ্গে টাকা ছিল। হাতে পাঁচ টাকা থাকতেই তিনি আবার টেলিগ্রাম করে দিতেন। পঁচিশ টাকার মানিঅর্ডার চলে আসত। বালাজীতে বেশ ভালোই ছিলেন কেদার। কিন্তু তবু বালাজী ছেড়ে যেতে হল। কেননা এক জায়গায় এক বছর থাকলে হাজার হাজার বছর বেঁচে থাকা দরকার।

তিনি বালাজী থেকে তিরুপতিতে ফিরে এলেন। এখন কেদারের কাছে টাকা থাকত; কিন্তু টাকা খরচ করে বেড়ানোর মধ্যে ভ্রমণের আসল স্বাদ পাওয়া যায় না। 'পায়দলে' নিঃসম্বল ভ্রমণেই প্রকৃত মজা, যেমন 'লঙ্কার ঝালই আসল স্বাদ'। তিরুপতি থেকে কেদার রানিগুণ্টা হয়ে স্বামী কার্তিকের দিকে গেলেন। তারপর চিঙ্গলপট ও পক্ষীতীর্থ। উত্তর ভারতের সাধুরা দক্ষিণের অধিকাংশ তীর্থের নাম পালটে দিয়েছে। এইসব তীর্থের আসল তামিল নাম কেদারের জানা ছিল না। পক্ষীতীর্থ থেকে কাঞ্চিপুরে গিয়ে সেখানের শিবকাঞ্চি, বিষ্ণুকাঞ্চি প্রভৃতি মন্দিরগুলিতে গিয়েছিলেন কেদার। তারপর শ্রীরঙ্গম ও মাদুরা হয়ে রামেশ্বরম্। রামেশ্বরমের রেলের পুল তখনও তৈরি হয়নি। সেখানে যেতে হল স্টিমারে। রামেশ্বরম থেকে কেদার ধনুষ্কোটিতে যান। পথে যুবক সাধু ব্রহ্মচারী দয়াশঙ্করের সঙ্গে দেখা হল। ব্রহ্মচারীর শরীরে লম্বা আলখাল্লা, মাথায় ছোট মতো গামছা, হাতের পিতলের কমণ্ডলুতে একটি শঙ্খ। তিনিও ধনুষ্কোটিতে যাচ্ছিলেন। বাড়ি মথুরাতে। ধনুষ্কোটিতে 'রত্নাকর' ও 'মহোদধির' সঙ্গমে স্নান করলেন কেদার। রাত্রিটা সেখানেই কাটালেন।

ফেরার পথে আবার ব্রহ্মচারী দয়াশঙ্করের সঙ্গে দেখা হল। ব্রহ্মচারী কয়েক মাস

দক্ষিণে এসেছেন। পামনে থাকেন এবং বৈদ্যের কাজ করেন। ব্রহ্মচারী কেদারকে তাঁর সঙ্গে পামনে নিয়ে গেলেন। পামন রামেশ্বর দ্বীপের অন্তিম বসতি। ব্রহ্মচারীর সঙ্গে থাকাকালীনই তিনি গাঁজায় দম দিতে শুরু করেন। কেননা ব্রহ্মচারীর আশ্রমে দিনরাত গাঁজার কলকে জ্বলত। 'সকালে যখন ঘুম ভাঙ্গত, তৈরি গাঁজার কলকে পেতাম। একটি কলকে নিভে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি জ্বলত। রাত্রিতে ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত এই অবস্থা চলতে থাকত। আমার মনে হয় রাত্রিতে তিন-চার ঘণ্টা মাত্র আমার মস্তিষ্ক গাঁজার নেশা থেকে মুক্ত থাকত।' অবশ্য গাঁজার কলকেতে তিনি দম দিতে শিখেছিলেন বালাজীর সেই ভবঘুরে সাধুর কাছ থেকে। পামনে কিছুদিন থেকে কেদার রামনদে চলে গেলেন। রামনদেও ব্রহ্মচারীর একটা আস্তানা ছিল। সাধুদের খাইয়ে-দাইয়ে ব্রহ্মচারীর খুব আনন্দ হত।

বাঙ্গালোর থেকে তিনি হুস্‌পেট গেলেন। উদ্দেশ্য বিজয়নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখা। হুস্‌পেটের ধর্মশালায় কিছু 'খড়িয়া পল্‌টন-এর সঙ্গে দেখা হল।' 'খড়িয়া পল্‌টন'-এক ধরনের সাধুর বিশেষ নাম। অনেক স্ত্রী-পুরুষ কোনো সম্প্রদায়ের নিয়ম অনুযায়ী দীক্ষা না নিয়েই সাধুর বেশ তৈরি করে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। এদের আচারব্যবহার ও বেশভূষা সাম্প্রদায়িক নিয়ম মতো হয়না। তাই তারা সম্প্রদায়ের বাইরে থেকে সাধুদের দেখে তাদের নকল করে। নকল করতে হলেও সাধুদের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, যা খুব সূক্ষ্ম তা জানা জরুরি। কিন্তু এতে তাদের অভিজ্ঞতার অভাব প্রকাশিত হত। সাধুরা দেখেই বুঝে নিত এরা ভণ্ড সাধু। কাঁধের দুইদিকে লটকানো ঝোলাকে বলে খড়িয়া। কোনো সম্প্রদায়ের সাধুই তা ব্যবহার করে না। 'এই সব সাধুরা খড়িয়া নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তাই ওদের নাম 'খড়িয়া পল্‌টন' হয়ে গেছে। সাধুদের মধ্যে যারা স্ত্রীলোক তারা স্ত্রী সন্ন্যাসিনীদের সঙ্গে এবং যারা পুরুষ তারা পুরুষ সাধুদের সঙ্গে চলাফেরা করে। খড়িয়া পল্‌টন এই নিয়ম থেকে নিজেদের মুক্ত বলে মনে করত। তাদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ দুইই থাকত।'

হুস্‌পেট থেকে কেদার বিজয়নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে যাত্রা করলেন। পথে যখন তিনি হেঁটে যাচ্ছিলেন তখন এক শাহ্‌ সাহেবের (মুসলমান ফকির) সঙ্গে দেখা হল। 'তিনি হাত তুলে 'দরশন সফা' বললেন, আমিও 'মিজাজে বফা' বলে জবাব দিলাম। হিন্দু-মুসলমান সাধুদের পারস্পরিক সম্ভাষণের এই রীতি। শাহ্‌ সাহেব সাগ্রহে আমাকে বসালেন এবং গাঁজার কলকে তৈরি করলেন। কলকেতে টান দিতে দিতে কথাবার্তা চলতে লাগল। শাহ্‌ সাহেব উত্তর ভারতেরই কোনো জায়গার লোক। দক্ষিণের মুসলমানদের খাওয়াদাওয়া, ভাষা ও কথাবার্তা সম্পর্কে তাঁর কড়া অভিযোগ ছিল।' তিনি বলছিলেন—'তেঁতুল আর লঙ্কা, তোবা তোবা, কমবখ্‌তেরা খাওয়ার তরিকা পর্যন্ত জানে না।' বিজয়নগরের প্রাচীরের কাছে একটা পরিত্যক্ত পাথরের ঘরে কিছু সাধু পাঁচ সাত দিন ধরে ছিলেন। তাঁরা রামউদারকে ডেকে নিলেন। গোসাই (সন্ন্যাসী), উদাসী, বৈরাগী সম্প্রদায়ের লোক সেখানে জড় হয়েছিল। সাধুরা সবাই জটাধারী, বিভূতি মাখা,

মাঝখানে কাঠের ধুনি জ্বলছিল। তার চারদিকে সাধুরা বসেছিলেন। রামউদারও সেখানে বসলেন। গাঁজার কলকে ও কথাবার্তা চলছিল। সবাই পুরনো লোক। দুনিয়া ঘুরে তাঁরা সারা জীবন কাটিয়েছেন। ধুনিতে আটার মোটা রুটি (টিক্কর) সেঁকা হল। তরকারি অথবা ডাল ছিল কিনা মনে নেই রামউদারের।

পরদিন বিজয়নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখে হস্‌পেট স্টেশনে ট্রেন ধরে রামউদার বাগলকোটের বৈরাগী মঠে চলে যান। সেখান থেকে গান্ধাপুরন্দর ও বিট্‌ঠল নাথের মন্দির দেখে পুনা, বোম্বাই, নাসিক, ত্র্যম্বক, ওঙ্কারনাথ, মান্ধাতা, উজ্জয়িনী, ডাকোর, আমেদাবাদ হয়ে পরসায় ফিরে আসেন।

মান্ধাতা থেকে যখন তিনি রওনা হন তখন তার সঙ্গে এক যুবক নাগা সাধু ছিলেন। মুসলমানি যুগে মঠাধিকারী ও ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় স্বার্থ রক্ষার জন্য ফৌজি পদ্ধতিতে নিজেদের সংগঠিত করেছিল। মুসলমান শাসনের সময় আজকালের মতো হিন্দু-মুসলমান ঝগড়া হতে পারত না। তার বদলে হিন্দুরা নিজেদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ঝগড়া করত। বারো বছর পর পর হরিদ্বার, প্রয়াগ, উজ্জয়িনী ও নাসিকে চার চঢ়াও (কুম্ভমেলা) হত, যাতে যাত্রীদের সংখ্যা কয়েক লাখে পৌঁছে যেত। বৈরাগী দশনামি (গোঁসাই অথবা সন্ন্যাসী) ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের হাজার হাজার সাধু জোট বেঁধে কুম্ভমেলায় যেত। সংখ্যা ও প্রতিপত্তির দিক থেকে বৈরাগী ও সন্ন্যাসী এই দুই সম্প্রদায় এগিয়ে ছিল। সেইজন্যেই কুম্ভমেলায় প্রথম স্নান করার অধিকারের জন্য এরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করত। কবীরের সময় থেকে বৈরাগীদের প্রতিপত্তি শুরু হয়। তাই ষোড়শ শতাব্দী শেষ হয়ে যাওয়ার আগে তারা যে সন্ন্যাসীদের সঙ্গে লড়াইয়ের উপযুক্ত হয়নি তাতে সন্দেহ নেই। মনে হয়, এদের কলহ শুরু হয় সতেরো শতকের গোড়ার দিকে। খুব বেশি পেছিয়ে গেলেও এর আরম্ভ হুমায়ুন-শেরশাহের সময় পর্যন্ত যেতে পারে।

'চঢ়াও-এর (কুম্ভমেলার) ঝগড়ায় মার খেয়ে প্রত্যেক সম্প্রদায়ই নিজেদের মজবুত করতে শুরু করে এবং প্রত্যেকের সশস্ত্র সাধারণ যুদ্ধশিক্ষাপ্রাপ্ত সেনা গড়ে উঠতে থাকে। বৈরাগীদের দিগম্বর, নির্বাণী, নির্মোহী প্রভৃতি সাতটা আখড়া এবং সন্ন্যাসীদেরও নিরঞ্জনী ইত্যাদি আখড়া তৈরি হয়। আখড়ায় যে সব যুবক সাধু নাম লেখাতো তাদের নাগা বলা হত। বর্শা, দুদিকে লোহা-বাঁধানো লাঠি, তরবারি-বল্লম চালানোর নিয়মিত শিক্ষা দেওয়া হত তাদের। বৈরাগী আখড়ায় যে সব ছেলেরা ঢুকত তাদের হুড়দংগা বলা হত। বারো বছর আখড়ায় শিক্ষা নেওয়ার পর কোনো কুম্ভমেলায় পঞ্চায়েত তাদের নাগা বানাতো। সেই সময় তারা সূচিশিল্প শোভিত ঝাণ্ডা-নিশান (দিগম্বরদের পাঁচ রঙা এবং অন্যদের ভিন্ন ভিন্ন রঙের) রাখার ও ওড়ানোর অধিকারী হত। বারো বছরের নাগা হওয়ার পর তারা 'অতীত' নাম পেত। এইসব আখড়ার পাশে মাহাত্ম্যপূর্ণ স্থানে অনেক মঠ ও সম্পত্তি থাকত যার সব বিধিব্যবস্থার অনেক কিছুই এক মোহান্তের হাতে না থেকে থাকত পঞ্চায়েতের হাতে এবং সত্যি সত্যি সঙ্ঘের শক্তির নির্ণায়ক হত।'

'নাগা-'অতীত'রা নিজেদের আখড়া ছাড়াও এক চঢ়াও থেকে আর এক চঢ়াও-এ

জোট বেঁধে পায়ে হেঁটে যেত। তাদের কাছে উট থাকত। যে মঠে এই নাগারা যেত, তাদের খাওয়ানো-দাওয়ানো ছাড়াও নিজেদের সম্প্রদায়ের পলটন্ মনে করে কিছু ভেটও দিতে হত। নাগাদের মধ্যে এখানে নিজেদের শিষ্যদের চেয়েও সাদিক শিষ্যদের প্রাধান্য হত। জ্ঞান বৈরাগ্যের জন্য এদের তৈরি করা হয়নি। এরা ছিল মেলা ও অন্য সময়ে সুযোগ পেলে আখড়ার ঝাণ্ডা উঁচু রাখার জন্য। মরতে ও মারতে এরা কাউকেই ভয় পেত না।'

আহমদাবাদের জমাল দরওয়াজার বাইরে কিছুটা দূরে নরসিংহ রাওয়ের মন্দির সাধুসেবার জন্য বিখ্যাত ছিল। রামউদার সেখানে গিয়ে ধুনির পাশে বসে যান। তিনি লক্ষ্য করছিলেন যে, ধুনি তাঁকে খুব আকৃষ্ট করছে। সে কি শুধু গাঁজার কলকের জন্যে? তা নয়। গাঁজাখোর ভাঙখোরেরাই প্রথম শ্রেণির ভবঘুরে হয়ে থাকে। তাদের কাছেই দেশদেশান্তরের কথা বেশি শুনতে পাওয়া যায়। তাদের অভিজ্ঞতার কথা শুনেই তিনি পরবর্তী যাত্রার প্রোগ্রাম তৈরি করতেন। কাশ্মীর, কুলু, কাথিয়াওয়াড়, ছত্রিশগড়, অমরকণ্টক, আসামের দুর্গম তীর্থগুলির কথা ধুনির সামনেই শোনা যেত। মঠে থাকলে গুজরাতে সাধু হিসেবে গৃহস্থ বাড়িতে নিমন্ত্রণ হত। অনেক সময় গৃহস্থেরা মঠে খাদ্যসামগ্রী পাঠিয়ে দিত। নিমন্ত্রণ করলে কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে সাধুদের মিছিল বেরোত। সঙ্গে দামি পতাকা থাকত।

গুজরাতের নডিয়াদে একটা বৈরাগী মঠে রামউদার কয়েকদিন ছিলেন। নডিয়াদে মোহান্তের বৈঠকখানায় চমৎকার সোফাসেট, গদি-আঁটা চেয়ার, ঝাড়-লণ্ঠন, ছবি-টাঙানো। রামউদার জানতে পারলেন সবই মোহান্তজির প্রেয়সীর দান। গুজরাতের বৈরাগী মঠের অধিকাংশ মোহান্ত ও স্বত্বাধিকারী উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের লোক। এখানে মোহান্তরা অনায়াসে প্রেয়সী পেয়ে যান। অধিকাংশ প্রেয়সী কুলীন বিধবা। নডিয়াদ থেকে ডাকোর-এ যান রামউদার। সেখানে পরসার মোহান্তের মানিঅর্ডার ও টেলিগ্রাম অপেক্ষা করছিল। টেলিগ্রামে জরুরি আহ্বান ছিল। ডাকোর থেকে রতলাম, ভূপাল, কাটনি, প্রয়াগ, কাশী হয়ে তিনি পরসায় পৌঁছন।

পরসায় এসময়ে মঠের জমির জরিপের কাজ হচ্ছিল। তা দেখাশোনার জন্যই মোহান্ত মহারাজ রামউদারকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। জরিপের কাজ শেষ করে রামউদার আবার পরসা ছেড়ে পালালেন। এবার অযোধ্যায় এলেন তিনি। অযোধ্যাতে এসে নানা ধরনের হিন্দু সাম্প্রদায়িক ধর্ম কিছুদিন দেখে বেড়ান। একটি সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সম্প্রদায়টি সখী মতাবলম্বী। এদের মধ্যে অনেকে দাড়ি গোঁফ কামিয়ে একেবারে স্ত্রী বেশে থাকত। চলনে-বলনে হুবহু মেয়েদের অনুকরণ করত এরা। এদের গলার স্বরও ছিল মেয়েলি। তবে অনেকে লম্বা দাড়ি গোঁফ ও চুল রাখত; তবুও ভেতরে ভেতরে এরা সখী মতাবলম্বী ছিল। এদের বিশ্বাস ছিল যে একমাত্র ভগবানই পুরুষ; কোনো ব্যক্তি পুরুষভাব রেখে কখনোই ভগবানে ভক্তি লাভ করতে পারে না। তাই ভগবানে ভক্তির জন্য সখীভাবের পূর্ণ সাধনার প্রয়োজন। প্রত্যেক সখী

মতাবলম্বীর স্ত্রীলিঙ্গসূচক গোপন নাম থাকত; যেমন—লবঙ্গলতা, অনঙ্গলতা, ইত্যাদি।

রামউদার কয়েকদিন অযোধ্যায় ঘুরে বেড়িয়ে বেদান্তের পাঠশালায় ভর্তি হলেন। এখানে কিছুদিন বেদান্ত শেখার পর বৈরাগী সাধুদের শক্তিদেওয়ালি মন্দিরের পাণ্ডাদের সঙ্গে সংঘাত হয়। তাতে রামউদারও ছিলেন। শেষপর্যন্ত এই নিয়ে পুলিশ চলে আসে। এ সময় রামউদার স্বামী দয়ানন্দের আর্যসমাজের নাম শুনেছিলেন। কিন্তু তিনি আর্যসমাজ-বিরোধী ছিলেন। অযোধ্যায় বৈরাগীদের সঙ্গে থাকতেও আর মন লাগছিল না। তাই কয়েকদিনের জন্য তিনি আবার দেশে ফিরে গেলেন। কিন্তু সেখানেও তাঁর মন টিকল না। প্রয়াগে চলে গেলেন, আবার প্রয়াগে কয়েকদিন কাটানোর পর তিনি কী করবেন, কোথায় যাবেন এই সমস্যা তাঁকে ভাবিয়ে তুলল। তাঁর ইচ্ছা ছিল, নিজে রোজগার করে পড়াশোনা করবেন। এ সময়ে এক ব্যক্তি তাঁকে পরামর্শ দিলেন আগ্রায় আর্যসমাজী ভোজদত্তের বিদ্যালয়ে যেতে। সেখানে থাকা, খাওয়াদাওয়া ও পড়াশোনার জন্য কোনো টাকা লাগে না। বক্তৃতা দেওয়াও শেখানো হয়।

আর্যসমাজী রামউদার দাস

অতএব ১৯১৫ এর জানুয়ারিতে রামউদার আগ্রায় ভোজদত্তের আর্য মুসাফির বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে গেলেন। এই আর্যসমাজী বিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও আরবি ভাষার সঙ্গে খ্রিস্টান, মুসলমান ও হিন্দুদের প্রধান প্রধান সম্প্রদায়ের দুর্বল রীতিনীতি ও সিদ্ধান্তের এবং আর্যসমাজের মুখ্য সিদ্ধান্তের শিক্ষা দেওয়া হত। প্রতিদিন সন্ধ্যায় শাস্ত্রালোচনা হত এবং বক্তৃতা দেওয়ার পদ্ধতি শেখানো হত। কিছুদিনের মধ্যেই বৈরাগী রামউদার-বাবা আর্যসমাজী রামউদার বাবা হয়ে গেলেন। তিনি আর্যসমাজের মতবাদ প্রচারের জন্য ইতস্তত ভাষণ দিতে লাগলেন। এমনকি খ্রিস্টান মিশনারি ও মুসলমান মৌলানাদের সঙ্গে বিতর্কে যোগ দিতে লাগলেন। এসময় থেকেই তিনি নিয়মিতভাবে আর্যসমাজের 'মুসাফির' কাগজের অফিসে চলে যেতেন। তিনি সেখানে 'লিডার' 'আর্য গেজেট' 'প্রকাশ', 'হিন্দুস্তান' ও 'দেশ'-- এইসব লাহোরের কাগজ নিয়মিত পাঠ করতেন। এখানে ক্রমাগত শাস্ত্রালোচনা হত এবং তিনি খবরের কাগজে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান ও আর্যসমাজী পণ্ডিতদের মধ্যে যে শাস্ত্রালোচনার সংবাদ প্রকাশিত হত তা খুঁটিয়ে পড়তেন।

আর্যসমাজীরা ঋষি দয়ানন্দের বাণী, বৈদিক ধর্ম ও আর্যসমাজের সিদ্ধান্তসমূহ সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য শিক্ষিত মিশনারি তৈরি করতে চাইছিল। আর্যসমাজী মিশনারিদের শিক্ষিত করে তোলার জন্য খ্রিস্টীয় মিশনারিদের স্বার্থত্যাগ ও সাহসিকতার এবং জাপান-চীন-তিব্বত মধ্য-এশিয়ার দুরূহ রাস্তায় বহু শতাব্দী পূর্বের বৌদ্ধ ও ভিক্ষুদের কথা বলা হত। রামউদার ও তাঁর সহযোগী ছাত্ররা আর্য মুসাফির বিদ্যালয়কে ছোটো-খাটো নালন্দা বলে মনে করত। ধর্মপ্রচারের শিক্ষা শুধু মৌখিক ছিল না। শহরের বাজারে ও সড়কে আর্যসমাজী বৈদিক ধর্ম প্রচারের জন্য ছাত্রদের পাঠানো হত।

এ-সময়ে রামউদারের ভেতরে একটি অস্থিরতা ছিল। কারণ সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন চলছিল এবং কামাগাতামারুর প্রচণ্ড ঘটনা ঘটেছিল। রামউদার জাতীয়তা ও ধর্মকে আলাদা মনে করতেন না। ধর্ম বলতে তখন তিনি বুঝতেন, আর্যসমাজ ও স্বামী দয়ানন্দ স্বীকৃত বৈদিক ধর্ম। খ্রিস্ট, ইসলাম, ইহুদি ও বৌদ্ধ ধর্মই শুধু নয়, হিন্দু ধর্মের অনেক সম্প্রদায়কে তিনি মিথ্যে ধর্ম বলে মনে করতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, এই সব ধর্ম বেদ ও বিজ্ঞানের আলোয় শীঘ্রই লুপ্ত হয়ে যাবে। তাঁর বিশ্বাস ছিল, তর্ক ও বিচারের দ্বারা অন্যান্য ধর্ম-বিশ্বাসীদের বৈদিক ধর্মের আলোয় নিয়ে আসা যাবে। তাই তিনি মুসলমান ও খ্রিস্টীয় প্রচারকদের সঙ্গে সুযোগ পেলেই তর্ক ও বিচারে লিপ্ত হতেন।

আগ্রায় শিক্ষা শেষ হবার পর নানা জায়গায় কিছুদিন ঘোরাঘুরি করে রামউদার লাহোরে চলে এলেন। লাহোরে আসার পর রামউদারের মনে হল, যেন তিনি একটি বিশাল জগতে প্রবেশ করেছেন। এখানে তাঁর সঙ্গে আর্যসমাজের পরবর্তীকালের বিখ্যাত মানুষদের বন্ধুত্ব হয়। যেমন 'আর্য গেজেট'-এর সম্পাদক খুর্সন্দ, ভাই মহেশপ্রসাদ, গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থী ইত্যাদি। তাছাড়া লাহোরে ইংরেজি কাগজ 'ট্রিবিউন' বার হত। লাহোরে ইচ্ছে মতো খবরের কাগজ বিশেষত 'ট্রিবিউন' পড়ার সুযোগ মিলে গেল; এবং তিনি ডি. এ. বি. কলেজ ও আর্যসমাজের বিখ্যাত পণ্ডিত ভগবদ্দত্ত ও পণ্ডিত রামগোপাল শাস্ত্রীর সংস্পর্শে আসেন। তাঁদের বিদ্যা, অনুসন্ধিৎসা ও জিজ্ঞাসা তাঁকে নতুনভাবে অনুপ্রাণিত করে। আর্যসমাজের লেখাপড়া সমাপ্ত হবার আগেই রামউদার ও অন্যান্য কয়েকজন ছাত্র মিশনারি তৈরি করার জন্য একটি বিদ্যালয় খোলার চেষ্টা করেন। একটি বিদ্যালয় খোলাও হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অর্থাভাবের জন্য এই স্কুল টেকেনি।

১৯১৮ নাগাদ রামউদার ঠিক করলেন, তিনি শাস্ত্রী-পরীক্ষায় বসবেন। ইতিমধ্যে তাঁকে আবার একবার পরসায় যেতে হল। কেননা তখনও জরিপের কাজ চলছিল। এই জরিপের কাজের তত্ত্বাবধানের জন্য রামউদার পরসা চলে গেলেন এবং জরিপের কাজ ভালোভাবে সম্পূর্ণ করে তিনি আবার পরসা থেকে পালালেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছিল। রামউদার খবরের কাগজে আসক্ত ছিলেন। তিনি দেশবিদেশের রাজনৈতিক খবর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তেন। রুশ বিপ্লব ও সাম্যবাদ, ভারতের রাজনৈতিক বিপ্লব এই ছিল তাঁর প্রিয় বিষয়। সাম্যবাদের উপর কোনো বই পড়ার তখনো তাঁর সুযোগ হয়নি। কিন্তু এ বিষয়ে অনেক চিন্তা ও তর্ক-বিতর্কে তিনি অংশ নিতেন। কিন্তু তখনো তাঁর সাম্যবাদী মনকে আর্যসমাজের ধর্মের উদার ব্যাখ্যার সঙ্গে তিনি মেলাতে পারতেন। কয়েকবছর ভালোভাবে পড়াশোনা করে চীন ও জাপানে বৈদিক ধর্ম প্রচারে যাওয়ার জন্য রামউদার ব্যাকুল হয়েছিলেন। নতুন অভিজ্ঞতা ছাড়াও মানুষ নিরন্তর বদলায়। এই তত্ত্ব তখনো রামউদারের মনে আসেনি। লাহোরে যে কয়জন ছাত্র ডি. এ. বি. কলেজ থেকে শাস্ত্রী-পরীক্ষায় বসেছিল তাদের একজনও পাশ করতে পারেনি। রামউদারও পাশ করেননি। পরে তিনি জব্বলপুর থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'মধ্যমা' পরীক্ষায় প্রথম শ্রেনিতে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ও পরবর্তীকালের মার্শাল-ল-এর সময় ব্রিটিশের অত্যাচার তাঁকে অগ্নিময় করে তুলেছিল। হত্যাকাণ্ডের সময় রামউদার লাহোরে ছিলেন না। কিন্তু মার্শাল-ল্-এর সময় তিনি লাহোরে গিয়েছিলেন, তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে কে জীবিত আছে কে নিহত হয়েছে তা জানার জন্য। লাহোরে গিয়ে দেখলেন, জায়গায় জায়গায় ফৌজি আদেশ টাঙানো : লোকজন কখন হেঁটে যেতে পারবে, তাদের কখন শুতে হবে, দোকানদারকে কী দামে জিনিসপত্র বেচতে হবে, অন্যথায় কী দণ্ড হবে ইত্যাদি। এ সময়ে পাঞ্জাবের লেফটেনান্ট গভর্নর ও'ডায়ারের হৃদয়হীনতার সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়ার সুযোগ মিলেছিল। নিরস্ত্র, স্ত্রী-পুরুষ, শিশু ও বৃদ্ধদের ওপর যে অত্যাচার সে করেছিল তার কথা শুনে রক্ত টগবগ করে ফুটতে থাকত। মিউজিয়মের দিকে মার্শাল-ল-এর আদালত বসত। যেসব লোককে বন্দি করা হয়েছিল তাদের ভাগ্যে কী আছে জানার জন্য তাদের হাজার হাজার আত্মীয় জমা হত। নিরপরাধের ফাঁসি ও লম্বা লম্বা সাজার রায় শুনে কেদারের মতো লোকদের নিজেদের অসহায়তার জন্য রাগ ও গ্লানি হত। 'ভগবানে বিশ্বাস এখনও আমার একেবারে নষ্ট হয়ে যায়নি। তা হলেও ভাবতাম—তাঁর ন্যায়বিচার এখন হচ্ছে না কেন? আজ এই আদালতের ওপর বজ্র পড়ছে না কেন? প্রথমে গুলিগোলা বর্ষণ করে ও বিমান থেকে গুলি করে কচিকচি শিশুদের রক্তে হাত লাল করে ফাঁসি, যাবজ্জীবন কারাবাসের হুকুম যারা দিচ্ছে সেই সব আততায়ীর জিভ কেন হাজার টুকরো হয়ে খসে পড়ছে না? এই অত্যাচারী জাতির নৌবহর মহাযুদ্ধে চিরতরে ডুবে যায়নি কেন?'

আবার উড্ডীন হলেন রামউদার : দক্ষিণের তীর্থ পর্যটন

লাহোর থেকে তিনি কর্বী চলে যান এবং কর্বী থেকে চিত্রকূট ও আশেপাশের পাহাড়ে ও সাধুদের আশ্রমে কিছুদিন ঘুরে বেড়ান। চিত্রকূট থেকে দণ্ডকারণ্যে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল তাঁর। কিন্তু ঘুমক্কড়ীর ভূত আবার তাঁকে পেয়ে বসে এবং তিনি কর্বী হয়ে বিনা টিকিটে ট্রেনে জলন্ধর যান এবং সেখান থেকে কাশী চলে যান। কাশী থেকে সারনাথ। সারনাথের পুরনো ধ্বংসাবশেষ ও অশোকস্তম্ভই প্রধান দর্শনীয় স্থান ছিল। সারনাথ থেকে পরসা হয়ে তিনি আবার গোরখপুরের পথ ধরলেন। এসময় থেকেই তিনি তাঁর বিখ্যাত পোষাক কালো কম্বলের আলখাল্লা পরতে শুরু করলেন। সঙ্গে থাকত দুটি ল্যাঙট, একটি গামছা। একেবারে খাঁটি কালী কমলীওয়ালা। জল খাওয়ার জন্য হাতে থাকত একটি কমণ্ডলু। খালি মাথা ও খালি পা। তিনি পরসা থেকে কসয়া এবং তারপর বুদ্ধের নির্বাণস্থানে (মাথাকুঁঅর) গেলেন। সেখানে শিশুগাছ তার সদ্যোজাত কোমলপাতা ছড়িয়ে ভূমিকে ঢেকে দিয়েছিল। রামউদার বুদ্ধের জীবনী পড়েছিলেন। অবশ্য মূল প্রাচীন ভাষায় নয়। বুদ্ধের পূত চরণের স্পর্শ পেয়েছে—সেই ভূমিতে পা দেওয়ার সময় আড়াই হাজার বছর আগের সেই মহান ভারতীয়ের জন্য তাঁর হৃদয় উন্মুখ হয়ে উঠেছিল, সেই মহান ভারতীয় যিনি তাঁর জন্মভূমির নাম সারা জগতে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন

এবং জগতের এক-তৃতীয়াংশ মানুষের জন্য ভারতকে পূণ্যভূমি বানিয়ে দিয়েছিলেন।

মাথাকুঁঅর থেকে ফিরে এসে তিনি গোরখপুরে চলে যান এবং গোরখপুর থেকে তিনি গৌতমবুদ্ধের জন্মস্থান রুম্মিনদেই (লুম্বিনী) পৌঁছোন। লুম্বিনীতে একটা ছোটো মতো মন্দির; মন্দিরের ভেতরে একটি ছোটো অস্পষ্ট মূর্তি। পেছনে অশোকের শিলাস্তম্ভ। মন্দিরের অঙ্গনে পাঁঠা, মুরগি ইত্যাদি প্রাণীদের বলির রক্তের রঙ লেগে ছিল। রুধিরে রক্তিম প্রাঙ্গণ। গৌতমবুদ্ধের জন্মস্থানে পশুবলি দেখে রামউদারের হৃদয়ে বড় লেগেছিল। লুম্বিনী থেকে কপিলাবস্তু (তিলৌরাকোট) যান রামউদার। সেখান থেকে ফিরে আসেন সহেট-মহেট অর্থাৎ পুরোনো জেতবন শ্রাবস্তীতে। তিনি জেতবনের কুটির ও শ্রাবস্তীর ধ্বংসাবশেষ দেখলেন; আবার গোরখপুর ও নরকোটিয়াগঞ্জ এবং সেখান থেকে লৌরিয়া-নন্দনগড়। এই লৌরিয়া-নন্দনগড়ও বৌদ্ধ পুণ্যভূমি। কিন্তু নওয়াজিন্দা রামউদারকে সোজা রাস্তায় চলতে দেয়নি। নন্দনগড় স্টেশন থেকে রকসৌল স্টেশনে নেমে রামউদার দেখলেন যে, নেপালি পুলিশ বাইরের লোককে নেপালে ঢুকতে দেয় না। তাই বীরগঞ্জের রাস্তায় এক বৈরাগী মঠে চলে গেলেন রামউদার। সেখানে এক রমতা সাধুর সঙ্গে দেখা হল। সে রুশ দেশের জ্বালামাই সম্পর্কে রামউদারকে বলেছিল যে, জ্বালামাই স্বয়ং আগুন। ভোগরাগ রেখে দিলে মা নিজের জিভ দিয়ে তা গ্রহণ করেন। সে বলছিল, জ্বালামাই থেকে কাশ্মীরের রাস্তায় পাহাড়ের পর পাহাড় পেরিয়ে সে নেপাল এসেছে। তার কথা সত্য বলে মনে হয়নি। কিন্তু তা অসম্ভবও ছিল না। রাশিয়ায় গৃহযুদ্ধ চলার সময় বাকু থেকে মধ্য-এশিয়া এবং সেখান থেকে চীনা তুর্কিস্তানের রাস্তায় অথবা সিধা কাশ্মীর হয়ে জম্মু, চম্বা, কুল্লু হয়ে অথবা লাদাখ থেকে মানস সরোবর হয়ে নেপাল পৌঁছোনো সম্ভব ছিল। দু-চার দিন অপেক্ষা করে রামউদার পাকদণ্ডি ও রেলের সড়ক ধরে ঘোড়া-সাইন চলে যান। সেখান থেকে সেমরোনগর। তারপর মাতামঢ়ী, মাটিহানী ও জনকপুর। জনকপুর থেকে পাটনা ফিরে এলেন। পাটনা থেকে নালন্দা, নালন্দা থেকে রাজগীর, রাজগীর থেকে গয়া ও বোধগয়া। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে ভাগলপুর হয়ে তাঁর মুর্শিদাবাদ যাবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তিনি পৌঁছে গেলেন রানাঘাট। একেবারে খাঁটি বাঙলায়। 'এখানকার লোকদের তেল-চোঁয়ানো টেরিকাটা চুল, পানে কালো হয়ে যাওয়া দাঁত, ম্যালেরিয়ায় ভাঙা স্বাস্থ্য।' রানাঘাটে এসে তাঁর মনে হয়েছিল যে তিনি ব্রহ্মপুত্রের তীরে এসেছেন। রামউদার বাঙলাদেশের সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। 'আকাশ মেঘে ভরে ছিল। চারদিকে সবুজ খেত ও গাছপালা দেখা যাচ্ছিল। শস্য-শ্যামলা মনোহারিণী বঙ্গভূমি এখন বর্ষার জন্য যৌবনবতী। বাংলা আমি কিছুটা পড়তে পারতাম। কিন্তু এখন পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র অথবা অন্য কোনো মহান উপন্যাসিকের লেখা পড়িনি। তাহলে হয়তো বাংলার প্রকৃতিকে দেখে আরো আনন্দ হত।'

রানাঘাট থেকে রামউদার শান্তিপুরের রাস্তা ধরে চলতে থাকেন। হাঁটতে হাঁটতে রামউদার ক্ষুধার্ত হয়ে একটি বাংলোর মতো বাড়িতে গিয়ে বেশ চড়া গলায় বৃদ্ধ গৃহস্বামীকে কিছু খেতে পাওয়া যাবে কিনা জিজ্ঞেস করেন। গৃহস্বামী তাঁকে ডেকে নিয়ে

চমৎকার সাজানো ড্রয়িংরুমে বসান। এই গৃহস্থের ঘরে প্রথম বাঙালি খাবার খেলেন রামউদার। প্রথমে তিনি কোনো দ্বিধা না করে সের দেড়েক কাঁঠালের কোয়া খেয়ে ফেললেন। তারপর রান্না করা খাবার খেলেন। বড় সুস্বাদু এই বাঙালি আহার। কমলা রংয়ের আচারের মতো একটা জিনিস ছিল, যা তাঁর অত্যন্ত ভালো লেগেছিল। দু-তিনবার জিনিসটা কেটে খাবার পর তিনি জানতে পারলেন যে সেটা গল্‌দা চিংড়ি। রাহুল লিখছেন, 'যা হোক 'হরেরিচ্ছা বলিয়সী।' মৎস্যাবতার ধারণ করে তিনি যদি সব জায়গায় পৌঁছতে থাকেন তবে আমি দুর্বল মনুষ্য কি করতে পারি।' আরো কিছুটা এগিয়ে গঙ্গা পার হয়ে তিনি নবদ্বীপ পৌঁছে যান। নব্যন্যায়শাস্ত্র নবদ্বীপের অসামান্য কীর্তি। কাশী এবং তার থেকেও দূরে নব্যন্যায়ের খ্যাতি পৌঁছেছিল। সম্প্রতি রামউদার নব্যন্যায়ের কিছু গ্রন্থ পড়েছিলেন, তাই সেখানে থেকে মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশের কাছে নব্যন্যায় পড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি। মহামহোপাধ্যায় সানন্দে তাঁকে পড়াতে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু নবদ্বীপে থাকা সম্ভব হল না রামউদারের। নবদ্বীপে প্রথম রাত্রিতেই মশার কামড় খেয়ে পরদিন সকালে কাউকে কিছু না বলে নবদ্বীপ থেকে ট্রেনে উঠলেন। সারা শরীরে মশার কামড়ের দাগ ; ডান হাতের তর্জনীর মাঝখানে একেবারে 'খুঁজলী' হয়ে গেল। এই 'খুঁজলী'-র দাগ তাঁর সারা জীবন ছিল।

নবদ্বীপ থেকে সোজা হাওড়া। হাওড়া থেকে পুরী হয়ে আবার তিরুপতি মঠে। সেখান থেকে আবার বালাজী। বালাজীতে সেই মস্তানবাবা 'কৃষ্ণ কানাইয়া তুম্‌হী তো হো'-কে পাওয়া গেল না। এই মস্তানবাবা বাতাসের মতো। পাখির মতো। বাতাস আর পাখি কখনও এক জায়গায় থাকে না।

বালাজী থেকে আবার তিরুমিশীতে দ্বিতীয়বার (১৯২০-২১)। কিন্তু সেখানে রামউদারের বেশিদিন থাকা সম্ভব হল না; কেননা তিরুমিশীর হরিপ্রপন্নাচার্য আবার তাঁকে মঠের মোহান্ত হওয়ার জন্য ধরে বসলেন। অনেক করে তাঁকে রামউদার বোঝালেন যে তিনি রাজনীতিতে যোগ দেবেন। তাঁর পক্ষে মঠের মোহান্ত হওয়া সম্ভব নয়। তবু তিরুমিশীতে রামউদার কিছুদিন ছিলেন। কেননা তিরুমিশীর বৃদ্ধ অধ্যাপকের কাছে তিনি 'অষ্টাদশ রহস্য' পড়লেন. রামানুজ সম্প্রদায়ের তিংগল ও বলহল এই দুই শাখার মধ্যে তিংগল শাখার অষ্টাদশ রহস্যের লেখক ছিলেন পিল্লোলোকাচার্য। এই রহস্য গ্রন্থ সূত্ররূপে 'মণিপ্রবাল' ভাষায় লেখা হয়েছে। ইতিমধ্যেই রামউদার তিন চারটি তামিল রিডার সমাপ্ত করেছিলেন; আর এই 'মণিপ্রবাল' (মনিমুংগা) ভাষার সত্তর-আশি শতাংশ বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ। তাই রামউদারের পক্ষে এই ভাষা বোঝা সহজ ছিল। এখানে তিনি রামানুজীয় বেদান্ত পড়েছিলেন। রামানুজ ভাষ্য ও তার টীকা শ্রুতিপ্রকাশিকা পড়ার সময় শঙ্কর বেদান্তের বিভিন্ন গ্রন্থ পড়ার সুযোগ হয়েছিল তাঁর। তিনি নিজে আর্যসমাজী হওয়ায় দ্বৈতবাদী রামানুজের সমর্থক ছিলেন। শঙ্কর ও রামানুজীয় বেদান্তের মধ্যে বিতর্কের ও গভীর অধ্যয়নের ফলে তাঁর মনে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জেগেছিল। দার্শনিক সিদ্ধান্ত অনুসারে রামানুজপন্থীরা শঙ্করকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলত। 'এ থেকে

বৌদ্ধধর্মের প্রতি আমার আকর্ষণ জন্মেছিল। বৌদ্ধধর্ম কী, এ বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক ছিল।' কিন্তু রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করায় এ সময়ে তিনি এ বিষয়ে সময় দিতে পারেননি।

তিরুমিশী ছেড়ে আর্যসমাজী প্রচারের জন্য তিনি কুর্গে চলে যান। সেখানে একটি আর্যসমাজী প্রচারকমণ্ডলী গড়ে তোলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে নাগপুর কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধির অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। অতএব তিনি এ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য উদ্বেল হয়ে উঠলেন। কিন্তু আর্যসমাজী প্রচার ছেড়ে কুর্গ থেকে যেতেও পারছিলেন না। ঠিক এই সময়ে একটি চিঠি তাঁর বাবার মৃত্যু সংবাদ বহন করে আনল। 'আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। কিন্তু আমার চোখে অশ্রুর কোনো চিহ্ন ছিল না। সঙ্গীদের আমি স্বাভাবিকভাবে বাবার মৃত্যুর কথা বললাম। অন্য কেউ কিছু না বললেও শ্রীপূবেয়া ভর্ৎসনা করে বললেন—'তোমার কি রকম হৃদয়, বাপের মৃত্যুর জন্য দু'ফোঁটা চোখের জল ফেললে না।'

বাবার মৃত্যু সংবাদ শুনে ছুটি নেওয়ার অজুহাত পেলেন রামউদার এবং রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ করার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি।

চতুর্থ অধ্যায়

পরিব্রাজকের রাজনীতিতে প্রবেশ (১৯২১-২৭)

রামউদার ছাপরাকেই তাঁর রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্র বলে নির্দিষ্ট করেছিলেন। তিনি ছাপরায় পৌঁছে দেখেন অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে, হাজার হাজার ছাত্র স্কুল-কলেজ ছেড়ে দিয়েছে, অনেক উকিল-ব্যারিস্টার প্র্যাকটিস বন্ধ করেছে। 'তিলক স্বরাজ ফান্ডে' এক কোটি টাকা জমা হয়েছে।

শোলাপুরে ইতিমধ্যে গুলি চলেছিল। তাই রামউদার সেখানে নামলেন। তারপর ছাপরায় পৌঁছোলেন। ইতিমধ্যে রামউদার ছাপরা কংগ্রেস কমিটির কাছে একটা চিঠি দিয়েছিলেন যে, তিনি যাচ্ছেন। ছাপরা কংগ্রেস কমিটি আঁচলা পরা কমণ্ডলু হাতে খালি মাথা, খালি পা এই সাধুকে দেখে খুশি হয়নি। কিন্তু রামউদার যখন বললেন যে তিনি পরসায় রাজনৈতিক কাজ করবেন, তখন তাঁরা আপত্তি করেননি। রামউদারের কংগ্রেসি কার্যকলাপে নিজস্ব একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। কংগ্রেসি আন্দোলনে তৃণমূল সংগঠনের ওপর জোর দেওয়া হয়নি। নেতাদের কার্যকলাপের উপরেই বিশেষ জোর দেওয়া হত। অতএব নেতারা জেলে চলে গেলেই কংগ্রেসি আন্দোলন অনেকাংশে স্তব্ধ হয়ে যেত। রামউদার গুরুত্ব দিয়েছিলেন তৃণমূল সংগঠনের ওপর। সুতরাং তিনি ছাপরা জেলার কয়েকটি থানায় তাঁর অনুরাগী কংগ্রেস কর্মীদের রেখে সব গ্রামে কংগ্রেসি সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। এতে তাঁর পক্ষে একটি বিরাট স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল।

এই সংগঠন গড়ে তোলার জন্য গ্রামবাসীদের সেবাকে তিনি একটি আবশ্যিক উপাদান বলে মনে করেছিলেন। এটা লক্ষ করা যায় ছাপরা জেলায় বন্যা পীড়িতদের সেবাকার্যের মধ্যে। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলার অর্থ সত্যাগ্রহের প্রস্তুতি। এই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী বে-আইনী বলে ঘোষিত হওয়ার পরেই রামউদারকে গ্রেপ্তার করা হল।

গ্রেপ্তার হওয়ার পর তাঁকে কয়েক দিন হাজতে রেখে বক্‌সার জেলে নিয়ে যাওয়া হয় (১৩ ফ্রেবুয়ারি —৯ অগস্ট ১৯২১)। *মেরী জীবনযাত্রা*-য় বক্‌সার জেলের জীবনের চমৎকার বর্ণনা করেছেন রাহুল। জেলে থাকার সময়টা তিনি পড়াশোনার কাজে লাগিয়েছিলেন। জেলের স্তব্ধ জগতে রামউদারের ওপর আবার জ্ঞানার্জনের ভূত সওয়ার হল। তিনি ইতিপূর্বে সাম্যবাদ সম্পর্কে খবরের কাগজে কিছু কিছু পড়েছিলেন। তা ছাড়া বলশেভিক বিপ্লব সম্বন্ধে তিনি আর কিছু জানতেন না। কিন্তু এ সময়েই তিনি ইউটোপিয়া 'বাইসবীঁ সদী'র পরিকল্পনা করেন ও বেদান্তসূত্রের হিন্দি টীকা লেখেন।

ছয় মাস পরে জেল থেকে বেরিয়ে তিনি ছাপরা জেলা কংগ্রেসের সেক্রেটারি হন (১৯২২)। তিনি যখন সেক্রেটারি ছিলেন তখন গয়ায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। গান্ধিজি সত্যাগ্রহ আন্দোলন বন্ধ করে দেওয়ায় স্বরাজ্য পার্টি ও গান্ধিজির অনুগামী দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল কংগ্রেস। রামউদারের সহানুভূতি ছিল পরিবর্তনবাদীদের দিকে অর্থাৎ স্বরাজ্য পার্টির দিকে। তিনি গয়া কংগ্রেসে বোধগয়ার মন্দিরটি বৌদ্ধদের হাতে সমর্পণ করার প্রস্তাব এনেছিলেন। কিন্তু স্বরাজ্য পার্টি ও গান্ধিজির অনুগামীদের মধ্যে ঝগড়ার ফলে এই প্রস্তাব কংগ্রেসে আলোচিত হয়নি।

ইতিমধ্যে নওয়াজিন্দা আবার রামউদারের কানে গুনগুন করছিল। অতএব একজন সঙ্গী নিয়ে দেড় মাসের জন্য তিনি নেপালে যাত্রা করেন (মার্চ-এপ্রিল ১৯২৩)। গয়া কংগ্রেসে ভারতের বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অর্থাৎ ইংরেজি, পালি ও সংস্কৃতে যাঁরা বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাদের বক্তৃতা হিন্দিতে ভাষান্তরণের কাজ করেছিলেন রামউদার। এই বহু ভাষাবিদ সাধুর কথা সর্বত্র প্রচারিত হয়েছিল। তাই নেপালে গিয়ে রাহুলের কোনো অসুবিধা হয়নি। নেপালের থাপা পল্লির মঠ থেকে সিধে আসত। সঙ্গী কৃষ্ণদাস রান্না করত এবং তাঁরা খাওয়া-দাওয়া করে পশুপতিনাথ, গুহ্যেশ্বরী, মহাবোধা, কাঠমান্ডু, পাটন প্রভৃতি বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান দেখে বেড়াতেন। নেপালে রামউদার দুই সপ্তাহ ছিলেন। থাপা পল্লি থেকে শিখরনারায়ণের নীচে একটি গুহায় রামউদার কিছুদিন কাটিয়েছিলেন। এক ব্রাহ্মণ গৃহস্থ তাঁকে রান্না করে খাবার দিয়ে যেত। এখানে তিনি দু সপ্তাহ ছিলেন। নেপালে আরও কিছুদিন তিনি থাকতে পারতেন এবং তাঁর ইচ্ছা হয়েছিল নেপাল থেকে তিব্বতে চলে যাবেন। কিন্তু তিব্বত যাওয়া হল না। কেননা তিনি কথা দিয়েছিলেন যে দেড়মাসের মধ্যে ছাপরা ফিরে যাবেন। ২২ মার্চ তিনি ছাপরা ফিরে গেলেন। সেখানে তাঁর জন্যে সরকারি ওয়ারেন্ট অপেক্ষা করছিল। এবার যেতে হল হাজারিবাগ জেলে (১৯২৩ এপ্রিল থেকে ১৯২৫)।

মেরী জীবনযাত্রা-য় হাজারিবাগ জেলের নানা ঘটনার যে বিবরণ রামউদার দিয়েছেন তা অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। হাজারিবাগ জেলের জীবন রামউদারের কাছে জ্ঞানার্জনের নিস্তব্ধ জীবন। হাজারিবাগ জেলে এ সময় স্বামী শঙ্করাচার্য ছিলেন। স্বামীজির কাছে উচ্চ বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি, অপটিক্স (দৃষ্টিশাস্ত্র) ইত্যাদি পড়া যখন শেষ হয়ে এসেছিল তখন শঙ্করাচার্য ছাড়া পেয়ে চলে গেলেন। স্বামীজি চলে যাওয়ার পর রামউদার 'বাইসবী সদী' লেখা শেষ করেন। লেখায় তিনি এত তন্ময় হয়ে যেতেন যে অনেক সময় রাত ভোর হয়ে যাওয়ার পর অথবা ঊষাকালে তাঁর কলম থামত। এই বই শেষ হয়ে যাওয়ার পর তিনি জ্যোতির্বিদ্যার একটি বড় গ্রন্থ ও গ্রহ-নক্ষত্রের একটি বড় চিত্র রচনা করেন। সময় কাটাবার জন্য সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিক তাঁকে কয়েকটি ইংরেজি উপন্যাস দিয়েছিলেন। তিনি উপন্যাস কয়টিকে স্বাধীনভাবে হিন্দিতে অনুবাদ করেন। পরে তা একসঙ্গে 'সোনেকী ঢাল' নামে ছাপা হয়। পড়াশোনা, জেলের সঙ্গীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও বিদ্যাচর্চায় এত দ্রুত সময় কেটে গেল যে রামউদার টেরই পেলেন না যে দু বছর

কেটে গেছে। হাজারিবাগ জেলে বসেই তিনি কিছুটা ফরাসি ও আবেস্তা পড়েছিলেন। হাজারিবাগ জেলেই তাঁর আর্যসমাজী মতবাদের প্রতি আস্থা ক্রমশ শিথিল হয়ে গিয়েছিল। বেদের অভ্রান্ততায় সন্দেহ হচ্ছিল এবং বৌদ্ধধর্মের প্রতি টান বাড়ছিল। এরই মধ্যে ১৮ এপ্রিল ১৯২৫ এসে গেল। ঠিক দু বছর পরে রামউদার হাজারিবাগ জেল থেকে ছাড়া পেলেন।

জেল থেকে বেরিয়ে রামউদার সর্বত্রই রাজনৈতিক শিথিলতার স্পষ্ট চিহ্ন দেখতে পেলেন। কংগ্রেসি নেতাদের মধ্যে নির্বাচনে দুর্নীতি, স্বজনপোষণ এবং আর্থিক সুযোগসুবিধার জন্য খেয়োখেয়ি, হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রামউদারের মনে রাজনীতির প্রতি এক ধরনের বিরাগ এনে দিয়েছিল। হিন্দু সংগঠন ও মুসলিম তঞ্জিমের জমানা শুরু হয়ে গিয়েছিল। রামউদারের মনে হল তিনি এই ধরনের রাজনীতির বাইরের লোক। অতএব আবার নওয়াজিন্দার গুনগুন। আবার হিমালয় যাত্রা।

লাদাখে প্রথমবার

প্রতিনিধি হয়ে রামউদার কানপুর কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। সেখান থেকে তিনি মিরাট চলে যান। মিরাট থেকে জানুয়ারির শেষে দিল্লি চলে গেলেন রামউদার। আবার সেই ঘুরে বেড়ানোর পুরোনো পাগলামি। লালকেল্লা, জুম্মা মসজিদ, তুঘলকের কেল্লা, অশোকস্তম্ভ, কুতুবমিনার ভালো করে দেখলেন। দিল্লি থেকে চলে গেলেন লাহোরে। সেখানে কিছু আর্যসমাজী ভাষণ দিলেন। আর্যসমাজের কিছু প্রভাবশালী নেতার সুপারিশে এবারের ভ্রমণে তাঁর উত্তর-পশ্চিম ভারত ঘুরে বেড়াবার এবং খাইবার গিরিবর্ত্ম, লাণ্ডিকোটাল পর্যন্ত যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। পাঞ্জাব ও সীমান্তপ্রদেশ ঘুরে তিনি শ্রীনগরে চলে যান। শ্রীনগরেও আর্যসমাজের মন্দিরে উঠেছিলেন। খেতে যেতেন ডাক্তার কুলভূষণের বাড়িতে। ডাক্তার কুলভূষণের সহায়তার ফলে লাদাখ যাওয়ার পারমিটও পেয়ে গেলেন রাহুল। শুধু তাই নয় কুলভূষণ লাদাখের এনজিনিয়ার রামরখামলকে চিঠি লিখে লাদাখে যাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। কারগিল-এ রামরখামল রামউদারের সঙ্গে লাদাখের তহশিলদার ও লেহ্-র পাঞ্জাবি মহাজনদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। লেহ্‌তে হোশিয়ারপুর জেলার লালা শিবরামজীর মতো কিছু লোকের দোকান চীনী-তুর্কিস্তানের কাশগার, ইয়ারকন্দ, খোটান শহরেও ছিল। রাহুলের খুব ইচ্ছা হয়েছিল চীনী-তুর্কিস্তানে চলে যাওয়ার। কিন্তু পাশপোর্ট না থাকায় যাওয়া হল না। এ সময় থেকেই সম্ভবত মধ্য-এশিয়ার অস্পষ্ট আহ্বান আসছিল রামউদারের কাছে। কিন্তু এখনই নয়। আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে রামউদারকে। মধ্য-এশিয়া রামউদাব নয়, রাহুল সাংকৃত্যায়নের কাছে ধরা দেবে।

কারগিল থেকে হেমিস। রামরখামল হেমিসের লামাকে রামউদারকে খাতির-যত্ন করার কথা বলে দিয়ে চলে গেলেন। তিব্বতিরা মাংস ছাড়া খেতে পারে না। কিন্তু হেমিসের লামা তাঁকে নিরামিষ রান্না করে পাঠাতেন, রুটি, শালগমের পাতার তরকারি,

দুধ, মাখন, দই প্রভৃতি। এখানে রামউদার বই পড়ে ও নিজের বুদ্ধিতে যে মেস্‌মেরিজম শিখেছিলেন তা দেখিয়ে হেমিসের লামাকে চমৎকৃত করে দেন। লেহ্‌ থেকে খর্দোঙ গিরিবর্ত্ম পেরিয়ে নুব্রা উপত্যকা দেখতে গেলেন। এদিক দিয়েই চীনী-তুর্কিস্তানের পথ গেছে। মনে হয় চীনী-তুর্কিস্তান রাহুলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছিল। কিন্তু রামউদারের পক্ষে তখন এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। এই পথেই চীনী-তুর্কিস্তান থেকে ভারতে চরস আসত। লাদাখের প্রচণ্ড শীতের জন্যেই রামউদার শ্রীনগর থেকে পশমি কাপড়-চোপড় নিয়ে এসেছিলেন। পায়ে ফেলটের মোজা ও ইয়ারখন্দি জুতা, মাথায় কান-ঢাকা টুপির ওপর পশমি চাদর ও শরীরে আলোয়ান জড়িয়ে তাঁবুতে ঘুমোতেন রামউদার। তিনি লাদাখে যাবেন। রাত্রি দুটো নাগাদ রামউদার ও তাঁর দুই সঙ্গীকে লাদাখ রওনা হতে হল। লাদাখে বরফে ঢাকা গিরিবর্ত্ম পার হওয়ার জন্য রাত দুটো উপযুক্ত সময়। কেননা তা হলে সূর্য ওঠার আগেই বরফের রাস্তা শেষ হয়ে যায়। রোদ বাড়লে বরফ নরম হয়ে যায়, মানুষ ও পশুর পা বরফের খাদে ঢুকে যায়। চৌদ্দ হাজার ফুট উঁচুতে আসল চড়াই শুরু হয়েছিল। সাদা বরফের ফরাসের ওপর দিয়ে যাচ্ছিলেন রামউদার ও তাঁর দুই সঙ্গী। চাঁদনি রাতে বরফ ঝকঝক করছিল। চারদিকে স্তব্ধতা, শুধু জানোয়ারদের নিঃশ্বাসের শব্দ। ঘোড়া আঁকাবাঁকা পথ ধরেছিল। তাতে চড়াইয়ের শ্রম লঘু হয়। পা মেপে মেপে অগ্রসর হচ্ছিল রামউদার ও তার দুই সঙ্গী এবং ঘোড়া। পনেরো হাজার, ষোলো হাজার, সতেরো হাজার ফুট। আঠারো হাজার ফুট উঁচুতে খর্দোঙ লা। খর্দোঙ লা তিব্বতের সবচেয়ে কঠিন গিরিবর্ত্মগুলির অন্যতম। এখানে তাঁরা ঘোড়া থেকে নামলেন। এক সঙ্গী এক টুকরো আদা দিয়ে বলল, 'এখানে এটা খেলে ভাল হয়, এতে বিষাক্ত ভূমির প্রভাব কেটে যায়।'

খর্দোঙের উতরাই চড়াই-এর থেকেও বিপজ্জনক। সুতরাং উতরাই-এর সময় ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া চলে না। এখানে চিরন্তন তুষার। তা গলে না। এই রাস্তায় অনেক সময় হেঁটে যাওয়াও কঠিন। রাহুল লিখছেন, এখানে অনেকটা রাস্তা 'আমাকে হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হয়েছিল।'

শেষপর্যন্ত তাঁরা গিয়ে রাজার সরাইয়ে আশ্রয় পেলেন। খাওয়া-দাওয়া সেখানেই হল; তারপর কয়েক ঘণ্টা মানুষ ও পশুর বিশ্রাম। শিয়োক সিন্ধুনদের দুটি প্রবাহের অন্যতম। শিয়োকের বাঁ তীর ধরে এগিয়ে নদী থেকে কিছুটা উঁচুতে একটা গ্রামে রাত্রি কাটালেন তাঁরা। পরদিন সকালে চা খেয়ে আবার যাত্রা করলেন। রামউদার নুব্রায় রিজোঙ-এর লামার কাছে যাচ্ছিলেন। রিজোঙ লামা লাদাখের লামাদের মধ্যে সর্বাধিক শিক্ষিত ও বিদগ্ধ। তাঁর সঙ্গে দেখা করে রামউদারের বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার ইচ্ছা ছিল। এবার ১৯২৬-এ তিনি নুব্রা গিয়েছিলেন। ১৯৩৩-এ দ্বিতীয়বার লাদাখ ভ্রমণের সময় তিনি নুব্রা যেতে পারেননি।

কিন্তু কেন তিনি নুব্রা গিয়ে রিজোঙ লামার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন? রিজোঙ লামার ষাটের ওপর বয়স। অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন রুচির মানুষ। বিদ্বান রিজোঙ লামার সঙ্গে

তিব্বতি ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে রামউদারের কয়েক ঘণ্টা আলোচনা হল। লামা কঞ্জুরে অনূদিত মহাযান মহাপরিনির্বাণসূত্রের কিছু অংশ অর্থসহ শোনালেন। দোভাষী তা অনুবাদ করে দিল। রামউদার রিজোঙ লামাকে লাদাখিদের মধ্যে কিছু প্রথার সংস্কারের কথা বললেন ঃ লাদাখিদের দুর্গন্ধে ভরা অপরিষ্কৃত লম্বা লম্বা চুল কেটে দেওয়া; স্ত্রীলোকের বহুপতি বিবাহের প্রথা বন্ধ করা; ভিক্ষুদের উপযুক্ত পড়াশোনা করার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

নুব্রায় দু-তিন দিন থেকে লেহ্ যাত্রা করলেন রামউদার। সাধারণভাবে যে পথ দিয়ে রামউদার কোথাও যেতেন সে পথ দিয়ে আর ফিরতেন না। এবারেও তিনি তাই করলেন। তিনি স্থির করলেন হনলে, চুমুর্তি (তিব্বতের ভেতরে) ও কনৌরের রাস্তায় শিমলা যাবেন। হেমিস লামা হনলেতে তাঁর মঠের প্রধান কর্মচারী এবং কনৌরের প্রথম বড় গ্রামের প্রধানের নামে পরিচয় পত্র লিখে দিলেন।

লাদাখের রাজার প্রাসাদ, শংকর-গুম্বা, পিতোক্-গুম্বা, ফিয়াঙ গুম্বা, মেহ প্রাসাদ প্রভৃতি লেহ্র আশেপাশের দর্শনীয় স্থান দেখে নিলেন রামউদার। তহশিলদার হনলে পর্যন্ত গঙ্গারাম চাপরাশিকে সঙ্গে দিলেন। রামউদার ফিরে যাওয়ার পথ ধরলেন।

লেহ্ থেকে চাও-লা গিরিবর্ত্ম হয়ে এগোতে লাগলেন রামউদার ও গঙ্গারাম। খর্দোঙ-এর মতো অনেক উঁচু গিরিবর্ত্ম। কিন্তু খর্দোঙ-এর মতো কঠিন চড়াই-উতরাই নেই। ওপরের দিকে বরফ ছিল। সন্ধ্যার আগেই অপর পারের গ্রামে পৌঁছোলেন রামউদার। চড়াই-উতরাই ভেঙে অনেক পাহাড় পেরিয়ে যেখানে সিন্ধু নদ পায়ে হেঁটে পার হওয়া যায় সেখানে ঘোড়া ও মালপত্রশুদ্ধ নদ পেরোলেন, তারপর ইয়াকের লোম-অলা তাঁবুতে লাদাখি গ্রামে রাত কাটিয়ে হনলে গুম্বাতে এসে পৌঁছোলেন রামউদার ও তাঁর সঙ্গী। হনলে গুম্বা হেমিস গুম্বার শাখা। আকাশে খোদাই করা কোনো অলৌকিক ভাস্করের চিত্রকর্ম বলে মনে হচ্ছিল হনলেকে। একটি পাহাড়ের ওপর এই গুম্বা, নিচে তার দু'দিকে সবুজে ঢাকা উপত্যকা। মেঘে-ছাওয়া আকাশ, মাটিতে বিছানো সবুজ ঘাস এবং শীতল এই হনলে। হনলেতে তাঁদের প্রচুর আদর-যত্ন করা হল। হেমিস লামার কাছে রামউদার একটি কুকুর চেয়েছিলেন। হেমিস লামা হনলের লামাকে রামউদারকে একটি কুকুর দেওয়ার জন্য চিঠি লিখে দিয়েছিলেন। হনলের লামা হিন্দুস্থানি লামাকে (রামউদারকে লাদাখিরা এই নাম দিয়েছিল) একটি ছোটো ও সুন্দরী কুত্তি উপহার দেন হনলে থেকে যাত্রা করার সময়। কুত্তির নাম সেঙ-টুক। তার গলায় পশমের দড়ি বেঁধে রামউদার ঘোড়ায় চড়ে তাকে নিজের কোলে বসিয়ে নিলেন। সেঙ-টুক নেমে যাওয়ার জন্য জোর করছিল। আড়াই মাইলের মতো এগিয়ে রামউদার গলার দড়ি খুলে তাকে নিচে নামিয়ে দিলেন। সেঙ-টুক ঘোড়ার পিছনে ছুটতে লাগল। চড়াই শুরু হওয়ার পর আবার ঘোড়ার ওপরে সেঙ-টুককে তুলে নিলেন রামউদার। কিন্তু সে আবার নিচে নেমে যাওয়ার জন্য ছটফট করতে লাগল। নিচে নেমে সেঙ-টুক্ আবার ঘোড়ার পেছনে ছুটতে লাগল। যে গিরিবর্ত্ম দিয়ে রামউদার যাচ্ছিলেন তার উচ্চতা ছিল ১৮০০০ ফুট। চড়াই-

উতরাইয়ের রাস্তা। পুরো গিরিবর্ত্ম না পেরিয়েই কয়েকটা তাঁবু দেখে রাত কাটাবার জন্য সেখানে তাঁরা থামলেন।

রাত্রিতে সেঙ-টুক ছাতুর গুলি খেল না, মাঠধা খেল না, দুয়েক টুকরো মাংস ছাড়া কিছুই খেল না। চুপচাপ, শ্রান্ত সেঙ-টুক রামউদারের বিছানায় পড়ে রইল। খুব কাশতে লাগল। রাত্রিতে কয়েকবার বিছানা থেকে উঠে গিয়ে পায়খানা, প্রস্রাব করে এল। সকালবেলা চা খেয়ে ঘোড়ায় সওয়ার হওয়ার সময় সেঙ-টুক-এর কাতর কালো চোখ দেখলেন রামউদার। *মেরী জীবনযাত্রা*-র ভাষায়—'তার সুদীর্ঘ কালো কালো চোখে অপার করুণা ভরা ছিল। আমি বুঝলাম, এখন আর তার পায়ে চলার শক্তি নেই। আমি তাকে কোলে নিলাম। তার শিথিল শরীর দেখে মনে হল, গতকালের চড়াই ও খিদেতে সে ভেঙে পড়েছে। দু-তিন মাইল এগিয়ে প্রথম যে বাড়ি পেলাম, সেখান থেকে এক বাটি দুধ আনতে পাঠালাম। গৃহস্বামী দুধ নিয়ে আসতেই আমি সেঙ-টুককে তুললাম। তার মাথা ঝুলে পড়ল। কম্পিত বক্ষে আমি তাঁর শরীর, মুখ ও হৃদযন্ত্রের গতি পরীক্ষা করলাম। তার দেহ তখন প্রাণহীন। আমি এমন আকস্মিক এবং এত বেশি পীড়া কখনো অনুভব করিনি। আসলে আমি ঐ সময় হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে গিয়েছিলাম। শুধু বুকে একটা তীব্র যন্ত্রণার বোধ ছিল। প্রায় সংজ্ঞাহীনের মতো হয়ে সেঙ-টুকের মৃতদেহ সেখানেই রেখে ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে গেলাম। যে গ্রামে ঘোড়া বদল করার কথা সেখানে পৌঁছে আমার খেয়াল হল, আমি সেঙ-টুকের মৃতদেহের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইনি। তাকে এক জায়গায় কবর দেওয়া উচিত ছিল। আমি একটি লোককে অনেক টাকা দিয়ে এবং অনেক অনুনয়-বিনয় করে তার কাছ থেকে কথা আদায় করলাম যে, সে সেঙ-টুককে কবর দেবে। কিন্তু আমার মনে যন্ত্রণা বেড়েই যাচ্ছিল। বার বার চোখে জল আসছিল। মা-বাবার মৃত্যুতে আমার চোখে জল আসেনি। আমার জন্য যাঁরা প্রাণ দিয়েছিলেন, সেই দাদু-দিদিমার মৃত্যুতেও আমার চোখে জল ছিল না। কিন্তু আজ আমার চোখের জল বাঁধ মানছিল না। সেই রাত্রিতেই সন্তপ্ত হৃদয়ে আমি সেঙ-টুকের মৃত্যুর জন্য আটটি শ্লোক (সেঙ-টুকাষ্টক) লিখলাম, যার প্রত্যেকটি শ্লোক শেষ হয়েছিল এভাবে—'সেঙ-টুকে। তৎপ্রয়াণে।' আমার মনে হচ্ছিল, আমি এই হাত দিয়ে এই সুন্দর প্রাণটিকে হত্যা করেছি।'

ছাপরা পৌঁছে (১৯২৭ খ্রি.) সব চেয়ে জরুরি কাজ ছিল গান্ধিজির সারণ সফরের ব্যবস্থা করা। ব্যবস্থাপকদের মধ্যে রামউদার ছিলেন প্রধান। কিন্তু গান্ধিজির সঙ্গে সঙ্গে থাকার ইচ্ছা তাঁর একেবারেই ছিল না। কারণ 'যাঁকে লোক বড় মানুষ বলে মনে করে তাঁকে ঘিরে একটা প্রভামণ্ডল থাকে। তার মধ্যে থাকলে আমার দম বন্ধ হয়ে যাবে বলে মনে হয়।' জীরাদেইতে রাজেন্দ্রবাবু রামউদারকে গান্ধিজির কাছে নিয়ে যান। তিনি কয়েক মিনিট তাঁর কাছে ছিলেন, এই পর্যন্ত। ইতিমধ্যে কাউন্সিল ও ডিসট্রিকট বোর্ডের নির্বাচন উপলক্ষে কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে যে হানাহানি ও জাতপাতের দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায় তাতে রামউদার অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে যান। তাছাড়া কংগ্রেসের সামনে নতুন

কার্যক্রমও কিছু ছিল না। এতে বৌদ্ধধর্ম ভালোভাবে জানাব যে ইচ্ছা লাদাখে তাঁর মনে জেগে উঠেছিল তার প্রচণ্ড তাগিদ তিনি অনুভব করতে লাগলেন। তার সুযোগও এসে গেল। সারনাথের ভিক্ষু শ্রীনিবাসজি রামউদারকে শ্রীলঙ্কার বিদ্যালঙ্কার পবিবেনে (বিহারে) চলে যেতে বললেন। এই বিহার সংস্কৃতের অধ্যাপক হিসাবে অনায়াসেই তাঁকে নিয়ে নেবে। ১৯২৭-এর মে মাসে রামউদার শ্রীলঙ্কা যাত্রা করলেন। সেখানে উনিশ মাসের অবস্থান তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল।

১৯২৭-এর ১৬ মে রামউদার দাস শ্রীলঙ্কার বিদ্যালংকার পবিবেনে (বিহারে) পৌঁছোলেন। এরপর যখন তিনি ভারতে ফিরলেন তখন রাহুল সাংকৃত্যায়ন। কেদারনাথ পাণ্ডে থেকে রামউদার দাস, রামউদার দাস থেকে রাহুল সাংকৃত্যায়ন। কেদারনাথ যেদিন রামউদার দাস হলেন, সেদিন তিনি পন্দহা-কনৈলার গ্রাম্য জীবনকে অতিক্রম করে সনাতন ভারতবর্ষের গভীর প্রবাহে নিজেকে মেলালেন। অথবা বলা যেতে পারে পন্দহা-কনৈলার গ্রামের জীবনের স্রোত গ্রামীণ ভারতের অন্তঃশীল জীবন প্রবাহে মিশে গেল। সনাতন ভারতবর্ষ তাঁকে গ্রহণ করল। এই গ্রামীণ ভারতবর্ষ চিরকাল কেদার-রামউদার-রাহুলের জীবনে অন্তর্লীন হয়েছিল।

গ্রাম—তার গাছপালা, শস্যক্ষেত্র, পশু, পক্ষী, প্রাণী এবং সমাজের নীচের তলার সরল মানুষ নিয়ে ক্রমশ গভীরভাবে কেদারের সত্তাকে অধিকার করেছিল। ভারতপথিক রামউদার, এশিয়াপথিক ও বিশ্বনাগরিক রাহুল দেশ-দেশান্তরের বিদগ্ধ সংস্কৃত জনসমাজে মিশেও কেদার নামে একটি গ্রামীণ বালকের মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে ছিলেন। রাহুলের মধ্যে এই বালক কেদারের অবিচ্ছিন্ন উপস্থিতি লক্ষ করেছিলেন রাহুলের ঐতিহাসিক বন্ধু জয়সওয়াল। বালক কেদারের এই জীবনব্যাপী আবেশ ত্রিপিটকাচার্য মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের চরিত্রে একটি নতুন মাত্রা সংযোজন করে তাঁর ব্যক্তিত্বকে এমন মহিমায় মণ্ডিত করেছিল যা কদাচিৎ চোখে পড়ে।

ছেলেবেলার গ্রাম তাঁর মগ্ন চৈতন্যের মধ্যে বেঁচে ছিল। কিন্তু গ্রামের সীমাবদ্ধতায় পীড়িত হত তাঁর মন এবং জ্ঞানার্জনের যে প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা তাঁর মনে দাবানলের মতো জ্বলত তার পরিতৃপ্তিরও কোনো সুযোগ ছিল না গ্রামে। *মেরী জীবনযাত্রা*-য় তিনি লিখেছেন যে, তাঁর বংশে লেখাপড়ার কোনো ঐতিহ্য ছিল না। কেদারকে বংশ পরম্পরা থেকে আলাদা, প্রকৃতির উদ্ভট সৃষ্টি বলে মনে করা যেতে পারে। ছেলেবেলা থেকে বৈরাগ্যের ভূত কেদারকে অধিকার করেছিল। কিন্তু এই বৈরাগ্যের ভূত বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। বৈরাগ্যের ভূতের চেয়েও প্রবলতর দুটি ভূত কেদারের ওপর সওয়ার হয়েছিল যার ফলে সারা জীবন তিনি নেশায় পাওয়া মানুষের মতো কাটিয়েছিলেন। তা হল সৈর করার ভূত অর্থাৎ ভ্রমণলিপ্সার ভূত এবং জ্ঞানলিপ্সার ভূত। *মেরী জীবনযাত্রায়* তিনি লিখেছেন যে এই দুটি ভূতের মধ্যে কখন কোনটি তাঁর ওপর সওয়ার হবে তা তিনি নিজেও জানতেন না। সুতরাং যখন ভবঘুরেমির ভূত, রাহুলের ভাষায় ঘুমক্কড়ীর ভূত, তাঁর ওপর সওয়ার হত তখন তিনি ক্রমাগত পথ চলতেন। তারপর কোনো একদিন

কোনো আপতিক ঘটনা তাঁকে পাণ্ডিত্যের নিস্তরঙ্গ জগতে নিয়ে যেত। সেখানে তিনি কিছুকাল স্থির হয়ে থাকতেন। আবার একদিন এই স্থির জগৎ থেকে বেরিয়ে তিনি নিরন্তর পরিবর্তমান পথ ধরে চলতেন। এই পর্যায়ানুবৃত্তি তাঁর জীবনে চলেছে অনেকদিন।

উত্তরপ্রদেশের আজমগড় জেলার কনৈলা গ্রামের অজ্ঞাতকুলশীল বালক বিবাগি হয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। ওমরপুরের পরমহংস ও তাঁর শিষ্য হরিকিরণ দাসের সংস্পর্শে এসে এই বালকের বৈরাগ্য এসেছিল। বেনারসে এই বালক শিব ভক্ত হয়ে ওঠেন এবং এই শিবভক্তিরই পরিণতি হিসেবে তিনি জীবনকে বাজি রেখে তন্ত্রসাধনা করেন। তন্ত্রসাধনায় ব্যর্থতা এবং খুব নিকট থেকে অশিক্ষিত ধার্মিক মানুষের ধর্মচর্চার মধ্যে যে অনাচার ও হৃদয়হীনতা নিহিত তা দেখার পর বৈরাগ্যের ভূত তাঁকে ছেড়ে যায়। কিন্তু ভবঘুরেমি (ঘুমক্কড়ী) ও জ্ঞানলিপ্সার প্রচণ্ড দাবানল স্থাবর বৈষয়িক জীবনের প্রতি যে বৈরাগ্য এনে দেয়, তা কেদারকে কোনোদিনই ছেড়ে যায়নি। বিবাগি হয়ে গৃহত্যাগ করার পর উত্তরাখণ্ডে ভ্রমণের সময় যখনই কোনো সাধু তাঁকে জিগ্যেস করেছেন—সাধু হয়ে যাচ্ছ না কেন, তখনই তিনি উত্তর দিয়েছেন যে, তিনি সাধু হবেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তার আগে তিনি সংস্কৃত ও বেদান্ত শিখবেন। তাছাড়াও ছিল সারা জীবন ভ্রাম্যমান থাকার দুরন্ত আশা।

সরযূপারী ব্রাহ্মণপুত্র কেদারনাথ পাণ্ডের পণ্ডিতকুলের মুগ্ধ বৃত্তের মধ্যে নিজস্ব স্থান করে নেওয়ার দুর্দম ইচ্ছা কেন জেগেছিল বলা শক্ত। এই ইচ্ছা যদি না জাগত, তবে তিনি ছেলেবেলায় রাখাল ও পরে সম্ভ্রান্ত চাষি (রাহুলের ভাষায় ছোটোখাটো জমিদার) হয়ে দিন কাটাতেন। কিন্তু তিনি যে প্রচণ্ড ক্ষুধা নিয়ে জন্মেছিলেন তা মেটাবার শক্তি ছিল না পন্দহা-কনৈলার। এই ক্ষুধা তাঁকে তাঁর নিজস্ব গ্রাম থেকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল এবং এক সময় সমগ্র বিশ্বকেই তাঁর নিজের গ্রামে পরিণত করেছিল।

মেরী জীবনযাত্রা-য় প্রথম খণ্ডে রাহুল সারা ভারত পর্যটনের কাহিনি লিখেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষকে দেখা এবং ভারতের বিখ্যাত পণ্ডিতদের কাছে সংস্কৃত ও ষড়দর্শনের অধ্যয়ন। *মেরী জীবনযাত্রা*-র প্রথম খণ্ড পড়লে দেখা যাবে যে ৩৪ বছর বয়সে যখন তিনি শ্রীলঙ্কা গেলেন তার আগেই তিনি এই দুটি কাজ সম্পন্ন করেছিলেন।

ভারত পর্যটনের সময় তিনি একটি কথা বারবার বলেছেন, 'দেশ দেখনা তো পায়দল চল।' অবশ্য কখনো কখনো তাঁকে বাধ্য হয়ে ট্রেনে যেতে হত 'দশ আনা ছ আনায়' অর্থাৎ বিনা টিকিটে। অথবা কখনো পথের সঙ্গীর আগ্রহাতিশয্যেও ট্রেনে চাপতে হত। বিহারের পরসা থেকে বঙ্গদেশ, ওড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্য, দক্ষিণ, পশ্চিম ভারতের তীর্থ পরিব্রাজনের পর তিনি আবার পরসা ফিরে যান। তীর্থ পরিক্রমার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সর্বত্র ছড়ানো ধর্মীয় মঠে যে সব বিখ্যাত পণ্ডিতদের দেখা পেয়েছিলেন তাদের কাছে বেদান্ত ও অন্যান্য দর্শনের পাঠ নিয়েছিলেন। অতএব যে উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি ঘর ছেড়েছিলেন—'সংস্কৃত ও বেদান্ত শিখব'—সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল। পরসা যাওয়ার আগেই তিনি অযোধ্যা, হরিদ্বার, হৃষিকেশ, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, কেদারনাথ ও বদরিনাথ

ঘুরে এসেছিলেন। বেনারসে যখন তিনি সংস্কৃত ও বেদান্ত পড়ছিলেন, তখন তিনি পরসা যান। পরসা থেকে চলে যান তীর্থ পরিক্রমায়। তীর্থ পরিক্রমার যে কয়েক সহস্র মাইল তাঁকে পেরোতে হয়েছিল, তার অধিকাংশই তিনি অতিক্রম করেছিলেন পায়ে হেঁটে। পদব্রজে সমগ্র ভারতের তীর্থ-পরিক্রমা চিরকাল চলে আসছে। নিরক্ষর সাধারণ মানুষের মনে ভারতের আপাত বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সামগ্রিকতার অখণ্ডতার যে প্রগাঢ় উপলব্ধি তার সবচেয়ে বড় কারণ হয়তো পদব্রজে তীর্থ-পরিক্রমা। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, দৈহিক আকৃতি ও ভৌগোলিক অবস্থানের পার্থক্য উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমের ভারতীয়দের মধ্যে যে ব্যবধানের সৃষ্টি করে, কেদারনাথ থেকে কন্যাকুমারী, সোমনাথ থেকে কামাখ্যা পর্যন্ত বিলম্বিত লয়ে পদব্রজে তীর্থ-পরিক্রমা সেই ব্যবধান অনেকাংশে ঘুচিয়ে দেয়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মানুষের একই লক্ষ্যাভিমুখী যাত্রা, ছত্রে, ধর্মশালায় অথবা উন্মুক্ত আকাশের নীচে রাত্রিযাপন, সদাব্রত থেকে পাওয়া রুটি, সবজি, মাটঠা (ঘোল) দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি, অবিশ্রান্ত পথ চলা এবং তীর্থে পৌঁছে আত্মনিবেদনের গভীর পরিতৃপ্তি সব বিভেদ ও বৈষম্যকে ভুলিয়ে দেয়। তাই আবহমান কাল থেকে পরিব্রাজন ভারতের ধর্মীয় আচার্যদের আবশ্যিক কর্তব্য বলে স্বীকৃত। কেননা পরিব্রাজন ছাড়া ভারতের অখণ্ডতার সুদৃঢ় প্রত্যয় জন্মানো সম্ভব ছিল না। আচার্য শংকর ভারতের চারদিকে চারটি মঠ প্রতিষ্ঠা করে ভারতের অখণ্ডতার বোধকে সাধারণ মানুষের চেতনায় সংক্রামিত করতে চেয়েছিলেন। এই অর্থে শংকরের মঠ প্রতিষ্ঠা পুরোপুরি সার্থক হয়েছিল। শুধু শংকর মঠই নয়, অসংখ্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মঠ, মন্দির, সত্র, ধর্মশালা ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। সেখানে ভারতের সব সম্প্রদায়ের সাধুদেরই আশ্রয় মেলে। রাহুল লিখেছেন, 'তীর্থযাত্রীদের দুটি শ্রেণী ঃ এক, যাঁরা সাম্প্রদায়িক সাধু নন, দুই, কোনো সম্প্রদায়ের অন্তর্গত সাধু; যেমন, বৈরাগী, উদাসী, সন্ন্যাসী ইত্যাদি। তাদের পক্ষে নিজেদের সম্প্রদায়ের আচার-ব্যবহার শেখা আবশ্যিক ছিল। নিজস্ব সম্প্রদায়ের নির্দেশ মেনে চলাও তাদের পক্ষে বাধ্যতামূলক ছিল। লজ্জা, সংকোচ ও অসম্মানের কথা তাঁদের বিশেষভাবে মনে রাখতে হত। এতে লাভ ছিল এই যে, এঁরা সারা ভারতে ছড়ানো নিজস্ব সম্প্রদায়ের মঠে থাকার অধিকার পেতেন এবং আত্মমর্যাদা বজায় রেখে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মঠে থাকারও সুযোগ পেতেন। *মেরী জীবনযাত্রা*-র ভাষায় 'এই সব মঠ ছিল বিনা পয়সায় যাত্রীদের থাকার ও খাওয়ার হোটেল।' এ থেকে বোঝা যায় যে এইসব মঠ রমতারামদের ভ্রমণ কত সহজসাধ্য করেছিল। ভারতে এমন কোনো জায়গা ছিল না যেখানে কোনো মঠ বা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বাসস্থান ছিল না। হিন্দি ভাষাভাষী হিন্দুপ্রধানপ্রদেশ সমূহে এই সব মঠের সংখ্যা যথেষ্ট ছিল। হিন্দুদের সংখ্যা অনুযায়ী পাঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশে ও মঠের সংখ্যা কম ছিল না। দ্রাবিড় ভাষাভাষী অঞ্চলে অবশ্য মঠের সংখ্যা কম ছিল। শুধু ভারতেই নয়, এইসব মঠ বিশ শতকের গোড়ার দিকেও কাবুল, কান্দাহার ও কাস্পিয়ান সাগরের তীরে বাকুতেও ছিল।'

ভারতের ভেতরে ও বাইরে ছড়ানো মঠ, মন্দির, সত্র, ধর্মশালা এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাসস্থান, সদাব্রত ও অতিথি সৎকারের ব্যবস্থার রাহুল যে বর্ণনা করেছেন, তা থেকে সনাতন ভারতবর্ষের স্পষ্ট ছবি উঠে আসে। ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠা ও ইয়োরোপীয় শিল্পবিপ্লব বহিরঙ্গে পরিবর্তন নিয়ে আসা সত্ত্বেও ভারতের অন্তঃশীল পরিপূর্ণ মানব-আশয় বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক পর্বেও এই পরিবর্তনের দ্বারা অস্পৃষ্ট ছিল।

এই ভারতবর্ষ অন্তর্মুখ। বারবার ভারতের ঐতিহাসিক পটভূমির পরিবর্তন হয়েছে। শক, হুন, পাঠান, মোগল, ইংরেজ এসেছে। কখনো অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আবার কখনো এই ভারত খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু ভারতীয় জীবনের অন্তঃশীল রহস্য অপরিবর্তিত থেকে গেছে।

কিন্তু রামউদারের ভারত পরিক্রমার তাৎপর্য কিছুটা স্বতন্ত্র। বৈরাগ্য-তাড়িত হয়ে ঈশ্বর অন্বেষণের জন্য তিনি তীর্থ-পরিক্রমা করছিলেন, একথা বলা চলে না। এক ধরনের Wonder lust তাঁকে অধিকার করেছিল। সংসারের স্থবির কলুর বলদের জীবন তিনি মেনে নিতে পারেননি। অথচ তিনি জীবন-বিমুখ ছিলেন না। এই বসুধার মৃত্তিকার পাত্র থেকে যে অমৃত ক্ষরণ হয়, তা তিনি বারংবার পান করতে চেয়েছিলেন। পান করেছিলেন। কিন্তু তবু তিনি তৃপ্ত হননি। পার্থিব জীবন, এই পৃথিবীর মানুষ, অন্য সব প্রাণী, গাছ, লতাপাতা সব কিছু তিনি এমন ভালবাসতেন যে তাঁর পথ চলার উড়ানের বিরাম ছিল না। কেননা তিনি সব দেখে যেতে চেয়েছিলেন। সব জেনে যেতে চেয়েছিলেন। পৃথিবী বলতে তিনি একেবারে আক্ষরিক অর্থে এই মাটির পৃথিবীকেই বুঝেছিলেন। অতএব যে আনন্দ পৃথিবী সৃষ্টি করেছে তিনি তাঁর অংশভাক্ হতে চেয়েছিলেন। এই পার্থিব ভালোবাসা *মেরী জীবনযাত্রা*-র পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় স্পষ্টভাবে ধরা দেয়। হিমালয়ের তীর্থে তীর্থে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন, মন্দিরে, মঠে গিয়েছেন। হিমালয়ের তুষারাবৃত শৃঙ্গ, সারি সারি দেবদারু, কত বনস্পতি, গাছ, লতাপাতা, ওষধি, চড়াই-উতরাই, পাথুরে রাস্তা, কোমল ঘাসের ওপর ফুলের কার্পেটে মোড়া পথ, কালীকমলিঅলার চটি, ধর্মশালা, সদাব্রত, ভবঘুরে সাধুর দঙ্গল ও তাঁদের জীবনযাত্রার অনুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন। কীভাবে তারা রুটি তৈরি করে, কোন সবজি দিয়ে তা খায়, গাঁজার কলকেটি রুমালে জড়িয়ে কীভাবে টান দিলে কলকের আগুন অন্তত তিন ইঞ্চি লাফিয়ে ওঠে, ধুনি জ্বালিয়ে তার চারদিকে বসে তীর্থংকর জীবনের গল্প বলে, পরদিন আবার যাত্রা শুরু করে—তা ছবির মতো বর্ণনা করেছেন। এই ভবঘুরে সাধুদের মধ্যে রামউদারকে দেখা যায়। তিনি দেখছেন, শুনছেন, তাঁর মস্তিষ্কের ধূসর কোষ সব কিছু ধরে রাখছে, কোনো স্মৃতি মুছে যাচ্ছে না। তাই ত্রিশ বছর পরেও জেলে বসে কোনো নোট, ডায়েরি, বই অথবা মানচিত্র ছাড়া তাঁর অসামান্য আত্মজীবনীর প্রথম খণ্ড লেখা সম্ভব হয়েছিল। এই অনুপুঙ্খ বর্ণনার মধ্যে তাঁর দেখা অধিকাংশ মন্দিরের বিগ্রহ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য কৌতূহলোদ্দীপক ঃ 'অমুক মন্দিরের বিগ্রহ কীরকম ছিল?' 'ইয়াদ নেহি।'

ভগবান ও ভক্ত সম্পর্কে তাঁর বিতৃষ্ণা ছিল। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে ঈশ্বর অন্বেষণের জন্য তিনি ভারতের তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াননি।

কেদার বৈরাগী হয়েছিলেন কোনো অপার্থিব ঈশ্বরের জন্য নয়, এই পৃথিবীর জন্য ভালোবাসায়। ভ্রমণ ও জ্ঞানের তৃষ্ণার মধ্যে অন্তর্লীন ছিল জীবনতৃষ্ণা। কিন্তু স্থবির অপরিবর্তনীয় জীবনের তৃষ্ণা নয়। বহমান নদীর মতো চলমান জীবনের তৃষ্ণা। বস্তুত বহমান নদীই রাহুলের জীবনের প্রতীক। নদীর জন্ম লগ্নের সংকীর্ণ ধারা যেমন ক্রমশ বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততর হয়ে নিরন্তর বহমান থেকে একদিন সমুদ্রে মেশে, তেমনি কেদারও গ্রামের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে একদিন সমগ্র বিশ্বের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন।

মেথুজেলা হতে চেয়েছিলেন রামউদার। মেথুজেলা দীর্ঘায়ু মানুষের প্রতীক। বাইবেলের মেথুজেলা বেঁচেছিলেন ৯৬৯ বছর। আরো কিছুটা বেশি আয়ু চেয়েছিলেন রামউদার। এক হাজার বছর। আর যৌবন চেয়েছিলেন 'নগদ' পাঁচশ বছরের—চেয়েছিলেন আকাশ ও পর্বত দিয়ে ঘেরা নির্জন উপত্যকায় অন্যান্য প্রাণী পরিবেষ্টিত হয়ে আদিম মানব-মানবীর চলমান জীবন ও নিরাবরণ, নিঃশঙ্ক প্রেম উপভোগ করতে। কিন্তু আরো অনেক কামনা আছে জীবনে, কাজ আছে। এক ঘাটে নৌকা বাঁধা চলে না। স্রোতের টানে ভেসে যেতে হয়। তবু এই রোমান্টিক জীবনযাত্রার স্মৃতি আতুরতা তাঁর মনের এক কোণে স্থায়ী আসন পেতেছিল। রামউদারের প্রখর বুদ্ধিবাদী মনের পাহারা এড়িয়ে এই রোমান্টিক স্মৃতি আতুরতা মাঝে মাঝে বেরিয়ে এসে তার বিষণ্ণ আলোকপাত করে তাঁর জীবনযাত্রায়।

রাহুলের জীবনের সর্বপ্রথম কাজ ছিল ভারতবর্ষের জীবন, সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে অনুপুঙ্খভাবে জানা। এই জ্ঞান তাঁর ভবিষ্যতের কর্মিষ্ঠ জীবনের পটভূমি। কপর্দকহীন হওয়া সত্ত্বেও রাহুলের পক্ষে বারবার ভারত পরিক্রমা সম্ভব হয়েছিল। ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছড়ানো বিদ্যাপীঠের বিখ্যাত পণ্ডিতদের কাছ থেকে পাঠ নিতে পেরেছিলেন তিনি। যে কোনো ভারত প্রেমিকের পক্ষেই তা কেন সম্ভব ছিল, ইতিপূর্বে তা বলা হয়েছে। কিন্তু এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে; একমাত্র উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমেই রমতারামদের ভ্রমণ তৃষ্ণা অনায়াসেই মেটানো সম্ভব ছিল। কিন্তু উত্তর-পশ্চিম ভারতে রমতারামদের ভ্রমণ আয়াসসাধ্য ছিল। কারণ সেখানে হিন্দুর মঠ, মন্দিরের সংখ্যা অত্যন্ত কম ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও উনিশ শতকে ভারতের সমাজ ও ধর্ম সংস্কারের জন্য আর্যসমাজের উত্থানের পর্বে ভারতের উত্তর-পশ্চিমে সংখ্যালঘু হিন্দু অঞ্চলে অনেক আর্যসমাজী মন্দির গড়ে উঠেছিল। অতএব যে-কোনো আর্যসমাজী উত্তর-পশ্চিম ভারত দর্শন করতে পাবত অনায়াসে। আর্যসমাজী মন্দিরে গেলেই বিনামূল্যে আশ্রয় ও আহারের কোনো সমস্যা থাকত না।

যখন রামউদার ভারত পরিক্রমা শেষ করেছেন, সংস্কৃত ও ভারতীয় দর্শন যখন তাঁর অধিগত হয়েছে, সেই মুহূর্তে ভাগ্য তাঁকে আগ্রার আর্য মুসাফির বিদ্যালয়ে নিয়ে গেল।

সেখানে তিনি আরবি ভাষা শিখলেন এবং আর্যসমাজের শিক্ষা লাভ করে পুরোপুরি আর্যসমাজের প্রচারকে পরিণত হলেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতে লান্ডিকোটাল অবধি চলে যাওয়া এবং নির্বিঘ্নে ফিরে আসা সম্ভব হয়েছিল আর্যসমাজের প্রচারক বলেই। শ্রীলঙ্কা যাওয়ার আগে লাদাখ ভ্রমণও অনায়াস হয়েছিল আর্যসমাজে যোগসূত্রের জন্যই।

কিন্তু যে মানুষ সমগ্র পৃথিবীকে আত্মসাৎ করতে চেয়েছিলেন, বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক সীমানাকে যিনি বাধা বলে মনে করতেন না, অতৃপ্ত জ্ঞানপিপাসা যাঁকে অস্থির উন্মনা করে রাখত তাঁকে কোনো বিশেষ দেশে আবদ্ধ করে রাখা সম্ভব ছিল না। সুতরাং ভারতের বাইরে তাঁর জন্য পূর্ব নির্দিষ্ট কাজের সময় যখন এল, তার আগেই সেই কাজের পূর্ব প্রস্তুতি শেষ হয়েছিল। ভারত ভ্রমণের সময়ই তিনি ভগবান বুদ্ধের মহাজীবনের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন। প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধ ভিক্ষুর ত্যাগ ও সাহসিকতার ইতিহাস তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। লখনৌ-এর বৌদ্ধ ভিক্ষু বোধানন্দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তিনি উত্তর ভারতের সব বৌদ্ধতীর্থ পরিক্রমা করেন। কিন্তু তখনো তাঁর কোনো ধারণাই ছিল না যে তিনি এক অভাবনীয় নতুন জীবনের দ্বারপ্রান্তে এসে উপস্থিত হয়েছেন ; এক বিলুপ্ত মহাদেশের পুনরাবিষ্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার আহ্বান এসেছে তাঁর কাছে। মহাত্মা গান্ধির সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় আড়াই বছর বক্সার ও হাজারিবাগ জেলে কাটিয়ে এসে তিনি দেখলেন কংগ্রেসে দুর্নীতি, শিথিলতা ও ভাঙন। সারনাথের ভিক্ষু শ্রীনিবাসজি তাঁকে সংস্কৃতের অধ্যাপক হিসেবে শ্রীলঙ্কার বিদ্যালঙ্কার বিহারে চলে যেতে বললেন। শ্রীলঙ্কায় তাঁর নতুন জীবন শুরু হল।

পঞ্চম অধ্যায়

ঘুমক্কড় শাস্ত্র (ভবঘুরেমির শাস্ত্র)

ঘুমক্কড়ী ও জ্ঞানলিপ্সার ভূতের দ্বারা তাড়িত হয়ে রাহুল সারা ভারত ঘুরে বেড়িয়েছেন। প্রাণভরে দেখেছেন ভারতের আনন্দময় প্রকৃতিকে—তুষারশুভ্র হিমালয়, দেবদারু, সবুজের কার্পেটে-মোড়া উপত্যকা। ভারতের সনাতন ঐশ্বর্যের ভাণ্ডারকে আহরণ করে তাঁর রক্তের মধ্যে তা সঞ্চালিত করেছেন। বিশেষত ভারতীয় দর্শন, পুরাতত্ত্ব ও ইতিহাস তাঁর চৈতন্যের মধ্যে আহৃত হয়েছিল। ভারতীয় ঐতিহ্যের বহমান ধারাকে তিনি আত্মস্থ করোছলেন।

অথচ মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন পাণ্ডিত্যের স্তব্ধ জগতে লীন হয়ে যাননি। ব্রাউনিঙের বৈয়াকরণ decided not to live but to know—রাহুলের ক্ষেত্রে এ কথা কোনো মতেই বলা চলে না। রাহুল জীবন-রসিক। জীবনের প্রবহমানতার সঙ্গে রাহুল বাগর্থের মতো সম্পৃক্ত। ভারতীয় মানসের অসামান্য কীর্তির সঙ্গে ভারতীয় জীবনের বিপরীত দিকটাও তাঁর চোখে পড়েছিল। এই বিপরীত দিকে কোটি কোটি মানুষের শোষণের প্রায় স্থায়ী ব্যবস্থা। শুধু শোষণই নয়, সমাজের উপরতলার মানুষের অতিশয় দৃশ্যমান ঘৃণা—যা অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ ও অন্যান্য অমানবিক প্রথার মধ্যে প্রকাশিত এবং যা হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের অন্তর্গত, তা তিনি এই নিপীড়িত মানুষের জীবনের অংশভাক্ হয়ে জেনেছিলেন। এই জীর্ণ সমাজের প্রতি গভীর বিতৃষ্ণাই তাঁকে শেষপর্যন্ত সাম্যবাদের দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। তিনি শোষিত মানুষের উজ্জ্বল উদ্ধারের কাজে ব্রতী হয়েছিলেন।

কিন্তু প্রশ্ন হল—বিরতিহীন ঘুমক্কড়ী (ভ্রাম্যমান জীবন) ও পাণ্ডিত্যের নিস্তব্ধ জগৎকে তিনি মেলালেন কী করে। আগেই বলা হয়েছে যে তাঁর ঘুমক্কড়ী ও বিদ্যাচর্চার মধ্যে পর্যায়ানুবৃত্তি ছিল। ঘুমক্কড়ী জীবনে মাঝে মাঝে বিরতি আসত। তখন বিদ্যাচর্চায় তিনি ডুবে যেতেন। ঘুমক্কড়ীর ভূত ও জ্ঞানলিপ্সার ভূতের মধ্যে এই বোঝাপড়া রাহুলের জীবনদর্শনের মধ্যে অন্তর্নিহিত ছিল। কিন্তু ঘুমক্কড়ী ও জ্ঞানলিপ্সার পর্যায়ানুবৃত্তির অঙ্গাঙ্গী সম্পৃক্তি কীভাবে সম্ভব তা তিনি ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর ঘুমক্কড় শাস্ত্রে। রাহুলের জীবনের দ্বিতীয় পর্বকে তাঁর জীবনের কেন্দ্রীয় ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্ব বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না। এই পর্বে ঘুমক্কড়ীর ও জ্ঞানার্জনের অঙ্গাঙ্গী সম্পৃক্তি ঘটেছিল।

এই ঘুমক্কড় (ভবঘুরে) শাস্ত্রের আলোচনার আগেই একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন। এই শাস্ত্রের মডেল স্বয়ং রাহুল। এর ভাষ্য লিখলেই তা রাহুলের জীবনীতে পরিণত হতে পারে।

পুরোপুরি শাস্ত্রীয় পদ্ধতি অনুসরণ করে 'অখাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসার' মতো 'অখাতো ঘুমক্কড় জিজ্ঞাসা' অর্থাৎ ঘুমক্কড় শাস্ত্রের সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করে তিনি ঘুমক্কড় শাস্ত্র শুরু করেন। শাস্ত্রে এমন জিনিসই জিজ্ঞাসার বিষয় বলে গণ্য হয়, যা ব্যক্তি ও সমাজের জন্য হিতকারী ও শ্রেষ্ঠ। ব্যাস ব্রহ্মকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করে তা জিজ্ঞাসার বিষয় বানিয়েছিলেন। রাহুলও ঘুমক্কড়ীকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করে তা জিজ্ঞাসার বিষয় বানিয়েছেন। এই দুনিয়ায় সুখে দুঃখে মানুষকে সাহায্য করতে পারে একমাত্র ঘুমক্কড়ী (ভবঘুরেমি)। আদিম মানুষ ঘুমক্কড় ছিল। আকাশের পাখির মতো সে পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াত। ঘুমক্কড় এই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিভূতি। কারণ সে-ই এই দুনিয়াকে নির্মাণ করেছে। যদি আদিম মানুষ কোনো নদীর তীরে ঘর বেঁধে পড়ে থাকত এই দুনিয়ার অগ্রগতি সম্ভব হত না। আদিম ঘুমক্কড়দের মধ্যে আর্য, শক, হুনেরা রক্তাক্ত পথে এগিয়ে গিয়ে মানুষের অগ্রগতির পথ কীভাবে প্রশস্ত করেছে, তা আমরা ইতিহাস থেকে সুস্পষ্টভাবে জানতে পারি না। কিন্তু মোঙ্গল ঘুমক্কড়দের বিস্ময়কর কাজ আমরা ভালোভাবেই জানি। বারুদ, তোপ, কাগজ, ছাপাখানা, দিগ্‌দর্শক চশমা ইত্যাদি এমন সব জিনিস মোঙ্গল ঘুমক্কড়েরাই পাশ্চাত্য দেশে নিয়ে গিয়েছিল। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান তাকে কাজে লাগিয়েছিল।

কলাম্বাস ও ভাস্‌কো-ডা-গামা এই দুই ঘুমক্কড় (ভবঘুরে) পশ্চিমের দেশের অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করেছিলেন। এশিয়ার কূপমণ্ডূকেরা ঘুমক্কড় ধর্মকে ভুলে গিয়েছিল। এশিয়ার ঘুমক্কড়ী যদি সজীব থাকত, তবে এশিয়ার মানুষ অনায়াসেই আমেরিকায় তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে পারত। কারণ এশিয়ায় ঘুমক্কড়ী চলে আসছে আবহমান কাল থেকে। দুই শতাব্দী আগেও অস্ট্রেলিয়া ফাঁকা পড়েছিল। কিন্তু এশীয় কূপমণ্ডূকতার ফলে সেখানে আধিপত্য বিস্তার করল ব্রিটেন। আজ চীন ও ভারত এই দুই দেশই জনসংখ্যার ভারে পীড়িত। অথচ অস্ট্রেলিয়ায় তাদের স্থান নেই। অথচ এক সময় অস্ট্রেলিয়া তাদের হাতের মুঠোর মধ্যে ছিল। ঘুমক্কড় ধর্ম ভুলে যাওয়ার জন্য আজ চীন ও ভারত এই দুই দেশই জনসংখ্যার ভারে বিপন্ন। অথচ ভারত ও চীন অনেক বিখ্যাত ঘুমক্কড়ের জন্ম দিয়েছে। ভারতের দক্ষিণ-পূর্বে শ্রীলঙ্কা, ব্রহ্মদেশ, মালয়, যবদ্বীপ, শ্যাম, কম্বোজ, চম্পা, বোর্নিয়ো ও সেলিবিসই নয় ফিলিপিন পর্যন্ত ভারতীয় ঘুমক্কড়েরা ঘুরে বেড়াতেন। নিউজিল্যাণ্ড ও অস্ট্রেলিয়াও বৃহত্তর ভারতের অঙ্গীভূত হবে, একসময় একথাও মনে হয়েছিল। কিন্তু এ দেশের কূপমণ্ডূকেরা একথা বলতে শুরু করলেন যে কালাপানি ছুঁলেই ভারতীয়দের ধর্ম নষ্ট হবে এবং সমুদ্রকে ছুঁলেই তারা নুনের পুতুলের মতো গলে যাবে।

অথচ ভারতীয় ধর্মে ঘুমক্কড়ীর সমর্থন আছে। দুনিয়ার অধিকাংশ ধর্মনায়ক ঘুমক্কড় ছিলেন। ধর্মনায়কদের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সেই বুদ্ধ ছিলেন ঘুমক্কড়-রাজ। যদিও তিনি ভারতের বাইরে যাননি কিন্তু প্রথম থেকেই তিনি শিষ্যদের বলতেন, ভিক্ষুগণ, তোমরা ঘুমক্কড়ী কর। পশ্চিমে মরক্কো থেকে পূর্বে জাপান পর্যন্ত, উত্তরে মঙ্গোলিয়া থেকে দক্ষিণে বালিদ্বীপ পর্যন্ত তাঁর শিষ্যরা ধর্মপ্রচার করেছেন। যে বৃহত্তর ভারত নিয়ে আমরা

আজ গর্ব করি, তাও এই ঘুমক্কড়দেরই কীর্তি। বুদ্ধের আগেও ঘুমক্কড়দের জন্ম হয়েছিল বলেই এই দেশে বুদ্ধের মতো মানুষের জন্ম সম্ভব হয়েছিল।

জৈন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীর বর্ধমানও ঘুমক্কড় ছিলেন। তিনি ছোটো ও বড় সব বন্ধন ও উপাধি ত্যাগ করেছিলেন। এমনকি বস্ত্রও ত্যাগ করেছিলেন। করতল ভিক্ষা, তরুতল বাস ও দিগম্বর হয়ে থাকা তিনি বেছে নিয়েছিলেন বলে তাঁর পক্ষে নির্দ্বন্দ্ব হয়ে বিচরণ করার কোনো বাধা হয়নি।

রাহুল ঘুমক্কড়দের শ্রেণি বিভাগ করেছেন। প্রথম শ্রেণির ঘুমক্কড়দের মধ্যে আছেন বুদ্ধ, মহাবীর বর্ধমান, আচার্য শংকর ও এই জাতীয় মহাপুরুষ। তাঁর মতে আচার্য শংকরকে কোনো ব্রহ্ম বানায়নি। তিনি মহান হয়েছিলেন ঘুমক্কড় ধর্মের দ্বারা। শংকর সর্বদা ঘুরে বেড়াতেন। আজ যদি তিনি কেরলে, তবে কয়েকমাস পরে তিনি মিথিলায়। পরের মাসে তিনি হিমালয়ে বা অন্য কোনো জায়গায়। শংকর বেশিদিন বেঁচে ছিলেন না। কিন্তু এই স্বল্পায়ু জীবনে তিনি তিনটি ভাষ্যই শুধু লেখেননি, তিনি নিজের আচরণ দ্বারা তাঁর অনুগামীদের ঘুমক্কড়ীর শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁর উপদেশ পালন করছেন এমন ঘুমক্কড় আজও আছেন। ভাসকো-ডা-গামা ভারত পৌঁছোনোর অনেক আগে শংকরের শিষ্যরা মস্কো ও ইয়োরোপ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন। তাঁর সাহসী শিষ্যরা শুধু শংকর প্রতিষ্ঠিত ভারতের চার ধামে গিয়েই সন্তুষ্ট থাকেননি, তাঁদের মধ্যে অনেকে বাকু পর্যন্ত চলে গিয়েছিলেন। একজন তো পর্যটন করতে করতে ভোলগার তীরে নিজনিনোভোগ্রাদ গিয়ে সেখানকার মহামেলা দেখেন। কিছুকাল সেখানে থেকে অনেক খ্রিস্টানকে তাঁর অনুগামীতে পরিণত করেছিলেন। তাঁদের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে বিশ শতকের প্রথম দিকে কয়েক লক্ষে পৌঁছে গেছে।

রামানুজ, মাধবাচার্য ও অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্যরা ভারতে কূপমণ্ডূকতা প্রচার করেন। কিন্তু ব্যতিক্রম রামানন্দ ও চৈতন্য, যাঁরা ঘুমক্কড়ীকে আবার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মহান বৌদ্ধধর্ম ভারত থেকে লুপ্ত হয়ে যাওয়ার পর আমাদের দেশ কূপমণ্ডূকতার পথে চলে যায়। তবু একথা বলা চলে না যে, ঘুমক্কড় ধর্ম একেবারে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। গুরু নানকও মহান ঘুমক্কড় ছিলেন। তিনি ভারত ভ্রমণই যথেষ্ট মনে করেননি। তিনি ইরান ও আরব পর্যন্ত চলে গিয়েছিলেন। স্বামী দয়ানন্দও সতত ভ্রাম্যমান ছিলেন। তিনি বললেন, মানুষ স্থাবর বৃক্ষ নয়, সে জঙ্গল-প্রাণী। চলমান থাকা মানুষের ধর্ম। যে স্থাবর সে মনুষ্য নামের অধিকারী নয়।

রাহুল প্রথম শ্রেণির ঘুমক্কড়ের কথা বিশেষভাবে লিখেছেন। প্রথম শ্রেণির ঘুমক্কড় নির্ভীক হবে, নিশ্চিন্ত হবে। যে ঘুমক্কড়-ধর্মে দীক্ষা নেবে, সে ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে যাবে। মায়ের চোখের জল, পিতার ভয় অথবা তরুণী স্ত্রীর কান্না অথবা কোনো বাধা তাকে বেঁধে রাখতে পারবে না। তার পথ নির্দেশ করবে শংকরাচার্যের বাক্য— 'নিস্ত্রৈ পুণ্যে পথি বিচরতঃ কো বিধি ঃ কো নিষেধ ঃ', এবং রাহুলের গুরু কপোতরা বচন—

'সৈর কর দুনিয়া কো গাফিল, জিন্দগামী ফির কঁহা?
জিন্দেগী পর কুছ রহী তো নওজওয়ানী ফির কঁহা?'

ঘুমক্কড়ীর জন্য দেহ ও মনকে তৈরি করতে হবে। শরীরকে এতটা সমর্থ হতে হবে যাতে সওয়া মন বোঝা পিঠে নিয়ে সে পাঁচ-দশ মাইল হেঁটে যেতে পারে। কিছুটা লেখাপড়া শিখে অন্তত গ্রাজুয়েট হয়ে যদি সে ঘর ছেড়ে বেরোয় তবে ভালো। অর্থাৎ গৃহত্যাগ করে ঘুমক্কড় জীবনে প্রবেশ করার উপযুক্ত বয়স হল ২২ থেকে ২৪ বছর। কেননা প্রথম শ্রেণির ঘুমক্কড় লোকচক্ষুর সামনে আবার ফিরে আসবে কবি, শিল্পী ও লেখক হয়ে। কবি, লেখক ও শিল্পীর জ্ঞানের পুঁজি যদি কম থাকে তবে তাঁর কৃতিত্বে গভীরতা আসে না। অল্পশ্রুত ব্যক্তি যা দেখে তার গভীরে যেতে পারে না। ঘুমক্কড়ের ভূগোলের ও ইতিহাসের জ্ঞান আবশ্যিক।

ঘুমক্কড়কে সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়াতে হয়। তাঁকে জীবনকে নদীর প্রবাহের মতো সর্বদা প্রবহমান রাখতে হয়। তাই কোনো নারীর প্রতি প্রেমে আবদ্ধ হয়ে বিবাহবন্ধন যদি কোনো ভবঘুরে স্বীকার করে নেয়, তবে সে তার পাখা কেটে আবার স্থাবব হয়ে যায়। প্রেম ও যৌন সংসর্গ ভবঘুরের পক্ষে নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু এই প্রেম বন্ধন হবে না। এই প্রেম নদী ও নৌকার সংযোগের অথবা দুই সহযাত্রীর যে প্রেম সেই প্রেম।

ঘুমক্কড়ী ব্রত ও সংকীর্ণ ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার সহাবস্থান সম্ভব নয়। প্রথম শ্রেণির ঘুমক্কড় পুরুষ-শ্রেষ্ঠ। সে মানুষের মধ্যে সংকীর্ণ ভেদাভেদ অপছন্দ করে। উচ্চতম ভবঘুরে আদর্শকে যে জীবনের অঙ্গে পরিণত করে, সে তার ভবঘুরে বন্ধুদের ও সকল মানুষের সবচেয়ে বেশি হিতৈষী বন্ধু হয়।

ঘুমক্কড় (ভবঘুরে) শাস্ত্রকে রাহুলের জীবনের ঘটনার সামান্যীকরণ বলা যেতে পারে। অর্থাৎ ঘুমক্কড় শাস্ত্র রাহুলের ভবঘুরেমির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। ভবঘুরে জীবনেব প্রতি রাহুলের এমন প্রচণ্ড আকর্ষণ ছিল যে, ভবঘুরে মানুষের পথ নির্দেশের জন্য তিনি এই শাস্ত্র প্রণয়ন করেছিলেন। তাঁর এই বইটি পড়লে বোঝা যায় যে ঘুমক্কড় জীবনের সম্মোহ তাঁকে কীভাবে অধিকার করেছিল।

জীবন ও জগৎ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভের আকাঙ্ক্ষাই তাঁর ভবঘুরে বৃত্তির মূলাধার ছিল। স্থবির মানুষের অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু জঙ্গম মানুষ নিত্যনতুন জ্ঞান আহরণ করে, প্রতিনিয়ত জীবনকে, জগৎকে বিস্ময়ভরা চোখ মেলে দেখে। ক্রমে জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায় প্রভৃতি সম্পর্কে পার্থক্যের বোধ কমে আসে এবং শেষ পর্যন্ত 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' এই সত্যটি ক্রমশ আহৃত হয়ে তার মননের প্রাথমিক উপাদানে পরিণত হয়। যে সতত ভ্রাম্যমান সে জীবনকে পূর্ব নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখার সব বেড়া ভেঙে ফেলে অখণ্ড মানব জাতির অন্তর্গত হয়ে যায়।

এই ঘুমক্কড় শাস্ত্রের ভাষ্য লিখলেই তা রাহুলের জীবনী হয়ে দাঁড়াবে। কারণ আগেই বলা হয়েছে ঘুমক্কড় শাস্ত্রের ঘুমক্কড়ের মডেল রাহুল স্বয়ং। ভবঘুরে রাহুল নিছক পথ চলার আনন্দে ঘুরে বেড়ালেও তাঁর কোনো যাত্রাই নিরুদ্দেশ্য ছিল না। প্রথম শ্রেণির

ঘুমক্কড় চেনা জগৎ থেকে ডুব দিয়ে কবি, শিল্পী অথবা লেখক হিসেবে ফিরে আসেন। অতএব দেশ-বিদেশের জ্ঞানের ভাণ্ডার আত্মসাৎ করার জন্য রাহুলের তপস্যা তাঁর ঘুমক্কড়ীর সঙ্গে সমান্তরালভাবে চলেছে। রাহুল যখন ভবঘুরে জীবনের অন্তরাল থেকে জগতের কাছে ফিরে এলেন তখন তিনি ত্রিপিটকাচার্য, মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন। তখন তিনি একটি মহামূল্যবান সত্য আবিষ্কার করেছেন যা পুরোপুরি ভারতের নিজস্ব, যার কথা ভারতের স্মৃতি থেকে সম্পূর্ণ মুছে গিয়েছিল। যে অমূল্য জ্ঞান ভাণ্ডার ভারত থেকে তিব্বতে চলে গিয়েছিল, তা ফিরিয়ে এনে যে সত্যটি তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন তা হল এই ঃ প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি কোনো দিনই তার ভৌগোলিক সীমাকে স্বীকার করেনি। এই সংস্কৃতি সমগ্র মধ্য-এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়াকে নিয়ে একটি অখণ্ড সাংস্কৃতিক একক গড়ে তুলেছিল। মুসলমান বিজয়ের আগেই ভারতের ভৌগোলিক সীমাকে অতিক্রম করে তার বিদ্যুৎপ্রভ সংস্কৃতি মধ্য-এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়াকে তার অন্তর্গত করেছিল। প্রায় সমগ্র এশিয়া পরিক্রমার পর রাহুল নামে এই ঘুমক্কড় ভারতে ফিরে এসে আত্মবিস্মৃত ভারতীয় চৈতন্যকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিলেন। প্রথম শ্রেণির ঘুমক্কড় এভাবেই ফিরে আসেন।

রাহুলের তিব্বতাভিযানের সময় তাঁর ঘুমক্কড় বৃত্তির সঙ্গে তাঁর অন্তরের জ্ঞান-লিপ্সার প্রচণ্ড দাবানলের ছিল পর্যায়ানুবৃত্তি আর অঙ্গাঙ্গি সম্পৃক্তি। এই কথা মনে না রাখলে তিব্বত ভ্রমণের ও হারিয়ে যাওয়া বৌদ্ধ জগতের অনুসন্ধানের কঠিনতম কৃচ্ছ্রসাধনা ও অকল্পনীয় তপস্যার অর্থ বোঝা যাবে না।

ভারতবর্ষ তিব্বতকে ভুলে গিয়েছিল বললে অত্যুক্তি হবে না। একক চেষ্টায় সেই বিস্মৃত তিব্বতকে আবার সম্পূর্ণ সজীব করে শুধু ভারতবর্ষেরই নয়, পৃথিবীর পণ্ডিত-সমাজেব সামনে তুলে ধরে রাহুল ভারতের অতীতের মহিমার কথা বিশ্ববাসীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। এই ভূমিকার পর আমরা রাহুলের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিযানের অর্থাৎ তিব্বত অভিযানের বর্ণনায় অগ্রসর হতে পারি। রাহুল যখন প্রথম তিব্বতযাত্রা করেন, তখন তিনি বিদ্যালংকার পরিবেনের ত্রিপিটকাচার্য হলেও জনসমাজে অপরিচিত, অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তি। সওয়া বছর পরে তিব্বত থেকে ভারতে ফিরে আসার পর তিনি সারস্বত সমাজে আলোড়ন সৃষ্টিকারী মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন। পন্দহা কনৈলার মিড্‌ল পাশ কেদার রাহুল সাংকৃত্যায়ন হয়ে একটি হারিয়ে যাওয়া মহাদেশকে পুনরাবিষ্কার করে সমগ্র ভারতকে এক পরমাশ্চর্য মহিমায় মণ্ডিত করেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বৌদ্ধ রামউদার সাংকৃত্যায়নের তিব্বত অভিযান

শ্রীলঙ্কা

১৯২৭-এর ১৬ মে থেকে ১৯২৮-এর ১ ডিসেম্বর রামউদার বিদ্যালংকার পরিবেন-এ (বিহারে) ছিলেন। রামউদারের কাজ ছিল সংস্কৃতের অধ্যাপন'। সংস্কৃতের অধ্যাপনার সঙ্গে তিনি পালি ভাষার অধ্যয়নও শুরু করলেন। পালি সংস্কৃতের অত্যন্ত কাছাকাছি। তাই রামউদার অনায়াসে পালি শিখেছিলেন। পালি শিখে *ত্রিপিটক* পড়ার সময় তিনি দেখলেন যে, পালি *ত্রিপিটক*-এ বুদ্ধকালীন সমাজ, রাজনীতি ও ভূগোলের অনেক উপাদান আছে। 'ত্রিপিটক আমার ইতিহাসের ক্ষুধাকে প্রবলতর করেছিল।' পালি টেক্‌স্ট সোসাইটি (লণ্ডন) প্রকাশিত *ত্রিপিটক*-এর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা তাঁকে আরো অনুপ্রাণিত করেছিল। এরপর পালি টেক্‌সট্ সোসাইটির জার্নাল, ব্রিটেনের রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির এবং শ্রীলঙ্কা, বাংলা ও বোম্বাইয়ের এশিয়াটিক সোসাইটির *এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা*-র সব পুরনো সংস্করণ তিনি পড়ে ফেলেন। হাজারিবাগ জেলে তাঁর ব্রাহ্মীলিপির সঙ্গে পরিচয় হয়। শ্রীলঙ্কায় ব্রাহ্মীলিপিকে তিনি পুরোপুরি আয়ত্ত করেন।

ত্রিপিটক পড়ার সময় আড়াই হাজার বছর আগেকার সমাজের ছবি দেখতেন রামউদার। তন্ময় হয়ে বুদ্ধের যুক্তিপূর্ণ, সরল ও মধুর বাক্যের 'আস্বাদ' গ্রহণ করতেন। 'ত্রিপিটকের অলৌকিক ও অসম্ভব ঘটনাবলিকে আমি অবজ্ঞা করিনি। আমি জানতাম, আড়াই হাজার বছরের প্রভাব ত্রিপিটকের ওপর পড়তে বাধ্য। কিন্তু ছাই-চাপা আগুনের মতো বুদ্ধের অলৌকিক বাক্য আমার মনকে জোর করে তাঁর দিকে টেনে নিত। বুদ্ধ কালামোকে বলেছিলেন 'কোনো গ্রন্থ, ঐতিহ্য শ্রদ্ধেয় পূর্ব-পুরুষদের সৃষ্ট বলে তাকে মান্য কোরো না। সর্বদাই তার সত্যাসত্য নির্ণয় করে গ্রহণ করবে।' বুদ্ধের এই উপদেশ যখন শুনলাম, তখন হঠাৎ আমার মন বলল, এই মানুষটির সত্যের ওপর অটল বিশ্বাস আছে। এই মানুষটি মানুষের স্বাধীন চিন্তার মাহাত্ম্য বোঝেন। আমি যখন *মজ্‌ঝিম নিকায়*-তে পড়লাম, 'আমি তোমাদের ধর্মোপদেশ দিয়েছি নদী পার হওয়ার জন্য, মাথায় বয়ে বেড়ানোর জন্য নয়, তখন আমি বুঝতে পারলাম, যে-বস্তুর জন্য আমি এতকাল ঘুরে মরছিলাম, তা মিলে গেছে।'

কিন্তু রামউদারের সমস্যা হল এই যে, তিনি বুদ্ধ ও ঈশ্বরকে সঙ্গে নিয়ে চলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দু-তিন মাসের মধ্যে তাঁর এই ধারণা হল যে, এক খাপে দুই তরবারির মতো বুদ্ধের সঙ্গে ঈশ্বরের সহাবস্থান সম্ভব নয়। শেষ পর্যন্ত বুদ্ধকেই তিনি বেছে নিয়েছিলেন। *ত্রিপিটক* পড়ে রামউদার এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, শ্রীলঙ্কা থেকে

তাঁকে একবার তিব্বত যেতে হবে। তিব্বত না গেলে বৌদ্ধ দর্শনের শিক্ষা এবং ভারতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের জ্ঞান সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। যেহেতু তখন তিব্বতে যেতে হলে গোপনে যাওয়া ছাড়া কোনো পথ ছিল না, তাই তিনি ভিক্ষু হননি। কেননা ভিক্ষু হয়ে তিব্বতে যাওয়ার পথে অনেক বাধা ছিল।

শ্রীলঙ্কায় উনিশ মাস আবার রামউদার জ্ঞানার্জনের নিস্তব্ধ জগতে ফিরে যান। নির্দ্বন্দ্ব গভীর অধ্যয়নের জীবন। ১৯২৭-এই রামউদারের সাহিত্যিক জীবন শুরু হয়। অবশ্য তাঁর প্রথম হিন্দি লেখা ১৯১৪-তে *ভাস্কর*-এর প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে তিনি উর্দু কাগজেও লিখতেন। শ্রীলঙ্কায় কিছু লেখা তিনি *সরস্বতী*-র জন্য ধারাবাহিকভাবে লিখেছিলেন। *বিশ্বামিত্র* ও *মিলাপ*-এর ও তিনি শ্রীলঙ্কা সম্পর্কে কিছু লেখা এসময়ে লিখেছিলেন।

শ্রীলঙ্কাতেই রামউদার বই পড়ে তিব্বতি ভাষা শিখতে শুরু করেন। শ্রীলঙ্কা থেকে চলে যাওয়ার আগে বিদ্যালংকার পরিবেন রামউদারকে 'ত্রিপিটকাচার্য' উপাধি প্রদান করে (১৯২৮ এব ৩ সেপ্টেম্বর)। ১৯২৮-এর ১ ডিসেম্বর রামউদার ভারতে যাত্রা করেন। আসলে তিনি ভারতে যাত্রা করেননি, তিব্বতের উদ্দেশ্যেই তিনি ভারতে যাত্রা করেন। রামউদার যখন শ্রীলঙ্কায় যান তখন সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য ও দর্শনে তাঁব প্রগাঢ় অধিকার জন্মেছিল। শ্রীলঙ্কায় এসে তিনি পুবাতত্ত্ব ও ইতিহাসের মৌলিক উপাদান সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করেন। 'ভোট' (তিব্বতি) ভাষার বইও কিছুটা পড়েছিলেন। ভারতের সার্ভে বিভাগের ম্যাপ দেখে তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে নেপালের রাস্তা দিয়েই তিনি তিব্বতের ভেতরে ঢুকতে পারবেন। শিবরাত্রির সময় নেপালে যাওয়া সম্ভব। তাই ভারতের বৌদ্ধ ঐতিহাসিক স্থানসমূহ দেখে তিনি আগামী তিন মাস কাটানোর সিদ্ধান্ত নিলেন।

প্রথম তিব্বত যাত্রা ঃ নেপাল হয়ে তিব্বতে

ভারতে এসে রামউদার সাঁচি, সংকিলা, কৌশাম্বী দেখলেন। আগে তিনি বুদ্ধগয়া, কসয়া, রুম্মিনদেই, জেতবন, শ্রাবস্তী দেখেছিলেন। কিন্তু এবার তিনি বৌদ্ধতীর্থ পরিক্রমা করলেন বৌদ্ধ হিসাবে। এখন তিনি ত্রিপিটকাচার্য।

শিবরাত্রির মেলার সময় রামউদার নেপাল গিয়ে থাপাথলি বৈরাগী মঠে উঠলেন। এবার নেপাল গিয়ে বৌদ্ধতীর্থ মহাবৌধাতে ডুক্‌পা লামা নামে এক প্রভাবশালী লামার সঙ্গে দেখা হল। লাদাখ থেকে রামউদার হেমিস লামার চিঠি নিয়ে এসেছিলেন। ডুক্‌পা লামা রামউদারকে তাঁর সঙ্গে তিব্বতে নিয়ে যেতে রাজি হলেন।

নেপালের এক বৌদ্ধ গৃহস্থ ও ভক্ত তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। লাসায় তাঁর একশো বছরের পুরোনো দোকান ছিল। রামউদার তিব্বত যাবেন শুনে তিনি খুশি হলেন। ডুক্‌পা লামার সঙ্গে যাবেন বলে বামউদার নেপালের এলমোতে অপেক্ষা করছিলেন। ডুক্‌পা লামা কথা দিয়েছিলেন যে, তিনি এলমো আসবেন এবং রামউদারকে সঙ্গে নিয়ে তিব্বত

যাবেন। এলমোতে দু মাস থাকার পরও ডুক্‌পা লামা এলেন না। ডুক্‌পা লামা কাঠমাণ্ডু থেকে সোজা এৃন্নম-এর দিকে রওনা হয়ে যান। তিব্বতের লবণাক্ত হ্রদ থেকে নুন সংগ্রহ করে লোকে ইয়াকের (চমরি গরু) পিঠে করে তা এৃন্নমে নিয়ে আসে। নেপালের পাহাড়ি লোকেরা পিঠে করে চাল বা ভুট্টা বয়ে আনে এৃন্নমে। নুনের সঙ্গে তা বিনিময় করা হয়। ডুক্‌পা লামা চলে গেছেন শুনে রামউদার তখনই রওনা হয়ে যান। তিনি জানতেন যে প্রায় তিন মন ওজনের ডুক্‌পা লামা আগে রওনা দিলেও তিনি তাঁকে ধরে ফেলতে পারবেন। তাই হল। এলমো থেকে কিছু দূরে একটা গ্রামে তিনি ডুক্‌পা লামাকে ধরে ফেললেন। তিনি রামউদারকে নিয়ে যাবেন বলেছিলেন। কিন্তু তাঁকে না জানিয়ে চলে আসাটা যে তাঁর উচিত হয়নি, একথা তাঁর একবারও মনে হল না। 'তিব্বতে এক ধরনের মানুষের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হত যারা শিশুর মতো নিজেদের দায়িত্বকে ভুলে যেতে পারত। কিন্তু আবার যখন তাঁর কাছে এসে গেলাম তিনি আগের মতোই আমাকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে যেতে রাজি হলেন।'

ডুক্‌পা লামার সঙ্গে চলতে চলতে তাতপানী এল। সেখানে শুল্ক বিভাগের লোকেরা রামউদারের মালপত্র দেখল। সেখান থেকে কিছুটা এগোবার পরই নেপাল সীমান্তের ফৌজি চৌকি। ডুক্‌পা লামা এই রাস্তায় চারবার যাতায়াত করেছেন। তাই বড় অফিসার আসেননি। তবু রামউদারের বুক কাঁপছিল। তাঁকে তাঁর বাড়ি ও নামধামের কথা জিগ্যেস করায় তিনি বললেন, তাঁর নাম ছেবঙ ও তাঁর বাড়ি খুন্নু। সবাই ফৌজের হাবিলদারকে বলল, তিনি অবতারী লামার শিষ্য। আরো কিছুটা এগিয়ে ভোটকাশী। সেখানে একটা কাঠের পুল পেরিয়ে তিব্বতে প্রবেশ করলেন রামউদার। এবার তিনি নিশ্চিন্ত। তিব্বতিরা চার-পাঁচশো বছরের পুরোনো দুনিয়ায় বাস করছে। আর কোনো ভয় নেই। তিব্বতিরা তাঁকে কোনো প্রশ্ন করবে না। রামউদারের মনে হল, তাঁর মাথা থেকে হাজার মনের একটা বোঝা নেমে গেল। এবার তিনি চোখ ভরে পার্বত্য সৌন্দর্য দেখতে লাগলেন ঃ পাখির কলরব, কৌশিক নদীর ঘর্ঘর ধ্বনি, মাথা থেকে পা পর্যন্ত সবুজে মোড়া পাহাড়।

বুদ্ধগয়ায় রাহুলের সঙ্গে এক মোঙ্গল ভিক্ষুর দেখা হয়েছিল। তিনি লাসার কাছে ডে-পুঙ বিহারে থাকতেন। এখানে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। রামউদার ইতিমধ্যে তিব্বতিতে কথাবার্তা বলতে শিখে গিয়েছিলেন। মোঙ্গল ভিক্ষু ডে-পুঙ যাচ্ছিলেন। দুজনে একই পথের যাত্রী। তাঁরা আনন্দিত হয়ে পথ চলতে লাগলেন। লাদাখে রামউদারের মাখনের চা খেতে ভালো লাগেনি। কিন্তু এখন তাঁকে পুরোপুরি ভুটিয়া হতে হবে। তাই চা, ছাতু ও শুকনো মাংস খাওয়া তাঁর অভ্যাস করতে হল। তিব্বতিদের মতো রামউদার স্নানটাকেও শিকেয় তুলে রেখেছিলেন।

তাঁরা এৃন্নমে পৌঁছে দেখলেন, এৃন্নমে ভালো বাজার। এৃন্নমে লবণের মরশুম চলছিল। হাজার হাজার নেপালি পিঠে খাদ্যশস্য বয়ে আনছিল। তার বদলে এৃন্নম থেকে তারা নুন নিয়ে যাচ্ছিল।

এৃন্নমে কিছুদিন থেকে গেলেন ডুক্‌পা লামা। তাই রামউদার মোঙ্গল ভিক্ষুর সঙ্গে

রওনা হয়ে গেলেন। দুজনেরই পিঠে বোঝা। পথ নয়, শুধু পাহাড় আর পাহাড়। একদিকে দুনিয়ার সবচেয়ে উঁচু শৃঙ্গ গৌরীশংকর তার ভয়ংকর সৌন্দর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বারো তেরো হাজার ফুট উঁচু দিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁরা। এক মনের কাছাকাছি বোঝা পিঠে নিয়ে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল। মোঙ্গল ভিক্ষু বেশ লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু রামউদারের মনে হচ্ছিল তাঁর বুক ফেটে যাবে। ভিক্ষু তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে থাকবেন বলে দ্রুত চলছিলেন। কিন্তু রামউদারের পক্ষে ওইভাবে পথ চলা প্রায় অসম্ভব মনে হচ্ছিল। তবু কসাইয়ের পেছনে যেমন গরু হেঁটে যায় তেমনি যাচ্ছিলেন রামউদার। রাত দশটা নাগাদ মোঙ্গল ভিক্ষুর বন্ধুর বাড়িতে পৌঁছে রামউদার সোজা বিছানায় শুয়ে পড়লেন। লোহার উনুনে থুক্‌পা রান্না হচ্ছিল। ছাতু অথবা চালের সঙ্গে মুলো, হাড় ও সম্ভব হলে কিছুটা মাংস এক সঙ্গে মিলিয়ে ঘণ্ট তৈরি হত। তাই হল থুক্‌পা। থুক্‌পা তৈরি হলে রামউদার তাঁর কাঠের পেয়ালা এগিয়ে দিলেন। কয়েক পেয়ালা থুক্‌পা খেলেন।

এগারো শতকের চুরাশি সিদ্ধ পুরুষের পরম্পরায় তিব্বতে একজন বড় সিদ্ধ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নাম ছিল জে-চুন-মিলা-রেপা। তিনি শুধু মহাপুরুষই ছিলেন না, তিব্বতের সব চেয়ে বড় কবিও ছিলেন। তিনি থাকতেন লপচীতে। দুজনে এবার লপচীর দিকে রওনা হলেন। কিন্তু লপচীতে যাওয়া হল না। কারণ লপচী বরফে ঢেকে গিয়েছিল। মোঙ্গল ভিক্ষুর নাম ছিল লোবজঙ-শেরব। অনুবাদ করলে যার অর্থ দাঁড়ায় সুমতি প্রাজ্ঞ। অতএব রামউদার তাঁকে সুমতি বলেই ডাকতে লাগলেন।

সুমতি প্রত্যেক বছর বুদ্ধগয়ায় তীর্থ করতে যেতেন। নয় মাস তাঁর পথে কেটে যেত। লেখাপড়ার কোনো ব্যাপার ছিল না। ডেপুঙ থেকে বুদ্ধগয়ায় যাতায়াতের পথে তাঁর কিছু যজমান ছিল। বুদ্ধগয়া থেকে তিনি কিছু কাপড় নিয়ে আসতেন। যজমানদের বুদ্ধগয়ার কাপড় ছিঁড়ে ছিঁড়ে দিতেন। তার পরিবর্তে যজমানের বাড়িতে আরামে থাকতেন এবং কিছু রোজগারও হত।

আবার যখন তাঁরা যাত্রা করলেন, তখন রামউদার একজন মুটে যোগাড় করেছিলেন। এখন তিনি হালকা হয়ে হাঁটছিলেন। বেশ কিছুটা গিয়ে সুমতি এক বাড়িতে উঠলেন। সেই বাড়িতে দুটি প্রাণী। একজন পঁচিশ বছরের যুবক, অন্যজন বেয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ বছরের বুড়ি। তিব্বতের মানুষ এক বছর দু বছর পরে স্নান করে। কিন্তু পুরুষ ও নারী উভয়েরই লম্বা লম্বা চুল। কয়েকমাস পর পর সেই চুল পরিষ্কার করে তারা তেল দিয়ে বাঁধে। তাঁবা যখন পৌঁছোলেন তখন যুবকটি তেল দিয়ে বুড়ির চুল বেঁধে দিচ্ছিল। রামউদার বললেন, 'ছেলেটি মায়ের চুল বেঁধে দিচ্ছে?' সুমতি বললেন, 'চুপ! মা নয়, স্ত্রীর চুল বেঁধে দিচ্ছে।' তিব্বতে শুধু বড় ভাইয়েরই বিয়ে হয়। বড় ভাইয়ের স্ত্রী অন্য সব ভাইয়েরই স্ত্রী হিসেবে গণ্য হয়। সব সহোদর ভাইয়ের একটিই স্ত্রী। এও হতে পারে, যে-ভাই তখনো জন্মই নেয়নি, বড় ভাইয়ের স্ত্রী তারও স্ত্রী।

তিব্বতের পথ বন্ধুর। কিন্তু তিব্বতে কিছু সুবিধাও আছে। সেখানে জাতপাত,

ছোঁয়াছুঁয়ির কোনো প্রশ্ন নেই। মেয়েরা পর্দানসীনও নয়। একেবারে অপরিচিত লোকও বাড়ির ভেতরে গিয়ে বাড়ির বউ ও শাশুড়ির ঝুলি থেকে চা বার করে আনতে পারত।

এই গ্রাম থেকে বেরিয়ে সবচেয়ে বিপজ্জনক থোঙ-লা ডাঁড়া পেরোতে হল। দুটো পাহাড়ের মধ্য দিয়ে যেখানে নদী বয়ে গেছে সেই ফাঁকটাকে ডাঁড়া বলা হয়। তিব্বতে যাওয়ার পথে সব থেকে বিপজ্জনক স্থান হল এই সব ডাঁড়া। ষোলো-সতেরো হাজার ফুট উঁচু পাহাড় ও নদীর বাঁক অনেক দূর পর্যন্ত সব গ্রামগঞ্জ আড়াল করে রেখেছিল। এই বিপজ্জনক ডাঁড়া লাফিয়ে পার হতে হল।

এরপর তাঁরা তিঙরীর বিশাল প্রান্তরে পৌঁছোলেন। প্রান্তরটি পাহাড়ে ঘেরা তাঁবুর মতো। এই সব পাহাড়ের নাম তিঙরী-সমাধি-গিরি। আশেপাশের গ্রামে সুমতির অনেক যজমান ছিল। যজমানদের মধ্যে বিতরণের জন্য সুমতি বুদ্ধগয়া থেকে পাতলা ছেঁড়া কাপড়ের সলতে নিয়ে এসেছিলেন। সেগুলি ফুরিয়ে যাওয়ার পরও যে কোনো কাপড় দিয়ে সলতে বানিয়ে বিতরণ করছিলেন তিনি। রামউদার দেখলেন এভাবে সলতে বিতরণের কাজ চললে এখানেই এক মাস কেটে যাবে। সলতে বিতরণ না করে চলে গেলে সুমতির ক্ষতি হবে। রামউদার সেই ক্ষতিপূরণ করতে রাজি হওয়ায় তাঁরা শেকর বিহারের দিকে রওনা হলেন।

শেকর বিহারে তিনি ১০৩টি হাতে লেখা কনজুর (বুদ্ধ-বচন অনুবাদ) পুঁথি পেলেন। প্রত্যেকটি পুঁথি মোটা কাগজের ওপর সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা। এক একটি পুঁথির ওজন কম হলেও চব্বিশ-পঁচিশ সের। রামউদার পুঁথির মধ্যে ডুবে গেলেন। যে কাজে এসেছেন, তা হয়তো মিলেও যেতে পারে, এই হল তার প্রথম ইঙ্গিত। সুমতি চলে গেলেন আশেপাশের গ্রামে। দুদিন পরে ফিরে এলেন। সেখান থেকে তিঙরী গ্রাম এবং তিঙরী থেকে ডম্‌বা। ডম্‌বা থেকে তাঁরা চকোর গ্রামে পৌঁছোলেন। গ্রামে প্রথমে চীনা সৈনিকদের চৌকির ধ্বংসাবশেষ দেখা গেল। তারপর এক পাহাড়ের ওপর কোনো পুরোনো প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়ল। আকবর ও জাহাঙ্গীরের সময় তিব্বতে দু-চারটা গ্রাম নিয়ে এক একটা রাজ্যে এক একজন স্বতন্ত্র রাজা ছিলেন। ঐ সময় পাহাড়ের উপর জায়গায় জায়গায় এই ধরনের প্রাসাদ তৈরি হয়েছিল। খ্রিস্টিয় ১৬৪২ নাগাদ মোঙ্গলরা এই ছোটো ছোটো রাজাদের খতম করে এবং গোটা তিব্বত জয় করে দলাই-লামা উপাধিধারী মোহান্ত রাজাদের ভেট দেয়। সেই থেকে তিব্বতে দলাই-লামা উপাধিধারী মোহান্ত রাজাদের শাসন শুরু হয়। প্রথম শাসক ছিলেন পঞ্চম দলাই-লামা। দলাই-লামার কোনো চেলা তাঁর গদির উত্তরাধিকারী হয় না। তাঁর মৃত্যুর পর কোথায় দলাই-লামার শিশু অবতার আছেন, জ্যোতিষী, ওঝা প্রভৃতি মিলে সেই অবতারকে খুঁজে বার করেন এবং সেই শিশু দলাই-লামা হয়ে গদিতে বসেন।

দিন থাকতে থাকতেই তাঁরা চকোর গ্রামে পৌঁছে গেলেন। সুমতির যজমান ছিল এক গরিব গৃহস্থ। কোনো এক সময় চকোর ছোটখাটো রাজধানী ছিল। তখন লোক-বসতিও বেশি ছিল। কিন্তু গ্রামটি ছিল শ্রীহীন। অনেক চাষযোগ্য জমি পড়েছিল। সব

ভাইয়ের একই স্ত্রী হওয়ায় তিব্বতে জনসংখ্যা বাড়তে পারেনি। পাঁচ ভাই হলেও তাদের স্ত্রী একজনই হবে। ধরে নেওয়া যাক তাদের তেরোটি ছেলে হল। কিন্তু এই তেরোটির স্ত্রী একজনই হবে। তৃতীয় প্রজন্মে হয়তো এই ঘরে একটি ছেলেই থেকে গেল। কোনো ঘরে যদি ছেলে না হয়ে মেয়ে হয় তবে ঘরজামাই করে বংশবৃদ্ধি করা হয়। এই কারণে বাড়ির সংখ্যা কমে যাওয়া স্বাভাবিক। তিব্বতে এক প্রজন্ম যত খেত আবাদ করে রেখে যায়, তারপর বিশ প্রজন্মের জন্য তা যথেষ্ট। কেননা খেত ভাইদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয় না। চকোরের কাছাকাছি অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত চাষযোগ্য জমি বর্তমান জনসংখ্যা থাকা পর্যন্ত চাষ হবে না। পাশ দিয়ে কৌশিক নদীর একটি বড় প্রবাহ বয়ে যাচ্ছিল। তা থেকে খাল কেটে যত ইচ্ছা সেচের জল পাওয়া যেত।

ঐ দিন বর্ষা হচ্ছিল। তাতে তাঁদের যাত্রা বন্ধ হয়েছিল। বাড়িতে ঘরের বাইরে একটি চওড়া উঠোন। বাড়ি থেকে বেরোবার দরজায় শেকল দিয়ে একটা কুকুর বাঁধা ছিল। রামউদার দেখে নিয়েছিলেন যে কুকুরের শেকলের ওপর নির্ভর করা চলে না এবং তিনি যা ভেবেছিলেন, তাই হল। কুকুর ঝটকা টান দিয়ে শেকল ছিঁড়ে ফেলল। সুমতি আগে যাচ্ছিল, রামউদার যাচ্ছিলেন দশ হাত পিছে। হঠাৎ কুকুর শেকল ছিঁড়ে ফেলায় সুমতি পেছনে পালিয়ে এল, আর রামউদারকে বকতে লাগল। বাড়ির কর্ত্রী এসে কুকুরকে ধরে রাখলেন। তাঁরা দরজার বাইরে বেরিয়ে এলেন। এখান থেকে সকার দিকেও একটা রাস্তা চলে গেছে। কিন্তু তাঁরা শেকরের পথে চললেন। কিছুদূর যাওয়ার পর কৌশিকীর প্রধান প্রবাহ পাওয়া গেল। প্রায় কোমর পর্যন্ত জল ; নদী হেঁটে পার হতে হল। জলের স্রোত তীব্র না হলেও বরফ গলা জল; ভীষণ ঠাণ্ডা। নদী পেরিয়ে তাঁরা শেকর পৌঁছোলেন।

শেকরের পাশের পাহাড়ে একটি বড় মঠ ছিল। সেখানে কয়েকশো ভিক্ষু থাকতেন। তাঁরা পাহাড়ের নীচের গ্রামে এসেছিলেন। কিন্তু পাহাড়ের মঠে সুমতির পরিচিত ভিক্ষু ছিল। তাই তাঁরা দুজনে সেখানে গেলেন। মঠের প্রধান অধিকারী খনপো (পণ্ডিত) লাসার কোনো মঠের লেখাপড়া জানা বিদগ্ধ লোক। রামউদার তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে খুব খুশি হয়েছিলেন। মালপত্র বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য রামউদার কোনো লোক অথবা ঘোড়ার খোঁজ করছিলেন। কোনো লোক অথবা ঘোড়া পাওয়া যায়নি। কিন্তু একজন যুবক ভিক্ষুকে পাওয়া গিয়েছিল। সুমতি তাকে লাসা, সাম্যে ইত্যাদি মহাতীর্থ দেখাবার লোভ দেখান এবং সেই যুবক তাঁদের সঙ্গে যেতে রাজি হয়ে যায়।

বেলা দুটো-তিনটে নাগাদ শেকর থেকে যাত্রা শুরু হল। খালি হাত থাকলে চলতে বেশ আনন্দ হয়। সুমতির বোঝাও হালকা ছিল। চার-পাঁচ মাইলের মধ্যে তার একজন যজমান ছিল। দু ঘণ্টা দিন থাকতেই তাঁরা সেখানে পৌঁছে গেলেন। বাড়িটি কোনো সম্পন্ন গৃহস্থের। বেশ বড় বাড়ি। ঘরও অনেক। বাড়ির চার কোণে ভালুকের মতো লম্বা কালো লোম-অলা চারটে বড় কুকুর বাঁধা ছিল। তাদের গলার দড়ি এত বড় ছিল যে বাইরের দেওয়ালের সবটা কোনো না কোনো কুকুরের নাগালের মধ্যে ছিল। পঞ্চম

কুকুরটা বাঁধা ছিল না। সে তাঁদের তিনজনকে দেখেই ছুটে এল। বাড়ির চাকর এসে কুকুরটাকে তাড়িয়ে দিল। বাড়িতে ঢুকে গেটের পাশের ঘরে তাঁরা মালপত্র নামিয়ে রাখলেন। ঠিক সেই সময় তাঁদের সঙ্গে যে যুবক ভিক্ষুটি এসেছিল, সে আট বছরের ছেলের মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। সে বলতে লাগল, 'আমার একমাত্র মা-ই আছেন, তিনি কেঁদে কেঁদে মরে যাবেন। আমাকে ফিরে যেতে দিন।' সুমতি তাকে আটকে রাখার চেষ্টা করছিলেন। রামউদার বললেন, 'যেতে দাও।' তাই সে যাওয়ার অনুমতি পেয়ে গেল। গৃহকর্তা এসে তাঁদের ওপরের ঘরে নিয়ে গেলেন। কথাবার্তায় ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। চা তৈরি হল। সুমতি তাঁর বোঝা থেকে ছাতু বের করতে গিয়ে দেখলেন যে তাঁর সাত সের ছাতুর থলি গায়েব হয়ে গেছে। সুমতি ভিক্ষুকে গাল দিতে লাগলেন—সে-ই ছাতু চুরি করে নিয়ে গেছে। চা ফেলে তিনি ডাণ্ডা নিয়ে উঠলেন। রামউদার জিগ্যেস করলেন, 'কোথায় যাচ্ছ?' তিনি বললেন, 'কোথায় আর যাব? ছাতু নিয়ে আসতে যাচ্ছি।'

রামউদার শান্তভাবে তাঁকে যেতে বারণ করলেন। তিনি রেগে গেলেন। শেষ পর্যন্ত গৃহকর্তা সাত-আট সের ছাতু এনে তাঁর সামনে রেখে বললেন যে, ঐ ভিক্ষু এতক্ষণে শেকর পৌঁছে গেছে। এখন সেখানে রওনা হলে রাত হয়ে যাবে।

শেকর থেকে খনপো পথের কোনো গ্রামের মুখিয়াকে একটি লোক যোগাড় করে দেওয়ার জন্য চিঠি দিয়েছিলেন। কিন্তু গ্রামের মুখিয়া এই ধরনের চিঠিকে বিশেষ পাত্তা দিত না। পথের পাশে গ্রাম। ক্রমাগতই লোকজন যাতায়াত করছিল; এই রকমের সব ফরমায়েস রাখলে, গ্রামের লোকদের নিজেদের কাজকর্ম সব ছেড়ে এই কাজই করতে হয়। তিব্বতে যাত্রীদের পথ চলতে সুবিধা হয় যদি পেশাদার ঘোড়া ও খচ্চর-অলাদের সঙ্গে তাদের অনেক দূর পর্যন্ত ভাড়া ঠিক হয়ে যায়। বেগার দেওয়ার জন্য সরকারি চিঠি থাকলেও কাজ হয়। অন্য একটা উপায়ও আছে; যদি যাত্রীরা সময় নষ্ট করার পরোয়া না করে দুয়েক সপ্তাহ অপেক্ষা করতে পারে। এই তিনটি পন্থার একটিও রামউদারের পক্ষে সুবিধাজনক ছিল না। এই গ্রামে তিনি যে বাড়িতে উঠেছিলেন, সেখানে জায়গার অভাব ছিল। সামনের গ্রামের একজনের নাম মনে পড়ল। কিন্তু সেখানেও স্থানাভাব। ঘোড়াও পাওয়া গেল না। এ সময়ে জানা গেল যে, শেকর থেকে মালপত্র নিয়ে কিছু গাধা ব্রহ্মপুত্রের দিকে আসছে। রামউদার এই সব গাধার আশায় বসে রইলেন। গাধা-অলা দশ-বারো আনা পয়সা নিয়ে তাঁদের মাল লর্চে পর্যন্ত পৌঁছে দিতে রাজি হল। সঙ্গে একটা বড় কুকুর ছিল। রামউদাব ছাতু খাওয়ার সময় কুকুরটাকেও অনেক ছাতু খাওয়াতেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে কুকুরটার সঙ্গে বন্ধুত্ব না পাতিয়ে কোনো উপায় নেই। গাধা-অলা খুব ধীরেসুস্থে চলছিল। বেশির ভাগ সময় তারা রাত্রিতেই চলত। গাধা-অলাদেব মধ্যে একজন খনপোর ভাইপো। বেশ বড় একটা ডাঁড়া পার হতে হল। ওখান থেকে ব্রহ্মপুত্র দেখতে পেয়েছিলেন কিনা রামউদারের মনে নেই। কয়েকদিন পরে ব্রহ্মপুত্রের তীরে তাঁরা গাধা-অলাদের গ্রামে পৌঁছোলেন। মালপত্র

গ্রামের বাইরে ছিল। রামউদার ও সুমতি কাছাকাছি এক বুড়ির ঝুপড়িতে চলে গিয়েছিলেন। হয়তো সেখানে দু-এক দিন বিশ্রামও নিয়েছিলেন। যেখানে মাল ছিল সেখানে দু-এক বার যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন রামউদার। সেখানে লোকজনও ছিল। তা সত্ত্বেও কুকুরটা রামউদারকে কামড়াতে ছুটে এল। অথচ এই কুকুরটাকে আসার সময় পথে ক্রমাগত ছাতু খাইয়েছিলেন তিনি। সুমতি প্রতিনিয়ত রামউদারকে লেকচার দিতেন ঃ কুকুরের শরীর বড় হলেও সেই আন্দাজে সাহস নেই। আজ তিনি ছাতা নিয়ে যজমান বাড়িতে যাওয়ার জন্য বার হয়েছিলেন। বুড়ির ঘরের বাইরে বুক সমান উঁচু দেয়াল। দেয়ালের বাইরে তখন তিনি দশ কদমের বেশি যাননি। এরই মধ্যে চার-পাঁচটা কুকুর তাঁর ওপর লাফিয়ে পড়ল। আওয়াজ শুনেই রামউদার দেয়ালের কাছে গিয়ে দেখলেন সুমতির প্রাণ বিপন্ন। তিনি পাথর উঠিয়ে কুকুরগুলিকে মারতে শুরু করলেন। এই ভয়ঙ্কর তিব্বতি কুকুরগুলির বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, পাথর ছুঁড়ে মারলে যতদূর পাথর যাবে, কুকুরগুলিও ততদূর পাথরের পেছনে পেছনে যাবে। কুকুরগুলি পাথরের পেছনে যাওয়ায় সুমতি ভেতরে চলে আসতে পারলেন। রামউদার জিজ্ঞেস করলেন, 'কুকুরের সাহস কম না বেশি?' বেচারা ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিলেন।

এবার তাঁদের ব্রহ্মপুত্রের ডান তীর ধরে এগিয়ে লর্চে পৌঁছতে হবে। লর্চে বেশি দূর নয়। খনপোর ভাইপো রামউদারকে বলল যে লর্চেতে তাঁদের মালপত্র ব্রহ্মপুত্রের তীরে রেখে দেবে। সেখান থেকে চামড়ার নৌকো পেলেই তাতে চড়ে টসীলুনপো পৌঁছে যাওয়া যাবে। সুমতির ইচ্ছা ছিল লর্চের মঠে থাকার। কিন্তু মঠে না গিয়ে রামউদার চেয়েছিলেন সদাগরের সঙ্গে নদীর তীরে থাকতে। সুমতি নৌকোয় যেতে চাননি।

এরপর চামড়ার নৌকো কাল আসবে পরশু আসবে মনে করে রামউদার নদীর তীরে সদাগরদের মাল পাহারা দিতে লাগলেন। আর সুমতি ঘুরতে লাগলেন তাঁর যজমানদের কাছে। এ পর্যন্ত যতটা দূর রামউদার এসেছিলেন তার মধ্যে এক্লম, তিঙরী, শেকর বাদে এটা চতুর্থ জোত (ম্যাজিস্ট্রেটের স্থান) ছিল। সদাগরদের মধ্যে লাসার এক গৃহস্থ যুবক ছিল। আর দুজন ছিল ঢাবা (অর্থাৎ ভিক্ষু)।

এখানে স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ কি রকম সরল তা রামউদার নদীর ঘাটে দেখেছিলেন। একটি ষোড়শী নদীতে কাপড় ধুতে এসেছিল। রামউদারের সঙ্গী ঢাবা পাঁচ-দশ মিনিট মেয়েটির কাছে গিয়ে ফস্টি-নস্টি করল। আর একটু পরে দুজনেই তাঁবুর ভেতরে প্রণয়লীলা পূর্ণ করল। বৃষ্টির জল থেকে মালপত্র বাঁচানোর জন্য ওরা তাঁবু খাটায়। য়োদপোন-এর মহলে হয়তো কোনো বাড়ি তৈরি হচ্ছিল। নারী পুরুষ সেখানে বেগার খাটছিল এবং পাথর বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে ওরা গানও করছিল। রামউদার দেখতেন যে, মজা করে ওরা কাপড় ছিনিয়ে নিয়ে মেয়েদের সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে দিত। এ সময়টা ছিল গরমের। সারা বছর এরা স্নান করত না। অতএব এ সময়টা ওরা স্নান করত। অনেক স্ত্রী-পুরুষ উলঙ্গ হয়ে স্নান করছিল। খুব ঠাণ্ডা জল। কিন্তু ওরা লাফিয়ে লাফিয়ে দুশো গজ পর্যন্ত যাচ্ছিল। মেয়েদের সামনে পুরুষেরা নগ্ন হয়ে মাথার চুল

নিঙড়াচ্ছিল এবং শরীর শুকনো করছিল। এই বিবরণ পড়ে পাঠকের মনে হতে পারে, তিব্বতিরা অত্যন্ত কামুক। এ ব্যাপারে এইটুকুই শুধু বলা চলে যে, কামুকতা শব্দটি যে অর্থে ব্যবহার করা হয় সেই অর্থে হিন্দুস্থানীদের এক শতাংশ কামুকও এরা নয়। কথাটা হল এই যে, এখানে স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ অনেকটা খোলামেলা।

লর্চে থেকে টশীলুম্পো বা শিগর্চেতে চামড়ার নৌকোয় দুদিনে পৌঁছে যাওয়া যেত। ব্রহ্মপুত্রের জলাভূমিতে কিছু জংলি ঝাড় হয়। এই ঝাড়ের ডাল কেটে দড়িতে বেঁধে একটা চৌকো মতো ভেলা বানিয়ে তার উপর ভিজে চামড়া জড়িয়ে দেওয়া হত। এই হল চামড়ার নৌকো। গন্তব্য স্থানে পৌঁছে এই চামড়া খুলে নেওয়া হত।

অপেক্ষা করতে করতে এক যুগ কেটে গেল। শেষ পর্যন্ত নৌকো এলো। পরদিন রওনা হওয়ার কথা। তার একদিন আগে রামউদার একটি আস্ত ভেড়ার শুকনো মাংস কিনলেন। শুকনো মাংস রান্না করা হয় না। কিন্তু তিব্বতে এই মাংস রান্না করা হয়েছে বলে খাওয়া হত।

নদী পেরিয়ে গাধা ও খচ্চর পেলেন রামউদার। কিন্তু তিব্বতের ঘড়ি চলত খুব ধীরে। লোকজন রাস্তায় পথ চলার সময়ও মৌজ করতে করতে এগোত। খচ্চর-অলা ছিল তিনজন, কিন্তু খচ্চর ছিল ত্রিশটির মতো। এদিককার গ্রামে মুরগির ডিম খুব পাওয়া যেত। ছাতু খাওয়া রামউদারের পক্ষে খুব কঠিন ছিল। গলা দিয়ে ছাতু নামতে চাইত না। তাই তিনি বিশ-ত্রিশটা ডিম সেদ্ধ করে ছাতুর থলির মধ্যে রেখে দিয়েছিলেন। আর যখনই খিদে পেত তখনই তিনি সেই ডিম খেতেন। সারাদিনে পঁচিশ-ত্রিশটা ডিম খেয়ে ফেলা একেবারে সাধারণ ব্যাপার ছিল। কয়েকদিন চলার পর তাঁরা নরথঙ-এ পৌঁছোলেন। নরথঙ এগারো শতকের একটা পুরোনো মঠ। যখন ভারতে বৌদ্ধধর্ম জীবন্ত ছিল তখনই এই মঠ বানানো হয়েছিল। কনজুর (বুদ্ধ-বচন অনুবাদ) ও তনজুর (শাস্ত্র অনুবাদ)-এর তিনশ আটত্রিশটি বড় বড় পুঁথির মধ্যে দশ হাজারের মতো ভারতীয় গ্রন্থের অনুবাদ সুরক্ষিত ছিল। এই সব গ্রন্থের ছাপাখানা ছিল এই মঠ। কিন্তু খচ্চর-অলাদের সিধে শিগর্চেতে যাবার কথা ছিল। অতএব নরথঙ-এ থাকা হল না। এগোতে হল। কয়েক ঘণ্টা পরে পাহাড়ের পাদদেশে সোনার ছাদ ও বড় বড় মহল-অলা টশী-লহূন-পোর সুন্দর মহাবিহার (গুম্বা) সামনে দেখা গেল। সবাই শ্রদ্ধাভরে এই বিহারকে প্রণাম করল। যেমন দলাই লামার পরেই তিব্বতে সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন টশী লামা, তেমনি লাসার পরেই তিব্বতের সবচেয়ে বড় শহর শিগর্চি। কয়েক বছর হল টশী লামা চীনে পালিয়ে গিয়েছিলেন, তাই শিগর্চির বৈভব কিছুটা কমে গিয়েছিল। তবু এখানকার জোঙপোন (ম্যাজিস্ট্রেট) উচ্চশ্রেণীর অফিসার। শিগর্চির বাজার বিশেষ নষ্ট হয়নি। শিগর্চি ও টশী-লহূন-পোর মধ্যে চীনের মাটির দুর্গ ছিল। এর অনেকটাই ভেঙে পড়ে গিয়েছিল। হয়তো চীনা সৈন্য থাকার সময় শিগর্চি আরও বেশি ঐশ্বর্যশালী ছিল। শিগর্চি পৌঁছে রামউদার তাঁর মালপত্র পিঠে তুললেন এবং সুমতির পরিচিত কোনো বাড়িতে রাত কাটাবার জন্য চলে গেলেন।

তিব্বতে সওয়া বছর

কাঠমাণ্ডু ছেড়ে আসার পর এই প্রথম মনে হল যে আবার তাঁরা সভ্য সমাজে ফিরে এসেছেন। এখানে নেপালিদের অনেক দোকান। নেপালিদের দেখে তাঁর মনে হল তিনি পরিচিত মানুষের মধ্যে ফিরে এসেছেন। তিনি অবিলম্বে লাসা যেতে চাচ্ছিলেন। কেননা সেখানে না যাওয়া পর্যন্ত তাঁর আত্মপ্রকাশ করা সম্ভব ছিল না বা তার কোনো সুযোগ ছিল না। সুমতির কথা শুনতে শুনতে রামউদার বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাই তিনি সুমতির সঙ্গে আর যেতে চাচ্ছিলেন না। পরদিন রামউদারের পট্টনের এক পরিচিত সাহুর কথা মনে পড়ল। মহাবোধাতে সাহুর সঙ্গে দুএকবার দেখা হয়েছিল। তাঁর এক ভাই শিগর্চেতে থাকতেন। রাস্তায় এক নেপালিকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি কোথায় থাকেন তা জানতে পারলেন রামউদার। রামউদার তাঁর সাথে দেখা করলেন। তিনি সাগ্রহে রামউদারকে তাঁর বাড়িতে থাকতে বললেন এবং রামউদার তাঁর মালপত্র নিয়ে তাঁর বাড়ি চলে গেলেন। এই নেপালি সাহুর সঙ্গে জোঙপোনের বন্ধুত্ব ছিল। তিনি রামউদারকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বললেন। কিন্তু রামউদার তখনই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাননি। হিন্দুস্থান ছেড়ে আসার পরে রামউদার এই প্রথম শিগর্চি থেকে শ্রীলঙ্কায় আনন্দজিকে চিঠি লিখলেন। রামউদার লাসায় যাওয়ার জন্য খচ্চর-অলা খুঁজছিলেন। তিনি আবার সেই খচ্চর-অলাকে পেয়ে গেলেন। সাহুর সঙ্গে তিনি একদিন টশী-লহুন-পো দর্শন করতে গিয়েছিলেন। পাঁচ-ছশো বছর ধরে মঠের মন্দির সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। এখানে এত মূর্তি এবং রুপোর ও সোনার বড় বড় প্রদীপ যে তার কোনো লেখাজোখা ছিল না। এই মঠের আরও অনেক মন্দিরে রামউদার গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি জানতে পারলেন যে কনৌরের অনেক ভিক্ষু সেখানে থাকেন। সেখানে রঘুবরের সঙ্গে দেখা হল। রঘুবর হিন্দি উর্দু জানত। সে তিন বছর ধরে বৌদ্ধ গ্রন্থ পড়ছিল। রঘুবরের কাছে তিনি জানতে পারলেন যে, লাসার কাছে ডেপুঙ মঠে কনৌরের অনেক ভিক্ষু থাকেন।

জুলাই-এর শুরু। রামউদার আবার রওনা হলেন। কিন্তু খচ্চর-অলাদের কোনো তাড়াহুড়ো ছিল না। তিব্বতে হিন্দুস্থান থেকে ডাক ব্যবস্থা গ্যানচী থেকে লাসা এবং গ্যানচী থেকে শিগর্চি পর্যন্ত ছিল। অন্যান্য জায়গায় চিঠি পাঠাতে হলে মানুষের হাতে পাঠাতে হত। রামউদারের খচ্চর-অলা ডাক-পিওনের কাজও করত। প্রথম দিন খচ্চর-অলা কয়েক মাইল গিয়ে একটা বড় বাড়িতে উঠল। শিগর্চের সাহু অনেক করে খচ্চর-অলাকে রামউদারকে নিয়ে যাবার জন্য বলেছিলেন। কিন্তু রামউদার বুঝতে পেরেছিলেন যে এই ধরনের কথা খচ্চর-অলা কানে তোলেনি। গৃহকর্তা এখানে রামউদারকে থাকবার জন্য ভালো জায়গা দিয়েছিলেন। আরও কিছুটা এগোবার পরে তাঁরা এক ধনীর বাড়িতে উঠলেন। এখানে ঐ সময় লীলা হচ্ছিল। লীলা না দেখে খচ্চর-অলার যাবার ইচ্ছা ছিল না। তাঁরা রোজ লীলা দেখতে যেতেন। লীলা করতেন নদীপারের মঠের ভিক্ষু। লীলা মানে গান, বাজনা, নাচ ইত্যাদি। লীলার ব্যবস্থা

করেছিলেন রামউদার যে বাড়িতে উঠেছিলেন তার গৃহকর্তা।

লীলা খতম হবার পর আবার তাঁরা চলতে শুরু করলেন। শিগর্চির থেকে একটা রাস্তা সিধে লাসা গিয়েছিল। কিন্তু তাঁরা ঘুরতে ঘুরতে গ্যান্‌চীর রাস্তায় গিয়েছিলেন।

১৯২৯-এর ৭ জুলাই তাঁরা গ্যান্‌চী পৌঁছোলেন। গ্যান্‌চীতে ইংরেজ সরকারের এক ট্রেড এজেন্ট এবং একশোর কাছাকাছি সৈনিক ছিল। কিন্তু রামউদারের সঙ্গে তাদের কোনো লেনা-দেনা ছিল না। রামউদার ঠিক করেছিলেন যে, লাসায় গিয়ে দলাই লামাকে তাঁর আগমন বার্তা না জানিয়ে তিনি আর কাউকে নিজের ঠিকানা দেবেন না।

আরো কিছুটা এগিয়ে তাঁরা নগাচে পৌঁছোলেন। সেখানে সামনে বিশাল ঝিল আর গ্রামের মাঝে মাঝে সবুজ ঘাসের প্রান্তর। এখানে খচ্চরদের জন্য ঘাস কেনার প্রয়োজন ছিল না।

নগাচে খুব ঠাণ্ডা জায়গা। এর উচ্চতা ১৪-১৫ হাজার ফুটের কম ছিল না। ঝিলের তীর ধরে তাঁদের রাস্তা। পথে সবচেয়ে বড় ডাঁড়া—খম্‌বালা পার হয়ে তাঁরা আবার ব্রহ্মপুত্রের তীরে এসে গেলেন। নৌকোয় ব্রহ্মপুত্র পার হলেন। তারপর চলতে চলতে ১৯ জুলাই কয়েক মাইল দূর থেকে পোতলার সোনালী ছাদ দেখা গেল। সেই সোনালী ছাঁদ দেখে তিনি অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। হিন্দুস্থানে ও শ্রীলঙ্কায় থাকাকালীন তিব্বত সম্পর্কে যা কিছু পড়েছিলেন ও শুনেছিলেন তা থেকে তিনি ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে পোতলার দর্শন দুনিয়ার সব চেয়ে কঠিন বস্তুর অন্যতম। আজ তিনি সেই পোতলাকে তাঁর চোখের সামনে দেখলেন। একটা বড় নদীর পুল পেরিয়ে দু-তিন ঘণ্টা চলার পর তাঁরা লাসার পোতলা গেটের ভেতরে ঢুকলেন। সামনে বাঁদিকের কয়েকটা তলার রঙ লাল। পোতলা প্রাসাদ দলাই লামার প্রাসাদ। এতদিনে তিব্বতের রাজধানীতে পৌঁছোলেন রামউদার। রামউদার ভাবছিলেন ধর্মা সাহুর বাড়ি ছু-শিঙ-শামে পৌঁছোনোর জন্য কারো সাহায্য নেবেন। ঠিক সেই সময়ে এক নেপালি যুবককে তিনি মন্ত্রী মহলের দিকে যেতে দেখলেন। রামউদার তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। যুবক বললেন—দাঁড়ান, আমি ছু-শিঙ-শাকে চিনি; দরবার থেকে ফিরে এসে আমি আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যাব। ঘোড়ার পিঠে রাখা চামড়ার থলির মধ্যে তাঁর মালপত্র পড়েছিল। তিনি সব মাল একত্র করে একটা ঝোলা তৈরি করলেন। ধীরেন্দ্র বজ্র নামে সেই যুবক ফিরে আসতেই পিঠে মালপত্র, হাতে ডাণ্ডা এবং মাথায় ভিক্ষুণীদের মতো হলুদ টুপি পরে তিনি রওনা হলেন। এতকাল তিনি হলুদ কান-ঢাকা টুপি লাগিয়ে চলছিলেন। কিন্তু তিনি জানতেন না যে এখানে এই ধরনের টুপি ভিক্ষুণীরা পরে।

কাঠমাণ্ডু থেকে চলে আসার সময় রামউদার ধর্মা সাহুর কাছ থেকে চিঠি নিয়েছিলেন। তাঁর কাছে যত টাকা ছিল তার বেশ কিছুটা তিনি তিব্বতি সিক্কায় ভাঙিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু একশো টাকার কিছু বেশি তিনি আলাদা রেখে দিয়েছিলেন। তিনি লাসায় এসেছিলেন তিব্বতি ভাষা ও বৌদ্ধ গ্রন্থ অধ্যয়নের জন্য। একশো টাকায় তিব্বতি

দেড়শো সাঙ পাওয়া যেত। তার মধ্যে খাওয়ার জন্য মাসিক খরচা হত সাড়ে চার সাঙ (তিন টাকা)। কিন্তু ঠাণ্ডার জন্যে জামা-কাপড় তৈরি করতে হয়েছিল; তার জন্য লেগেছিল অন্তত চল্লিশ টাকা। বাসনপত্র ভাড়া এবং অন্যান্য জিনিসের জন্য পঞ্চাশ টাকা লেগে যেত। তারপর গ্রন্থেরও প্রয়োজন ছিল। অতএব টাকা পয়সার টানাটানি ছিল।

ধর্মা সাহুর পুত্র পূর্ণমান ও জ্ঞানমান। এই দুইজনই যুবক। যদিও তাঁদের পিতার মতো তাঁরা ভক্তিমান ছিলেন না, কিন্তু এই দুজনই বড় সুশীল ছিলেন। তাঁরা রামউদারকে স্বাগত জানালেন। চার মাস হল রামউদার খবরের কাগজ দেখেননি। ত্রিরত্নমান সাহু *Statesman*-এর সাপ্তাহিক সংস্করণ নিতেন। চিঠি লেখা ও কিছুটা কথাবার্তা বলার পর রামউদার চার মাসের খবরের কাগজ নিয়ে বসলেন। এতকাল পরে তিনি সভ্য মানুষের মধ্যে এসেছেন। তাই পরদিন (২০ জুলাই) তিনি ঠিক করলেন যে স্নান করবেন। পাশের ঘরের কাদির ভাই তাঁকে লাসার পশ্চিমের খালে স্নান করিয়ে আনলেন। ধর্মা সাহু অনেক দিন ধরেই নিজের বাড়িতে থাকেন। ছেলেরা ছোটো ছোটো ছিল। দোকান চালাত তাঁর ভাগ্নে জগৎমান। রামউদার লাসা যাবার পরদিনই তিনি নেপাল ফিরে যাচ্ছিলেন। তাঁর বড় আপশোশ হয়েছিল যে তিনি রামউদারের সেবা করতে পারলেন না। রামউদারও বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি থাকলে তাঁর কাজের সহায়তা হত। তাঁর যাত্রার আগে মঙ্গলানুষ্ঠান হল। ভাজা মাছ, সারসের সেদ্ধ ডিম দিয়ে যাত্রার সময় মঙ্গলভোজন হল। এরপর অল্প মদ্যপানও মঙ্গলভোজের অন্তর্গত ছিল।

লাসায় ঃ রামউদার দলাই লামার প্রশস্তি রচনা করে পাঠিয়ে দিলেন

এবার রামউদারের আগমনের বার্তা দলাই লামাকে জানানো প্রয়োজন। রামউদার জানতেন তিব্বতে যে শত শত পণ্ডিত ভারত থেকে এসেছিলেন তাঁরা তিব্বতি ভাষায় হাজার হাজার গ্রন্থ অনুবাদ করেছিলেন এবং হাজার হাজার যুবককে বৌদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলেন। রামউদার ভেবেছিলেন যে তিনিও তো পণ্ডিত; যদিও বেশ কিছু শতাব্দী ধরে তিব্বতের সঙ্গে ভারতের ধর্মীয় সম্বন্ধ নেই। কিন্তু আগে ভারতীয়রা তিব্বতে আসত গুরু হয়ে; আর এখন তিনি এসেছেন শিষ্য হবার জন্য। তবু তাঁর মনে হয়েছিল যে, তাঁর মতো ভারতীয় ছাত্রের জন্যে এখানে নিশ্চয়ই কিছু সুযোগ থাকবে। ২১ জুলাই দলাই লামাকে তাঁর আগমন বার্তা জানানোর জন্য রামউদার সংস্কৃতে একটি প্রশস্তি রচনা করলেন। কিন্তু তার তিব্বতি অনুবাদ করার প্রয়োজন ছিল। তার জন্য তিনি ধীরেন্দ্র বজ্রের সহায়তা পেয়েছিলেন। তিব্বতে তাঁকে লোকজন গুডালা বলত। গুডার (গুরুমাজু, গুরুমহারাজ) সঙ্গে তিব্বতি ভাষার লা (জি)কে যোগ করে গুডালা হয়েছিল। রামউদারের ভ্রাম্যমান জীবনে যে সব মানুষের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তাদের মধ্য থেকে বাছাই করা রত্নদের একজন গুডালা। তিনি যখন দলাই লামার কাছে খবর পৌঁছোনোর জন্য কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তিকে খুঁজে বার করতে বললেন, তখন গুডালা ঠী-রিনপো-ছের কথা বললেন। অর্থাৎ তিব্বতে ঞিঙমাপা, করয়ুদপা, সক্যপা ও গেলুগ্‌পা এই চার প্রধান

সম্প্রদায়ের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী গেলুগ্‌পার মূল গদির অধীশ্বর ছিলেন ঠী-রিনপো-ছে। যদিও ঠী-রিনপো-ছে গদি ছেড়ে দিয়েছিলেন, তবু তিনি অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। রামউদার গুডালার সঙ্গেই তাঁর কাছে গেলেন। তাঁর বয়স সত্তরের চেয়েও বেশি। স্বভাব অত্যন্ত শান্ত এবং কথা খুব মধুর। কেন রামউদার তিব্বতে এসেছেন তা দলাই লামাকে জানিয়ে দিয়ে চুপচাপ পড়াশোনা করতে পরামর্শ দিলেন। রামউদার জানতেন যে ১৯১১-র চীনের বিপ্লবের পর দলাই লামাকে সবচেয়ে বেশি সহায়তা করেছে ইংরেজ। কিন্তু তিব্বতিরা ইংরেজদের সন্দেহ করে এসেছে দেড়শো বছর ধরে। ইংরেজ সম্পর্কে তাদের বড় শঙ্কা ছিল। রামউদারের দুর্ভাগ্য, তিনি ইংরেজের প্রজা। এখানকার লোক কীভাবে জানবে যে, তিনি কী কষ্ট করে ইংরেজদের ফাঁকি দিয়ে এখানে এসেছেন। যা হোক যে কোনো ভাবেই তাঁকে দলাই লামার কাছে চিঠি পাঠাতে হবে। চুপচাপ থাকলেও হয়তো সফল হওয়া যেত; কিন্তু তাতে দুর্গতি হতে পারত। তাই দলাই লামাকে না জানিয়ে চুপচাপ কাজ করে যাওয়া রামউদারের ভালো লাগেনি। রামউদারের সংস্কৃত শ্লোক অনুবাদ করার সমস্যারও সমাধান হয়নি। শেষ পর্যন্ত ঙরী ছাঙ নামে দলাই লামার এক বিশ্বাসভাজন সভাসদের সহায়তায় রামউদারের সংস্কৃত শ্লোকের ভোটিয়া ভাষায় অনুবাদ হয়ে গেল। ৯ আগস্ট গুডালার সঙ্গে রামউদার দলাই লামার রাজোদ্যান নোবুলিঙ (মণিউদ্যান)-এ গেলেন এবং অনুবাদ সহ শ্লোকের মাধ্যমে পত্র ও একটি রেশমি খাতা ঙরী লামার হাতে দিলেন। ঙরী লামা সেই পত্র দলাই লামার হাতে দেন। ঙরী লামা স্বয়ং এসে জানিয়ে যান যে দলাই লামা কয়েকদিনের মধ্যেই রামউদারকে ডেকে পাঠাবেন।

অন্তত একটা ব্যাপারে রামউদার নিশ্চিন্ত হয়ে গেলেন। তাঁর আর লুকিয়ে থাকার দরকার নেই। তিনি একটা মঠে থাকতে চেয়েছিলেন, যেখানে পণ্ডিতদের সঙ্গলাভ হত; এবং সর্বদা তিব্বতি ভাষায় কথা বলার সুযোগ পাওয়া যেত। ত্রিরত্নমান ও প্রাণমান সাহু, মহিলা সাহু এবং আরো দুতিনজন কর্মচারী ছিলেন নেপালি। তাঁরা হিন্দি বলতেন। তাঁদের সঙ্গে থেকে মঠের মতো তিব্বতি ভাষা বলা চলবে না। কিন্তু কী করা যাবে!

এখানে খাদ্য ছিল ছাতু, চা ও মাংস। বেলা দুটোয় চিঁড়া ও শুকনো মাংস, সন্ধ্যায় ভাত, ডাল ও মাংস। কত পেয়ালা যে চা খেতেন তা বলা কঠিন। এক কথায় অগুনতি বলা যেতে পারে। ঘুমোবার আগেও চা হত। কিন্তু রামউদারের এত চা খেতে ভালো লাগত না। তিনি বছর খানেক থাকবেন বলে লাসায় এসেছিলেন। কিন্তু এতটা সময় খাওয়া-দাওয়ার ভার ছু-শিঙ-শার ওপর কী করে দেওয়া যায়? তাই তিনি তাঁর খাওয়া-দাওয়ার জন্য যাতে তাঁরা টাকা নেন তার জন্য পীড়াপীড়ি করায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঐ টাকাটা তাঁরা নিতে স্বীকৃত হন।

ঙরী-ছাঙকে চিঠি দিয়ে রামউদার ডেপুঙ মঠে চলে গেলেন। ডেপুঙ তিব্বতের সবচেয়ে বড় মঠ। সেখানে সাত হাজার ভিক্ষু থাকতেন। এই মঠকে প্রায় একটা শহর বলা চলে। এখানের একটা ঘরে থাকতে পারলে রামউদারের সুবিধা হত। কিন্তু জায়গা

পাওয়া সহজ ছিল না। সারা মঠকে কিছু ছাত্রাবাসে (খমজন) ভাগ করা হয়েছিল এবং এক একটা দেশের জন্য এক একটা খমজন (ছাত্রাবাস) ছিল। লাদাখবাসীরা পিতোক-খমজনে থাকত, কনৌরবাসীরা গুগে-খমজন-এ। ওখানে ভারতের কোনো খমজন ছিল না। নতুন যে ছাত্ররা আসত, তারা নিজেদের দেশের খমজনকে তাদের নিজস্ব বলে মনে করত। এই খমজন নির্মাণের জন্য ঐ দেশ আর্থিক সহায়তা করেছিল এবং খমজন পরিচালনার জন্য অর্থ দিয়েছিল। প্রত্যেক খমজনেরই ছোটো বড় জায়গির ছিল। বার্ষিক ২০ সাঙ (১৮ টাকা) দিলে একজনের একটা ভালো কামরা মিলে যেত। ১০ থেকে ১২ টাকায় খাওয়াও হয়ে যেত। আরো তিন চার টাকা খরচ করলে তৈরি রান্না পাওয়া যেত। মাসিক ২০ টাকা খরচ করলে বই ছাড়া অন্য সব কিছু হয়ে যেত। রামউদারের কাছে যে টাকা ছিল তাতে ৪-৫ মাস অনায়াসে চলে যেত। তারপর কোনো না কোনো ব্যবস্থা হয়েই যেত।

কিন্তু এই খমজনে নাম লেখানো সহজ ব্যাপার ছিল না। সুখরাম ও আরো কয়েকজন কনৌরবাসী ছাত্র কুঙারওয়া মহলে থাকত। জানা গেল ওখানে নাম লেখানোর প্রয়োজন নেই। এ হল সেই-মহল যেখানে শাসক হওয়ার আগে পঞ্চম দলাই লামা থাকতেন। পঞ্চম দলাই লামাই, দলাই লামার রাজত্ব আরম্ভ করেছিলেন। এখনো একে দলাই লামা মহল বলা হয়। কিন্তু বর্তমানের দলাই লামা পোতলার মতো ভব্য প্রাসাদকেও পছন্দ করতেন না। তিনি থাকতেন নোবুলিঙকার (মণিদ্বীপ) উদ্যান ভবনে। তিনি কুঙারওয়াতে কেন যাবেন? রশী এলাকার মোঙ্গল ছাত্রদের ছাত্রাবাস ছিল সম্‌লো-খমজন। গেশে-বথ দঙ-শেরব ভারত হয়ে এসেছিলেন। তাঁর জন্মস্থান সাইবেরিয়ায় বৈকাল হ্রদের পাশে বুরয়ত প্রজাতন্ত্রে। তিনি যেখানে ছিলেন প্রথম রাতটা রামউদার সেখানেই কাটিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে সুমতি প্রাজ্ঞও ডেপুঙ-এ চলে এসেছিলেন। অভ্যন্তরীণ মোঙ্গলিয়ার ভিক্ষু ছিলেন সুমতি প্রাজ্ঞ। ১০ আগস্ট তিনি ভোজ দিয়েছিলেন। মোঙ্গলদের প্রিয় খাদ্য মাংসের পরোটা তৈরি করেছিলেন তিনি। মোঙ্গলিয়ার চারটে অঞ্চল থেকেই ভিক্ষু ছাত্র তিব্বতের মঠে পড়তে আসত। বহির্মোঙ্গলিয়া (আধুনিক উলন্‌বাতুর), অভ্যন্তরীণ মোঙ্গলিয়া বুরয়ত (বৈকালের কাছে) এবং কলমুখ (ভোল্‌গা নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত)। কিন্তু রুশ বিপ্লবের পর বুরয়ত ও কলমুখ সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র হয়ে গিয়েছিল। বহির্মোঙ্গলিয়াতেও সাম্যবাদী শাসন কায়েম হয়েছিল। অতএব অভ্যন্তরীণ মোঙ্গলিয়াই মোঙ্গলিয়ার একমাত্র অঞ্চল ছিল যেখান থেকে মোঙ্গল ভিক্ষু তিব্বতে পড়তে আসত। সুমতি প্রাজ্ঞও অভ্যন্তরীণ মোঙ্গলিয়ারই লোক। যেখানে আগে ডেপুঙ-এ হাজারের মতো মোঙ্গল ভিক্ষু থাকত, এখন তাদের সংখ্যা দু-তিনশোর বেশি হবে না। সাম্যবাদী প্রজাতন্ত্র থেকে তখন আর নতুন ভিক্ষু আসত না বললেই হয়। তাদের পক্ষে ত্রিশ বছর ধরে মঠের পুরোনো বিদ্যাশিক্ষা করার কোনো অর্থ ছিল না। অবশ্য এখনো সবচেয়ে মেধাবী ও পরিশ্রমী ছাত্র ও পণ্ডিত মোঙ্গলদের মধ্যেই দেখা যেত। রামউদার সুমতিকে যা দেবেন বলেছিলেন তার চেয়েও বেশি টাকা দিয়েছিলেন। তাতে

তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন। তিনি তাঁকে তাঁর ঘরে থাকতে বলেছিলেন। ছু-শিঙ-শাতে থাকাই ঠিক হয়েছিল। কিন্তু লেখাপড়ার ব্যবস্থা করাই ছিল আসল কাজ। নেপালিদের মন্দিরে যে নটা সংস্কৃত গ্রন্থ (নব ব্যাকরণ) ছিল তা আনিয়ে রামউদার তিব্বতি অনুবাদের সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে শুরু করেছিলেন। তাঁর এই বিশ্বাস হয়েছিল যে, যদি এই শব্দগুলিকে আলাদা করা যায় তবে এক ভোট সংস্কৃত কোষ তৈরি হতে পারে। তাই তিনি ছোটো ছোটো কাগজের টুকরোয় শব্দগুলিকে লিখতে শুরু করে দিয়েছিলেন। ভিক্ষু ও তিব্বতি বিদ্বানদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা ও সৎসঙ্গ ছাড়া রামউদারের বেশির ভাগ কাজ হচ্ছিল সংস্কৃত ও ভোটিয়া অনুবাদ গ্রন্থের দ্বারা। শেষ পর্যন্ত রামউদার ষোলো হাজারের মতো শব্দ তাঁর কোষের জন্য জমা করেছিলেন। ঠী-রিনপো-ছে তঞ্জুরের পুঁথিসমূহ দেওয়ার জন্য মুরু বিহারকে বলে দিয়েছিলেন। সেখান থেকে বই রামউদারের বাসস্থানে চলে আসত। রামউদার যে ঘরে ছিলেন সে ঘরে আরও কয়েকজন লোক থাকতেন। তাই ত্রিরত্নমান সাহু অন্য একটা ঘর ঠিক করে দেন। ঘরের ভিতরে আরও কিছু জিনিসপত্র ছিল। কিন্তু রামউদারের জন্য বাইরের বারান্দাই যথেষ্ট ছিল। শীত বেড়ে যাচ্ছিল। রামউদার উলের ভিক্ষু-বস্ত্র ও পোস্তিলের লম্বা চোঙ্গা তৈরি করে নিয়েছিলেন।

এতে শীতের হাত থেকে রক্ষা পেলেও লেখার সময় হাত ও আঙুলকে ঢেকে রাখা মুশকিল ছিল। অক্টোবরের শেষ দিকে আঙুল ফেটে যেতে লাগল এবং হাত থেকে রক্ত বেরুতে লাগল। শীতের দিনে এই এক কষ্ট। কিন্তু ভেসলিন লাগিয়ে কাজ চালাতে লাগলেন। লেখাপড়া করা খুব কঠিন হয়ে পড়েছিল। কলমের নিবের কালি জমে বরফ হয়ে যাওয়ায় কালির দাগ পড়ত না।

রামউদার লাসা আসার এক মাসও হয়নি। এরই মধ্যে তিব্বতের উপর যুদ্ধের মেঘ জমতে লাগল। নেপাল সরকারের তিব্বত সরকার সম্বন্ধে কিছু অভিযোগ ছিল। শেষপর্যন্ত এই দুই সরকারের সম্পর্ক এমন তিক্ত হয়ে গেল যে মনে হল যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। অনেক নেপালি লাসা ছেড়ে চলে যেতে লাগল এবং দুই সরকার সৈন্যবাহিনীকে প্রস্তুত করতে লাগল।

এদিকে লাসায় এক মাস ধরে লামারা পুরশ্চরণ করতে লাগলেন। নেপালের মহামন্ত্রী সামসেরের অনেক বয়স হয়েছিল। তিনি ২৪ নভেম্বরে মারা গেলেন। লাসার সব জায়গায় হুলস্থূল পড়ে গেল যে তান্ত্রিক লামাদের পুরশ্চরণের ফলেই নেপালের প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। ২৮ ডিসেম্বর জানা গেল যে, যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। রামউদারের কিন্তু নিশ্চিত ধারণা হয়েছিল যে, যুদ্ধ হবে না। তিব্বতের শাসকবৃন্দ অনর্থক ভয় পাচ্ছেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি নেপাল ও তিব্বতের মধ্যে শান্তি বজায় রাখার জন্য সর্দার বাহাদুর লেদনলা এলেন। তিনি দার্জিলিঙের এক ভোট ভাষাভাষী ভদ্রলোক। লাসাতে এ সময় চীনের দূতও এসেছিলেন। ১৬ ফেব্রুয়ারি লেদনলা লাসায় যান এবং ২৪ ফেব্রুয়ারি তিনি দলাই লামার সঙ্গে তিন ঘণ্টা একান্তে কথাবার্তা বলেন। তারপর তাঁর মন্ত্রীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। ৭ মার্চ নাগাদ লেদনলা তাঁর কাজে সম্পূর্ণ সফল হলেন।

২২ মার্চ নাগাদ খবর এল সমঝোতা হয়ে গেছে। লেদনলার কর্মদক্ষতা ও মধুর স্বভাবের জন্য এই সমঝোতা হতে পেরেছিল। লেদনলা যদি ইংরেজ হতেন তাহলে এই সমঝোতার জন্য ইংরেজ সরকার তাঁকে পুরস্কৃত করতেন।

এদিকে যখন রাজনীতির ক্ষেত্রে এই তুফান চলছিল তখন রামউদার লাসাতে তাঁর কাজ নিয়ে পড়েছিলেন। তাঁর ঘরের পাশেই ছিলেন কাদির ভাই ও তাঁর স্ত্রী খাতিজা। কাদির ভাই আধা তিব্বতি আধা কাশ্মিরি। কিন্তু খাতিজা ছিলেন শুধু তিব্বতি। লাসায় পাঁচ-ছশো ঘর আধা কাশ্মিরি মুসলমান ছিল। তাছাড়াও ছিল কিছু চীনা মুসলমান। কিন্তু এদের মধ্যে কোনো ঘনিষ্ঠতা ছিল না। কাশ্মিরি মুসলমান ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পঞ্চম দলাই লামার শাসনের সময় লাসায় প্রথম আসে। এখন এদের সংখ্যা অনেক।

ডেপুঙ ও সে-রা বিহার

লাসার দু-তিন মাইল দূরে ডেপুঙ ও সে-রায় বড় বড় বিহার। ডেপুঙ-এ সাত হাজারেরও বেশি এবং সে-রায় পাঁচ হাজারের মতো ভিক্ষু থাকতেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এদের নালন্দার মতো বিশ্ববিদ্যালয় বলা চলে। সাত হাজার ভিক্ষু সবাই বিদ্যাশিক্ষার জন্য ওখানে থাকতেন না। ছাত্রের সংখ্যা বিশ-পঁচিশ শো। প্রকৃত ছাত্র ছিল এক হাজারের মতো। আর অবশিষ্ট সব ভিক্ষু। এঁরা মঠের রান্নাঘর থেকে জমিদারি দেখাশোনা সবই করতেন। কথায় কথায় এঁদের ঝগড়া বেধে যেত। অনেক সময় তো এই ঝগড়া দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরিণত হত। দ্বন্দ্বযুদ্ধ সাধারণ কুস্তি নয়। দ্বন্দ্বযুদ্ধ হত তরবারি দিয়ে। প্রথমেই দ্বন্দ্বযুদ্ধের স্থান ঠিক হত। তারপর মদ খেয়ে দুজনই তাদের বন্ধুদের নিয়ে সেই স্থানে যেত। এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে একজনের মৃত্যু নিশ্চিত ছিল। আর অন্যজন দ্বন্দ্বযুদ্ধের পর কোনো একদিকে চলে যেত। এইসব ভিক্ষুদের লোকেরা খুব ভয় পেত। মঠের বড় অফিসার ছাড়া এরা আর কাউকেই মানত না। গোটা ব্যাপারটা ছিল মধ্যযুগীয় ইউরোপের ডুয়েলের মতো।

রামউদারের টাকা ফুরোল

রামউদারের টাকা পয়সা ফুরিয়ে এসেছিল। তিনি প্রথম ভেবেছিলেন যে মাসে দু-তিনটি লেখা কোনো হিন্দি কাগজে পাঠিয়ে দিলে তা থেকে মাসে বিশ-পঁচিশ টাকা এসে যাবে। কিন্তু বছর খানেকের বেশি সময় হিন্দি পত্রিকায় লিখেও তাঁর আশা পূর্ণ হয়নি। তাই ভারতে বন্ধুদের কাছে তাঁর অবস্থা জানিয়ে তিনি চিঠি লিখেছিলেন। দেড় মাস পরে আচার্য নরেন্দ্র দেব বেনারস থেকে দেড়শো টাকা পাঠিয়ে দেন। সপ্তাহখানেক পরে তিনি আরও ১১৪ টাকা চার আনা পাঠান। অন্যদিকে আনন্দ কৌশল্যায়নও টাকা পাঠাবার চেষ্টা করেছিলেন। রামউদারের ধারণা ছিল তাঁর সংস্কৃত জ্ঞান শ্রীলঙ্কার মতো এখানেও অর্থকরী হবে। কিন্তু তিব্বতে সংস্কৃত নিয়ে কেউ মাথা ঘামাত না। তিব্বতে মন্ত্র জপ করা হত সংস্কৃতে। কিন্তু ভোট ভাষাকেও তিব্বতিরা কম পবিত্র বলে মনে করত না। আর একথাও ঠিক যে বৌদ্ধ সাহিত্যের ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষা ভোট ভাষার চেয়ে অনেক

দরিদ্র। ১৯৩০-এর জানুয়ারিতে আনন্দ কৌশল্যায়ন ও আচার্য নরেন্দ্র দেব দুজনেরই চিঠি এল যে, তাঁরা একটা স্থায়ী ব্যবস্থা করছেন। কৌশল্যায়ন এ কথাও লিখেছিলেন যে, ওখান থেকে টাকা পাঠালে রামউদারকে সব বই কিনে নিয়ে চলে আসতে হবে। নরেন্দ্র দেব কাশী বিদ্যাপীঠে ব্যবস্থা করেছিলেন। সেই ব্যবস্থা হয়ে গেলে রামউদার তিব্বতে থেকে পড়াশুনা করতে পারতেন। বিদ্যাপীঠের ছাত্রবৃত্তিকে রামউদার পছন্দ করেছিলেন এই জন্যে যে, এই বৃত্তির সাহায্যে কয়েক বছর তিব্বতে থেকে পড়াশুনা করতে পারতেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি রামউদার কৌশল্যায়নের তার পেলেন যে, দু হাজার টাকা তিব্বতে পাঠানো হয়েছে। নরেন্দ্র দেবের পত্র এসেছিল চারদিন আগে ১৯ ফেব্রুয়ারি। তাতে তিনি লিখেছিলেন যে, পঞ্চাশ টাকা মাসিক আর দেড় হাজার টাকা পুস্তকের জন্য দেওয়া হবে। কিন্তু টাকাটা আসত বৈশাখে। তাই রামউদারকে শ্রীলঙ্কার প্রস্তাবই মেনে নিতে হয়েছিল। শেষপর্যন্ত প্রথমবার রামউদারের অন্তত তিন বছর তিব্বতে থাকার সংকল্প পূর্ণ হয়নি।

লাসায় মোঙ্গল ভিক্ষুদের দিকে তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কেননা তারা ছিল বেশি পরিশ্রমী ও মেধাবী। কিন্তু সুমতি প্রাজ্ঞকে দেখে এদের সম্পর্কে তাঁর উলটো ধারণা হয়েছিল। হয়তো তার আর একটা কারণও ছিল ঃ বিগত বারো বছর ধরে রামউদারের সোভিয়েত প্রেমের বৃদ্ধি। যদিও এ পর্যন্ত তিনি মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের গ্রন্থ পড়ার সুযোগ পাননি অথবা অন্য কোনো মৌলিক মার্কসবাদী বইও পড়েননি; কিন্তু তা সত্ত্বেও ছ মাস আগে তিনি 'বাইসবী সদী' লিখেছিলেন। তাঁর এই দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে, এই দুনিয়াকে নতুন করে গড়ে তোলার জন্য সাম্যবাদ ছাড়া অন্য কোনো রাস্তা নেই। ধর্ম কিছু দিতে পারবে এমন আশা আর রামউদারের ছিল না। কিন্তু এখনও তিনি ধর্ম-বিরোধী হয়ে যাননি। বিশেষত বুদ্ধের ধর্মের প্রতি তাঁর অত্যন্ত শ্রদ্ধা ছিল। বস্তুত এই ধর্মের প্রভাবেই তিনি নিরীশ্বরবাদী হয়েছিলেন। সে-রা, ডেপুঙ-এর মোঙ্গল ছাত্র বেশির ভাগই সাম্যবাদী এলাকার ছিল। তারা বিপ্লবের আগেই দেশ ছেড়েছিল। পরে তাদের কাছে দেশের যে খবর আসছিল তা থেকে তারা বুঝতে পেরেছিল যে, সব মঠ জনশূন্য হয়ে যাচ্ছিল এবং ভিক্ষুও কমে যাচ্ছিল। রামউদারের বেশি পরিচয় ছিল সব-দত্ত-শেয়ব ও গেশে-তন্‌-দর-এর মতো মেধাবী বিদ্বানের সঙ্গে। তাঁরা সোভিয়েত বিরোধী ছিলেন না। বরং নিজেদের মাতৃভূমি ও সোভিয়েত ব্যবস্থার জন্য তাঁদের গর্ব ছিল। গেশে-তন্‌-দর পাঁচ বছর পরে তিব্বতের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় গোটা তিব্বতে প্রথম হয়েছিলেন। ল্‌হা-রম্‌-পা (ডক্টর বা আচার্য) পদবি সরকারের তরফ থেকে প্রতি বছরে শুধু ষোলোটি ছাত্রকে দেওয়া হত। গেশে-তন্‌-দর এখনও ল্‌হা-রম্‌-পা হননি। কিন্তু তাঁর বিদ্যার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি সে-রার ছাত্র ছিলেন। ১২ অক্টোবর রামউদার তাঁর সঙ্গে সে-রা গিয়েছিলেন। কিন্তু আপশোশ হল এই যে, ১৯৪৭-এ শান্তির উপদেশ দেওয়ায় এই মহান বিদ্বানকে খন্‌-পোর গুণ্ডা ভিক্ষুরা মেরে ফেলেছিল।

সে-রাকে এক ছোটো শহর বলা যেতে পারে। যেখানে পাঁচ-ছয় হাজার ভিক্ষু থাকে

তাকে শহর ছাড়া আর কী বলা যায়।

নভেম্বর-ডিসেম্বর আসতে আসতেই শীত খুব বেশি বেড়ে গেল। অধিকাংশ সময়ই তাপমান হিমাঙ্কের নীচে থাকত। ঘড়া অথবা লোটার জল রাত্রিতে জমে যেত।

দলাই লামার শবকে পোড়ানো হয় না। তাকে দু-তিন মাস নুনের স্তূপের মধ্যে রেখে দেওয়া হয়। নুন শরীরের সব রস শুষে নেয় এবং দেহকেও পচন থেকে বাঁচায়। তার উপর তাঁর দেহে মশলার প্রলেপ দেওয়া হয় এবং চোখ ইত্যাদি লাগিয়ে তাঁকে পদ্মাসনে বসা মূর্তি বানিয়ে দেওয়া হয়। লোকজন এই নুনকে প্রসাদ মনে করে ব্যবহার করে। চার বছর পরে যখন রামউদার আবার লাসায় এসেছিলেন তখন ত্রয়োদশ দলাই লামার এই লবণ প্রসাদ বন্টন করা হচ্ছিল।

দলাই লামার মৃত শব একটি বড় স্তূপে রেখে দেওয়া হয়। তাঁর অনেক প্রিয় বস্তুও সেখানে রেখে দেওয়া হয়; যেমন হীরা, মুক্তা, রত্ন, হস্তলিখিত পুস্তক ও আরও অনেক সব জিনিস। স্তূপের বাইরেটাও অনেক বহুমূল্য জিনিস দিয়ে সাজানো হয়।

৬ ফেব্রুয়ারিতে লাসায় প্রথম তুষার বৃষ্টি হল। খুব হালকা তুষার। পরে একদিন ষোলো আঙুল মোটা বরফ পড়েছিল। কিন্তু দুপুরের মধ্যে তা সব গলে গেল। লাসা শহরের মাঝামাঝি ছিল তিব্বতের সব চেয়ে পুরোনো বৌদ্ধ মন্দির জোখঙ। এই মন্দির তৈরি হয়েছিল সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি। রামউদার এই মন্দির অনেক বার দর্শন করতে গিয়েছিলেন। এই মন্দির শুধু যে পবিত্র স্থান ছিল তাই নয়, একে ত্রয়োদশ শতাব্দীর ভাস্কর্যের এক সুন্দর সংগ্রহশালা বলা যেতে পারে। জোখঙ-এর দরজার বাইরে এক শুকনো পুরোনো গাছ ছিল। লোকে বলত যে, যখন মন্দির তৈরি হয়েছিল এই গাছটা সেই সময়ের।

১ মার্চ তিব্বতি নববর্ষের প্রথম দিন। নববর্ষের প্রথম দিন থেকে এক মাস পর্যন্ত দলাই লামা শাসনভার ছেড়ে দিতেন এবং তাঁর জায়গায় ডেপুঙ বিহারের নির্বাচিত ভিক্ষু রাজ্য শাসন করতেন।

ইতিমধ্যে কৌশল্যায়নের তার এসে গেল। রামউদার বুঝতে পেরেছিলেন যে এবার তাঁকে শ্রীলঙ্কায় ফিরে যেতে হবে। তাই তিনি বই ও ভালো ভালো ছবি কিনতে লাগলেন। ফেরার সময় সঙ্গী হওয়ার জন্য তিনি মোঙ্গল ভিক্ষু ধর্মকীর্তিকে বললেন। তিনিও যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। রামউদার তিব্বতের সব চেয়ে পুরোনো মন্দির দেখেছিলেন। কিন্তু সবচয়ে পুরোনো মঠের (সাম্যে) দর্শনও আবশ্যিক ছিল। ৫ এপ্রিল-এর মধ্যাহ্নে তিনি লাসার নদী দিয়ে চামড়ার নৌকোয় যাত্রা করেন। বিকেল চারটে নাগাদ খুব হাওয়া বইতে লাগল। রাত্রিতে নদীর পাশেই মনড়ী গ্রামে থাকলেন। তাঁদের নৌকোয় এক চল্লিশ বছরের বৃদ্ধা ও তার চব্বিশ-পঁচিশ বছরের স্বামীও যাচ্ছিল। পরদিন মধ্যাহ্নে তাঁরা কনেনুম্বা গ্রামে পৌঁছোলেন। বৃদ্ধার যে চব্বিশ-পঁচিশ বছরের স্বামীটি তাঁদের সঙ্গে যাচ্ছিল তার ওপর দেবতার ভর হত। কনেনুম্বা থেকে যাওয়ার আগে এই চব্বিশ- পঁচিশ বছরের জোয়ানটির ওপরে দেবতার ভর হল এবং ৮ এপ্রিল-এর দুপুর পর্যন্ত ভূতের খেলা চলতে লাগল। রামউদারের মাঝি ও গ্রামের লোকদের কাছে লোকটি

দলাই লামার চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না। গ্রামের লোকদের কাছ থেকে ভূতে-ভর-করা লোকটা নানারকম উপহার পেল। ভাগ্য ভালো এবার তাঁদের নৌকো আগে চলল। সেই দিনই বেলা তিনটে নাগাদ তাঁরা ব্রহ্মপুত্রের তীরে 'সো-নম-ফুল-সুন' নামক শিলার কাছে পৌঁছোলেন। সেখানে রাত্রির বিশ্রামের জন্য তাঁরা নৌকো থেকে নামলেন। ঐ শিলার কাছে আরো দুটি শিলা ছিল। এই ছোটো বড় তিন শিলার দুটিকে মাতা-পিতা ও একটিকে ছেলে বলা হত। ৮টা নাগাদ তাঁরা ডক-ছেন-ফুর-বু শিলার কাছে রাত্রির বিশ্রামের জন্য নামলেন। এই শিলাটি একেবারে ব্রহ্মপুত্রের মাঝখানে একশো হাত উঁচু ত্রিকোণের মতো দেখতে। বলা হয়ে থাকে যে, যখন সাম্যে বিহার নির্মিত হয় তখন চিত্রপট টাঙানোর জন্য এই শিলাকে ভারত থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল। যারা এই শিলা নিয়ে আসছিল তারা ভুল করে শিলাকে এখানে রেখে দিয়েছিল এবং তখন থেকে এই শিলা এখানেই রয়েছে। দ্বিতীয় দিন মধ্যাহ্নে তাঁরা জম-লিঙ ঘাটে নামলেন। ব্রহ্মপুত্রের ডান দিকে কিছু দূর হাঁটলে এক বড় স্তূপে যাওয়া যায়। নেপালের মহাবোধের সঙ্গে এই স্তূপের বেশ মিল আছে। তারপর আরো কিছুটা যাওয়ার পর সাম্যে পৌঁছে গেলেন তাঁরা। অষ্টম শতকে নালন্দার আচার্য শান্তরক্ষিত উদন্তপুরী বিহারের মডেলে এই বিহারকে তৈরি করিয়েছিলেন। এগারো ও বারো শতক পর্যন্ত তিব্বতের বিহার (মঠ) সমতল ভূমিতে তৈরি হত। পরে দুর্গম পর্বত স্কন্ধকেই বিহার নির্মাণের সব চেয়ে অনুকূল স্থান বলে মনে করা হত। সাম্যে সমতল ভূমিতে তৈরি হয়েছিল। চারদিকে দেয়াল। তার ভেতরে পাকা ইঁটের ছত্রধারী চার স্তূপ। মাঝখানে প্রধান দেবালয়। বিহারের মুখ্য দরজা পূর্ব দিকে। রামউদাররা পশ্চিমের দরজা দিয়ে ঢুকেছিলেন এবং প্রথমেই দেখা হল সিকিমের বিদ্বান ভিক্ষু উ-গ্যেন-কুশো-র সঙ্গে।

সেদিন বিশ্রাম করে পরদিন তাঁরা প্রধান মন্দিরে গেলেন। কাঠের তিনতলা ইমারত এই মন্দির। মন্দিরের মুখ্য মূর্তি বুদ্ধের। বিহারের নির্মাতাও ভারতের মহান দার্শনিক আচার্য শান্তরক্ষিত। ভোট ভিক্ষু বৈরোচন ও আচার্যের গৃহস্থ শিষ্য সম্রাট ঠি-স্রোভ-এর মূর্তিও আছে। আচার্য যখন তিব্বতে গিয়েছিলেন তখন তাঁর বয়স ৭০ বছরেরও বেশি এবং তাঁর দেহাবসান হয়েছিল এই সাম্যেতেই। আচার্যের মুখে একটি দাঁত ছিল, তা দেখা যাচ্ছিল। চোখের সামনে কাঁচের ভেতর আচার্য শান্তরক্ষিতের কপাল দেখে অভিভূত হয়েছিলেন রামউদার। এ সেই কপাল যার ভেতর থেকে *তত্ত্ব সংগ্রহ*-র মতো মহান দার্শনিক গ্রন্থ বেরিয়েছিল। রামউদার কিছু সময় তন্ময় হয়ে সেই দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আচার্যের দেহাবসানের পর তাঁর শরীরকে পূর্বদিকের পাহাড়ের ওপর এক স্তূপের ভেতর রেখে দেওয়া হয়েছিল। কয়েক বছর আগে সেই স্তূপ জীর্ণশীর্ণ হয়ে পড়ে যায় এবং আচার্যের হাড় চারদিকে ছড়িয়ে যায়। সেই হাড় এখানে রেখে দেওয়া হয়েছে। মুখ্য মন্দির ছাড়াও আরো বারোটি মন্দির ও বাসস্থান আছে। এই মন্দিরকে লিঙ-দ্বীপ বলা হয়ে থাকে। গ্যা-গর-লিঙ (ভারত দ্বীপ) এই স্থানেরই নাম। অসংখ্য ভারতীয় পণ্ডিত যাঁরা সংস্কৃত গ্রন্থ ভোট ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন, তাঁরা এখানেই

থাকতেন। এগারো শতকের মাঝামাঝি সাম্যেতে সংস্কৃত গ্রন্থের কী বিশাল সংগ্রহ ছিল তা এ থেকে বোঝা যাবে যে, ভারতীয় পণ্ডিত দীপংকর শ্রীজ্ঞান তা দেখে বলেছিলেন যে এখানে এমন সব গ্রন্থ আছে যা বিক্রমশীলাতেও পাওয়া যাবে না। এ সময়ে এখানে কোনো সংস্কৃত গ্রন্থ আছে বলে মনে হয়নি রামউদারের। দীপংকর শ্রীজ্ঞানের দেহাবসানের কিছু পরে সাম্যেতে আগুন লেগেছিল। তারপর বারো শতকে আবার তা নতুন করে তৈরি করা হয়েছিল। সম্ভবত সেই আগুনেই অনেক বই পুড়ে গেছে। অথবা এও হতে পারে, কিছু গ্রন্থ এখনো স্তূপ অথবা মূর্তির ভিতরে সুরক্ষিত আছে।

উরগেন কুশী ও গনদন হয়ে তাঁরা আবার লাসায় ফিরে এলেন। এবার ভারতে ফিরতে হবে। পুস্তক চিত্রপট ও অন্যান্য জিনিসপত্র বেঁধে একুশটা খচ্চরে বোঝাই করে কালিম্পঙে পাঠিয়ে দিলেন রামউদার।

তিব্বত থেকে ফিরলেন রামউদার

বিদ্যালংকার পরিবেন তাঁকে যে তিন হাজার টাকা দিয়েছিল তা থেকে প্রায় দু হাজার টাকা দিয়ে রামউদার বই, চিত্রপট ও অন্যান্য সামগ্রী কিনেছিলেন। তিনি কনজুর পেয়েছিলেন, কিন্তু তনজুর পাননি। তাই তা ছাপাবার জন্য নর-থঙ যাওয়া প্রয়োজন হয়েছিল। ধর্মকীর্তিও তাঁর সঙ্গে শ্রীলঙ্কা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। ২২ এপ্রিল তাঁরা দুজনে লাসা ছেড়ে আসেন। দুপুরে তাঁরা নে-থঙ গ্রামে পৌঁছোন। এই গ্রামের পাশেই ঐতিহাসিক তারা মন্দির ডোল-মা-লহ্-খঙ। এখানেই ভারতীয় পণ্ডিত দীপংকর শ্রীজ্ঞান সতেরো বছর তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করে খ্রিস্টীয় ১০৫২-তে দেহত্যাগ করেন। মন্দির অন্তত নয়শো বছরের পুরোনো। লাল চন্দনের প্রলেপ থেকেই তা বোঝা যায়। এখানে একটি কক্ষে দীপংকরের ভিক্ষাপাত্র, খক্তব দণ্ড ও তামার ধর্মকরক রাখা ছিল।

২৬ এপ্রিল তাঁরা নৌকোয় ব্রহ্মপুত্র পার হলেন। ভারত থেকে গ্যানচী আসার সময় যে পথ পেরোতে তিনদিন লেগেছিল এখন সেই পথ তাঁরা পেরিয়ে আসছিলেন একদিনে। লাসা থেকে ঠিক ছয়দিনে তাঁরা গ্যানচী পৌঁছে যান। তনজুর ছাপাবার জন্য ৪০০ টাকার কালি কাগজ কিনে তাঁরা নরথঙ পৌঁছোলেন ৮মে। শেষপর্যন্ত কনজুর ও তনজুর নিয়ে আসার জন্য খরচ হল ২১-২২শো টাকা। সব কেনা বই ও অন্যান্য জিনিসপত্র নয়টি গাধার পিঠে চাপিয়ে ফরীর উদ্দেশে পাঠিয়ে দিয়ে রামউদার শিগর্চে থেকে শলু চলে গেলেন। ভারতীয় গ্রন্থের ভোটিয়া অনুবাদগুলোকে কনজুর ও তনজুর এই দুটি বৃহৎ সংগ্রহে শ্রেণি বিভক্ত করেছিলেন যে মহাবিদ্বান বু-তোন, তিনি এই শলু বিহারেই ছিলেন। শলু থেকে তাঁরা দেড় দিনে গ্যানচী পৌঁছে গেলেন। ২৩ মে গ্যানচী থেকে কালিম্পঙের রাস্তা ধরলেন। ৪ জুন কালিম্পঙ পৌঁছে গেলেন। ৬ জুন কালিম্পঙ থেকে শিলিগুড়ি পৌঁছোলেন। গরমে ধর্মকীর্তি অসুস্থ হয়ে পড়ায়, তাঁকে কালিম্পঙ পাঠিয়ে দিতে হল। রামউদার রাত্রির গাড়ি ধরে ৭ জুন কলকাতা পৌঁছে গেলেন।

একুশটা খচ্চরে বোঝাই করে তিনি যে অমূল্য গ্রন্থরাজি এনেছিলেন, তা তিনি কলকাতা থেকে জাহাজে কলম্বো পাঠিয়ে দিলেন। তিনি নিজে ১৬ জুন মাদ্রাজ মেল ধরে ২০ জুন বিদ্যালংকার পরিবেনে পৌঁছে গেলেন।

সপ্তম অধ্যায়

বৌদ্ধ সংস্কৃতি পুনরুদ্ধারে রাহুল সাংকৃত্যায়ন

প্রথমবার তিব্বত থেকে ফিরে আসার পর বিদ্যালংকার বিহারের নায়কপাদের উপাধ্যায়ত্বে রামউদারের প্রব্রজ্যা হয় ১৯৩০-এর ২২ জুন। এতকাল শ্রীলঙ্কায় রাহুল রামউদার স্বামী নামে পরিচিত ছিলেন। শ্রীলঙ্কা থেকে তিব্বতে যাওয়ার আগেই রাহুল রামউদারের সঙ্গে তাঁর গোত্রকে জুড়ে রামউদার সাংকৃত্যায়ন হয়েছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল যে প্রব্রজিত হওয়ার পরও তাঁর এই নামই থাকবে। কিন্তু প্রব্রজ্যা সংস্কার শুরু হওয়ার কয়েক মিনিট আগে নায়কপাদের আদেশ হল নতুন নামকরণের। নতুন দুয়েকটা নামের কথা তাঁকে বলা হয়েছিল। কিন্তু রামউদারের রা-এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রাহুল নামের প্রস্তাব করলেন রামউদার এবং তা স্বীকৃত হল। রাহুল নামের সঙ্গে সাংকৃত্যায়ন গোত্রটি জুড়ে দেওয়া হল। এভাবে রামউদার রাহুল সাংকৃত্যায়ন নামে প্রব্রজিত হলেন।

উপসম্পদা

২ জুন কাণ্ডীতে রাহুলের উপসম্পদা হল। উপসম্পদার কার্যপ্রণালী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আড়াই হাজার বছর আগেকার ভাষা ও স্বরে হয় বলেই নয়, এতে বৈশালী ও কপিলাবস্তুর প্রজাতন্ত্রের সাংঘিক কার্যপ্রণালীর ঝলক দেখতে পাওয়া যায়। একটি হলঘরে সংঘের অধ্যক্ষ মুখ্যস্থানে বসলেও উচ্চাসনে বসেন না। সকলের আসনই সমান। অধ্যক্ষের দুই দিকে দুই সারিতে স্বীয় উপসম্পদা বর্ষের ক্রম অনুযায়ী ভিক্ষুরা বসেন। দুইজন অভিজ্ঞ ভিক্ষু 'সুণাতু মন্তে সংঘ' (মাননীয় সঙ্ঘ শুনুন) এই সম্বোধন করে প্রার্থীকে উপসম্পদার জন্য উপস্থিত করে। সংঘ প্রার্থীর যোগ্যতা পরীক্ষা করে; শুধু বিদ্যার নিরিখেই নয়, তার শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি আছে কিনা তাও যাচাই করে দেখে। উপসম্পদার আগেই রাহুল *ত্রিপিটক* পড়েছিলেন এবং বৌদ্ধ ভারতের মানস আকাশকে আবার চোখের সামনে দেখার চেষ্টা করেছিলেন। সেই সময়ের গণতন্ত্র রাহুলকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। ভিক্ষু উপসম্পদার কার্যপ্রণালীর মধ্যে যে গণতান্ত্রিক নীতি অন্তর্নিহিত ছিল তাতে রাহুলের কোনো সন্দেহ ছিল না।

ভিক্ষুদের গোটা সংগঠন সংঘবাদের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। বৈশালীর গণতন্ত্রের দৃঢ়তা, স্বাধীনতাপ্রিয়তা বুদ্ধকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছিল। শাক্য গণতন্ত্রেও তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাই সাংঘিক কর্ম, সাংঘিক স্বাধ্যায়, সাংঘিক বিবাদ নির্ণয় ইত্যাদির ওপরও তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ভিক্ষুদের নিয়মের মধ্যে মাসে দুবার অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় বুদ্ধ সব ভিক্ষুদের সংঘ-সন্নিপাত (ভিক্ষু সম্মেলন) আবশ্যিক

করেছিলেন। কিন্তু মাঝখানে আড়াই হাজার বছরে এত সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন হয়েছিল যে, তার মাহাত্ম্য আর লোকচক্ষুর সামনে ছিল না। উপসম্পদার মতো প্রথম উপোসথের ভিক্ষু সম্মেলনও রাহুল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছিলেন। এখন সংঘ সম্মেলন অথবা উপোসথ স্রেফ বর্ষার দু-তিন মাস হয়ে থাকে। সেই দিন (৯ জুলাই, আষাঢ় পূর্ণিমা) পাশের এক বিহারের এক নতুন তৈরি উপোসথাগারে প্রথম উপোসথ করে তার প্রতিষ্ঠাও করার কথা ছিল। তাই ভিক্ষুদের সেখানে যেতে হয়েছিল। মধ্যাহ্নের আহারের পর কিছু সময় বিশ্রামের পর প্রত্যেকে তার অন্তর্বাসকে কোমরের সঙ্গে ঠিক মতো পরে নেয়। তারপর ডান কাঁধ খালি রেখে বস্ত্রের দুই কোণ মিলিয়ে বেঁধে তার ওপর চারভাঁজ করে চীবর রেখে কটিবন্ধনের সঙ্গে বাঁধে। আগে থেকেই আসন বিছিয়ে রাখা হয়েছিল। মাথার ওপর পাখা লাগানো একটি খালি আসন থাকত। এই আসনকে ধর্মাসন বলা হত। ধর্মাসনকে তিনবার প্রণাম করে উপস্থিত সংঘ নিজেদের মধ্য থেকে কাউকে ধর্মাসনে বসে (সভাপতি হয়ে) সেদিনের মতো কার্য পরিচালনার জন্য নির্বাচিত করত। সদ্য উপসম্পদা পাওয়া ভিক্ষুও নির্বাচিত হতে পারত। একথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে উপোসথাগারে বুদ্ধমূর্তি থাকা সত্ত্বেও বুদ্ধের উদ্দেশে প্রণাম না করে প্রণাম করা হত ধর্মাসনের উদ্দেশে। (ভিক্ষু নিয়ম) উপোসথের সময় গোটা প্রাতিমোক্ষ সূত্র পুনরাবৃত্তি করা হত। কিন্তু এসময়ে প্রথম ভাগের কিছুটা মাত্র আবৃত্তি করা হত। অপরাধ স্বীকারের ও ভাবী জীবনের ওপর কোনো প্রভাব পড়ত না।

এমনিতেই শ্রীলঙ্কার গৃহস্থ ও ভিক্ষুরা রামউদারকে বিশেষ শ্রদ্ধা করত। ভিক্ষু সংঘে যোগ দেওয়ার পর সেই শ্রদ্ধা অনেকটা বেড়ে গেল। ধর্মোপদেশের জন্য অনেক নিমন্ত্রণ তাঁর কাছে আসতে লাগল। ধর্মোপদেশ দেওয়ার ব্যাপারে কৌশল্যায়নও বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিলেন। রাহুলও প্রত্যেক মাসে দুয়েক বার ভাষণ দিতেন। পরিবেনে থাকাকালীন অধ্যাপনার সঙ্গে হিন্দিতে একটি বুদ্ধ-জীবনী লেখায় হাত দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তিনি নিজের ভাষায় বুদ্ধের আলাদা জীবনী লিখতে চাননি। বুদ্ধের জীবনীর উপাদান *ত্রিপিটক* থেকে সংগ্রহ করে, *ত্রিপিটকে*-এর ভাষাতেই তিনি তা লিখতে চেয়েছিলেন, যাতে *ত্রিপিটকে*-এর ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক উপাদান থেকে বুদ্ধের জীবনকে জেনে বুদ্ধ সম্পর্কে পাঠক তার নিজস্ব সিদ্ধান্তে পৌঁছোয়। *ত্রিপিটক* পড়ার সময় তিনি যে নোট করেছিলেন তাতে বুদ্ধের জীবনীর উপাদান সংগ্রহ অনায়াসে হয়েছিল। তাই তিনি অতি দ্রুতগতিতে বুদ্ধচর্চা লিখে ফেলেন।

শ্রীলঙ্কা থেকে ভারতে

১৯৩৩-এর ৩০ জানুয়ারি শ্রীলঙ্কা থেকে ভারতে চলে এলেন রাহুল। মে মাসে তিনি শ্রীনগরে যান। শ্রীনগর থেকে গিলগিট যেতে চেয়েছিলেন তিনি। সেখানে অনেক হস্তলিখিত গ্রন্থ ছিল। কিন্তু কাশ্মীর সরকার তাঁকে জানাল যে এই সব হস্তলিখিত গ্রন্থ তাঁকে পড়তে দেওয়া হবে, কিন্তু গ্রন্থ থেকে নোট নিতে দেওয়া হবে না। বারো-

তেরোশো বছরের পুরোনো ভূর্জপত্রে লেখা গ্রন্থ কোনো রকমে বেঁধে রাখা হয়েছিল। কাশ্মীরের মহারাজা তো এইসব গ্রন্থ নিলাম করে দিতে চেয়েছিলেন।

আবার লাদাখে

বই সম্পর্কে নিরাশ হলেও রাহুলের গিলগিটে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তাঁকে গিলগিটে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হল না। তিনি গিলগিটে যেতে পারলেন না। তাই দ্বিতীয়বার লাদাখ যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। ব্রহ্মচারী গোবিন্দ তাঁর সঙ্গে গেলেন। শিল্পী ও দার্শনিক এই মানুষটিকে ভালো লেগেছিল রাহুলের। তাঁরা প্রথম কার্গিল যান। সেখানে দুদিন থেকে মূলবেক হয়ে রিজোঙ গুম্বা যান। এই গুম্বাটি লাদাখের প্রধান গুম্বাগুলির অন্যতম। রাহুল লাদাখ যাচ্ছেন শুনে লন্ডন থেকে মিস্টার শাটলওয়র্থ তাঁকে লাদাখ, জাস্কর, লাহুলের ঐতিহাসিক নানা স্থানের কথা চিঠিতে লিখে জানিয়েছিলেন। তাতে তিনি আলচির মন্দিরেরও উল্লেখ করেছিলেন। অতএব রাহুল রিজোঙ গুম্বা থেকে আলচিতে লোচওয়ার মন্দির দেখতে চলে যান। বাইরে থেকে এই মন্দির দেখে ভিতরে কী আছে কিছুই বোঝা যাবে না। কিন্তু ভেতরে গেলে বোঝা যায় এগারো শতকের উত্তর ভারতীয় চিত্রকলার মহান সংগ্রহালয় এই মন্দির। নশো বছর আগে সূক্ষ্ম তুলি দিয়ে আঁকা চিত্র তখনো সজীব। অবলোকিতেশ্বরের মূর্তির চিত্রণ তো অসামান্য। অজন্তার অর্ধ বিলুপ্ত চিত্র দেখে তৃপ্তি হয় না। এই মন্দিরের চিত্রের ভাণ্ডার এখনো সম্পূর্ণ ও অবিকৃত। কিন্তু মন্দির অত্যন্ত জরাজীর্ণ। যে কোনো দিন ভেঙে পড়ে যেতে পারে। কিন্তু সরকারের তা নিয়ে কোনো শিরঃপীড়া ছিল না। এই মন্দির সংস্কারের জন্য রাহুলের আবেদন-নিবেদনে সরকার কর্ণপাত করেনি।

আলচি থেকে রাহুল লেহ্ যান এবং সেখানে তিনি হেমিস লবরঙে ওঠেন। লেহ্‌তে রাহুল মেলা ও ভূতনৃত্য দেখেন। ভূতনৃত্য বা ডেভিল্‌স্ ড্যান্‌স্ নামটি দিয়েছেন ইউরোপীয় দর্শকেরা। আসলে এই নৃত্য ছিল ক্রূর দেবতাদের অভিনয়।

দ্বিতীয়বার লাদাখ ভ্রমণের সময় বেশি ঘোরাঘুরি করতে পারেননি রাহুল। ভ্রমণের সময়ও তিনি ক্রমাগতই লিখছিলেন। ধর্মপদের হিন্দি ও সংস্কৃত অনুবাদ তিনি ইতিমধ্যেই করেছিলেন। *মাজ্‌ঝিম নিকায়*-এর অনুবাদের কাজ হাতে নিয়েছিলেন। তাছাড়া একটি ব্যাকরণ ও চারটি তিব্বতি পাঠ্যপুস্তক লেখাও শুরু করেছিলেন। কঠিন পাহাড়ি পথে চড়াই উতরাই করে অবসন্ন দেহকে নিদ্রার কাছে সমর্পন নয়, গভীর রাত পর্যন্ত লেখাপড়া। আগে ভ্রমণ ও বিদ্যাচর্চার পর্যায়ানুবৃত্তি ছিল। এখন তা অঙ্গাঙ্গি-সম্পৃক্তিতে পরিণত হয়েছে।

লেহ্‌র পাঞ্জাবি দোকানদাররা তাঁকে বারবার নিমন্ত্রণ করত। কিন্তু যত কাজ তিনি হাতে নিয়েছিলেন তা সম্পূর্ণ করার জন্য রাহুল সময়কে খুব কৃপণের মতো খরচ করতেন। তিনি নিমন্ত্রণে যেতেন শুধু রবিবার।

একশো বছর আগে লেহ্ স্বাধীন লাদাখ রাজার রাজধানী ছিল। পাহাড়ের ওপর

বিশাল রাজপ্রাসাদ। রাজপ্রাসাদে সোনালি অক্ষরে লেখা কন্‌জুরের কাগজের স্তূপ দেখেছিলেন রাহুল। লেহ্-তে রাহুল তার পেলেন যে বরোদায় ওরিয়েন্টাল কনফারেন্সের অধিবেশন হচ্ছে এবং তিনি তাঁর হিন্দি বিভাগের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। অতএব এবার প্রত্যাবর্তন। কিন্তু যে পথে রাহুল এসেছিলেন, সেইপথে তিনি ফিরলেন না। রাহুল কুলুর পথে ফিরলেন।

তিব্বতে দ্বিতীয়বার

রাহুল দ্বিতীয়বার তিব্বত যাত্রা করেন ১৯৩৪-এ। প্রথমবারের তিব্বত ভ্রমণের সময় তিনি সব কাজ সম্পূর্ণ করে আসতে পারেননি। একুশটা খচ্চরে বোঝাই করে তিব্বতি কনজুর-তনজুর, থাংকা চিত্রপট ও অন্যান্য গ্রন্থ নিয়ে এসেছিলেন ঠিকই। কিন্তু সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি বিশেষ পাননি। অথচ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তিব্বতের অনেক বিহারেই সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। অতএব এবার তাঁর প্রধান কাজ ছিল সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির অন্বেষণ।

দ্বিতীয়বার তিনি তিব্বত যান কালিম্পঙ-গ্যাংটক-ফরী জোঙের রাস্তায়। ফরী থেকে গ্যান্‌চী হয়ে রাহুল ও তাঁর সঙ্গীরা লাসা পৌঁছোলেন। ১৯ মে তাঁরা লাসায় ছু-শিঙ-শা-তে ধর্মামান সাহুর দোকানে উঠলেন। রাহুল লিখছেন, 'আমার এবারকার যাত্রা বিশেষ করে সংস্কৃত গ্রন্থের খোঁজেই হয়েছিল।' তাই শিকারি বেড়ালের মতো এবার তিনি তিব্বতের নানা বিহারে সংস্কৃত বই খুঁজে বেড়ান।

সংস্কৃত ভাষার সব বই-ই তালপাতায় লেখা। দুদিকে দুটি কাঠের পাটা দিয়ে তালপাতার সংস্কৃত পুঁথি বেঁধে রাখা হত। তিব্বতিতে বই লেখা হত ভূর্জপত্রে। অতএব তালপাতার পুঁথির খোঁজ করলেই সংস্কৃত পুঁথি বেরিয়ে আসবে। ইতিমধ্যে রাহুল *মাজ্‌ঝিম নিকায়*-এর অনুবাদ শেষ করে *বিনয়-পিটক* অনুবাদেব কাজে হাত দিয়েছিলেন। লাসায় সেই কাজ শেষ করে তিনি সংস্কৃত পুঁথির অন্বেষণে বেরোবেন বলে স্থির করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে *সাম্যবাদহী কিউ* লিখতে শুরু করেছিলেন।

রাহুল তাঁর বন্ধুদের তালপাতার পুঁথির খোঁজ করতে বলেছিলেন। একদিন মাঘের *শিশুপাল বধ* কাব্যের ওপর ভবদত্ত-এর টীকার খণ্ডিত অংশ তাঁর হাতে এল। এরপর অভিসময়ালংকারের ওপর বুদ্ধশ্রীজ্ঞান বিরচিত *প্রজ্ঞাপ্রদীপাবলী* বইটি এল।

বিনয় পিটক শেষ করে রাহুল বইয়ের খোঁজে রেডিঙ বিহারে যান। সেখানে বেশ কিছু তালপাতার পুঁথি পাওয়া যাবে, এই আশা ছিল রাহুলের। তিনি খবর পেয়েছিলেন যে রেডিঙ-এ দীপংকর শ্রীজ্ঞানের স্ব-হস্ত লিখিত পাণ্ডুলিপি আছে।

৩০ জুলাই ৩টি খচ্চরের পিঠে জিনিসপত্র চাপিয়ে রাহুল লাসা থেকে রেডিঙ যাত্রা করলেন। রেডিঙ গিয়ে কিন্তু তিনি নিরাশ হলেন। রেডিঙ-এর লামা বই দেখাতে অস্বীকার করলেন। টাকা দিলে হয়তো রাহুল বই দেখতে পারতেন। কিন্তু রাহুলের হাতে ঘুষ দেওয়ার মতো টাকা ছিল না। তিব্বত থেকে রাহুল যে সব সামগ্রী সংগ্রহ করে

এনেছিলেন, তার কিছু অংশও যদি তিনি বেচে দিতেন তাহলে তাঁর অর্থের কোনো অভাবই হত না। কিন্তু তিনি এই ধরনের সংগ্রহ মিউজিয়ামে দেওয়াই পছন্দ করতেন। এ বিষয়ে রাহুল লিখেছেন, 'লক্ষ্মীর বরপুত্রদের সঙ্গে চিরকাল আমার সম্পর্ক খারাপ ছিল। কেউ হয়তো মনে করবেন, আমি ভুল করেছি। যথেষ্ট পয়সা থাকলে আমি যে-কোন য়োরোপীয় গবেষকের চেয়ে একশো গুণ বেশি কাজ করতে পারতাম।'

রেডিঙ বিহারে সংরক্ষিত দীপংকর শ্রীজ্ঞান ও তাঁর প্রধান শিষ্য ডোন্-তোনপার ছবি ছিল। তা ছাড়াও ছিল যোলোটি সুরক্ষিত চিত্রপট। এগুলোর রেখা ও হালকা রঙ সব বলে দিচ্ছিল যে, এগুলো কোনো কুশলী হাতের তৈরি।

রাহুলের মন ভরল না। বই দেখতে এসেছিলেন; তা দেখতে পেলেন না। বড় খেদ ও ক্ষোভ নিয়ে তিনি ৭ অগষ্ট ৮টার সময় রেডিঙ ছাড়লেন। লাসায় ফিরে গেলেন রাহুল। ৮ সেপ্টেম্বর আবার লাসা থেকে সাক্যা বিহারের দিকে রওনা হলেন। পথে শলু বিহারে তিনি মহাসাংঘিক লোকোত্তরবাদী সম্প্রদায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ *বিনয়* গ্রন্থ পেলেন। তিব্বতের শ্রেষ্ঠ বিদ্বানদের অন্যতম বুতোন (১২৯০-১৩৬৪) এই বিহারেই ছিলেন। ঙোর বিহারে কুড়িটি পুঁথি ছিল। এই বিহারেরই দেখাশোনার ভার ছিল লবরঙ-শুঙ ছুগজোদ এর উপর। এই বিহারের দোতলার একটা ঘরের তাকে তিব্বতি ভাষার অসংখ্য বই ছিল। তার মধ্যে তালপাতার পুঁথিও ছিল। রাহুল টেনে টেনে বই নামাতে শুরু করলেন। মোট ৩০টা বান্ডিল বেরিয়ে এল। এই বান্ডিলের মধ্যে ধর্মকীর্তির বাদন্যায়ের দুটো মূল পুঁথি পেলেন রাহুল। লাসাতে এবার রাহুল বাদন্যায়ের তিব্বতি অনুবাদ পেয়েছিলেন।

কিন্তু এখন তিনি মূল গ্রন্থই পেয়ে গেলেন। একটা পুঁথিতে ধর্মকীর্তির দুটো গ্রন্থ *হেতুবিন্দু* ও *ন্যায়বিন্দু*-র ওপর দুর্বেক মিশ্রর দুটো টীকা ছিল। ধর্মকীর্তির বই পেয়ে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন রাহুল। পরদিন আরো ২৭টি বই পেলেন। সবশুদ্ধ ৩৯টি বই। এই সব বইয়ের মধ্যে সবচেয়ে মাহাত্ম্যপূর্ণ ছিল (১) *বাদন্যায় টীকা,* (২) *অভিধর্মকোষ মূল,* (৩) *সুভাষিত রত্ন কোষ* (ভীমজ্ঞান সোম), (৪) *অমরকোষ টীকা* (কামধেনু), (৫) *ন্যায়বিন্দু পঞ্জিকা টীকা* (ধর্মোত্তর ও দুর্বেক মিশ্র), (৬) *হেতুবিন্দু অনুটীকা* (ধর্মাকর দত্ত অৰ্চট ও দুর্বেক মিশ্র), (৭) *প্রাপ্তিমোক্ষ সূত্র* (লোকাত্তরবাদ), (৮) *মধ্যান্তবিভঙ্গ ভাষ্য*।

সাক্যা বিহার

ঙোর থেকে রওনা হয়ে ১১ অক্টোবর তাঁরা সাক্যা বিহারে পৌঁছোলেন। সাক্যা বিহারের সামনের ময়দানে লহখঙ ছেনপো বিহার। এই বিহারের দোতলার সিঁড়ির ওপরে একটি কুঠরিতে কি অমূল্য রত্ন ভাণ্ডার সংরক্ষিত আছে তা তিনি বুঝতে পারেননি। কুঠরির দরজা বন্ধ ছিল। এই ঘরটি এবার রাহুলের চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল। তৃতীয় বার তিব্বত ভ্রমণের সময় এই ঘরের বন্ধ দরজা খুলে যাবে। রাহুল ভারতের জন্য তার হারানো নিধি

ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। দ্বিতীয় যাত্রায় সাক্যাতে *প্রমাণ বার্তিক*-এর দেড় পরিচ্ছদের ওপর প্রজ্ঞাকরগুপ্তের ভাষ্য *বার্তিকালংকার* পেয়েছিলেন।

তিব্বতে তৃতীয়বার

বার্তিকালংকার-এর ফটো তুলে নিয়েছিলেন তিনি। সবশুদ্ধ সাক্যায় চল্লিশটারও বেশি সংস্কৃত বই বেরিয়েছিল। সাক্যাকে রাহুল তীর্থস্থান মনে করতেন। সাক্যা থেকে নেপালের পথে বাহুল ভারতে ফিরে এলেন।

রাহুল তৃতীয়বার তিব্বত যাত্রা করেন ১৯৩৬-এ। এবার তিনি তিব্বত গিয়েছিলেন নেপাল হয়ে। কাঠমাণ্ডু থেকে তিনি তিব্বতের দিকে অগ্রসর হন ১৯৩৬-এর ১৫ এপ্রিল। এবারও তিনি প্রথমবারের মতো এেনম হয়ে তিব্বতে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি প্রথম লাসা যাননি। গিয়েছিলেন সাক্যাতে।

ফুনছোগ্ প্রাসাদের নতুন মোহন্তরাজের কাছে রাহুল শুনেছিলেন, সাক্যায় অনেক তালপাতার পুঁথি আছে। সেগুলো ভালো করে খোঁজা উচিত। লহাখঙছেন-মোর-ছগ্‌পে লহাখঙ নামে ছোটো গ্রন্থগারটিও খুলিয়ে দেখতে বলেছিলেন তিনি।

অবশেষে ২৫ মের স্মরণীয় দিনটি এল। ছগপে লহাখঙ গ্রন্থাগারের তালা বন্ধ ছোট ঘরটির চাবি পাওয়া গেল। একজন অফিসার সেখানে রাহুলকে নিয়ে গেলেন। রাহুল লিখছেন, 'আমি ছগপে লহাখঙের গ্রন্থাগারের খাড়া, লম্বা ও ভয়ংকর সিড়ি ভেঙে ওপরে ওঠার সময় ভাবিনি যে, এখানে কোনো সংস্কৃত গ্রন্থ থাকতে পারে। ওপরে উঠে ডান দিকের ঘরে ঢুকলাম। ঘরের ভেতরে কত বছরের ধূলা জমে ছিল বলা শক্ত। ঘরে ঢুকতেই এত ধূলা উড়ল যে ঘরটা ধূলায় অন্ধকার হয়ে গেল। ঘরের চারদিকে দেয়ালের গায়ে তিনতলা চারতলা বইয়ের তাক। তাতে কাপড় জড়ানো, খোলা অথবা বাঁধা অবস্থায় কয়েক হাজার বই। এগুলো সেই সব বই, যা তিব্বতের ঐতিহাসিক পণ্ডিতেরা স্ব-হস্তে লিখেছিলেন, যা তিব্বতি সাহিত্য ও ইতিহাসের অমূল্য রত্ন.......আমার প্রয়োজন ছিল সংস্কৃতে লেখা তালপাতার পুঁথি। নানা জায়গায় হাত চালিয়ে আমার হাত গিয়ে ঠেকল তালপাতার পুঁথিতে। দুটি কাঠের পাটার ভেতরে রাখা এই সব পুঁথি মোটা দড়ি দিয়ে এফোঁড়-ওফোঁড় করে বাঁধা। তালপাতার পুঁথিগুলি এক জায়গা থেকে বেরিয়ে এল। ১, ২, ৩, ৪......এভাবে বিশটা তালপাতার পুঁথি পেলাম। কিছু পুঁথি পাওয়া গেল তিব্বতি পুঁথির স্তূপের মধ্যে। রাহুল সব পুঁথি খুলে দেখতে শুরু কবলেন ঃ ধর্মকীর্তির সম্পূর্ণ *বার্তিকালংকার* (প্রমাণ বার্তিক ভাষ্য) কর্ণকগোমির *স্ববৃত্তি টীকা* (প্রমাণ বার্তিকের টীকা ও ভাষ্য), দার্শনিক অসঙ্গের *যোগাচারভূমি, চান্দ্র ব্যাকরণে*-এর টীকা, তামিল ও সিংহলি অক্ষরে লেখা দুটি বই। রাহুল *বার্তিকালংকার* ও *স্ববৃত্তি টীকা* সঙ্গে নিয়ে চলে এলেন। এই সব বই নকল করে নিয়ে যেতে হবে। অতএব তাঁকে সাক্যাতে থাকতে হল আড়াই মাস। আট হাজার শ্লোকের মহাগ্রন্থ *যোগাচার ভূমি* তিনি প্রায় সম্পূর্ণই পেয়েছিলেন। এই গ্রন্থ নকল করার সময় ছিল না তাঁর। তাই বইয়ের সব পৃষ্ঠার ফোটো নিতে হল।

এবারের সাক্যা আসা সার্থক হয়েছিল। তিব্বতে আসার আগে টাইফয়েড হয়েছিল তাঁর। তিনি যখন মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছিলেন, তখন তাঁর মুখে শুধু ধর্মকীর্তির নাম ছিল। তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন কেউ তাঁর হাতে তালপাতার পুঁথি দিল। তিনি তা খুলে দেখলেন— দিঙনাগের *প্রমাণ সমুচ্চয়* ও ধর্মকীর্তির *বার্তিকালংকার*। তিনি সাক্যাতে *বার্তিকালংকার* পেয়েছিলেন। কিন্তু *প্রমাণ সমুচ্চয়* পাননি। প্রজ্ঞাকর গুপ্তের *বার্তিকালংকার বৃহদ্ভাষ্য*-ও তিনি সাক্যায় পেয়েছিলেন। *যোগাচার ভূমি*-র ফোটো নিয়েছিলেন। অন্যান্য সব বই তিনি নকল করে নিয়েছিলেন। শলুতে মনোরথ নন্দীর একটি সুন্দর বৃত্তি পেয়েছিলেন রাহুল। এই বইটিও তিনি নকল করে নিয়েছিলেন।

শলু থেকে বিফুগা। মহাবিদ্বান বুতোন তাঁর অন্তিম দিনগুলি বিফুগাতে কাটিয়েছিলেন। বিফুগার গ্রন্থাগারে ৩৯ বান্ডিল তালপাতার পুঁথি পাওয়া গেল। এর মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বই ছিল। এত বই নকল করার সময় ছিল না রাহুলের। রাহুল অবিলম্বে শিগর্চে গিয়ে তেজরত্নকে নিয়ে এলেন। তেজরত্ন বেশ কিছু ফোটো তুললেন। এই সব বইয়ের মধ্যে ছিল *মধ্যমকহৃদয়* (ভাষ্য), *বিগ্রহব্যবর্তিনী* (ন্যায়ার্জুন), *প্রমাণবার্তিকবৃত্তি* (মনোরথ নন্দী) ও *মনভঙ্গাধ্যায়* (জ্ঞানশ্রী)। এই বিহার থেকে এই বইগুলি তিনমাস রাহুলের কাছে রাখার অনুমতি দিয়েছিল। তাই রাহুল বইগুলি নকল করে আনতে পেরেছিলেন।

বিফুগা থেকে রাহুল গ্যান্চী চলে গেলেন। সেখান থেকে ঙোর বিহারে গিয়ে সেখানকার গ্রন্থাগারে আবার তালপাতার পুঁথির খোঁজ করলেন। বসুবন্ধুর *অভিধর্মকোষ* পেলেন। *তর্করহস্য* ও *বাদরহস্য* নামে দুটি খণ্ডিত ন্যায় গ্রন্থ পেলেন। আর পেলেন *সুভাষিত*, *প্রাতিমোক্ষ* ও *বাদন্যায়ের* পুঁথি। সব পুঁথিরই ফোটো নিয়ে নিলেন তেজরত্ন। তারপর আবার ফিরে এলেন সাক্যাতে। সাক্যাতে এসে তিনি *যোগাচার ভূমি* নকল করার কাজে লেগে গেলেন। আট-দশ হাজার শ্লোকের এই গ্রন্থ নকল করতে তাঁর সমস্ত সময় কেটে যেত। প্রত্যেক দিন পাঁচশোর মতো শ্লোক লিখতেন। ২১ অক্টোবর *যোগাচার ভূমি* শেষ হল। বই ছাড়া তিনি অনেক প্রস্তর ও ধাতুর মূর্তির ফোটো তুললেন।

ভারতে ফিরলেন সিকিম হয়ে

৩০ অক্টোবর রাহুল সাক্যা ছেড়ে ভারতে ফেরার পথ ধরলেন। তিনি ফিরলেন সিকিম হয়ে। ১৪ নভেম্বর বিকেল সাতটায় তিনি শিলিগুড়ি পৌঁছোলেন এবং তারপর রাত্রিতে কলকাতার ট্রেন ধরে ১৫ নভেম্বর সকাল সাতটায় শেয়ালদা পৌঁছোলেন।

তিব্বতে চতুর্থবার

রাহুলের চতুর্থ তিব্বত অভিযানের জন্য বিহার সরকার ছয় হাজার টাকা মঞ্জুর করেছিল। তিব্বতে যাওয়া এবার অনেক সহজ হয়ে গিয়েছিল। এবারের তিব্বত যাত্রায় রাহুলের অনেকটা পূর্ব-প্রস্তুতি ছিল। তিব্বত সরকার সমস্ত পুরোনো গ্রন্থাগারের দরজার সীলমোহর ভেঙে বই-পত্র দেখবার অনুমতি দিয়েছিল; রাহুলকে তিনটি ঘোড়া ও তিনটি

গাধা দেওয়ার আদেশ দিয়েছিল। তাছাড়া কলকাতা থেকে ফোটোগ্রাফির সব সাজ-সরঞ্জাম আনিয়ে নিয়েছিলেন রাহুল। ১৯৩৮-এর ৪ মে সকাল দশটায় তাঁরা তিব্বত রওনা হন। ৭ মে তারা লিঙতম্ থেকে খাড়া চড়াইয়ের পথ ধরে ১১মে ফরী পৌঁছোলেন। ফরী থেকে গ্যান্চী। গ্যান্চীতে তিন-চার দিন বিশ্রামের পর আবার যাত্রা শুরু হল। এখানে লাসা থেকে কেনা তিনটি খচ্চর চলে এল। তাছাড়া তিব্বত সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নির্দিষ্ট ভাড়ায় নির্দিষ্ট গ্রামে তিনটি ঘোড়া ও তিনটি গাধা দেওয়ার নির্দেশ এল।

শলু, নরথঙ, সাক্যা

২৭ মে-তে রাহুল শলু পৌঁছে গেলেন। পরদিন গ্রন্থাগার খোলা হল। একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বই— প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক জ্ঞানশ্রেণীর বারোটি রচনা সংগ্রহ ও আরো কয়েকটি বই পাওয়া গেল।

শলু থেকে ঙোর ও নরথঙ এবং তারপর সাক্যা। সাক্যাতে দু-সপ্তাহ থেকে রাহুল তাঁর প্রয়োজনীয় সব বইয়ের ফোটো তুললেন। সাক্যা থেকে তাঁরা মরজা এলেন। মরজা থেকে ডোবথা-লা পার হয়ে নীচে নামার পথে তাঁরা ডাকাতের হাতে পড়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডাকাতেরা তাদের আক্রমণ করেনি। ২৮ সেপ্টেম্বর তাঁরা লাছেন পৌঁছোলেন। ২৯ সেপ্টেম্বর লাছেন থেকে রওনা হয়ে ২ অক্টোবরে কালিম্পঙ। ৪ অক্টোবরে মোটরে শিলিগুড়ি এলেন রাহুল এবং পরদিন রেলপথে কলকাতা পৌঁছে গেলেন। রাহুলের তিব্বত অভিযান শেষ হল।

অষ্টম অধ্যায়

রাহুলের তিব্বত অভিযানের তাৎপর্য

প্রথমবার রাহুল সওয়া বছর তিব্বতে কাটিয়েছিলেন (নভেম্বর ১৯২৯ থেকে জুন ১৯৩০)। দ্বিতীয়বার ১৯৩৪-এর এপ্রিল থেকে নভেম্বর পর্যন্ত। অর্থাৎ দ্বিতীয়বার তিনি আট মাস তিব্বতে ছিলেন। তৃতীয়বার তিব্বতে ছিলেন ১৯৩৬-এর এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত অর্থাৎ সাত মাস। চতুর্থ তিব্বত অভিযান স্থায়ী হয়েছিল ১৯৩৮-এর মে থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অর্থাৎ পাঁচ মাস। সবশুদ্ধ তিন বছর রাহুল তিব্বতে ছিলেন। এই তিন বছরে একটি বিলুপ্ত জগৎকে পুনরুদ্ধার করে ভারতে নিয়ে এসেছিলেন তিনি। হারানো বৌদ্ধজগৎকে তিনি ভারতকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, একথা বললেই যথেষ্ট হল না। মুসলমান আক্রমণে বিধ্বস্ত উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে বৌদ্ধ দার্শনিকেরা তাঁদের প্রাণের চেয়ে প্রিয় গ্রন্থাদি নিয়ে যখন তিব্বতে পালিয়ে যান, সেই যুগের অতিশয় স্পষ্ট ছবিও এঁকেছেন রাহুল। তিব্বতের রাজা স্রঙ-সান-গাম-পা সম্রাট অশোকের মতো ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত শান্তরক্ষিতের শিষ্যত্ব স্বীকার করে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। তারপর থেকে হাজার হাজার ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতে চলে যান এবং সেখানে বৌদ্ধ গ্রন্থ অনুবাদ করতে শুরু করেন। মুসলমান বিজয়ের আগে তিব্বতিরা বৌদ্ধ দর্শন অধ্যয়নের জন্য ভারতের বিভিন্ন বিহারে আসতেন। ফিরে যাওয়ার সময় তাঁরা ভারতের বৌদ্ধ পণ্ডিতদের তিব্বতে নিয়ে যেতেন। এইসব ভারতীয় পণ্ডিতেরা তিব্বতের বিভিন্ন বৌদ্ধ গুম্ফায় আজীবন জ্ঞানের তপস্যায় মগ্ন থাকতেন। ভারতীয় পণ্ডিতদের তিব্বতি শিষ্যরাও বৌদ্ধ দর্শনকে সমৃদ্ধ করেছিলেন।

এসময়ে ভারতীয় বৌদ্ধ বিদ্বান ও ভিক্ষুদের সমবেত প্রয়াসে ভারত সমগ্র এশিয়ার বৌদ্ধিক রাজধানীতে পরিণত হয়েছিল। তারপর ধীরে ধীরে ভারত থেকে বৌদ্ধধর্ম মুছে গেল। ভারতে বৌদ্ধ দার্শনিক ও ব্রাহ্মণ ধর্মীয় দার্শনিকদের মধ্যে আটশো বছর ধরে যে বিতর্ক চলছিল, তার অবসান ঘটালেন আচার্য শংকর। তিনি বৌদ্ধ দর্শনের সঙ্গে অদ্বৈত বেদান্তকে মেলালেন। ফলে দার্শনিক ক্ষেত্রে, বৌদ্ধ দর্শনের আর raison d'etre রইল না। আর যেহেতু বৌদ্ধ দর্শনের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের অঙ্গাঙ্গি-সম্পৃক্তি তাই বৌদ্ধধর্মও পৃথকভাবে তাব অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারল না। তারপর মুসলমান আক্রমণ বৌদ্ধ বিহার ধ্বংস করে দেওয়ায় ভারত থেকে বৌদ্ধধর্ম মুছে গেল।

রাহুল বেশ ভেবেচিন্তে নিজেকে হিউয়েন-সাঙ্ এর আদলে তৈরি করেছিলেন। বৌদ্ধ ভিক্ষু রাহুল তীর্থযাত্রা করেছিলেন তিব্বতে। মধ্য এশিয়া থেকে তীর্থযাত্রীর যে প্রবাহ পুণ্যভূমি ভারতে আসত, সেই প্রবাহ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। যে বৌদ্ধ সংস্কৃতি

ও সভ্যতা সমগ্র ভারতকে সিঞ্চিত করে এবং দেশ কালের বেড়া ভেঙে মধ্য-এশিয়া ও দূর প্রাচ্যকে একটি অখণ্ড সাংস্কৃতিক এককে এবং ভারতকে এই সংস্কৃতির কেন্দ্র-বিন্দুতে পরিণত করেছিল, ভারতীয়দের স্মৃতি থেকে তা একেবারে মুছে গিয়েছিল। ভারতীয়দের মন থেকে এই বিস্মৃতির অন্ধকার দূর করার জন্য রাহুলের তিব্বতাভিযান অত্যন্ত কার্যকর হয়েছিল। তাঁর তিব্বতাভিযান এবং বিলুপ্ত সংস্কৃত গ্রন্থের পুনরুদ্ধার ভারতীয় বিদ্বজ্জন সমাজের কাছে একটি প্রচণ্ড ধাক্কার মতো এসেছিল। বৌদ্ধধর্ম কোনো অ-ভারতীয় ব্যাপার নয়, ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতিরই অঙ্গ, এই অতিশয় সহজ কথাটিই ভারতীয়দের মন থেকে হারিয়ে গিয়েছিল। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও দর্শনের মিশ্রণে জন্ম নিয়েছে ভারতীয় সভ্যতার বিচিত্র মোজেইক। হারিয়ে যাওয়া বৌদ্ধ জগৎকে পুনরুদ্ধার করে রাহুল এই কথাটিই ভারতীয় চৈতন্যে সংক্রামিত করেছিলেন।

বৌদ্ধ সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির অন্বেষণে বিশ শতকের ফরাসি, ইংরেজ, জার্মান, জাপানি, ইতালিয় এবং রুশি গবেষক দল (১৯১২-১৯১৪) চীনা তুর্কিস্তানে ভূর্জপত্রে লেখা পাণ্ডুলিপিব জীর্ণ অংশ খুঁজে বার করেছিলেন। ২-৭ শতকের এই সব গ্রন্থ মূলত পালি ও সংস্কৃতে বৌদ্ধ সাহিত্যের খণ্ডিত রূপ। কিন্তু রাহুল সাংকৃত্যায়ন তিব্বতে বৌদ্ধ সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির বিশাল ভাণ্ডার উদ্ধার করে (১৯২৯-১৯৩৮) সমগ্র বিশ্বের প্রাচ্য-বিদ্যা-বিদ্‌দের উচ্চকিত করে দিয়েছিলেন। তাঁদের দৃষ্টিতে রাহুল-সংগ্রহ এই শতকের মহান প্রাপ্তি বলে স্বীকৃত। এই সব বহুমূল্য সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি ভারত থেকে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। চীনা অথবা তিব্বতি অনুবাদ থেকেই এই সব পাণ্ডুলিপির কথা আমরা জানতে পারি। এইসব পাণ্ডুলিপি নয় থেকে ষোলো শতকের; যার অধিকাংশই সম্পূর্ণ।

তিব্বত ভারতের প্রতিবেশী দেশ। তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের আরম্ভ ও প্রচার তিব্বতের রাজা স্রোঙ-চেন-গাম্বোর (৬৩০-৬৯৩ খ্রিঃ) শাসনকালে হয়েছিল। তাঁর শাসনকালে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত মহাপণ্ডিত শান্তরক্ষিত তিব্বতে গিয়েছিলেন। তিনি বৌদ্ধ দর্শনের মহান গ্রন্থ *তত্ত্বসংগ্রহকারিকা* রচনা করেছিলেন। তাঁর প্রধান শিষ্যদের মধ্যে কমলশীল অন্যতম। তিনি তত্ত্বসংগ্রহের ব্যাখ্যা *তত্ত্বসংগ্রহ পঞ্জিকা* রচনা করেন। তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্মপ্রচার ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শান্তরক্ষিত সেখানে বৌদ্ধদর্শন ও বৌদ্ধ ন্যায়েরও ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর তিব্বতে যান পদ্মসম্ভব ও কাশ্মীরের বৈরোচন। আরো পরে দীপংকর শ্রীজ্ঞান, জ্ঞানশ্রী ভদ্র ও অন্যান্যরা আরো অনেকে কিছুকাল পর পর তিব্বতে যেতে থাকেন এবং বৌদ্ধ সাহিত্যের বিশাল ভাণ্ডারের তিব্বতি অনুবাদে সহায়তা করেন। নালন্দা ও বিক্রমশীলা মহাবিদ্যালয়ে অধ্যয়নের জন্য তিব্বত ও অন্যান্য দেশ থেকে ছাত্ররা আসতেন। ফিরে যাওয়ার সময় এঁরা নিজেদের সঙ্গে তালপাতার পাণ্ডুলিপি ও পূজ্যদের মূর্তি ইত্যাদি নিয়ে যেতেন। এখানকার বিখ্যাত পণ্ডিতদেরও তাঁরা সসম্মানে ও সাদরে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। এগারো শতকে দীপংকর শ্রীজ্ঞানের সঙ্গে অনেক পণ্ডিত তিব্বত গিয়েছিলেন। তাঁরা তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম এবং দর্শনের প্রসার ঘটিয়েছিলেন। তিব্বতিতে বৌদ্ধদর্শনের অনুবাদ হতে থাকে। তেরো শতকে বখতিয়ার

খিলজির আক্রমণে বৌদ্ধ বিহার বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়ার পর বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান শাক্যশ্রীভদ্র ও তাঁর শিষ্যরা ও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু আচার্য তাঁদের সঙ্গে তালপত্রের মুখ্য সব পুঁথি নিয়ে শরণার্থী হয়ে তিব্বতে যান। তিব্বতের তৎকালীন রাজা সাদরে এই পণ্ডিতদের আশ্রয় দেন। এভাবে সপ্তম শতাব্দী থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত ভারত থেকে তিব্বতে তালপত্রের পাণ্ডুলিপি যেতে থাকে।

এই নশো বছরে তালপাতার পুঁথির বিশাল ভাণ্ডার তিব্বতে সংগৃহীত হয়। ভারতের ওদন্তপুরী মহাবিহারের স্থাপত্যের মডেলে একটি মহাবিহার তিব্বতে শান্তরক্ষিত সপ্তম শতকে তৈরি করিয়েছিলেন। এগারো শতকে যখন আচার্য দীপংকর শ্রীজ্ঞান এই মহাবিহারে যান, তখন এর গ্রন্থাগারে সংগৃহীত নতুন পুঁথি দেখে তিনি আশ্চর্য হয়ে যান। কেননা এখানকার মতো ভালো সংগ্রহ বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকাগারেও ছিল না। কিন্তু এই মহাবিহারে অগ্নিকাণ্ডের ফলে এই গ্রন্থাগার সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়ে যায়। সাক্যা মহাবিহারেও সংস্কৃত পুঁথির ভালো সংগ্রহ ছিল। এখানে সংস্কৃত গ্রন্থের তিব্বতি ভাষায় অনুবাদ হয়েছিল। এভাবে ঙোর, শলু, দের্গে, কুন-দে-লিঙ, পো-খঙ ইত্যাদি মঠে ভারতীয় গ্রন্থের ভাণ্ডার গড়ে উঠেছিল। বিভিন্ন কারণে ষোড়শ শতকে যখন তিব্বতের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ছিন্ন হতে থাকে, তখন সংস্কৃত ভাষায় মানুষের রুচিও কমে যেতে থাকে। তিব্বতিরা তিব্বতি ভাষার সাহায্যেই বৌদ্ধধর্মের জ্ঞানার্জন করতে থাকে। আগেকার আচার্যদের কৃতি পূজনীয় ও রক্ষণীয় মনে করে তারা দেবমূর্তি ও অন্যান্য মূর্তির ভেতরে তা রেখে দেয়। এতে আগুনের হাত থেকে বেঁচে গেলেও তা পণ্ডিতদের দৃষ্টির আড়ালেই থেকে যায়। রাহুল সাংকৃত্যায়ন তাঁর যাত্রা বৃত্তান্তে লিখেছেন যে, সাম্যে মহাবিহারে একটি মূর্তি ভেঙে যাওয়ায় তার ভেতর থেকে অনেক গ্রন্থ বেরিয়ে আসে। কিন্তু তারপরও সেই মূর্তিকে মেরামত করে সেই সব গ্রন্থ আবার সেই মূর্তির ভেতরেই বন্ধ করে রাখা হয়। রাহুল লিখেছেন যে, তিব্বতিদের মধ্যে এই অন্ধ বিশ্বাস ছড়িয়ে পড়েছিল যে, তালপাতার পুঁথির টুকরো জলে ডুবিয়ে খাওয়ালে রোগী ভালো হয়ে যায়। তাই অনেক লামা নিজেদের শিষ্যদের মধ্যে বিতরণের জন্য অন্যান্য মঠ থেকে তালপাতার পুঁথি জমা করতে থাকেন। কয়েকশো বছর ধরে তাঁরা তালপাতার সংস্কৃত পুঁথি কেটে কেটে ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করতে থাকেন। এভাবে তালপাতার পুঁথি বিলুপ্তির পরও যা বেঁচেছিল তার মধ্যেও বেশ কিছু পুঁথি টুকরো টুকরো হয়ে মন্ত্রপূত জলের সাহায্যে তিব্বতি জনতার পেটে চলে গেছে। তাছাড়াও এক মঠ থেকে অন্য মঠে পাণ্ডুলিপি স্থানান্তরিত হতে থাকে। রাহুল সাংকৃত্যায়ন শলু ও ঙোর মঠে যে সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি দেখেছিলেন আসলে তা ছিল সাক্যা মঠের। এই সব পাণ্ডুলিপি যে এত দিন টিকে ছিল তাকে পরম ভাগ্য বলতে হবে, কেননা এসব যাতে সুরক্ষিত থাকে তার জন্য কিছুমাত্র অর্থ ব্যয় করা হয়নি।

রাহুল সাংকৃত্যায়নের সবচেয়ে কঠিন ও দুঃসাহসিকতাপূর্ণ ভ্রমণ হল তাঁর চারবার তিব্বত যাত্রা। ১৯২৯-এর ১৯ জুলাই তিব্বত পৌঁছে তিনি তাঁর প্রথম তিব্বত যাত্রা

সম্পূর্ণ করেন। সে সময়ে তিব্বতে যাওয়া সহজ ব্যাপার ছিল না। যে বই ও চিত্রপট তিনি সংগ্রহ করেছিলেন তা একুশটা খচ্চরে বোঝাই করে কালিম্পঙ নিয়ে আসেন। ফেরার পথে তিনি শলু, টশীলহুন-পো, নরথঙ, গ্যান্‌চীর মঠে কিছু বই কেনেন এবং কিছু উপহার হিসাবে পান। *কনজুর* ও *তনজুর* ছাড়া বিবিধ তিব্বতি গ্রন্থও তিনি নিয়ে এসেছিলেন যার সংখ্যা ১৬১৯। তিব্বত থেকে কালিম্পঙ ফিরে আসতে তাঁর সময় লেগেছিল ৩৯ দিন। এই সংগ্রহ পাটনার বিহার রিসার্চ সোসাইটিতে রাখা হয়েছে।

রাহুল *কনজুরে*-এর লাসা সংস্করণ ও *তনজুর*-এর দের্গে সংস্করণ বিহার রিসার্চ সোসাইটিতে জমা দিয়েছিলেন। তাঁর এই কাজ কতটা মাহাত্ম্যপূর্ণ তা বোঝা যাবে এই থেকে যে তিব্বতি *ত্রিপিটক কনজুর-তনজুর*-এর দের্গে সংস্করণের সূচি জাপান থেকে ১৯৩৪-এ প্রকাশিত হয়েছিল। লাসা সংস্করণের *কনজুর-তনজুর*-এর এক সেট তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়েছিলেন। নরথঙ *কনজুর-তনজুর*-এর এক সেট তিনি শ্রীলঙ্কায় পাঠিয়েছিলেন। *কনজুর-তনজুর*-এর লাসা, নরথঙ ও দের্গে এই তিন সংস্করণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল দের্গে সংস্করণ। তারই এক সেট বিহার রিসার্চ সোসাইটিতে আছে।

ভারতীয় গ্রন্থের তিব্বতি ভাষায় অনুবাদের বিশাল সংগ্রহের নাম *কনজুর* এবং তনজুর। এই সংগ্রহের মধ্যে সাড়ে চার হাজার ভারতীয় গ্রন্থের অনুবাদ পাওয়া গেছে। এই অনুবাদ তিব্বতি ও ভারতীয় পণ্ডিতেরা যুক্তভাবে করেছিলেন। এই অনুবাদের জন্য একটি কোষও রচনা করা হয়েছিল যার নাম *মহাব্যুৎপত্তি*। ভারতে মূল বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের বিশাল ভাণ্ডার তো নষ্ট হয়েই গিয়েছিল। এ বিষয়ে ভারতীয়দের কোনো ধারণাও ছিল না। তিব্বতেও আর তা পাওয়া কঠিন ছিল। এই বিশাল রত্নভাণ্ডার তিব্বতি অনুবাদে সুরক্ষিত ছিল। এই অনুবাদ এমন বৈজ্ঞানিক ভাবে করা হয়েছে যে তা মূলের অত্যন্ত কাছাকাছি। এই অনুবাদ থেকে অবিকল মূল সংস্কৃত অনুবাদ করা সম্ভব। যখন রাহুল *প্রমাণবার্তিক*-এর মূল সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি পাননি তখন তিনি তিব্বতি অনুবাদ থেকে মূল সংস্কৃত কারিকাকে পুনরুদ্ধার করেছিলেন। এই *কনজুর-তনজুর*-এর অনেক গ্রন্থের সংস্কৃত অনুবাদ দলাই লামার সহায়তায় সারনাথ মঠের অধ্যক্ষ রিনপোদের নির্দেশনায় করানো হচ্ছে। তাছাড়াও কাশীপ্রসাদ জওসওয়াল শোধ সংস্থান (পাটনা), বিহার রিসার্চ সোসাইটি (পাটনা), দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, সম্পূর্ণানান্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় (বারাণসী), তিব্বতি শোধ সংস্থান (গ্যাংটক) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এই পূণ্যকাজে লেগে আছে। বিহার রিসার্চ সোসাইটিতে *তনজুর*-এর তিব্বতি অনুবাদ সুরক্ষিত। বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত আচার্য রত্নাকর শান্তির গ্রন্থ *ছন্দোরত্নাকর*-এর প্রকাশনা ডঃ সোহনী অভিনন্দন গ্রন্থে করা হয়েছে। চৌদ্দ শতকে *কনজুর-তনজুর*-এর সঙ্কলন করেছেন রিন-ছেন-ডর যিনি বুস্তোন। সপ্তম শতাব্দী থেকে কয়েক শো বছর অনেক পণ্ডিত অনুবাদের কাজ করতে থাকেন। অত্যন্ত-সতর্কভাবে তাঁরা এই অনুবাদের কাজ করেন। যথোচিত ভাবে শ্রেণি বিন্যাস করে তাঁরা *কনজুর-তনজুর*-কে বিভক্ত করেন। *কনজুর-তনজুর*-কেই

আমরা *ত্রিপিটক* বলে জানি। *কনজুর*-এ তন্ত্র, প্রজ্ঞাপারমিতা, মন্ত্র, সূত্র, ধাবনী ও বুদ্ধবচন সংকলিত। *তনজুর*-এ এইসব কিছুর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাছাড়া এতে ন্যায়শাস্ত্র, কাব্য, আয়ুর্বেদ ও শিল্পকলা ইত্যাদি বিষয়ের সংকলন করা হয়েছে। এতে স্তোত্র, তন্ত্রবৃত্তি, প্রজ্ঞাপারমিতা, মধ্যমক, সূত্রান্তবৃত্তি, যোগাচার, বিজ্ঞনাদ, অভিধর্মশাস্ত্র, বিনয়সূত্র বৃত্তি, জাতক, পরিকথা এবং লেখ, হেতুবিদ্যা, শব্দবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, শিল্পবিদ্যা ইত্যাদি সংকলিত। *কনজুর-তনজুর*-এর অনেকটাই বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের সঙ্গে সংযুক্ত। কিন্তু বেশ কিছু ধর্ম নিরপেক্ষ বিষয়ের সংকলনও *তনজুর*-এ আছে। অতএব *কনজুর-তনজুর* শুধু বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের অধ্যয়ন ও গবেষণার বিষয় মাত্র নয়। ভারতবর্ষ ও তার প্রতিবেশী দেশের প্রাচীন ও মধ্যকালীন ইতিহাসের ছাত্র ও গবেষকদের জন্য এই সংকলনের অধ্যয়ন অপরিহার্য। নয়তো ভারতবর্ষের প্রাচীন ও মধ্যকালীন ইতিহাসের পাঠ অপূর্ণ থেকে যাবে।

কনজুর-তনজুর ছাড়া তিব্বতি ভাষায় লিখিত যে ১৬১৯টি গ্রন্থ রাহুল নিয়ে এসেছিলেন, তার একটি সূচি প্রণয়ন করেন শ্রীরাধারমণ চৌধুরী এবং বিহার রিসার্চ সোসাইটি তা প্রকাশ করেন। এই সংগ্রহ থেকে *আর্য সুরঙ্গম সূত্র* নামে মহাযান সূত্রম সাক্যা-পাকা সুলেখ ও পদ্ম সম্ভবের জীবনী প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া এই সংস্থায় *ব্যুৎপত্তি* নামক তিব্বতি সংস্কৃত কোষ, শাক্যশ্রীভদ্রের প্রামাণিক জীবনী প্রভৃতির সম্পাদনা কার্য চলছে।

পাণ্ডুলিপি ছাড়া ১০৯টি থাংকা (চিত্রপট), ২৫টি কাঠের ব্লক প্রিন্ট, চন্দন কাঠে খোদাই করা পোতলা রাজপ্রাসাদ, সাম্যে বিহারের অনুকৃতি, হাতির দাঁত ও অস্থিতে তান্ত্রিক দেব-দেবীর মূর্তি, তিব্বতি লামাদের বস্ত্র এবং নানা প্রকারের পরিধান, পিতল ও তামার মূর্তি, শিলালেখ, জ্যোতিষশাস্ত্রের সঙ্গে যুক্ত চিত্র, বজ্র, ডমরু, ঘণ্টা, তান্ত্রিক প্রতীক, পূজার উপকরণ ও অলংকার তিনি এনেছিলেন যাদের সংখ্যা ছিল ৮৩। এইসব কিছুই পাটনা সংগ্রহালয়ের রাহুল সাংকৃত্যায়ন কক্ষে সর্বসাধারণের দর্শনের জন্য রাখা হয়েছে।

তাঁর প্রথম তিব্বত যাত্রার সময় (১৯২৯-১৯৩০) রাহুল সংস্কৃত গ্রন্থ খুঁজেছিলেন। কিন্তু প্রথম যাত্রায় তিনি তা খুঁজে পাননি। মূল ভারতীয় সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির খোঁজে ১৯৩৪, ১৯৩৬ ও ১৯৩৮-এ আরো তিনবার তিব্বতে গিয়েছিলেন। এই পুণ্যকাজে কাশীপ্রসাদ জয়সওয়াল ও বিহার রিসার্চ সোসাইটির কাছ থেকে তিনি আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন। এই তিনবারের যাত্রায় তিনি সর্বসাকুল্যে ৩৬৩টি সংস্কৃত গ্রন্থ খুঁজে পেয়েছিলেন এবং এই সব গ্রন্থের একটি সূচিও তিনি প্রণয়ন করেছিলেন। রাহুল এই ৩৬৩টি সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি বিহার রিসার্চ সোসাইটির পত্রিকায় তিন খণ্ডে প্রকাশিত করেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় অর্থ-সংকটের জন্য রাহুল সব পাণ্ডুলিপির ফোটোগ্রাফ নিতে পারেননি। পাণ্ডুলিপি ভারতে আনার অনুমতিও পাননি। অনেক পাণ্ডুলিপি তাঁকে হাতে লিখে আনতে হয়েছে। সব পাণ্ডুলিপি ফোটোগ্রাফ করে অথবা হাতে লিখে আনাও সম্ভব ছিল না। তাই পাণ্ডুলিপি বাছাই করে তিনি হাতে লিখে এনেছিলেন। যে সব গ্রন্থ তিনি

হাতে পেয়েছিলেন অথবা যাদের ফোটো নিয়েছিলেন তাদের সংখ্যা আশির কাছাকাছি। তিব্বতে চীনের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই সব গ্রন্থ সুরক্ষিত আছে, এই আশা দুরাশা কিনা কে জানে।

রাহুলের আগে ইতালির বিখ্যাত পণ্ডিত ডঃ তুচি তিব্বত গিয়েছিলেন পাণ্ডুলিপির খোঁজে। এই কাজে ইতালি সরকার প্রচুর অর্থ ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা দিয়েছিলেন। ডঃ তুচি তিব্বতে ভারতীয় গ্রন্থের সন্ধান করেছিলেন এবং অনেক সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি কিনে নিয়েছিলেন। সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি ছাড়া অনেক তিব্বতি ভাষার গ্রন্থও তিনি ক্রয় করেছিলেন। শেষপর্যন্ত তিব্বত থেকে তিনি একটি বৃহৎ গ্রন্থের সংগ্রহ নিয়ে গিয়েছিলেন। এই বিশাল সংগ্রহ 'সেরি ওরিয়েন্টালিয়া' রোমে সুরক্ষিত আছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত এই সংগ্রহের প্রামাণিক সূচি প্রকাশিত হয়নি। তাই এই সংগ্রহ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায়নি। শোনা যাচ্ছে যে সংগ্রহের সূচি বানানোর জন্য কিছু পণ্ডিত কাজ করছেন। রাহুল তাঁর যাত্রা বৃত্তান্তে লিখেছেন যে যদি তাঁর কাছে পাঁচ-ছয় হাজার টাকা থাকত তবে তিনি অনায়াসে সব তালপাতার গ্রন্থ কিনে নিয়ে আসতে পারতেন। কিন্তু তাঁর সেই সৌভাগ্য হয়নি। অতএব তিনি সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি ভারতে নিয়ে আসতে পারেননি। তিব্বত থেকে যে সব লামা ভারতে পালিয়ে এসেছিলেন তাঁরাও নিজেদের সঙ্গে সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি নিয়ে এসেছিলেন। তার মধ্যে কিছু তিব্বতি অধ্যয়ন সংস্থান, গ্যাংটক, সিকিমে সংরক্ষিত আছে।

তিব্বত থেকে নিজের হাতে তিনি যে সব পাণ্ডুলিপির নকল করেছিলেন, তার মধ্যে ছিল *অধ্যর্দ্ধশতক, তর্কজ্বালা, বিগ্রহব্যাবর্তনী, যোগাচারভূমি শাস্ত্র, ক্ষণভঙ্গাধ্যায়*, প্রজ্ঞাকরগুপ্তকৃত *প্রমাণবার্তিক ভাষ্য*, মনোরথ নন্দীকৃত *প্রমাণবার্তিকবৃত্তি*, ধর্মকীর্তিকৃত *প্রমাণবার্তিক সোপজ্ঞবৃত্তি*, কর্ণকগোমীকৃত *স্বোপজ্ঞবৃত্তি টীকা* ও *বাদন্যায়*। এইসব পাণ্ডুলিপির মধ্যে রাহুল *বাদন্যায়, প্রমাণবার্তিক, প্রমাণবার্তিকবৃত্তি বিগ্রহব্যাবর্তনী* ও *অধ্যর্দ্ধশতক* বিহার রিসার্চ সোসাইটি থেকে প্রকাশিত করেছিলেন। কর্ণকগোমীকৃত *প্রমাণবার্তিকবৃত্তি টীকা* এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এই সংগ্রহে মৈত্রেয় নাথের রচনা *রত্নগোত্রবিভাগ* মহাযানোত্তর তন্ত্রশাস্ত্রের সম্পাদনা করেছেন ই. এইচ. জনস্টন ১৯৫০-এ। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে বিহার রিসার্চ সোসাইটি, পাটনা থেকে।

১৯৫০-এ বিহার সরকার কাশীপ্রসাদ জয়সওয়াল গবেষণা পরিষদের (শোধ সংস্থান) প্রতিষ্ঠা করেন। রাহুলের সংগৃহীত গ্রন্থের সামীক্ষিক সংস্করণের প্রকাশনা এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব বলে স্বীকৃত হয়। স্বয়ং রাহুল *প্রমাণবার্তিক ভাষ্যের* সম্পাদনা করেছিলেন যা এই প্রতিষ্ঠানের তিব্বতি সংস্কৃত গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থ। আজ পর্যন্ত এই গ্রন্থমালার ৩০টি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

তিব্বতে যে সব ভারতীয় পাণ্ডুলিপি মিলেছিল তাদের মধ্যে কোনো কোনো গ্রন্থের সমাপ্তি সূচক বাক্যে (পুষ্পিকা) বাংলার রাজা ধর্মপালের শাসনকালে (৭৬০-৮০০) গ্রন্থ রচিত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই হল এই সব গ্রন্থ রচনার আদি সীমা। আর

অন্তিম সীমা হল মহামহোপাধ্যায় বাচস্পতি মিশ্রকৃত এবং মিথিলাক্ষরে শ্রীমন্ডন শর্মা উপাধ্যায় দ্বারা লিখিত *শুদ্রাচার* নামক ধর্মশাস্ত্রীয় গ্রন্থ। এই গ্রন্থটি লক্ষ্মণ সেনের আমলে (১৫১৭ খ্রিঃ) রচিত। এর সম্পাদনা করেছেন জয়সওয়াল গবেষণা সংস্থার শ্রীনিবাস শর্মা।

ভগবান বুদ্ধ গ্রাম্য ভাষা ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও খ্রিস্টিয় প্রথম শতক থেকে বৌদ্ধরাও সংস্কৃত ব্যবহার করতে থাকেন। তাছাড়া একটি সঙ্কর সংস্কৃত ভাষাও ব্যবহার হতে থাকে যাকে 'বুদ্ধিষ্ট হাইব্রিড' সংস্কৃত নাম দেওয়া হয়। তিব্বতে এই ভাষার গ্রন্থও পাওয়া গেছে, যার মধ্যে আছে 'বুদ্ধিষ্ট হাইব্রিড ধর্মপদ' *অভিসমাচারিকা* এবং *ভিক্ষুনী বিনয় মুখ্য*। কিন্তু অধিকাংশ গ্রন্থ সংস্কৃতেই পাওয়া গেছে।

তিব্বতে যে সব গ্রন্থ রাহুল খুঁজে পেয়েছিলেন তা মুখ্যত লিখিত হয়েছিল মিথিলাক্ষর, মাগধি, শারদা, কুটিলা, নেওয়ারি, রঞ্জনা ও নাগরী লিপিতে। তামিল লিপিতে লেখা *মণিপ্রবালম* নামে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের একটি গ্রন্থও তিনি পেয়েছিলেন। সিংহলি লিপিতে লেখা একটি পাণ্ডুলিপিও তাঁর হাতে এসেছিল। এ থেকে জানা যায় যে মধ্য ভারত ও কাশ্মীরের পণ্ডিতদেরও তিব্বতে যাতায়াত ছিল। তাছাড়া দক্ষিণ ভারত ও সিংহলের সঙ্গেও তিব্বতের সংযোগ ছিল, তাও বোঝা যায়।

তিব্বত থেকে রাহুল যে সব পাণ্ডুলিপির ফোটোগ্রাফ ভারতে নিয়ে এসেছিলেন, তাদের সংখ্যা বেশি নয়। কিন্তু তাদের গুরুত্ব খুব বেশি। এইসব পাণ্ডুলিপি সমগ্র ভারত ও বিশেষ করে বিহারের মধ্যকালীন ইতিহাসের অন্ধকারময় যুগের ওপর আলোকপাত করে। ভারতের দার্শনিক ইতিহাসের বিকাশের বিলুপ্ত ধারাবাহিকতার শৃঙ্খলের বিলুপ্ত কড়া এই সব গ্রন্থ—যা ভারতীয় দার্শনিক ইতিহাসের পরম্পরাকে পুনরুদ্ধার করে। এইসব বহুমূল্য গ্রন্থের পুনরুদ্ধারে রাহুলের অসামান্য কীর্তির সঙ্গে তুলনা করা চলে একমাত্র হিউয়েন সাঙের। হিউয়েন সাঙ ভারতীয় জ্ঞানকে চীনে নিয়ে গিয়েছিলেন। ভারতে লুপ্ত হয়ে যাওয়া ভারতীয় জ্ঞানকে রাহুল আবার ভারতে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। *মেরী জীবনযাত্রা*-য় রাহুল বলেছেন যে, তিনি হিউয়েন সাঙের মডেলে নিজেকে তৈরি করেছিলেন। সেই প্রস্তুতি তাঁকে বিশ শতকের হিউয়েন সাঙে পরিণত করেছিল। তিনি ভারতকে অমূল্য, দুর্লভ বস্তু প্রদান করেছিলেন। রাহুল যা এনে দিয়েছেন তার জন্য বিশ্বের সব ভারত-বিদ্যাবিদেরা তাঁর কাছে চিরঋণী থাকবেন।

তিনি যে সব গ্রন্থ এনেছিলেন, তার মধ্যে মুখ্য গ্রন্থসমূহের অন্যতম ছিল *যোগাচার ভূমি শাস্ত্র*। এই বিশাল গ্রন্থে আট হাজারের মতো শ্লোক আছে। একে বৌদ্ধ ধর্ম এবং দর্শনের বিশ্বকোষ বলা বিশেষ যুক্তিযুক্ত হবে। এই গ্রন্থের মাহাত্ম্য এ থেকেই স্পষ্ট হবে যে এই গ্রন্থের নামেই যোগাচার সম্প্রদায়ের নামকরণ হয়েছিল। এই গ্রন্থ আচার্য অসঙ্গের কীর্তি। হিউয়েন-সাঙ ছয় বছর নালন্দায় থেকে যোগাচার দর্শনের অধ্যয়ন করেছিলেন। *যোগাচার ভূমি শাস্ত্র*-র একটি কপি হিউয়েন-সাঙে চীনে নিয়ে গিয়েছিলেন। চীনে গিয়ে তিনি এই গ্রন্থটি চীনা ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। এর তিব্বতি অনুবাদও পাওয়া যায়।

সাম্যা মঠে রাহুল-এর একটি সম্পূর্ণ কপি পেয়েছিলেন। তিনি এই বইয়ের ফোটো নিয়েছিলেন। তিনি এই বইয়ের মাহাত্ম্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। তাই এই বইয়ের নকলও করেছিলেন। তিনি যে ফোটো ও তিব্বতি অনুবাদ এনেছিলেন তার সহায়তায় মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর ভট্টাচার্য এই গ্রন্থের সতেরোটি ভূমির মধ্যে পাঁচটি সম্পাদনা করে প্রকাশিত করেন। এর আরো দুটি ভূমির সম্পাদনা করেন ডঃ নলিনাক্ষ দত্ত ও ডঃ করুণেশ শুক্ল। শেষ দশ ভূমির সম্পাদনাও হয়ে গেছে। তাছাড়া *অভিধর্ম সমুচ্চয়* মূল সংস্কৃতে পাওয়া গেছে। *অভিসময়ালংকারকারিকা* ও *মধ্যান্তবিভাগকারিকা*-ও মূল সংস্কৃতে পাওয়া গেছে।

অসঙ্গের পরই তার ভাই বসুবন্ধুর খ্যাতি। তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত আচার্যদের অন্যতম। *অভিধর্মকোষকারিকা* এবং তার ভাষ্য তাঁর প্রধান গ্রন্থসমূহের মধ্যে একটি। এতে বৈভাসিক সিদ্ধান্তের প্রতিপাদন করা হয়েছে। এঁর বই *মধ্যান্তবিভাগ* শাস্ত্র। মূল সংস্কৃতে এই গ্রন্থ এখনো পাওয়া যায়নি। এই বইয়ের প্রকাশনাও জয়সওয়াল গবেষণা সংস্থা থেকে হয়েছে।

বসুবন্ধুর পরেই আচার্য দিঙনাগের কথা বলা চলে। দিঙনাগকে বৌদ্ধ ন্যায়ের জনক বলা হয়। রাহুল এঁর মূল সংস্কৃত গ্রন্থ *প্রমাণসমুচ্চয়*-কে তিব্বত থেকে নিয়ে আসার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন। দিঙনাগের অন্য গ্রন্থ *প্রজ্ঞাপারমিতা পিন্ডার্থ* তিব্বতে রাহুলের চোখে পড়েছিল। কিন্তু তিনি এর ফোটো নিতে পারেননি

দিঙনাগের পরে বৌদ্ধ দার্শনিকদের মধ্যে ধর্মকীর্তির নাম বিশেষ ভাবে করা যেতে পারে। তিব্বতি পণ্ডিতেরা ধর্মকীর্তিকে জম্বুদ্বীপের ছয় জন রত্নের অন্যতম বলে মনে করেন। তাঁর *ন্যায়বিন্দু* ও তার উপর ধর্মোত্তরেব টীকা ভারতে প্রকাশিত হয়। ধর্মোত্তরের এই টীকার ওপর দুর্বেকামিশ্রের অনুটীকা *ধর্মোত্তর প্রদীপ* মূল সংস্কৃতে পাওয়া গিয়েছিল। জয়সওয়াল শোধ সংস্থান তা প্রকাশ করেছে। *হেতুবিন্দু*-র ওপর অর্চটের টীকার ওপর দুর্বেকা মিশ্রের এক অনুটীকা তিব্বতে পাওয়া গেছে। ধর্মকীর্তির প্রধান গ্রন্থ *প্রমাণবার্তিক* আর মূল সংস্কৃতে পাওয়া যাচ্ছিল না। এই বইয়ের সংস্কৃত কপি রাহুল তিব্বতে পেয়েছিলেন। তাছাড়া এই গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে স্বার্থানুমানের ওপর ধর্মকীর্তির স্ববৃত্তি ও তার ওপর কর্ণকগোমিনের টীকাও তিনি পেয়েছিলেন। অন্য তিন পরিচ্ছেদের ওপর প্রজ্ঞাকর গুপ্তের টীকাও তাঁর হাতে এসেছিল। সম্পূর্ণ *প্রমাণবার্তিক*-এর ওপর মনোরথ নন্দীর টীকাও তিনি পেয়েছিলেন। ধর্মকীর্তির *বাদন্যায়* শান্তরক্ষিতের বিপঞ্চিতার্থ টীকা সহ রাহুল খুঁজে পেয়েছিলেন।

ধর্মকীর্তির পর শংকর নন্দনের নাম করা যেতে পারে। মূল সংস্কৃতে তাঁর দশটি নিবন্ধ পাওয়া গেছে। কিন্তু এই নিবন্ধ কয়টির তিব্বতি ভাষায় অনুবাদ হয়নি। এর মধ্যে বৌদ্ধ ন্যায়ের অত্যন্ত উপযোগী নিবন্ধ পাওয়া গেছে, যার মধ্যে 'সিদ্ধিকারিকা', 'প্রতিবন্ধ সিদ্ধিকারিকা', 'আপোদ সিদ্ধি', 'বৃহৎ প্রামাণ্য', 'মধ্যপ্রামান্য', 'লঘু প্রামাণ্য' ও 'প্রজ্ঞালংকার' মুখ্য।

শংকরানন্দের পর বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য জিতারিপাদের নাম করা চলে। এঁর তিনটি রচনা 'হেতুতত্ত্বোপদেশ', 'ধর্মাধর্মবিনিশ্চয়' 'বালাবতার তর্ক'-র তিব্বতি অনুবাদ পাওয়া গিয়েছিল। তাছাড়া রাহুল তিব্বতে এঁর আরো দশটি মূল নিবন্ধ পেয়েছিলেন। এই সব নিবন্ধের তিব্বতি অনুবাদ পাওয়া যায়নি। তাঁর মধ্যে 'নৈরাত্ম্যসিদ্ধি', 'বেদপ্রামাণ্যসিদ্ধি', 'সর্বজ্ঞসিদ্ধি', 'সহোপলম্ভ' ও 'নৈয়ায়িক মতপরীক্ষা' প্রধান।

আচার্য জিতারির পর বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য রত্নাকরশান্তির নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর 'অষ্টসাহস্রিকা' 'প্রজ্ঞাপারমিতা', 'সারতমাপঞ্জিকা', 'হেবজ্রসাধনোপায়িকা', 'নৈরাত্মসাধন' ও 'ছন্দোরত্নাকর স্ববৃত্তি' মূল সংস্কৃতে পাওয়া গেছে।

বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য জ্ঞানশ্রী মিত্র এবং রত্নকীর্তির কৃতিও এখানে উল্লেখযোগ্য। জ্ঞানশ্রী মিত্রের বারোটি ও রত্নকীর্তির দশটি নিবন্ধ *জ্ঞানশ্রী মিত্র নিবন্ধাবলী* ও *রত্নকীর্তি নিবন্ধাবলী* নামে কাশীপ্রসাদ জয়সওয়াল শোধ সংস্থান থেকে প্রকাশিত হয়েছে। মূল সংস্কৃতে এই দুটি গ্রন্থ আর ভারতে পাওয়া যায় না।

বৈভাষিক সম্প্রদায়ের কোনো অজ্ঞাত লেখকের *অভিধর্ম দীপ* বিভাষাপ্রভার সঙ্গে পাওয়া গেছে। এটি খণ্ডিত গ্রন্থ। এতে সর্বাস্তিবাদী বিভজ্যবাদী, শূন্যবাদী, পৌদগলিক সম্প্রদায়ের মতেব চর্চা আছে। এতে ধর্মশ্রাত, বসুমিত্র, ঘোষক প্রভৃতির মত উদ্ধৃত করা হয়েছে। এই বইও জয়সওয়াল শোধ সংস্থান থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

তর্ক রহস্য নামে একটি খণ্ডিত গ্রন্থ পাওয়া গেছে। এই বইয়ের সম্পাদনা করেছেন আচার্য পবমানন্দ শাস্ত্রী।

দোহাকোষেরও আর একটি গ্রন্থ পাওয়া গিয়েছিল যার সম্পাদনা করেছেন রাহুল স্বয়ং।

আরো কিছু গ্রন্থ পাওয়া গেছে যাতে সঙ্ঘের আচার-অনুষ্ঠানের কথা আছে। এই সব গ্রন্থের মধ্যে আছে *প্রাতিমোঃ সূত্র, অভিসমাচারিকা, আর্যমহাসাংঘিক লোকোত্তরবাদী বর্গ-র* সঙ্গে যার মুখ্য কেন্দ্র ছিল বৈশালী ও তার আশেপাশে। এই গ্রন্থেও ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের আচারের আলোচনা আছে। সমাজশাস্ত্র ও ভাষাবিজ্ঞানের ছাত্রদের প্রয়োজনীয় তথ্য এই গ্রন্থে ভর্তি। যুগপৎ এতে অপ্রত্যাশিতভাবে মনোবিজ্ঞানের জ্ঞানও লাভ করা যায়।

উপরে উল্লিখিত তিনটি গ্রন্থ জয়সওয়াল শোধ সংস্থান থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া মূল *সর্বাস্তিবাদী বিনয়গ্রন্থ, উপসম্পদাজ্ঞপ্তি, বিনয়সূত্রবৃত্তি*-ও এই সংস্থান প্রকাশ করেছে।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য চন্দ্রকীর্তিকৃত *গুহ্যসমাজপ্রদীপোদ্যোতন টীকা ষটকোটিব্যাখ্যা* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থ অনুসারে তন্ত্রে যে অশ্লীল শব্দের প্রয়োগ ও অনুচিত কার্য যথা সুরা, সুন্দরী, মাতৃগমনের উল্লেখ মেলে বাস্তবে তার সেই অর্থ নয়। তার অর্থ আলাদা। এর ছয় প্রকার ব্যাখ্যার বিধান দেওয়া হয়েছে। যথা (১) সন্ধ্যা ভাষা, (২) নাসন্ধ্যা, (৩) কেদার্থ (৪) নীতার্থ (৫) তথারুত ও (৬) নারুত।

এই গ্রন্থে এইসব পারিভাষিক শব্দের বিস্তারপূর্বক ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

তাছাড়া অমরকোষের *কামধেনু টীকা*, *কালচক্রের বিমলপ্রভা টীকা*, চন্দ্রগোমীকৃত *চন্দ্রগোমী টীকা*, *শিশুপালবধম্‌*-এর *তত্ত্বকৌমুদী টীকা*, *হেজকসাধন*, *হেবজ্রডাকিনী-জাল সম্বর টীকা* ইত্যাদি অনেক গ্রন্থ রাহুল ভারতে এনেছিলেন।

নবম অধ্যায়

ইউরোপে

সত্যাগ্রহের জন্য ভারতে (১৯৩১)

প্রথম তিব্বত অভিযানের (১৯৩০) পর বৌদ্ধ ভিক্ষু রাহুল সাংকৃত্যায়ন তখন শ্রীলঙ্কায়। এ সময়ে ভারতে গান্ধিজির লবণ সত্যাগ্রহ চলছিল। মহাত্মা গান্ধির কাগজ *ইয়ং ইণ্ডিয়া*-র অনেক টাইপ করা কপি শ্রীলঙ্কাতেও আসত। এসময়ে আন্দোলন থেকে আলাদা থাকা রাহুলের অসহ্য লাগছিল। কৌশল্যায়নেরও এই একই অবস্থা ছিল। কিন্তু তখনও তিব্বত থেকে আনা গ্রন্থ, চিত্রপট ইত্যাদি কলকাতা থেকে কলম্বোর রাস্তায়। এইসব গ্রন্থ ও চিত্রপট সুরক্ষিত রাখাও অত্যন্ত জরুরি ছিল। একমাত্র তিব্বত থেকে আনা বই, চিত্রপট ও অন্যান্য সামগ্রী বিদ্যালংকার পরিবেনে পৌঁছোনোর পরই রাহুলের পক্ষে ভারত যাওয়া সম্ভব ছিল।

সমুদ্রপথে এই সব বই, চিত্রপট ইত্যাদি বিদ্যালংকার পরিবেনে আসার পর রাহুল নায়কপাদের কাছে ভারতে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। স্নেহপরায়ণ নায়কপাদ রাহুলকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে রাজনীতি তাঁর জন্য নয়। ইতিমধ্যে *বুদ্ধচর্যা* সমাপ্ত হয়েছিল (৭ অক্টোবর থেকে ১৪ ডিসেম্বর)। রাহুল আবার নায়কপাদকে বোঝাতে লাগলেন যে বৌদ্ধ ভিক্ষুকে নিজে আচরণ করে দেখাতে হবে যে, অপরের জন্যে সে কতটা কষ্ট সহ্য করতে পারে। শেষপর্যন্ত নায়কপাদ অনুমতি দিলেন। ১৪ ডিসেম্বর (১৯৩০) রাহুল ভারতে যাত্রা করলেন।

এ সময়ে রামউদারের টীকা সহ কাশী বিদ্যাপীঠ থেকে *অভিধর্মকোষ* ছাপা হচ্ছিল। প্রুফ দেখার ঝামেলা ছিল বলে তাঁর রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্র ছাপরায় না গিয়ে তিনি কাশী চলে যান। কিন্তু এমন ঢিলেঢালাভাবে বইটির প্রকাশনার কাজ চলছিল যে তিনি কাশী থেকে ২৫ জানুয়ারি ছাপরায় চলে আসেন।

এ সময়ে সরকারের দমননীতি অত্যন্ত কঠিন ভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছিল। জেলখানায় এত সত্যাগ্রহীতে ভরে গিয়েছিল যে সেখানে নতুন সত্যাগ্রহীর জায়গা ছিল না। তাই সত্যাগ্রহীদের জেলে না পাঠিয়ে জরিমানা ও মারপিটের ব্যবস্থা করেছিল সরকার। রাহুল এক্‌মা (তাঁর কর্মক্ষেত্র) গিয়ে দেখলেন যে সেখানকার অনেক কর্মকর্তা জেলে চলে গেছেন। সরকার বাজেয়াপ্ত করে দেবে এই ভয়ে আশ্রমের জন্য কোনো ঘর মিলছিল না। স্বেচ্ছাসেবকেরা স্টেশনের পশ্চিমে রেল সড়কের দক্ষিণে এক কুয়ার পাশে অড়হর আর আখে ঢাকা একটা জায়গায় আশ্রম বানিয়েছিল। একটা ঝাণ্ডা পুলিশ ছিনিয়ে নেবার পর আরেকটা পুঁতে দেওয়া হত। দেশি পুলিশ রাখা হত না। রাখা হত গোর্খা পুলিশ।

কেননা সরকারের ভয় ছিল, যে কোনো সময়ে দেশি পুলিশ আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে যেতে পারে।

ইতিমধ্যে বিহারের রাজনৈতিক কর্মীরা গান্ধিবাদ সম্পর্কে হতাশ হয়ে গিয়েছিল। তারা সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে জনতাকে তৈরি করার প্রয়োজন অনুভব করছিল। গান্ধি-আরউইন সমঝোতার পর রাহুল বিহার সোসালিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা করেন (১৩ জুলাই ১৯৩১)। তিনি এই পার্টির কার্যানির্বাহী সমিতির সদস্য হয়েছিলেন।

রাহুল অনেকদিন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেননি। গান্ধি-আরউইন চুক্তি হয়ে গিয়েছিল। জেলের রাজনৈতিক কর্মীদের ছেড়ে দেওয়া হচ্ছিল। ১০ মার্চ ছাপরার রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল। রাহুল সঙ্গীদের নিয়ে জেলগেটে যান। অপেক্ষা করতে করতে প্রায় বারোটা বেজে গিয়েছিল। ভিক্ষু রাহুলের দুপুরের পর আহার নিষিদ্ধ ছিল। তাই জেলের কাছাকাছি জুমরাতী মিঞার বাড়িতেই তিনি আহার করেন। ছোঁয়াছুঁয়ি ব্যাপারটা তিনি অনেকদিন আগেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ছাপরায় মুসলমানের বাড়িতে নিঃসংকোচে খানা খাওয়া এই প্রথম। তাঁর অনেক সঙ্গী রাহুলকে ভয় দেখিয়েছিল যে, এতে জনতার মধ্যে তাঁর সম্পর্কে ঘৃণা জন্মাতে পারে। কিন্তু রাহুল তাঁদের বলতেন, 'আপনারা বলবেন যে রামউদার বাবা এখন রাহুল সাংকৃত্যায়ন। তিনি হিন্দু নন, বৌদ্ধ।' প্রথম থেকেই রাজনৈতিক বিপ্লবের সঙ্গে সামাজিক বিপ্লবও আবশ্যিক বলে রাহুল মনে করতেন। মুসাফির বিদ্যালয়ের সময় থেকেই ছোঁয়াছুঁয়ি ও জাতপাতের বিরুদ্ধে কঠিন সমালোচনা করতেন রাহুল। জুমরাতী মিঞার বাড়িতে রাহুল খেয়েছিলেন—খোলাখুলিভাবে তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করতেন। তাঁকে এইজন্যে কেউ তিরস্কার করেননি। যাদের জন্য তিনি কাজ করছিলেন, সার্বজনীন সেবার মাপকাঠিতেই তাঁরা বিচার করবেন বলে রাহুলের বিশ্বাস ছিল।

১৯৩১ ঃ কংগ্রেস হল করাচীতে (২৬-৩১ মার্চ)। রাহুল কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে ২৩ মার্চ করাচীতে যাত্রা করেন। রাস্তায় যখন তাঁর বন্ধুরা পুরি-তরকারির খোঁজ করতেন তখন রাহুল রুটি-মাংস খেতেন। ২৬ মার্চ তাঁরা করাচী পৌঁছোলেন। সেখানে কৌশল্যায়নের সঙ্গে দেখা হল। ভগৎ সিংহ ও তাঁর সঙ্গীদের ফাঁসির জন্য কংগ্রেসের প্রতিনিধি ও জনতার মধ্যে উত্তেজনা ছিল। তবে গান্ধি-আরউইন সমঝোতা থেকে অনেকের এই ধারণা হয়েছিল যে, ইংরেজ সরকারের হৃদয়ের পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু ইংরেজ সরকারের মতো সরকারের হৃদয় থাকে কোথায়?

এই কংগ্রেসে রাহুল যে নতুন একটি ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তা হল কাস্তে-হাতুড়ি-অলাদের সভা। তাঁদের কোনো কোনো নেতার সঙ্গেও দেখা হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে কোনো ঘনিষ্ঠতা হয়নি। সন্ত্রাসবাদীদের বীরত্ব ও তাঁদের আত্মবলিদানকে রাহুল প্রশংসা করতেন। কিন্তু তাঁদের দলেও তিনি যেতে পারেননি।

করাচীতে তিনি শ্রীলঙ্কার বৃদ্ধ স্থবির-জিনবংশকে দেখেছিলেন। আর দেখেছিলেন তুষারশুভ্র কেশ, গৌরবর্ণ ধর্মানন্দ কৌশাম্বীকে।

করাচী থেকে মোহেন-জো-দারোর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন দেখে রাহুল সক্খর হয়ে সিন্ধুনদের তীর থেকে কিছুটা দূরে উদাসী সাধুদের মঠ সাধুবেলায় যান। সেখান থেকে চলে যান হরপ্পায়। হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ দেখে তিনি লাহোর চলে যান। ১০ এপ্রিল লাহোর থেকে ছাপরা যান।

গান্ধি-আরউইন চুক্তির পর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের তীব্রতা কমে গেল। কংগ্রেসের গঠনমূলক কাজ চরকা-খদ্দর, অস্পৃশ্যতা নিবারণ; হিন্দু-মুসলিম ঐক্য, গান্ধি-আরউইন চুক্তি আক্ষরিকভাবে পালন এবং গান্ধিজির গোলটেবিলে যাওয়ার প্রস্তুতি—এইসব কাজে রাহুলের কোনো রুচি ছিল না।

রাহুল সারন জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস লেখায় লেগেছিলেন। যুগপৎ *অভিধর্মকোষে*-এর সঙ্গে *বুদ্ধচর্যা* মুদ্রণেরও কথা ছিল। কিন্তু *বুদ্ধচর্যা*-র প্রকাশক পাওয়া সহজ ছিল না। রাহুলের কাছে *বুদ্ধচর্যা*-র অত্যন্ত গুরুত্ব ছিল। বুদ্ধ ও বুদ্ধকালীন ভারতের মৌলিক উপাদানরূপেই রাহুল *বুদ্ধচর্যা*-কে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন।

এসময়ে সারনাথে নতুন বিহার নির্মিত হচ্ছিল। অনাগরিক ধর্মপালের সঙ্গে রাহুলের দেখা হয় সারনাথে। ১৯৩১-এর ১১ থেকে ১৩ নভেম্বর সারনাথে নতুন মূলগন্ধকুটী বিহারের উদ্‌ঘাটন মহোৎসব ছিল। উৎসবে শ্রীলঙ্কা থেকে অনেক ভিক্ষুও এসেছিলেন। শান্তিনিকেতন থেকে এসেছিলেন পণ্ডিত বিধুশেখর ভট্টাচার্য। নায়কপাদ এবং কৌশল্যায়ন এসেছিলেন। তাঁরা সারনাথ থেকে জেতবন যান। যিনি *ত্রিপিটক* গভীরভাবে পড়েছেন তিনি জানেন যে বুদ্ধের জীবনে জেতবনের কি মাহাত্ম্য। বুদ্ধ তাঁর প্রচারক জীবনের অর্ধেক বর্ষাবাস এখানেই কাটিয়েছিলেন। জেতবনের গন্ধকুটির ধ্বংসাবশেষের সামনে দাঁড়িয়ে সব ভিক্ষু ও গৃহস্থ নায়কপাদকে কিছু উপদেশ দিতে অনুরোধ করলেন। নায়কপাদ জেতবনের প্রশংসায় *সংযুক্ত নিকায়*-এর 'ইন্দ জেতবন' এই কথা বলতেই তাঁর কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে এল। চোখ দিয়ে অশ্রুধারা বইতে লাগল। কি বলবেন তিনি! তিনি মনশ্চক্ষে দেখছিলেন রাজকুমার জেতকে, দেখছিলেন অনাথপিণ্ডদকে মোহর দিয়ে জেতবন কিনে নিচ্ছেন, দেখছিলেন বুদ্ধকে সেখানে তাঁর শিষ্যসহ বর্ষাযাপন করতে, দেখছিলেন বুদ্ধের নির্বাণের বছর আনন্দকে, গন্ধকুঠিতে বিছানো আসন ও তাঁর ব্যবহৃত অন্যান্য সামগ্রীকে।

কসয়া থেকে তাঁরা ছাপরা ও পাটনা হয়ে নালন্দা ও রাজগৃহে যান। তারপর ২৪ নভেম্বর তাঁরা শ্রীলঙ্কা রওনা হয়ে যান।

তৃতীয়বার শ্রীলঙ্কায় এলেন রাহুল। এবার আনন্দ কৌশল্যায়নের সঙ্গে রাহুল ইউরোপ যাত্রা করেন। উদ্দেশ্য ইউরোপে বৌদ্ধধর্ম প্রচার। ২৩ জুলাই তাঁরা প্যারিস দেখে পরদিন চ্যানেল পেরিয়ে ইংলন্ডে এলেন।

পশ্চিম লন্ডনে ও ইউরোপে

যৌবন বয়সে অনাগরিক ধর্মপাল শ্রীলঙ্কায় বসে বসে বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারের স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু যৌবনেই তিনি ভারতে চলে আসেন এবং তাঁর সারা জীবন ভারতেই কাটে।

বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য তিনি মহাবোধি সভা স্থাপন করেন। কলম্বো, কলকাতা, সারনাথ ইত্যাদি জায়গায় মহাবোধি সভার শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। লন্ডনে রিজেন্ট পার্কের কাছে এক লাখেরও বেশি টাকা দিয়ে তিনি একটি চারতলা বাড়ি কিনেছিলেন, যা বিলেতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম প্রচারের দায়িত্ব ছিল আনন্দ কৌশল্যায়নের। রাহুল এসেছিলেন তাঁর সঙ্গী হিসেবে।

দোতলার একটি বড় ঘরে তাঁদের দুজনকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল। অনেক ঘর এই বাড়িতে। মাটির নীচে রান্নাঘর ও আরো কয়েকটি ঘর। একতলায় মন্দির, ভাষণের জন্য হলঘর, লাইব্রেরি ও অফিস ঘর। ভারতীয় ও সিংহলি ছাত্র কয়েকটি ঘরে। এখানকার ব্যবস্থা দেখে রাহুলের একটা কথা মনে হয়েছিল যে বৌদ্ধধর্মকে যদি ইংরেজদের ধর্ম করার ইচ্ছা করা হয়, তবে বৌদ্ধধর্মকে ইংলন্ডের পরিমণ্ডল মেনে নিতে হবে। অথচ এখানে যে সব ভিক্ষু ধর্মপ্রচারের জন্য এসেছিলেন, তাঁরা তাঁদের সঙ্গে শ্রীলঙ্কার পরিমণ্ডল নিয়ে এসেছিলেন। সুতরাং ইংলন্ডের লোকের সঙ্গে বৌদ্ধদের মেলামেশা করা খুব কঠিন হবে।

২৮ জুলাই ইংলন্ডের কিছু বিখ্যাত খবরের কাগজের রিপোর্টার তাঁদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। তাঁরা তাঁদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। ইংরেজি পত্রিকার রিপোর্টারের সঙ্গে এই প্রথম সাক্ষাৎকার হল রাহুলের। শ্রমিক পার্টির পত্রিকা *ডেইল হেরাল্ড* এই সময়ে সব চেয়ে বেশি বিক্রি হত। এই কাগজের রিপোর্টার তাঁদের কিছু প্রশ্ন করলেন। তাঁরা সোজা জবাব দিলেন যে তাঁরা ইংলন্ডের অধিবাসীদের কাছে বুদ্ধের শিক্ষা প্রচার করতে এসেছেন। *ডেইলি মেল*-এর সংবাদদাতা এসে রাহুলের তিব্বত যাত্রা সম্পর্কে দুয়েকটা কথা জিগ্যেস করলেন। কমিউনিস্ট পার্টির কাগজ *ডেইলি ওয়ার্কার* রাহুল আগাগোড়া পড়তেন। প্রত্যেক মাসে *ডেইলি ওয়ার্কারে*-এর কয়েক হাজার টাকা লোকসান হত। ইংলন্ডের গরিব লোকেরা চাঁদা দিয়ে তা পূর্ণ করত। কিন্তু তিন বছরের মধ্যে *ডেইলি ওয়ার্কার*-এর কয়েক লক্ষ গ্রাহক হয়ে যায়। তখনো রাহুল কমিউনিস্ট পার্টির মেম্বার হননি, কিন্তু তিনি লেনিন, স্তালিনের পার্টি ছাড়া অন্য কোনো পার্টির আদর্শ ও কার্যপ্রণালী পছন্দ করতেন না। *বাইসবী সদী* রচনা ও তার ছয় বছর আগে রুশ বিপ্লবের প্রতি অগাধ প্রেম ও সহানুভূতি এই নব দৃষ্টিভঙ্গি সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছিল।

৩০ জুলাই তাঁরা মোটরে লন্ডন শহর দেখলেন। রিজেন্ট পার্ক দেখলেন। এই বিশাল উদ্যানে দিনের বেলাও ঘাসের ওপর বহু লোককে শুয়ে থাকতে দেখলেন। এক বন্ধু তাঁকে জানালেন যে এদের কোনো ঘর-বাড়ি নেই। এদের কোনো কাজ নেই, খাওয়া-দাওয়ারও কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। রাত্রিতে পার্ক বন্ধ হয়ে যায়। তাই দিনের বেলায়ই এরা পার্কে ঘুমিয়ে নেয়। রাতটা কাটাতে হয় সড়কে ঘোরাঘুরি করে। রাহুলের মনে হল, দুনিয়ার এক চতুর্থাংশ ধন সম্পত্তি বিলেতে আসে, তা কোথায় যায় এবং কাদের কাছে যায়।

বাকিংহাম প্রাসাদ, হাইড পার্ক, কেনসিংটন মিউজিয়াম, পার্লামেন্ট ভবন, ওয়েষ্ট মিনিস্টার এ্যাবে, কাউন্টি কাউনসিল, সেন্ট জেমস প্রাসাদ প্রভৃতি স্থান তাঁরা ৩০ জুলাই

দেখেন। হাইড পার্কে অনেক জায়গায় বক্তৃতা হচ্ছিল, অনেক জায়গায় চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা ছিল।

মহাবোধি সভায় প্রত্যেক রবিবার অধিবেশন হত। কোনো কোনো সভায় রাহুলও বক্তৃতা দিয়েছিলেন। কিন্তু ভাষণ দেওয়ার কাজটা ছিল কৌশল্যায়নের। লন্ডনের দিনচর্যা এই রকম ছিল ঃ রাত বারোটার পর নিদ্রা, সকাল সাতটায় ঘুম থেকে ওঠা এবং আটটা পর্যন্ত শৌচ ও প্রাতঃরাশের ছুটি। সাড়ে নটা পর্যন্ত খবরের কাগজ পড়া, ১০টা পর্যন্ত ডায়েরি ও চিঠি লেখা, সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত পড়াশোনা; তারপর ভোজন, আবার পড়াশোনা ইত্যাদি।

লন্ডন মানেই ইংলন্ড। এখানে ধর্মপ্রচারের জন্য অনেক ধর্মের প্রচারকেরা কাজ করে যাচ্ছে। বৌদ্ধরাও ধর্মপ্রচারে কিছুটা তৎপর হয়েছিলেন। কিন্তু এই তৎপরতা বড় হালকা ছিল। তা এ থেকেই বোঝা যাবে যে চীন, জাপানের মতো বিশাল বৌদ্ধ দেশ নয়, শ্যাম দেশের মতো স্বাধীন দেশ এবং ব্রহ্মদেশও নয়; শুধু শ্রীলঙ্কা, ঠিক শ্রীলঙ্কাও নয়, বরং বলা চলে শ্রীলঙ্কার এক ব্যক্তি লন্ডনে বৌদ্ধধর্মের ঝাণ্ডা পুঁততে চেয়েছিলেন। এ থেকে বলা চলে যে, বৌদ্ধরা ধর্মপ্রচারের আন্তরিক চেষ্টা করেনি। খ্রিস্টধর্মের রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্টরা তো ইংলন্ডকে তাদের জায়গির বলে মনে করত। মুসলমানরাও লন্ডনে তাদের মসজিদ বানিয়েছিল। হিন্দুধর্ম এতকাল ছিল না; এখন হিন্দুধর্মও এখানে পৌঁছে গেছে। কিন্তু হয়তো হিন্দু শেঠ হিন্দু মন্দিরকে হিন্দুস্থান ও লন্ডনে যাতায়াতকারী শেঠদের ধর্মশালায় পরিণত করতে চেয়েছিলেন। শ্রী চম্পত রায় ব্যারিস্টারও কয়েক বছর হল এখানে জৈন ধর্ম প্রচারের চেষ্টা করেছিলেন। বুড়ো বয়সে তাঁর এই এক ধরনের কাশীবাস। চম্পত রায়কেই রাহুলের সবচেয়ে সাদাসিধা ধর্মপ্রচারক বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু যে দেশে মাংস সাধারণ আহার সেখানে নিরামিষ আহারের ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দেয় যে জৈনধর্ম, তার সাফল্যের সম্ভাবনা খুবই কম।

লন্ডনের আকাশ সর্বদাই মেঘে ঢাকা থাকে। তাই সূর্য উঠলে লন্ডনবাসী সবচেয়ে খুশি হয়ে ওঠে। লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম গোটা দুনিয়ার বৃহত্তম গ্রন্থাগারের অন্যতম। পড়াশোনা করার এখানে খুব ভালো ব্যবস্থা আছে। রাহুল লন্ডনে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে পড়াশোনা করতে যেতেন। তিনি প্যারিসে পাতাল রেলে চেপেছিলেন। কিন্তু লন্ডনে তাঁকে পাতাল রেল আরো বেশি ব্যবহার করতে হত। তাড়াতাড়ি নেমে যাওয়ার জন্য এখানে বৈদ্যুতিক সিঁড়ি। এই দ্রুত চলমান সিঁড়িকে স্থির ধরিত্রীর এক সন্ধিস্থান বলা যেতে পারে। সিঁড়ি ক্রমাগত উঠছে, নামছে। রাহুলের এই বৈদ্যুতিক সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করাটা ঝামেলার ব্যাপার বলে মনে হত। তাই এ নিয়ে রাহুল বেশ কিছু ভাবনাচিন্তা করেছিলেন, তাঁর মনে হত যে গোটা দুনিয়াটাই এই ধরনের এক চলমান সিঁড়ি। মানুষের এক পা জোর করে এগোচ্ছে, কিন্তু দ্বিতীয় পা স্থির মাটিতে আবদ্ধ। তাই অগ্রগতি হয় না। ভারত এই ব্যাধিগ্রস্ত। ভারতের মানুষের এক পা বাড়ানো ভবিষ্যতের দিকে। কিন্তু অন্য পা তার পুরোনো ধর্মীয় ও সামাজিক সব বিষয় আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইছে।

হিন্দুস্থানের মানুষ বিজ্ঞান পড়ছে, ভূগোল পড়ছে, জ্যোতিষ পড়ছে আবার গ্রহণ হলে স্নানও করছে; পুরোনো ভ্রান্ত জ্যোতিষের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎবাণীর ওপর পুরোপুরি বিশ্বাস করছে। এরা টিকি, পৈতে, ধুতি, ছোঁয়াছুঁয়ি সব নিয়ে এই বৈদ্যুতিক সিঁড়ি দিয়ে ভবসাগর পার হতে চাইছে।

লন্ডনেই রাহুল খবর পেলেন যে তিনি তিব্বত থেকে যে চিত্রপট নিয়ে এসেছেন পাটনা মিউজিয়ামের প্রেসিডেন্ট ডঃ জয়সওয়াল টমাস কুককে সেইসব চিত্রপটের দায়িত্ব নিতে বলেছেন। প্রায় দেড়শোর মতো চিত্রপট ছিল, যা রাহুল পাটনা মিউজিয়ামকে দান করেছিলেন। তার মূল্য এক লক্ষ টাকার কম ছিল না।

রাহুল যখন লন্ডনে ছিলেন তখন বিশ্বব্যাপী মন্দার তৃতীয় বছর চলছিল। ত্রিশ লাখের ওপর মানুষ বেকার হয়ে গিয়েছিল। বিলাতের বেকারি ভারতের বেকারির থেকে অধিকতর কষ্টকর। লন্ডনে কোনো পায়খানা ব্যবহার করতে হলেও এক পেনি ফেলতে হবে, তবে পায়খানার দরজা খুলবে। এক পেয়ালা চা ও এক টুকরো রুটির জন্য বারো আনা দরকার। সব জিনিসের দাম আগুন। চাদর ধুতে হলে ১ শিলিং (দশ আনার বেশি) রুমাল ধুতে হলে তিন পেনি (তিন আনার বেশি)। সব জিনিসের এত দাম ছিল যে আতিথেয়তা সহজ ব্যাপার ছিল না। এই অবস্থার কারণ পুঁজিবাদ, যা ইংলন্ডের ৯০ শতাংশ মানুষের জীবনকে অনিশ্চিত করে দিয়েছিল। তাই ট্রামে চলার সময় মা ও মেয়ে নিজেদের আলাদা আলাদা টিকিট কাটত। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

২৭ জুলাই থেকে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত সাড়ে তিন মাস তাঁরা লন্ডনে কাটিয়েছিলেন। ৩ সেপ্টেম্বর লন্ডন থেকে তাঁরা উইম্‌বল্‌ডন দেখতে যান।

২৭ সেপ্টেম্বর গান্ধিজির উপবাস ভঙ্গের খবর শুনে সব ভারতীয় খুশি হয়েছিলেন। ম্যাকডোনাল্ডের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করার জন্য গান্ধিজিকে উপবাস করতে হয়েছিল। অস্পৃশ্যদের উপর হিন্দুরা হাজার বছর ধরে জুলুম করে আসছে এবং তাদের মানুষ থেকে পশুতে পরিণত করেছে। কিন্তু গান্ধিজির পথে অস্পৃশ্যদের সমস্যার সমাধান হবে না—এ বিষয়ে রাহুল নিশ্চিত ছিলেন। তাই অস্পৃশ্যদের কোনো নেতা অন্য রাস্তায় যেতে চাইলে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। গান্ধিজি অনশন করেছিলেন এইজন্য যে, ইংরেজ শাসক পৃথক নির্বাচনের নীতি মুসলমানদের ছাড়া অস্পৃশ্যদের ক্ষেত্রেও মেনে নিয়েছিল। ইংরেজদের স্পষ্ট অভিপ্রায় এই ছিল যে, হিন্দুস্থানের শক্তি আরও ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাক। গান্ধিজির জন-জাগৃতির কাজের রাহুল প্রশংসা করতেন; কিন্তু তাঁর পুরোনো পন্থা রাহুলের পক্ষে সহনীয় ছিল না।

কেনসিংটন মিউজিয়ম দেখতে গিয়েছিলেন রাহুল। সেখানকার অধ্যক্ষ মিঃ কাম্বেলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। ৪ তারিখে রাহুল বিশেষ করে ভগবান বুদ্ধের দুই প্রধান শিষ্য সারিপুত্ত ও মৌদ্‌গল্যায়নের অস্থি দর্শন করতে গিয়েছিলেন। দু হাজার দুশো বছর আগে এই দুজনেব কিছু হাড় কৌটোয় রাখা হয়েছিল। এখন এই কৌটো ভারতে আনা হয়েছে। মিঃ কাম্বেল এই কৌটো রাহুলকে দেখালেন। এতে খ্রিস্ট-পূর্ব দ্বিতীয়

শতাব্দীর লিপিতে এই দুই মহাপুরুষের নাম অঙ্কিত ছিল। কৌটোর ভেতর হাড়ের ছোটো টুকরো দেখলেন রাহুল। বুদ্ধের সব চেয়ে বেশি মেধাবী এই দুই শিষ্যের শরীরের অবশেষ এই দুনিয়ায় এইটুকু থেকে গেছে।

অনাগরিক ধর্মপালের কয়েকটি পত্র রাহুলের কাছে এসেছিল। তাঁর বড় ইচ্ছা ছিল যে রাহুল ধর্মপালের কার্যভারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু রাহুল নিজের মধ্যে ধর্মের প্রতি ততটা শ্রদ্ধা দেখতে পাননি। হিন্দুস্থানে আসার পরেও অনাগরিক এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলেছিলেন। কিন্তু রাহুল নিজেকে বিদ্যা ও গবেষণার ক্ষেত্রেই আবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন। মহাবোধি সভার লোকদের ইচ্ছা ছিল যে লন্ডন থেকে রাহুল আমেরিকা যান। একটা সময় ছিল, যখন রাহুলের ধর্মপ্রচারের প্রতি তীব্র অনুরাগ ছিল। কিন্তু এখন অবস্থা একেবারে পালটে গেছে। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে রাহুলের সমন্বয়ের সূত্রও জীর্ণ হয়ে এসেছিল। তবে বুদ্ধের প্রতি রাহুলের শ্রদ্ধা কখনও কমেনি। তাঁর ধারণা ছিল, যখন দুনিয়ার সব ধর্মের চিহ্ন মুছে যাবে তখনও মানুষ সশ্রদ্ধভাবে বুদ্ধের নাম নেবে। বুদ্ধ-বচন পড়ার পরে রাহুলের মনে হয়েছিল যে, তিনিও সারা দুনিয়াকে সাম্যবাদী করার স্বপ্ন দেখতেন। ২৩ অক্টোবর তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে যান। আর ১০ নভেম্বর যান অকস্‌ফোর্ড-এ।

১৯৩০-৩১ পর্যন্ত রাহুল মার্কস-এর কয়েকটি গ্রন্থ পড়েছিলেন। তখনো তিনি মার্কসের বস্তুবাদকে পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেননি। কেননা এই শরীরের সঙ্গেই জীবন শেষ হয়ে যাবে, তা তখন পর্যন্ত রাহুল মানতে পারেননি। কিন্তু তিনি মার্কস-এর অন্যান্য বক্তব্যকে মানতেন। বারো বছর পরে ডঃ শ্রীনিবাসাচারী রাহুলকে এই সময়ের কথা মনে করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—আপনি ঐ সময় বলতেন যে, বুদ্ধ ও মার্কস এই দুইজন আজকের দুনিয়ার সব বেড়া পার করতে পারেন। রাহুল পড়েছিলেন যে, মার্কস-এর দেহাবসান হয়েছিল লন্ডনে এবং হাইগেটে তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছিল। তাঁর আশেপাশে যে সব লোক থাকত, এ বিষয়ে তারা একেবারেই কিছু জানত না। কিন্তু রাহুল খুঁজতে খুঁজতে তাঁর কবরখানায় পৌছে গিয়েছিলেন। কবরখানার বাইরে একটি স্ত্রীলোক ফুল বিক্রি করছিল। রাহুল তার কাছ থেকে ফুল কিনে চৌকিদারকে মার্কস-এর সমাধি সম্পর্কে জিগ্যেস করলেন। সে বলতে পারল না। রাহুল বিস্মিত হলেন। যাদের গোলামি দূর করার জন্য মার্কস এত কাজ করেছিলেন, তাদেরই একজন কবরখানার চৌকিদার হয়েও মার্কস-এর সমাধি কোথায় জানে না। এতে রাহুল বড় আশ্চর্য হলেন। রাহুল জানতেন, ১২ বছর পরে এখন আর সে অবস্থা নেই। কেননা আজ ১৯৪৪-এ মার্কস-এর সেনা লাল ফৌজের শৌর্যের খবর দৈনিক খবরের কাগজে বের হয়। হাইগেট কবরখানায় কয়েক হাজার কবর ছিল। নাম পড়ে কবর খুঁজে পাওয়া একদিনে সম্ভব ছিল না। এই সময়ে একজন লোক গেটের সামনে এলেন। তিনি বললেন, কোথায় যেতে চান বলুন, আমি বলে দিচ্ছি। মার্কসের কবর একেবারে সাধারণ। কবরের ওপর ঘাস জন্মেছিল। এই দুনিয়ার শ্রমজীবীদের ত্রাতা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত

পরিশ্রম করে ও দারিদ্র্য সহ্য করে তাঁর স্ত্রী জেনী ও নাতির সঙ্গে এখানে নীরবে ঘুমিয়ে আছেন। রাহুল ভক্তিভরে সমাধির উপর ফুল দিলেন। মার্কসের মাথার কাছে পাথরের ওপর তাঁর নাম খোদাই করা আছে। কেউ সেখানে ছোটো মতো লাল-ঝান্ডা রেখে দিয়ে গেছে। সেই দিনই রাহুল ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবে দেখতে গিয়েছিলেন। রাহুল মনে করতেন, সেখানে, যারা গরিবের রক্ত শুষে নিয়েছে তাদের সমাধি। ডজন খানেক রাজা-রানি ও তাঁদের দরবারের লোকদের সমাধি নির্মাণ করতে ও সাজাতে জলের মতো টাকা খরচ করা হয়েছে।

ফ্রান্সে

১৪ নভেম্বর রাহুল কৌশল্যায়ন ও অন্যান্য বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। ১১টার ট্রেন ধরার সময় আকাশ মেঘে ছেয়ে গিয়েছিল। ডোভার দুর্গের রাস্তা ধরেছিলেন। লন্ডন থেকে রেলপথে ডোভার এবং তারপর জাহাজে যেতে হবে। ক্যালেতে জাহাজ ছেড়ে আবার ট্রেন ধরে তিনি ছটা নাগাদ প্যারিসে পৌঁছোলেন।

২৩ নভেম্বর রাহুল আচার্য সিলভ্যাঁ লেভির বাড়ি গেলেন। তাঁর বয়স সত্তর-এর কাছাকাছি। গোটা পৃথিবীতে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। মাথার সব চুল সাদা। এই বয়সের অনেক আগেই ভারতীয় বিদ্বানরা নিজেদের বৃদ্ধ মনে করে কাজ ছেড়ে বসে থাকেন। কিন্তু এই বৃদ্ধ বয়সেও এই পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ দশ-বারো ঘণ্টা কাজ করতেন এবং এই কাজের জন্য পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় যেতে প্রস্তুত ছিলেন। রাহুল তাঁর সম্পাদিত *অভিধর্মকোষ* লেভিকে উপহার দিলেন। তাঁর ঘরের চারদিকে শুধু বই আর বই। এই বই-এর মধ্যে আধুনিক ইউরোপীয় ভাষার বই ছাড়াও চীনা, পালি, সংস্কৃত ও তিব্বতি পুস্তক দেখা যাচ্ছিল। তাঁর সঙ্গে চার ঘণ্টা কথা বলেছিলেন রাহুল। তিনি তিব্বতি রাজবংশাবলির কিছু সমস্যা সম্পর্কে রাহুলকে জিগ্যেস করলেন। মধ্য-এশিয়ায় প্রাপ্ত তিব্বতি হস্তলিখিত কাগজে এক অপরিচিত রাজকুমারের নাম পাওয়া গিয়েছিল। রাহুলের নোটবুকেও সেই নামটা পাওয়া গেল। এতে আচার্য খুব খুশি হলেন। হালে তিনি গিলগিট-এ প্রাপ্ত হস্তলিখিত এক লেখ্য-এর উল্লেখ করে রাহুলকে সেখানে গিয়ে লেখ্যে কি আছে জানতে বললেন। রাহুল গঙ্গার পুরাতত্ত্ব বিভাগের জন্য মহাযানের উৎপত্তি ও চৌরশীসিদ্ধ সম্পর্কে দুটো লেখা লিখেছিলেন যার ইংরাজি অনুবাদ তাঁর কাছে ছিল। লেভি রাহুলের লেখা খুব পছন্দ করলেন এবং *জুর্নাল আশিয়াতিক*-এ ছাপার জন্য নিয়ে নিলেন। পরে তা ছাপা হয়েছিল। রাহুল Bibliothcque Nationalও দেখেছিলেন। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের মতো এই গ্রন্থাগারটিও দুনিয়ার সব চেয়ে বড় গ্রন্থাগারসমূহের অন্যতম। এখানে পড়াশোনা করার ব্যবস্থা আরও ভালো। তিনি সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ও দেখতে গিয়েছিলেন।

জার্মানিতে

সোয়া তিনটে নাগাদ রাহুল প্যারিস থেকে জার্মানিতে রওনা হলেন। সেখানে প্রথম ফ্রাঙ্কফুর্টে গেলেন। সকালে ঠাকুর ইন্দ্র বাহাদুরজীর বাড়িতে প্রাতরাশ হল। দুপুরে এক রেস্তোরাঁয় খেতে গেলেন। প্রথমেই এল গো-মাংস। রাহুল তাতে হাত লাগালেন না। যে-সব ভারতীয় ছাত্ররা ইউরোপে আসে তারা গো-মাংস-টোমাংসের পরোয়া করে না। রাহুল যদি বেশি দিন থাকতেন তাহলে তিনিও পরোয়া করতেন না। বার্লিন থেকে তিনি মারবুর্গে ডঃ অটোর বাড়িতে যান। মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ডঃ অটোর বক্তৃতা শুনে তিনি তাঁর সংগ্রহশালা দেখলেন। সেখানে বৌদ্ধ, হিন্দু, ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলমান এই পাঁচ ধর্মের পূজার সামগ্রী, পূজার পাত্র, মূর্তি ও চিত্রপট সাজিয়ে রাখা ছিল।

ইতিমধ্যে ৪ ডিসেম্বর কৌশল্যায়নের পত্র এল। তিনি লিখেছিলেন যে, মহাবোধি সভা চাইছে যে তিনি লন্ডনে ফিরে আসুন এবং তারপর আমেরিকা যান। কিন্তু ইউরোপের পুঁজিবাদী জীবন রাহুলের ভালো লাগেনি। আমেরিকায়ও সব কিছু ইউরোপের মতোই। তাই আমেরিকায় গিয়ে মূল্যবান সময় নষ্ট করতে চাননি তিনি। কিন্তু ভ্রমণ তো রাহুল ছেলেবেলা থেকে ভালোবাসেন। তবে আমেরিকা যাত্রায় এত অনাসক্তি কেন? তার কারণ হল এই যে, এটা দুঃসাহসিক যাত্রা নয়, আরামের যাত্রা; রেল-মোটর-জাহাজে ভ্রমণ, অট্টালিকায় বাস করো। আমিরদের বিলাস দেখে ক্রোধ, গরিবদের দুঃখ দেখে মনস্তাপ। তাই রাহুল লিখে দিলেন—তিনি একবার দেশে ফিরবেন। অবশ্য তাঁর প্রচণ্ড ইচ্ছা ছিল রাশিয়া যাওয়ার। তা হল না। তাই দেশে ফেরাই ভালো। ফ্রাঙ্কফুর্টে থাকাকালীন দশ পাউন্ড এসে গেল। রাহুলের অর্থচিন্তা দূর হল।

সন্ধ্যা নাগাদ মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফ্রিক এলেন। তিনি ধর্মের অধ্যাপক। তিনি বললেন যে, দুনিয়ায় এমন বিপজ্জনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে যে সাবধান না হলে ধর্ম লুপ্ত হয়ে যাবে। সময়টা বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় নয়; সব ধর্মকে একসঙ্গে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে।

প্রতি মানুষের জীবনেই অনেক সহৃদয় নরনারী আসে। তাদের কাছ থেকে সে কত সাহায্য ও সহানুভূতি পায়। এই সব উপকারী মানুষের প্রত্যুপকার করা একজন মানুষের সাধ্যাতীত। রাহুল বুঝতে পারলেন না যে, মানুষকে কেন এতটা স্বার্থপর বলে চিত্রিত করা হয়। তিনি একথা স্বীকার করেন যে, স্বার্থান্ধ মানুষ আছে; কিন্তু সব মানুষই যদি স্বার্থান্ধ হত, তবে কোনো মানুষের জীবনযাত্রায় বিন্দুমাত্র মাধুর্য খুঁজে পাওয়া যেত না। রাহুল যখন তাঁর নিজের জীবনযাত্রার কথা ভাবেন, তখন অসংখ্য মানুষের স্নেহপূর্ণ চেহারা চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়। রাহুল তাঁদের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং তাঁদের ঋণ শোধ করা অসম্ভব মনে হয়। মানুষের মনে স্বার্থচিন্তা থাকে; কিন্তু স্বার্থপরতা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বলে রাহুল মেনে নিতে পারেননি। আজকের সামাজিক কাঠামো মানুষের স্বার্থপরতার ৯৯ শতাংশের জন্য দায়ী। এই কাঠামো পুরোপুরি সরিয়ে নিয়ে গেলে মানুষের দিব্য প্রকৃতি চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।

১২ ডিসেম্বর রাত পৌনে বারোটার গাড়িতে রাহুল বার্লিনের উপনগরী ফ্রোনো যাত্রা করেন। জার্মানির প্রসিদ্ধ বিদ্বান ও চিকিৎসক পল ডালকে এক ছোটো পাহাড়ে একটি বৌদ্ধ বিহার তৈরি করেছিলেন। মাটিতে ঢাকা এই পাহাড়ে দেবদারু গাছ ছিল। এই বিহারে আলাদা আলাদা বাসস্থান, বুদ্ধ মন্দির, সমাধি ভবন ইত্যাদি নির্মাণ করা হয়েছিল। ডালকে চেয়েছিলেন যে এই বিহারকে একটি ট্রাস্টের হাতে দিয়ে যাবেন। কিন্তু তা করার আগেই তাঁর দেহাবসান হয়েছিল। ডালকের পরিবার রাহুলকে স্বাগত জানালেন। সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ ৫০জন বুদ্ধ-ভক্তের একটি সভা হল। ডঃ ব্রুনো ও রাহুল এই সভায় ভাষণ দিয়েছিলেন। ১৪ ডিসেম্বর মধ্যাহ্নের আহারের পর তিনি ফ্রোনো স্টেশন থেকে বার্লিনে শার্লটেনবুর্গ গেলেন। বস্তুত তিনি বার্লিন গিয়েছিলেন সোভিয়েত রাশিয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করতে। সরোজিনী নাইডুর ছেলে বাবা নাইডু, ভগ্নিপতি নামবিয়ার এবং আরও অনেক ভারতীয় কমিউনিস্ট বার্লিনে থাকেন, তা রাহুল শুনেছিলেন। এঁদের প্রধান লোক ছিলেন নামবিয়ার। রাহুল তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্যই গিয়েছিলেন। তিনি বাড়ি ছিলেন না। টেলিফোনে কথা বলার পর তিনি রাহুলকে এক রেস্তোরাঁয় দেখা করতে বললেন। রাহুল সেখানেই চলে গেলেন। পঁচিশজন লোক সেখানে খাচ্ছিলেন। যদিও রাহুল গিয়ে এক কোণে বসলেন, তবু তাঁর পোশাক সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। আড়াই ঘণ্টা পর নামবিয়ার খবর পাঠালেন যে সেদিন তাঁর দেখা করার সময় হবে না। রাহুল জানতেন যে, ভারতীয় কমিউনিস্টদের পেছনে বিদেশেও ব্রিটিশ সরকারের গুপ্তচর লেগে থাকত। তাঁর হয়তো এই সন্দেহ হয়েছিল যে, রাহুল নামে এই নতুন মানুষটি ব্রিটিশেরই গুপ্তচর। অন্যদিকে তাঁর একথাও ভাবা উচিত ছিল যে, এই মানুষটি বিশ্বস্তও হতে পারে। এমনকি কমিউনিস্টও হতে পারে। তাছাড়া রাহুলের সঙ্গে দেখা করার জন্য তিনি সময় দিয়েছিলেন। তাঁকে অজ্ঞাতকুলশীল লোকের মতো, চিড়িয়াখানার জানোয়ারের মতো একগাদা লোকের ভিড়ের মধ্যে আড়াই ঘণ্টা বসিয়ে রেখেছিলেন তিনি। তারপর দু মিনিটের জন্য তাঁর সঙ্গে দেখা করার সময় হল না নামবিয়ারের? একে কি ভদ্রোচিত ব্যবহার বলা চলে! রাহুল নামবিয়ারের পরোয়া করতেন না। কিন্তু তিনি সোভিয়েত রাশিয়ায় যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি নামবিয়ারের সঙ্গে দেখা না করেই ফিরে আসেন। কেননা সোভিয়েত যাওয়া তখন সম্ভব ছিল না।

লন্ডনে এক সিংহলি যুবক এক জার্মান কমিউনিস্টের ঠিকানা দিয়েছিল। রাহুল তাঁকে একটা পোস্টকার্ড লিখে দিয়েছিলেন। দু-তিন দিন পরে তিনি দেখলেন যে গাট্টাগোট্টা একজন মানুষ, সাধারণ মজুরের মতো চামড়ার জ্যাকেট পরে দুহাতে দুটো পনেরো সেরের ব্যাগ ঝুলিয়ে তাঁর কাছে এসে হাজির হলেন। তিনি তাঁর পরিচয় দিলেন। তাঁর চেহারা ছবি দেখে তাঁকে মজুর বলে মনে না করার কোনো কারণ ছিল না। কিন্তু তিনি পি.এইচ. ডি. এবং তাঁর কথাবার্তাও অত্যন্ত মধুর। অনেকক্ষণ তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা হল। সোভিয়েতে যাত্রার জন্য এ সময়ে তিনি কোনো ব্যবস্থা করতে পারবেন না বলে দুঃখ প্রকাশ করলেন। কয়েকদিন পরে রাহুল জীমানের কারখানা দেখে যখন ফিরছিলেন,

তখন কেউ পেছন থেকে আওয়াজ করল। তাকিয়ে দেখলেন সেই বিশাল মূর্তি তাঁর কাছে আসছেন। তিনি হাত মেলালেন। রাহুলের মনে হল ইনিও কমিউনিস্ট, আর নামবিয়ারও কমিউনিস্ট।

বেশিরভাগ সময় রাহুল বুদ্ধভবনেই থাকতেন। জার্মানিতে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে বুদ্ধভক্তের সংখ্যা অনেক ছিল। সংস্কৃত ও পালি ভাষার বড় বড় বিদ্বান জার্মানিতে জন্ম নিয়েছেন। তাঁরা অসংখ্য গ্রন্থের সম্পাদনা ও অনুবাদ করেছেন। তাঁরা জানতেন যে, জগতে এমন এক ব্যক্তির জন্ম হয়েছিল যাঁর মধ্যে খ্রিস্টের চেয়ে বেশি ভালোবাসা, মাধুর্য ও সরলতা ছিল, যাঁর প্রতিভা আড়াই হাজার বছর পরেও সম্পূর্ণ সজীব রয়েছে। এই ধরনের ব্যক্তির প্রতি নিম্নমধ্যবিত্ত শিক্ষিত মানুষের আকর্ষণ স্বাভাবিক। অতএব ডালকের মতো আরো অনেক শিক্ষিত জার্মান ছিলেন যাঁরা বুদ্ধের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। শ্রীলঙ্কায় একটি দ্বীপকে জার্মান ভিক্ষুরা এক বিহার রূপে গড়ে তুলেছিলেন এবং সেখানকার স্থবির জ্ঞানাতিলোক জার্মান ভাষায় কয়েকটি ভালো বই লিখেছিলেন; জার্মানির শহরসমূহের সর্বত্রই বুদ্ধ ভক্তেরা মিলিত হতেন।

একদিন (২২ ডিসেম্বর) রাহুল বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় ও সেখানকার মিউজিয়াম দেখতে গেলেন। জার্মানদের বিদ্যার প্রতি খুব প্রেম। বিজ্ঞানের সব শাখায় তাদের দানের সীমা নেই। প্রাচ্য ভাষা ও সংস্কৃতির অধ্যয়নেও তাঁরা অগ্রগণ্য।

২৪ ডিসেম্বর শ্রীলঙ্কায় খ্রিস্টমাস ইভ অর্থাৎ বড়দিনের আগের দিন। ডালকে পরিবার, রাহুল যেখানে থাকতেন সেখানেও দেবদারুর শাখা পুঁতেছিলেন। বৃক্ষ শাখাটি আলো দিয়ে সাজানো হয়েছিল। বন্ধুবান্ধব ও শিশুদের নানা উপহার দেওয়া হচ্ছিল। খ্রিস্টধর্ম প্রবর্তিত হওয়ার আগেও জার্মানিতে এই উৎসব পালন করা হত। এই দিনই কৌশল্যায়নের তার এল ঃ মার্সেই থেকে ফরাসি জাহাজে তাঁর ভারত যাত্রার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৩০ ডিসেম্বর রাহুল মার্সেই থেকে রওনা হলেন। ১৩ জানুয়ারি ভোর তিনটায় তিনি কলম্বো পৌঁছোলেন।

দশম অধ্যায়

পরিব্রাজন নিরন্তর

এবার রাহুলের কর্মক্ষেত্র ভারত। ৩০ জানুয়ারি সন্ধ্যার গাড়িতে রাহুল ভারত রওনা হয়ে গেলেন। রাহুল প্রণাম করে নায়ক মহাস্থবিরের কাছে বিদায় নিলেন। কোমলহৃদয় ধর্মানন্দ নায়ক মহাস্থবির রাহুলকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। রাহুল বিদায় নেওয়ার সময় তিনি কাঁদছিলেন। ভারতে পৌঁছে রাহুল দ্বিতীয়বার লাদাখ যাত্রা করেন। ১৯৩৪-এ দ্বিতীয়বার তিব্বত যান। তৃতীয়বার তিব্বত যাত্রা করেন ১৯৩৬-এ।

রাহুলের মতো মানুষের জীবনীকারের একটি বিশেষ অসুবিধা আছে। নিয়ত ভ্রাম্যমান রাহুল ক্রমাগতই এক দেশ থেকে অন্য দেশে চলে যাচ্ছেন, ঘটনার পর ঘটনা ঘটছে; তাঁর অতি-দ্রুতগতি লেখনী টেপরেকর্ডারের মতো সব ঘটনাকে ধরে রাখছে; কাগজের ওপর সব ঘটনা চলচ্চিত্রের ছবির মিছিলের মতো ফুটে উঠছে। সব ছবিই জীবন্ত, গ্রহণযোগ্য মনে হয়। অথচ সবই তুলমূল্য হতে পারে না। তুল্যমূল্য হতে পারত যদি রাহুল শুধু 'রমতারাম' হতেন; কিন্তু রাহুল তো তা নন। তিনি প্রথম শ্রেণির ঘুমক্কড়, যিনি পরিচিত স্থির জীবন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে যান, কবি, লেখক ও শিল্পী হিসেবে ফিরে আসবেন বলে। রাহুলের ঘুমক্কড়ী, টয়েনবি যাকে বলেছেন Withdrawal, তাই। এই Withdrawal-এর পর Returnও অনিবার্য। এভাবে দেখলে বলা চলে যে, রাহুল তিনবার নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন ও ফিরে এসেছেন। অথবা অন্যভাবে বলা চলে যে, চারটি বিশিষ্ট আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে রাহুল আজীবন ঘুরে বেড়িয়েছেন : (১) সংস্কৃত ও বেদান্তের জ্ঞান আহরণ ; (২) হারানো বৌদ্ধ জগতের পুনরুদ্ধার ; (৩) সাম্যবাদ এবং (৪) স্বাধীন ভারতে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সংস্কৃত-নিষ্ঠ হিন্দি ও রাষ্ট্রলিপি হিসেবে নাগরীর স্বীকৃতির সংগ্রাম, হিন্দি সাহিত্যের সেবা এবং পারিভাষিক শব্দ নির্মাণের জন্য পুরোপুরি আত্মনিয়োগ। রাহুলের জীবনের নিয়ন্ত্রণহীন ঘটনাপুঞ্জকে এই কটি প্রধান সূত্রে গ্রথিত করলে রাহুলের জীবন ও কৃতির স্পষ্ট ছবি ভেসে ওঠা সম্ভব। তাতে অনেক অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রাসঙ্গিক তথ্য বাদ পড়বে এবং ছবির ফ্রেমের মধ্যে সেই সব ঘটনার সমাহার ঘটবে যা মানুষ হিসেবে রাহুলের জীবনকে পাঠকের সামনে তুলে ধরবে।

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, কেদারনাথ পাণ্ডে যদি বৈরাগী ও আর্যসমাজী রামউদার দাস না হতেন তবে কপর্দকহীন কেদারনাথ ভারত পরিক্রমা করতে পারতেন না। রামউদার দাস যদি বৌদ্ধ ভিক্ষু রাহুল সাংকৃত্যায়ন না হতেন তবে তাঁর পক্ষে এশিয়া ও ইউরোপ পরিক্রমা সম্ভব হত না এবং রাহুল সাংকৃত্যায়ন যদি তাঁর হলুদ-চীবর বর্জন না করতেন তবে তাঁর জীবনের চিত্রলেখটি সোভিয়েত দেশে পৌঁছোতে পারত না।

তাহলে যে অখণ্ড মানবিকতার মহিমার মণ্ডল রাহুলের জীবনকে আলোকিত করেছে তা হয়তো এতটা সুস্পষ্টভাবে ধরা দিত না।

এই কথা মনে রেখেই কালাসঙ্গতি সত্ত্বেও আমরা রাহুলের তিব্বতাভিযানকে পর পর গ্রথিত করেছি এবং তারপর ফিরে এসেছি তাঁর জীবনের কালানুক্রমিক বিবরণে। অর্থাৎ ১৯৩৮-এ চতুর্থবারের তিব্বত যাত্রা বিবৃত করে ফিরে এসেছি ১৯৩৫-এ যখন তিনি ব্রহ্মদেশ, মালয়, হংকং, সাংহাই হয়ে জাপান যান। তারপর জাপান থেকে কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া ও রেলপথে সাইবেরিয়া অতিক্রম করে মস্কো যান। মস্কো থেকে চলে যান বাকুতে। বাকু থেকে জাহাজে ইরান এবং ইরান থেকে তেহরান, ইস্পাহান, শিরাজ, মশহদ, বোলান উপত্যকা দিয়ে ভারতে ফিরে আসেন। যদিও এবারের যাত্রা পায়দলে হয়নি, তবু সাড়ে সাত মাসে এতগুলি দেশ পরিক্রমা করে অক্ষতভাবে ফিরে আসার জন্য যে প্রচণ্ড দৈহিক ও মানসিক শক্তির প্রয়োজন তা রাহুলের ছিল। প্রাণ ও মনের সজীবতা ছিল। আর ছিল এক জোড়া চোখ যা সব দেখত। কোনো কিছুই সেই চোখের দৃষ্টিকে এড়িয়ে যেতে পারত না।

কপর্দকহীন অবস্থায় নিরন্তর ভ্রমণের দুঃসহ শ্রম ও কষ্ট সহ্য করার মতো দেহ এবং নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধিযুক্ত একটি মন দিয়ে বিধাতা তাঁকে সৃষ্টি করেছিলেন। নয়তো জীবনব্যাপী ঘুমক্কড়ীর ও জ্ঞানান্বেষণের সাধনা সম্ভব হত না। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে প্রায় সমগ্র এশিয়া ও ইউরোপ পরিক্রমার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন ছিল, তা তিনি পেলেন কোথায়। প্রথমবারের ভারত পরিক্রমায় তাঁর বিশেষ অর্থের প্রয়োজন হয়নি। কেননা তিনি পদব্রজে ভারতের তীর্থ পরিক্রমা করেছেন। ট্রেনে চেপেছেন বিনা টিকিটে। আর অল্প-স্বল্প যে টাকার প্রয়োজন হত তা মিটিয়েছেন পরসা মঠের মোহান্ত। পরে যখন ট্রেনে আবার ভারত-পরিক্রমা করেছেন, তখন টাকা এসেছে বিভিন্ন সাহিত্য সম্মেলনের কাছ থেকে। কিন্তু ১৯২৭ থেকে ১৯৪৭-এর মধ্যে তিনি প্রায় সমগ্র এশিয়া ও ইউরোপ ঘুরেছেন। এই সময়ের মধ্যে যখন তিনি জেলে ছিলেন সেই সময়টা বাদ দিলে কখনোই তিনি থামেননি। নিরন্তর ভ্রাম্যমান জীবনের জন্য অর্থ তিনি কোথায় পেয়েছেন তার উত্তর রাহুল নিজেই দিয়েছেন। প্রথমবার তিব্বত যাত্রার সময় তিন হাজার টাকা দিয়েছিল শ্রীলঙ্কার বিদ্যালংকার পরিবেন। রাহুলের যাত্রার জন্য এক হাজার টাকা এবং বাকি দু হাজার টাকা বই কেনার জন্য। মহাবোধি সংস্থার মতো ধনী প্রতিষ্ঠান তাঁকে ইউরোপ পাঠিয়েছিল বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য। এই সংস্থা তাঁকে আমেরিকাও পাঠাতে চেয়েছিল। কিন্তু রাহুল যাননি। এই ছিল রাহুলের একমাত্র যাত্রা যাতে টাকা পয়সার ব্যাপারে তিনি বেশ নিশ্চিন্তে ছিলেন। কোনো কোনো দেশে যাওয়ার টাকা রাহুল উপার্জন করেছেন কাগজে লিখে। তাঁর একটি লেখার জন্য সব চেয়ে বেশি টাকা দিয়েছিল একটি আমেরিকান কাগজ। এই টাকাটা তাঁর হাতে এসেছিল জাপানে। এই টাকা দিয়েই তিনি প্রথমবার ইরান ও রাশিয়া ঘুরে আসতে পেরেছিলেন। ডঃ জয়সওয়াল তাঁকে টাকা দিয়ে সহায়তা করেছেন। তিনি সর্বদাই টাকা দিয়ে সাহায্য করতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু রাহুল

প্রায় তাঁর পরিবারের একজন হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর আর্থিক অবস্থার কথা তিনি বেশ ভালোভাবেই জানতেন। তাই তাঁর ওপর নিজের বোঝা চাপিয়ে দিতে চাইতেন না রাহুল। তিনি তিব্বত থেকে যে সব মূর্তি ও চিত্রপট এনেছিলেন তা বিক্রি করে যথেষ্ট টাকা পেতে পারতেন। কিন্তু তিনি এই সব অমূল্য নিধি বেচে দিতে চাননি। কোনো মিউজিয়ামকে এই সব সামগ্রী দিয়ে দেওয়াই তিনি উচিত বলে মনে করতেন। তবু কিছু সামগ্রীর জন্য পাটনা মিউজিয়াম থেকে তিনি কিছু টাকা পেয়েছিলেন। কোনো কোনো বন্ধুও অনেক সময় তাঁকে টাকা দিয়ে সাহায্য করেছেন। 'কিন্তু এই সব বিদ্বান ও গুণগ্রাহী বন্ধুর ওপর লক্ষ্মীর বরদ হস্ত ছিল না। লক্ষ্মীর বরপুত্রদের সঙ্গে আমার চিরকাল তিক্ত সম্পর্ক ছিল। অনেকে মনে করতে পারেন যে টাকা পয়সার ব্যাপারে এতটা উদাসীন হয়ে আমি ভুল করেছিলাম। আমিও জানতাম যে হাতে অনেক টাকা থাকলে যেকোনো য়োরোপীয় গবেষকের চেয়ে আমি একশোগুণ বেশি কাজ করতে পারতাম।'

হয়তো তিনি ভুল করেননি। হয়তো বিধাতাপুরুষ মননের ও দৈহিক শক্তির সমাবেশ দেখবেন বলেই তাঁকে গড়েছিলেন। কারণ তিনি যদি লক্ষ্মীর বরপুত্রদের কাছে হাত বাড়িয়ে হাজার গুণ বেশি কাজ করে যেতেন তাহলে হয়তো এই অনন্য মানুষটিকে আমরা পেতাম না।

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, রাহুল বৌদ্ধ ভিক্ষু না হলে তাঁর পক্ষে সমগ্র এশিয়া পরিক্রমা সম্ভব হত না। ব্রহ্মদেশ, মালয়, হংকং, জাপান, কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া পরিক্রমা করতে পারতেন না। বৌদ্ধদের আতিথ্য এই সব দেশ ভ্রমণের জন্য তাঁর পক্ষে আবশ্যিক ছিল। সব দেশেই তিনি বৌদ্ধদের সম্মানিত অতিথি হয়ে থেকেছেন। বৌদ্ধ মন্দিরে থেকেছেন রাজার হালে। সব দর্শনীয় স্থান দেখার জন্য যানবাহন পেয়েছেন। সর্বত্রই বৌদ্ধদের কাছে বক্তৃতা দিয়েছেন।

ব্রহ্মদেশে

১৯৩৫-এর ২ এপ্রিল রাহুল কলকাতা থেকে জাহাজে জাপান যাত্রা করেন। ৫ এপ্রিল জাহাজ রেঙ্গুনে পৌঁছোয়। পেনাঙ থেকে আবার জাহাজ ছাড়ল ১১ এপ্রিল। অতএব এই কয়দিনে ব্রহ্মদেশ দেখার সুযোগ মিলে গেল। রেঙ্গুনের হিন্দি-ভাষাভাষীরা তিনি জাপান যাচ্ছেন শুনে আগেই রাহুলকে হিন্দি ভাষাভাষীদের সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি হওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। রাহুলও তা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। অধিবেশনের দিন ১০ এপ্রিল। অতএব এই কয়দিনে ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন শহর ঘুরে দেখলেন রাহুল। আরো একটি বিশেষ কারণে রাহুলের কাছে ব্রহ্মদেশের গুরুত্ব ছিল। গোটা ব্রহ্মদেশে সর্বত্রই স্তূপের ছড়াছড়ি।

৬ এপ্রিল রাহুল মান্দালয় যাওয়ার গাড়ি ধরলেন। মান্দালয় পৌঁছে তিনি সেখানকার আর্যসমাজে চলে গেলেন। মান্দালয় ব্রহ্মদেশের পুরোনো রাজধানী। সর্বত্রই ভাঙা স্তূপ।

ভাঙা স্তূপের মেরামত করা হচ্ছে না; অথচ নতুন স্তূপ গড়ে উঠছে। পরদিন তিনি রেঙ্গুন ফিরে এলেন। ব্রহ্মদেশের ভিক্ষুরা সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা হারিয়েছে। তিব্বতি ভিক্ষুদের চেয়ে তাদের অবস্থা কিছুটা ভালো হলেও এমন দুষ্কর্ম নেই যা তারা করে না।

১০ এপ্রিল হিন্দি ভাষাভাষী সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে রাহুল তাঁর ভাষণ পাঠ করলেন। ১১ এপ্রিল জাহাজ ধরলেন।

মালয়ে

১৪ এপ্রিল জাহাজ পেনাঙে পৌঁছোল। আড়াই দিন কোয়ারান্টাইনে থাকতে হল। পেনাঙের বুদ্ধিস্ট এ্যাসোসিয়েশান রাহুলকে নামিয়ে নিয়ে গেল। এই অ্যাসোসিয়েশানের মন্দিরের বুদ্ধ, আনন্দ, কাশ্যপ, অমিতাভ প্রভৃতির মূর্তি ইতালি থেকে তৈরি করে আনা হয়েছে। ১৭ এপ্রিল তিনি পোনাঙের দর্শনীয় স্থান ঘুরে দেখে এলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, এখান থেকেই জাপানের রাস্তা ধরেন। কিন্তু তা হল না। জাপানি জাহাজ ধরার জন্য তাঁকে সিংগাপুরে যেতে হল।

১৮ এপ্রিল ট্রেনে তিনি কুয়ালালামপুর রওনা হলেন। কুয়ালালামপুর স্টেশনেই কয়েকজন বৌদ্ধ গৃহস্থ ও একজন সিংহলি ভিক্ষু তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কুয়ালালামপুর মালয়েশিয়ার রাজধানী। রাহুল দেড় ঘণ্টা ধরে শহর ঘুরে দেখলেন। তারপর বৌদ্ধ মন্দিরে চলে গেলেন। বৌদ্ধ গৃহস্থদের ছোটো সভায় ভাষণ দিলেন।

সিংগাপুরে

১৯ এপ্রিল ট্রেনে তিনি সিংগাপুরে গেলেন। সিংগাপুরে একটি বিশাল বুদ্ধের মূর্তি দেখলেন। একটি উপেক্ষিত চীনা মন্দির দেখলেন। সন্ধ্যায় চীনা বৌদ্ধ সভায় বক্তৃতা দিলেন। ২১ এপ্রিল জাপান যাত্রার জন্য 'অন্যোমারু' জাহাজ ধরলেন। ২৭ এপ্রিল জাহাজ হংকং পৌঁছোল। হংকং-এ নেমে একটা ট্যাকসি নিয়ে ২৭ মাইল ঘুরে এলেন।

সাংহাইয়ে

৩০ এপ্রিল জাহাজ সাংহাই পৌঁছোল। ১ মে সাংহাইয়ে নেমে শহরটা দেখলেন রাহুল এবং একটা ভারতীয় হোটেলে রুটি-মাংস খেয়ে জাহাজে ফিরে এলেন।

জাপানে

৩ মে রাত সাড়ে আটটায় ক্যুশো দ্বীপের মোজী শহরে জাপানের মাটিতে তিনি পা রাখলেন। ৬ মে ওসাকা শহরে জাহাজ থেকে নামলেন। বস্ত্রশিল্পে এই শহর জাপানের ল্যাংকাশায়ার-ম্যানচেস্টার। ওসাকা থেকে ট্রেনে হোরিয়োজী বিহারে গেলেন। হোরিয়োজী জাপানের সব চেয়ে পুরোনো বিহার। এখানকার মন্দির বেশির ভাগই কাঠের। সবচেয়ে পুরোনো মন্দিরটি ষষ্ঠ শতাব্দীর। প্রধান মন্দিরের দেয়ালে বোধিসত্ত্বের চিত্র অজন্তার

গুহাচিত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মোটরে ওসাকা শহর দেখে পরদিন তিনি কিয়োটো রওনা হয়ে যান।

১০ মে জাহাজ ইয়াকোহামা পৌঁছোল। ইয়াকোহামা থেকে বৈদ্যুতিক ট্রেনে টোকিও। টোকিওতে কোসীয়োজীর মন্দিরে শ্রীসকাকীবারার ওখানে উঠলেন। টোকিওর বেশির ভাগ দিনই কেটে গেল বিদ্বানদের সঙ্গে দেখা করতে এবং সেখানকার বিদ্যায়তনগুলি দেখতে।

টোকিওর ইম্পিরিয়াল বিশ্ববিদ্যালয় ও ওয়াসেদা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান, অর্থনীতি দর্শন ও অন্য সব বিষয়ই পড়ানো হয়। রিশশো একটি বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়। প্রোফেসার কিমুরা, ইনোয়ে, নাগাই, কাবাগুচী, বতনবে, তাকেদাসে প্রভৃতির সঙ্গে আলাপ আলোচনা হল।

জাপানের বাণিজ্যিক সাফল্য ও পুঁজিবাদী শোষণ দুইই রাহুলের চোখে পড়েছিল। আধুনিক অর্থনীতি যাকে dumping বলে অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ বাজারে জিনিসের দাম বাড়িয়ে বাইরে সস্তায় জিনিস বিক্রি করার কৌশল, তা রাহুলের দৃষ্টি এড়ায়নি। জাপানি শিল্পপতিদের এই কৌশলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় মজুরেরা। শিল্পপতিদের লাখ টাকাকে কোটি টাকা এবং কোটি টাকাকে দশ কোটি টাকা করতে সময় লাগে না; অনেক শিল্পপতির মুনাফা তো একশো শতাংশ। অথচ দুঃসহ আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য জাপানি মজুররা ধর্মঘট করতেও পারে না। কারণ জাপানে সম্রাট ও তাঁর শাসন ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও প্রকৃত ক্ষমতা ছিল সামরিক নেতাদের হাতে।

সওয়া এক মাস জাপানে থেকে রাহুল নিত্তাতে চলে যান। নিত্তাতে গিয়ে উঠেছিলেন তার পূর্ব পরিচিত শ্রীব্যোদোসানের ওখানে। বড় শান্ত, নির্জন জায়গা এই নিত্তা। জাপানিরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে অত্যন্ত ভালোবাসে। নিজেদের বাগানকেও এরা মনের মতো করে বানায়। নিত্তাতে রাহুল দেড় মাস ছিলেন। এখানে এসেও তিনি প্রুফ দেখছিলেন এবং *দীঘনিকায়* হিন্দিতে অনুবাদ করছিলেন।

জাপানের সবচেয়ে বড় পণ্ডিত বোগিহারার সঙ্গে তিনি দেখা করেন। ৬৮ বছর বয়স; কিন্তু লেভি এবং পেলিয়োর মতো ইনিও রাতদিন বিদ্যাচর্চা করেন। তিনি থৈসো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তাঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ বৌদ্ধ সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেছিলেন রাহুল।

রাহুল লক্ষ করেছিলেন জাপানি শাসকেরা আর কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়া দখল করে সন্তুষ্ট নয়, তাঁরা এশিয়া বিজয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

সর্বক্ষেত্রে জাপানের সাফল্য সত্ত্বেও জাপানে নারীর কোনো মর্যাদা নেই। তাও তাঁর চোখে পড়েছিল। বিয়ের আগে এদের কর্তব্য ছিল শরীর পর্যন্ত বিক্রি করে মা-বাবার সেবা করা। যে মেয়েরা নাচ-গানের পেশা গ্রহণ করে, তাদের গৈশা বলা হয়। এইরকম গৈশা ঘর সব শহরে দেখা যায়। গৈশা মেয়েদের মা-বাবারা কিছু টাকা নিয়ে মালিকের হাতে কিছুকালের জন্য তাদের কন্যাসন্তানকে সঁপে দেয়। নির্দিষ্ট সময়ে এই সব মেয়েরা

ফিরে যেতে পারে। বিয়ের পর তাদের পুরোনো জীবনের কথা আর মনে রাখা হয় না। বিবাহিতা তরুণী স্বামীর পূর্ণ আস্থা লাভ করে। জাপানে ছেলেদের মতো মেয়েদেরও প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক। মেয়েদের পড়াশোনা হাইস্কুলেই শেষ হয়। সেন্দাই একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে মেয়েরা পড়তে পারে; কিন্তু সেখানে খুব কম লোকের পক্ষেই পড়া সম্ভব।

সাধারণ জাপানিরা অত্যন্ত সৎ। তাদের স্বভাবও অত্যন্ত মধুর। মৃত্যুতে এত নির্ভীক জাতি খুব কম আছে।

নিত্তা থেকে ৩১ জুলাই কিয়োতে গেলেন রাহুল। ৩১ জুলাই থেকে ৩ অগস্ট পর্যন্ত সেখানে থেকে তিনি মিউজিয়ামে মূর্তি ও চিত্রকলার সংগ্রহ দেখলেন। তারপর মহাবুদ্ধের ধাতুর বিশাল প্রতিমা দর্শন করে প্রাচীন বিহার তোশো দাইজী যান। জাপানে প্রায় ৪০০ বৌদ্ধ মন্দির ছড়িয়ে আছে।

কিয়োতে থেকে কোয়াসান শহরে গেলেন রাহুল। কোয়াসানে পীত চীবরধারী ভিক্ষু মিজুহারা সাবা তাঁকে আন্তরিকতার সঙ্গে অভ্যর্থনা করলেন। এখানকার সব প্রতিষ্ঠানই ভিক্ষুদের হাতে। হাইস্কুলের চারশো ছাত্রের মধ্যে তিনশোই ভিক্ষু। কলেজের দুশো ষাট জন ছাত্রের মধ্যে পাঁচ-সাত জন ছাড়া সবই ভিক্ষু। কোয়াসান জাপানের মহান ধর্মাচার্য কোবো থইশীর নিবাসস্থান। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী থেকে এই স্থান জাপানি বৌদ্ধদের তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে। কোয়াসানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের তুলনা নেই। দেবদারুতে আচ্ছাদিত হিমালয় যে দেখেছে, একমাত্র সেই কোয়াসানের অনুপম প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের কথা কল্পনা করতে পারবে।

রাহুলের ইচ্ছা ছিল কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়া হয়ে রাশিয়া যাবেন। কিন্তু মাঞ্চুরিয়া ও রাশিয়ার ভিসা পাওয়া ঝামেলার ব্যাপার ছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত ভিসা পাওয়া গেল। কৌশল্যায়নের চেষ্টায় ভারত থেকে ৩৬৭ ইয়েনের চেকও পাওয়া গেল। অতএব রাশিয়া দর্শনের আর কোনো বাধা রইল না।

কোরিয়ায়

১৭ অগস্ট রাহুল কোরিয়ার সিওলে পৌঁছোলেন। সেখানকার বিহারের ধর্মাচার্য স্টেশনে এসেছিলেন। তিনি তাঁর ওখানে নিয়ে গেলেন। সিওলের মিউজিয়ামে অনেক সুন্দর বৌদ্ধ মূর্তি ছিল। ১৮ অগস্ট বৌদ্ধ ক্লাবে রাহুলের সম্মানে চা-পান সভা হল। যারা এসেছিলেন তাঁরা সবাই বৌদ্ধ। তাই তাঁরা রাহুলের সঙ্গে অকৃত্রিম আত্মীয়ের মতো ব্যবহার করছিলেন। সিওল থেকে রাত সওয়া আটটায় মাঞ্চুরিয়ার ট্রেন ধরলেন।

মাঞ্চুরিয়ায়

১৯ অগস্ট বেলা দেড়টায় মাঞ্চুরিয়ার মুকদেন-এ পৌঁছোলেন। হিগাশী মন্দিরের ধর্মাচার্য স্টেশনে এসেছিলেন। তিনি রাহুলকে তাঁর বিহারে নিয়ে গেলেন। শহরের বিভিন্ন দর্শনীয়

স্থান দেখার পর ধর্মাচার্য তাঁকে বনস্‌সুই নামে সবচেয়ে বড় চীনা মঠ দেখাতে নিয়ে গেলেন। কিছু দূরে একটা লামা মন্দিরও দেখতে গেলেন তাঁরা। এই লামা মন্দিরে ৪০-৫০ জন মোঙ্গল ভিক্ষু ছিলেন। রাহুল লিখছেন, 'মনে হচ্ছিল, আমি তিব্বতের কোনো এক গুম্বায় এসে গেছি। এখানে টশীলামার দু-তিন জন লোক ছিলেন। আমাকে ফর ফর করে তিব্বতি বলতে দেখে ওঁরা মন খুলে কথা বললেন, চা খাওয়ালেন, তিব্বতের কথা জিগ্যেস করলেন। এঁদের খুব বিষণ্ণ মনে হল। কারণ তিব্বতে ফেরার কোনো পথই তাঁদের সামনে খোলা ছিল না।'

মুকদেন থেকে সিঙকিঙ। এখানেও হিগাশী বিহারের পুরোহিত স্টেশনে এসেছিলেন। রাহুল মোটরে তাঁর সঙ্গে বিহারে গেলেন এবং খেয়েদেয়ে তাঁরই সঙ্গে শহর দেখতে বেরোলেন। কয়েক বছরের মধ্যেই জাপানিরা তাদের আধিপত্য পুরোপুরি কায়েম করে ফেলেছে মাঞ্চুরিয়ায়।

সিঙকিঙ থেকে হরবিন। হরবিনে চিরোস্‌সু (গোকুরাজী অথবা সুখাবতী) বিহার দেখলেন। মাঞ্চুরিয়ার আর কোনো বিহারে এত বৌদ্ধ ভিক্ষু নেই। এখানে ১৭৫ জন ভিক্ষু থাকতেন। বিহারের নায়ক ভারতীয় ভিক্ষু বেশ ভালোভাবে অতিথি সৎকার করলেন। ২৬ অগস্ট মনচুলী থেকে মস্কো হয়ে বাকুর টিকিট কেনা হল। হরবিন বিহারের নায়ক ও অন্য ভিক্ষুরা রাহুলের সঙ্গে অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করেছিলেন।

সোভিয়েতে

মাঞ্চুরিয়ার শেষ স্টেশন মনচুলী। পরের স্টেশন সোভিয়েত দেশে। মনচুলী পৌঁছে রাহুল কিছু গরম পোশাক কিনলেন। দুরন্ত শীতে তাঁকে সাইবেরিয়া পার হয়ে যেতে হবে। অবশেষে তিনি সোভিয়েত দেশে যাচ্ছেন, এই আনন্দে রাহুলের বুক ভরে উঠল। *বাইসবী সদী*-তে তিনি একটি সাম্যবাদী সমাজের পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন। সোভিয়েত দেশ সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করেছে। সোভিয়েত দেশ তাঁর স্বপ্নের দেশ। সেই দেশে যাচ্ছেন তিনি। এতে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠাটাই স্বাভাবিক।

৩০ অগস্ট মনচুলী স্টেশন থেকে গাড়ি ছাড়ল। ৩১ অগস্ট গাড়ি বৈকাল হ্রদের তীর দিয়ে যাচ্ছিল। 'বড় রমণীয় দৃশ্য। আমাদের ডানদিকে নীলাভ সরোবর, পাশে আবছা পর্বত। বাঁ-দিকের পর্বত আমাদের সঙ্গেই চলছিল। ট্রেন বার বার একটার পর একটা সুড়ঙ্গ পার হয়ে আসছিল। জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়, কালো রঙের পাথর ও অঙ্গারা, নদীর তীব্র জলস্রোত। হরকুতস্ক স্টেশনের দালানে লেনিন-স্তালিনের বড় ছবি টাঙানো। পয়লা সেপ্টেম্বর যে জায়গা দিয়ে ট্রেন যাচ্ছিল সেখানে শুধু ভূর্জপত্রের গাছ ও ঘাসে ঢাকা পাহাড়।'

৩ সেপ্টেম্বর মনচুলী ছেড়ে আসার ষষ্ঠ দিন চলছিল। ট্রেনের দুধারে ভূর্জপত্রের জঙ্গল, কালো মাটি ও প্রশস্ত খেত। রাহুল আশ্চর্য হলেন এই দেখে যে, ইউরোপ ও এশিয়াকে পৃথক করেছে যে ইউরাল পর্বত তা অতি সামান্য ব্যাপার। পুকুরের পাড়ের

মতো উঁচু একটা পাহাড়ের পিঠের ওপর দিয়ে ট্রেনটা পার হয়ে গেল। সঙ্গীরা বললেন, এই ইউরাল পর্বত। গাড়ি স্বের্দলোবস্ক স্টেশনে এল। স্বের্দলোবস্ক বেশ বড় শহর। তার সব চেয়ে বড় গির্জার ওপর লাল পতাকা উড়ছিল। ৪ সেপ্টেম্বর মধ্যরাত্রে মস্কো স্টেশন এল। রাতটা ট্রেনে কাটিয়ে পরদিন সকাল নটা নাগাদ তিনি মেট্রোপোল হোটেলে গেলেন। লেনিনগ্রাদ দেখার জন্য আবেদন করেছিলেন রাহুল। তিনি লেনিনগ্রাদ দেখার অনুমতি পাননি।

মস্কো শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ালেন রাহুল।

ডঃ ওলডেনবুর্গ ও ডঃ শ্চের্বাৎসকি বৌদ্ধ দর্শনের এই দুজন বিখ্যাত পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে ছিল তাঁর। তিনি শুনেছিলেন দুজনেই অকাদেমিতে আছেন। কিন্তু অকাদেমিতে গিয়ে শুনলেন ডঃ ওলডেনবুর্গের দেহাবসান হয়েছে এবং ডঃ শ্চের্বাৎসকি লেনিনগ্রাদে।

বাকুতে

সেদিনই রাত দশটায় বাকুর ট্রেন ধরলেন রাহুল। ৭ সেপ্টেম্বর ডনবাস পেরিয়ে ডন নদীর তীরে অবস্থিত রোস্‌তোফ শহর এল। ডন পেরিয়ে গাড়ি ককেশাস দিয়ে যাচ্ছিল। ডানদিকে বরফে ঢাকা পর্বত শিখর। ৮ সেপ্টেম্বর ডানদিকে ককেশাসের পর্বত শ্রেণি দেখা গেল। 'ককেশাসে ঢুকেই বুঝতে পারলাম আমি ভারতের কাছাকাছি এসে পড়েছি। পাউরুটির সঙ্গে এবার তন্দুরি রুটিও পাওয়া যেতে লাগল। অনেকের পায়ের জুতো ভারতীয়দের মতো, মহিলাদের ঘাগরা এবং কুর্তা পাঞ্জাবিদের মতো। এদিককার গ্রামের বাড়িগুলো খোলার এবং দেয়াল সাদা রঙের। তরুণ-তরুণীরা পুরনো ঢঙের পোষাক ছেড়ে নতুন ধরনের পোশাক পরেছিল। রাত দুটোর সময় গাড়ি বাকু পৌঁছল।'

পরদিন সকালে ইনতুরিস্ত-এর লোকজন এসে রাহুলকে ইনতুরিস্তের অফিসে নিয়ে গেল। বিদেশের যাত্রীদের যাত্রা, থাকা, খাওয়াদাওয়া, দর্শনীয় স্থান দেখানোর ব্যবস্থা করে ইনতুরিস্ত। সোভিয়েতের বড় বড় শহরে এদের নিজেদের অফিস ও হোটেল আছে; পথ-প্রদর্শক, দোভাষী ও মোটর আছে। রাহুল ইরান হয়ে ভারতে যাওয়ার সংকল্প করেছিলেন। ইরানে যাওয়ার জাহাজ আরো আড়াই দিন পরে ছাড়বে। এই সময়টা বাকু দেখার জন্য কাজে লাগালেন রাহুল। ইনতুরিস্তের মোটর দেরিতে ছাড়ার কথা ছিল। তাই তিনি একাই বেরিয়ে পড়লেন। যেতে যেতে দেখলেন, একটা ইহুদি মন্দিরকে ক্লাবে পরিণত করা হয়েছে। একটা খ্রিস্টান গির্জাকে অন্য কিছুতে পরিণত করা হয়েছে। একটা মসজিদ ভেঙে পড়ছিল। মন্দির-গির্জা-মসজিদ-এর এই অবস্থা রাহুলের মতে, বলশেভিকদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের মাল-মশলা। এই ভগ্নদশার কারণ বলশেভিকদের ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ নয়; সরকারি কোষাগার থেকে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থের বরাদ্দ বন্ধ করার জন্যই মন্দির-মসজিদ-গির্জার এই হীনদশা।

মোটরে বাকু ও তার চারপাশের দর্শনীয় স্থানগুলি দেখে নিলেন রাহুল। অনেক নতুন

নতুন প্রাসাদের মতো বাড়ি উঠেছে। এই সব বাড়িতে এশিয়া-ইউরোপের সব জাতির মজুর একত্রে বসবাস করে। এদের বেতনেও কোনো তারতম্য নেই। রঙ, ধর্ম ও জাতির ভাবনা এতটা ঘুচে গেছে যে, পরস্পরের মধ্যে অনেক বিয়ে হচ্ছে।

জ্বালাদেবীর মন্দির

পাঁচ মাইল দূরে বড় জ্বালাদেবীর মন্দির। এখানকার লোক অগ্নিপূজারিদের মন্দির বলে। এই বড় জ্বালামাঈয়ের মন্দিরের কথাই রক্সৌলে এক বৈষ্ণব বৈরাগী যুবক রাহুলকে বলেছিলেন। যুবক বলেছিলেন যে, তিনি বড় জ্বালামাঈ দেখে পাহাড়ে পাহাড়ে চলতে চলতে নেপালে চলে এসেছেন। রাহুল তাঁর কথা তখন বিশ্বাস করেননি। জ্বালামাঈয়ের মন্দির হল একটি চৌকো আঙিনা, যার চারদিকে পাকা কুঠরি। অনেকগুলো কুঠরিতে পাথরের ওপর লেখ্য খোদাই করা; সংখ্যায় অন্তত বারো-তেরোটা। অধিকাংশ লেখ্যই দেবনাগরি অক্ষরে, দুটো গুরুমুখি অক্ষরে। আঙিনার মধ্যখানে একটি কুণ্ড, যার মাথায় থামের ওপর পাকা ছাদ। দশ বছর আগে এই মন্দিরে আগুন জ্বলত, নিভত না। এটাই হিন্দুদের বড় জ্বালামাঈ। আশেপাশে খনিজ তেলের কুয়ো, এরকম জায়গায় আগুন জ্বলে ওঠা এবং তারপরে তার ভেতরকার গ্যাসে তা জ্বলতে থাকা খুবই স্বাভাবিক।

জ্বালামাঈ-এর শিলালিপিগুলি পড়ে ফেললেন রাহুল। এই লেখ্যগুলির মধ্যে একটি এই রকম ঃ-

"॥ ৬০ ॥ ওঁ গণেশায় নমঃ ॥ শ্লোক ॥ স্বস্তিশ্রী
নরপত বিক্রমাদিত্য রাজসাকে ॥ শ্রী জ্বালাজী
নিয়ত দরওয়াজা বণায়াঃ শ্রীকেচনগির
সন্ন্যাসী রামদহাবাসী কোটেশ্বর মহাদেবকা ॥....
আসোজ বদি ৮। সংবত্ ১৮৬৬ ॥"

১০ সেপ্টেম্বর আরো কিছু জায়গা দেখলেন রাহুল। প্রথমে 'স্তালিন শ্রমিক সাংস্কৃতিক প্রাসাদ' দেখলেন, 'বাগীরোফ শিশুভবনে' গেলেন। ১১ সেপ্টেম্বর রাহুল একাই শহরে বেরিয়ে রাস্তায় রাস্তায় অলিগলিতে ঘুরে বেড়ালেন। দেখলেন, ছোটো ছোটো সোডা ওয়াটারের দোকান থেকে বড় বড় দোকান সবই রাষ্ট্রের।

সেই দিনই তিনি ইরানগামী জাহাজে উঠলেন। 'কাস্পিয়ান সাগরের শান্ত জলের ওপর দিয়ে 'ফোমিন' ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছিল—আর আমি মনে মনে গত ১৪ দিনের দেখা দৃশ্যাবলীর মানসিক আবৃত্তি করছিলাম।'

ইরানে

১২ সেপ্টেম্বর সকাল আটটায় কাস্পিয়ানের অপর পারে পহ্লবী বন্দরে নেমে মোটরে তেহরান চলে গেলেন রাহুল। তেহরান থেকে ১০ মাইল দূরে গমিরান যেতে হল বাসে। তেহরান উত্তর ইরানের সর্বোচ্চ তথা সুন্দরতম পর্বতশিখর অলবুর্জ-এর পাদদেশে

অবস্থিত। পরদিন রাহুল পহ্লবী প্রাসাদ, অস্ত্রাগার, মজলিস (পার্লামেন্ট ভবন) প্রভৃতি দেখলেন। তাছাড়া রেজাশাহের ইরানের আধুনিকীকরণের প্রয়াসও তাঁর চোখে পড়ল। লোকজনের পোশাক-পরিচ্ছদ পুরো ইউরোপীয়। রেজাশাহের আমলে দেশে শিক্ষার প্রসার হয়েছে, ব্যবসা-বাণিজ্যে অগ্রগতি ঘটেছে, চুরি-ডাকাতিও আর নেই। সব চেয়ে বড় কথা ইরানিরা নিজেদের চিনেছে। তবে মানুষের জীবনে অনেক অনাবশ্যক বিধি-নিষেধ এসেছে। দেশের মানুষদেরও এখানে নিজের ফোটোর সঙ্গে একটি প্রমাণপত্র (জাওয়াজ) নিতে হয়। ইস্‌পাহান যাওয়ার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে জাওয়াজ নিতে হল রাহুলকেও। বাসে উপচে পড়া ভিড়ের মধ্যে রাহুল ইস্‌পাহানে চলে গেলেন।

ইস্‌পাহানে

ইস্‌পাহান অনেক দিন ইরানের রাজধানী ছিল। ইস্‌পাহানের রাস্তা বেশ ভালো ও চওড়া। রাস্তার পাশ দিয়ে খাল বয়ে গেছে। খাল থেকে মাঝে মাঝে রাস্তায় জল ছিটানো হয়। রাস্তায় তাই ধূলা ওড়ে না। রাস্তা তৈরি করার ব্যাপারে সরকার বাড়ি, কবর, মসজিদের তোয়াক্কা করেনি। যা সামনে পড়েছে, তা ভেঙে ফেলা হয়েছে। পথে মৈদানশাহতে হারুন বলায়তের কবর, ইমামজাদা ইসমাইলের কবর। ইসলাম-পূর্ব ইস্‌পাহানও অত্যন্ত প্রসিদ্ধ শহর ছিল। শহরের বাইরে কুহ (কোহ) আতিশগাহ হল সেই পর্বত যেখানে পার্শিদের অগ্নিমন্দির ছিল। এখন অগ্নিমন্দিরের কয়েকটি দেয়াল দাঁড়িয়ে আছে। বাইরে থেকে দেখলে ইস্‌পাহানকে বাগানের শহর বলে মনে হয়। ইস্‌পাহানের পূর্বে করমান, দক্ষিণে শিরাজ, পশ্চিমে বক্তিয়ারী ও উত্তরে তেহ্‌রানের এলাকা। রাহুল ইস্‌পাহানের সুন্দর উদ্যান চহারবাগ দেখলেন।

শিরাজে

ইস্‌পাহান থেকে সকাল আটটায় শিরাজের বাসে চাপলেন রাহুল। পাহাড়ি রাস্তা। চারদিকে ন্যাড়া, শুকনো পাহাড় আর ধুলো। রুক্ষ প্রকৃতির কোলেই হাফিজ আর শাদীর মতো কবি জন্মেছিলেন। বেলা চারটে নাগাদ তাঁরা তখতজমশিদ (পুরোনো পরসে-পুলিখ) পৌঁছোলেন। ন্যাড়া পাহাড়, সামনের উপত্যকাও রুক্ষ। এক সময় পরসে-পুলিখ সভ্য দুনিয়ার রাজধানী ছিল। সম্রাট দারাউসের সাম্রাজ্য সভ্য দুনিয়ার কেন্দ্র ছিল। সম্রাটের রাজ্য পূর্বে সিন্ধুদেশ, পশ্চিমে গ্রিস ও মিশর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পাহাড়ের পাদদেশে দারাউসের মহল ছিল। সেখানে বড় বড় স্তম্ভ এখনো দাঁড়িয়ে আছে।

সন্ধ্যে নাগাদ শিরাজে পৌঁছোলেন রাহুল। সাড়ে ১২ আনা দিয়ে ভালো ঘর পাওয়া গেল। চেয়ার, টেবিল, পালঙ্ক, বিছানা, চাদর, বিদ্যুতের আলো সবই ছিল। ৫ পয়সা দিয়ে স্নানের ব্যবস্থা ছিল। ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে রাহুল শহরের বাইরে হাফিজের সমাধিতে গেলেন। হাফিজ ফারসি ভাষার মহান কবি। আরো একমাইল এগিয়ে শেখ শাদির কবর দেখলেন। একটি দোতলা বাড়ির ভেতরে মহান কবির সমাধি। নতুন ইরান

কট্টর মুসলমানদের মন থেকে এই ধারণা মুছে দিতে চায় যে, ছবি বা মূর্তিকে সম্মান করা খারাপ। তাই ব্রিটিশ মিউজিয়াম থেকে শাদির ছবির ফোটো তুলে এনে এখানে রাখা হয়েছে।

রাত্রিতে রাহুল একটি ফিল্ম দেখলেন।

তেহরানে

২১ সেপ্টেম্বর রাহুল আবার তেহরানে রওনা হয়ে গেলেন। রাত নটায় বাস ছাড়ল। সকাল সাতটায় বাস ইস্পাহানে পৌঁছে গেল। কিন্তু বাস ইস্পাহান থেকে আর এগোল না। ইরানে থাকা-খাওয়া সস্তা; কিন্তু মুশকিল হল এই বাসগুলিকে নিয়ে। ২৪ সেপ্টেম্বর আবার বাস পাওয়া গেল। তেহরান চলে গেলেন রাহুল।

রাহুল চাইছিলেন আফগানিস্তানের রাস্তায় ভারতে ফিরতে। কিন্তু আফগানিস্তানের কনসাল ভিসা দিলেন না। মশহদ থেকে হিরাট যেতে পারবেন, এই ভরসায় ২৮ সেপ্টেম্বর তিনি রাত্রি সাড়ে আটটায় তেহরান থেকে বাসে মশহদ রওনা হলেন। রাত্তিরটা পথে এক জায়গায় কাটাতে হল। শোয়ার ব্যবস্থা মাটিতে। পরদিন ছটায় আবার রওনা হলেন। পথে ফিরোজকুহ্ শহরে দেখলেন অনেক দোকানপাট, মদের দোকান। আগে লোকে লুকিয়ে মদ খেত। এখন কোনো বাধা নেই। সব জায়গাতেই খাওয়ার জন্য রুটি, মাংস, ফল পাওয়া যাচ্ছিল। ইরানিরা মাংসে ঝাল-মশলা দিতে জানে না। এবারের যাত্রায় যেখানেই গেছেন কোথাও ঝাল-মশলা দেওয়া মাংস খাননি রাহুল। এতে তাঁর মনে হয়েছিল যে ঝাল-মশলা দেওয়া মাংস ভারতের নিজস্ব জিনিস। রাত সাড়ে চারটায় বাস নেশাপোর পৌঁছোল। নেশাপোরে ওমর খৈয়ামের সমাধি আছে:

মশহদে

বাস যখন মশহদ পৌঁছোল তখন দিনের আলো যথেষ্ট ছিল। মশহদ সুন্দর শহর। প্রশস্ত রাস্তা। ইরানের শহরগুলোর রাস্তার সঙ্গে একমাত্র ভারতের রাস্তার তুলনা করা যেতে পারে। মশহদ থেকে ১৮ মাইল দূরে তূস। এখানেই মহাকবি ফিরদৌসীর সমাধি। তিনি সমাধিস্থল দেখার জন্য ঘোড়ার গাড়িতে দু-ঘণ্টায় তূসে পৌঁছোলেন। তূস এখন কৌশাম্বির মতো একটি পরিত্যক্ত স্তূপ। এরই এক পাশে একটি নতুন বাগান করা হয়েছে। সেখানে ইরানের এই মহাকবির সমাধি। সমাধি গৃহটি ইরানি ঢঙে শ্বেতপাথর দিয়ে বানানো হয়েছে। দরজায় শাহনামার পাঁচটি দৃশ্য শ্বেতপাথরের ওপর উৎকীর্ণ করা হয়েছে। সম্ভবত এতে মাহমুদ ও ফিরদৌসীর মূর্তিও আছে। নবীন ইরান ইসলামের মূর্তি ভাঙা নীতি মানে না।

ভারতে

৩ অক্টোবর রাহুল বাসে ভারতের দিকে রওনা হলেন। রাহুল লিখেছেন, 'এই বাসে যা

কষ্ট হল বলার নয়। বোধ হয়, এত কষ্ট সারা জীবনে কোনো জায়গায় হয়নি।' আসলে যে বাসে তিনি রওনা হয়েছিলেন, সেটা বাসই নয়। মাল বহনের লরি। পেছনের এক-চতুর্থাংশ জায়গা মালে ঠাসা ছিল। ছাদটাও মালের ভারে ফেটে পড়ছিল। মাল বোঝাই করে যতটা জায়গা ছিল তার মধ্যে ১৮ জন যাত্রীকে ঠেসে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। এই বাসেই মালের বস্তার মতো আঠারো জন যাত্রী ৭ অক্টোবর জাহিদান পৌঁছোলেন। ৯ অক্টোবর বেলা একটায় লরি ছাড়ল। পরদিন বেলা একটায় লরি ব্রিটিশ সীমার ফৌজি চৌকিতে পৌঁছোল। ইরান ও ব্রিটিশ-ভারতের সীমা হল একটা শুকনো সরু নালা। ফৌজি চৌকিতে পাসপোর্ট দেখাতে হল। পরদিন সকালে আবার লরি চলল। কয়েক শতাব্দী ধরে এই শত শত মাইলের নির্জন প্রান্তর ভারতকে রক্ষা করে আসছে। এখন তো লরিগুলো এই বন্ধ্যা জায়গাকে কয়েক ঘণ্টার রাস্তা বানিয়ে দিয়েছে। ১০ অক্টোবর বেলা একটায় নোককুন্ডি পৌঁছোল লরি। ভারতে ফিরে এলেন রাহুল।

ভারতে প্রত্যাবর্তন

নোককুন্ডি বেলুচিস্থানের একটি ছোটো রেলওয়ে স্টেশন। রাত আটটায় গাড়ি ছাড়ল। পরদিন দুপুরে ট্রেন বোলান উপত্যকায় ঢুকল। বেশ কয়েকটা সুড়ঙ্গ পার হল ট্রেন। এদিক দিয়ে বিদেশি শত্রুর আক্রমণের দুটো বড় বাধা ছিল : কয়েকশো মাইলব্যাপী নির্জন-নির্জল বন্ধ্যাভূমি এবং বোলানের এই পাহাড়। এই পথে আক্রমণ দুঃসাধ্য ছিল। তাই ইংরেজ আসার আগে যত আক্রমণকারী এসেছে সব খাইবার গিরিবর্ত্ম দিয়ে এসেছে। স্পেজন্দ জংশনে ট্রেন পালটে রাহুল লাহোরগামী ট্রেনে চাপলেন। সক্কর রোহড়ী হয়ে ১২ অক্টোবর সন্ধ্যে সাতটায় রাহুল লাহোর পৌঁছোলেন। ডঃ লক্ষ্মণ স্বরূপ স্টেশনে এসেছিলেন। তিনি তাঁর বাড়ি নিয়ে গেলেন রাহুলকে। ১৮ অক্টোবর দিল্লি চলে গেলেন রাহুল। দিল্লিতে হিন্দি প্রচারিণী সভা থেকে তাঁকে মানপত্র দেওয়া হল। দিল্লি থেকে ২২ অক্টোবর কানপুরে পৌঁছোলেন। কানপুর থেকে প্রয়াগ। ২৪ থেকে ২৭ অক্টোবর প্রয়াগে থেকে কিছু প্রুফ দেখলেন। সেখানে টন্‌সিলের ব্যথা শুরু হল। ২৯ অক্টোবর টন্‌সিলের ব্যথা নিয়েই তিনি পাটনায় জয়সওয়ালজির বাড়ি চলে এলেন। টন্‌সিলটা একটু চিরে দেওয়ার পর ব্যথা কমল। ছু-শিঙ-শার কাছ থেকে টাকা ধার করে তিনি দ্বিতীয়বার তিব্বত ভ্রমণের সময় তেরগীর দুষ্প্রাপ্য কন্‌জুর কিনে নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু পাটনায় জয়সওয়ালজি ছাড়া তার কদর বোঝার লোক ছিল না। নিরুপায় হয়ে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে চিঠি লিখলেন। ১৭ নভেম্বর ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচি এসে *কন্‌জুর* নিয়ে গেলেন। কয়েকদিন জয়সওয়ালজির ওখানে থেকে গেলেন রাহুল। কিন্তু স্বল্পকালের স্বস্তিও তাঁর জীবনে ছিল না। টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে যেতে হল। সারাজীবন তিনি লড়াই করেছেন পথের বিপদের সঙ্গে, দারিদ্রের সঙ্গে, তাঁর সাধনার সিদ্ধির পথে যত বাধা এসেছে তার সঙ্গে। এবার একেবারে মৃত্যুর সঙ্গে সরাসরি মোকাবিলা। জ্বর এসেছিল ২৩ ডিসেম্বর। ২৭ ডিসেম্বর টাইফয়েড জ্বর নিয়ে হাসপাতালে

গেলেন। মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রামে জয়ী হয়ে ১৫ জানুয়ারি আবার জয়সওয়ালজির বাড়ি ফিরে এলেন অপরাজেয় রাহুল। ফিরে এসে মুঙ্গের সাহিত্য সম্মেলনের জন্য ভাষণ লিখে নিলেন। ১ ফেব্রুয়ারি মুঙ্গের চলে গেলেন। মুঙ্গের সাহিত্য সম্মেলনে তাঁর ভাষণ পড়লেন।

৩ থেকে ৯ ফেব্রুয়ারি পাটনায় কাটালেন। কলেজের ছাত্রদের কাছে কয়েকটি বক্তৃতা দিলেন। প্রুফ তো ক্রমাগতই দেখতে হচ্ছিল। ১২ ফেব্রুয়ারি ছাপরা হয়ে আবার প্রয়াগে। দুদিন প্রেসের কাজ দেখে ১৪ ফেব্রুয়ারি বেনারসে গেলেন। বেনারস থেকে আবার ছাপরা। মাঁঝি স্টেশনে নেমে একবার একমা ঘুরে এলেন। তারপর ছাপরা। সন্ধ্যার গাড়িতে নেপাল রওনা হয়ে গেলেন। ১৭ ফেব্রুয়ারি সকাল সাতটায় রক্সৌল পৌঁছোলেন এবং নটায় অন্য গাড়িতে অমলেখগঞ্জ পৌঁছে গেলেন। আবার তিব্বত।

একাদশ অধ্যায়

সোভিয়েত দেশে অধ্যাপনা ও সংসার

রাহুল দ্বিতীয়বার সোভিয়েত দেশে যান আচার্য শ্চের্বাৎসকির আহ্বানে। এবার তিনি সেখানে ছিলেন ১৯৩৭-এর নভেম্বর থেকে ১৯৩৮-এর জানুয়ারি পর্যন্ত। প্রথমবার সোভিয়েত দেশ থেকে তিনি যে পথে ফিরেছিলেন, সেই পথেই অর্থাৎ ইরান হয়েই তাঁকে সোভিয়েত দেশে যেতে হয়েছিল। কারণ ভারত থেকে তিনি রাশিয়ার ভিসা পাননি। তাঁকে রাশিয়ার ভিসা সংগ্রহ করতে বলা হয়েছিল ইরান থেকে। ১৯৩৭-এর সেপ্টেম্বরে তিনি কোয়েটা থেকে ট্রেনে নোক্‌কুণ্ডী যান। সেখান থেকে লরিতে জাহিদান। জাহিদান থেকে মশহদ হয়ে তেহরান।

৩০ সেপ্টেম্বর তিনি তেহরান পৌঁছোন। সেখানে রাশিয়ার ভিসা পেতে রাহুলকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়েছিল। তেহরানে আটকে থাকতে হয়েছিল সওয়া এক মাস। ৯ নভেম্বর তিনি ভিসা এবং লেনিনগ্রাদ পর্যন্ত জাহাজ ও রেলের টিকিট পেয়ে যান। ১১ নভেম্বর পহ্‌লবী থেকে তিনি জাহাজে চাপলেন। ১৬ নভেম্বর সকাল ৯টা নাগাদ লেনিনগ্রাদ পৌঁছোলেন। সন্ধ্যা নাগাদ আচার্য শ্চের্বাৎসকির বাড়ি গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন রাহুল। ডঃ শ্চের্বাৎসকির পায়ে আঘাত লেগেছিল; তাই পা প্লাস্টার করা। তিনি সংস্কৃতে বললেন, আসুন, এই আপনার আসন। রাহুলকে তিনি ডেকেছিলেন লেনিনগ্রাদের ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউটে ইন্দো-তিব্বতি বিভাগে কাজ করার জন্য। তিনি রবিনোভিচ নামে একটি সংস্কৃতের ছাত্রকে রাহুলকে ইনস্টিটিউটে নিয়ে যেতে বললেন। ইনস্টিটিউট বন্ধ ছিল। সেই সুযোগে রাহুল বিখ্যাত হেরমিতাজ মিউজিয়াম দেখে নিলেন। হেরমিতাজে শিল্পকলা ও অন্যান্য সামগ্রীর এত বেশি সংগ্রহ ছিল যে তিনি শুধু পূর্ব বিভাগের শিল্পসামগ্রী খুঁটিয়ে দেখলেন। বিশেষ করে দেখলেন মধ্য-এশিয়া থেকে প্রাপ্ত মূর্তি, ভিত্তি চিত্র, কাষ্ঠফলক, বস্ত্র, বাসন ও চিত্রপট। এখানকার চিত্রপটের সঙ্গে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর চিত্রপটের খুব মিল। এখানে যবন-বাহ্লীক চিত্রকর্মের নিদর্শনও ছিল। খ্রিস্টিয় প্রথম শতাব্দীর হূনদের অনেক সামগ্রী এখানে ছিল। তা ছাড়াও ছিল মিশরীয় ও আসিবীয় সভ্যতার অনেক নিদর্শন, জার বংশের অলংকার, ঘড়ি, লাঠি ও অন্যান্য জিনিস।

১৯ নভেম্বর রাহুল ইনস্টিটিউটে গেলেন। অধ্যক্ষ স্ত্রুভে ও আধুনিক ভারতীয় ভাষায় বিরাট পণ্ডিত ডঃ বরান্নিকোফের সঙ্গে দেখা হল। রোমনীতে (বেদেদের ভাষা) তিনি বিরাট পণ্ডিত। ইতিমধ্যেই তিনি তুলসীদাসের রামায়ণের রুশি অনুবাদ সম্পূর্ণ

২৪ নভেম্বর তিনি দাউদ আলি দত্তের কাছে অর্থাৎ প্রমথনাথ দত্তের কাছে যান। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রমথনাথ দত্ত একটি বিখ্যাত নাম। বঙ্গভঙ্গের সময় তিনি স্বদেশি আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। তারপর তিনি পাশ্চাত্য দেশে পালিয়ে যান। পাশ্চাত্য দেশ থেকে তুর্কি ও ইরাকে বেশ কিছুকাল থাকেন। সেখানে তিনি নাম পালটে দাউদ আলি হয়ে যান। ইরানে ইংরেজরা আসবে, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি রাশিয়ায় চলে আসেন। তিনি ইংরেজি, উর্দু, বাংলা ও হিন্দি ভালো জানতেন। লেনিনগ্রাদে তিনি তাই পড়াতেন।

২৮ নভেম্বর লেনিনগ্রাদের সব রাস্তা বরফে ঢেকে গিয়েছিল। ইনস্টিটিউটে ইন্দো-তিব্বতি বিভাগের সেক্রেটারি লোলা (এলেনা) নারবেরতোগুনা কোজেরোভস্‌কায়ার সঙ্গে দেখা হল। ফরাসি, রুশি, ইংরেজি ও মোঙ্গল বলতে পারতেন তিনি। প্রথম দর্শনেই স্থির হল রাহুল লোলাকে ইংরেজি পড়াবেন এবং লোলা রাহুলকে পড়াবেন রুশ ভাষা।

লেনিনগ্রাদ নেভা নদীর দুই-তীরে অবস্থিত। ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকেই নেভা নদী জমে বরফ হয়ে গেল। ইনস্টিটিউটে যাওয়ার পথে রাহুলকে প্রতিদিন নেভা নদী পেরোতে হত। রাহুল লেনিনগ্রাদে থাকাকালীনই সুপ্রিম সোভিয়েতের প্রথম নির্বাচন হল।

রাহুল ও লোলা

ইতিমধ্যে ঘুমক্কড় রাহুলের অন্তরে একটা অঘটন ঘটতে শুরু করেছিল। এই যাযাবর পাখির নিরন্তর পক্ষ-বিধূননে কি ক্লান্তি আসছিল? লোলারও সায় ছিল তাতে। *মেরী জীবনযাত্রা*-য় রাহুল তাঁর পূর্বরাগের কথা কিছু বলেননি। শুধু একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। রাহুল লিখছেন, '২৮ নভেম্বর যখন আমি লোলাকে দেখলাম তখন আমার মনে হয়নি যে, আমরা দুজনে কোনো স্থায়ী সম্পর্ক তৈরি করতে চলেছি। কিন্তু ধীরে ধীরে আমরা পরস্পরের কাছাকাছি আসছিলাম। একবার লোলা পথে কোথাও বরফের ওপর পড়ে গিয়েছিল। সে এসে আমাকে এই কথা বলল। আমি একটি শ্লোকের অংশ তাঁকে পড়ে শোনালাম : 'কালে পয়োধরাণামপতিতয়া নৈব শক্যতে স্থাতুম।' (বর্ষাকালে পতিকে ছাড়া থাকা যাচ্ছে না। তাই পথে পিছলে পড়ে যেতে হচ্ছে।) লোলা হেসে ফেলল।' এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, ইতিপূর্বেই রাহুলের সঙ্গে লোলার পূর্বরাগের পালা চলছিল। ২২ ডিসেম্বর 'আমরা দুজনে পরস্পরের হয়ে গেলাম।' রাহুল লোলার বাড়িতে যেতেন। যেহেতু তখনও পর্যন্ত ইনস্টিটিউট রাহুল সম্পর্কে কোনো পাকা সিদ্ধান্ত নেয়নি, তাই রাহুল হোটেলেই থাকতেন।

পয়লা জানুয়ারি রাহুল লেনিনগ্রাদের বৌদ্ধ বিহারে গেলেন। সেটা মিউজিয়ামে পরিণত হয়েছিল। রাশিয়ার সব চেয়ে বড় গির্জাও দেখলেন। সেটাও এখন মিউজিয়াম। লেনিনগ্রাদে প্রায়ই রাহুল অপেরা ও ব্যালে দেখতে যেতেন। সপ্তাহে ছয়দিন রাহুল ইনস্টিটিউটে চার-পাঁচ ঘণ্টা করে কাজ করতেন। তারপর অন্য দর্শনীয় জিনিস দেখতেন;

রাজনীতির ও রুশ বিপ্লবের বই পড়তেন। এ সময়েই তিনি তাঁর নিজস্ব বই *সোভিয়েত ভূমি*-র উপকরণ সংগ্রহের কাজ শুরু করেছিলেন। কিন্তু তাঁর লেনিনগ্রাদে থাকা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছিল। তাঁর লেনিনগ্রাদে আসার উদ্দেশ্য ছিল শ্চের্বাৎসকির সঙ্গে থেকে বৌদ্ধ ন্যায়ের গ্রন্থ উদ্ধার করা এবং কয়েকটি ইউরোপীয় ভাষাতে তা অনুবাদ করা। কিন্তু এ সময়ে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। মনে রাখতে হবে যে, বছরটা ছিল ১৯৩৮। হিটলারের তোষণনীতি অনুসরণ করছিল ইংলন্ড ও ফ্রান্স। এই নীতির উদ্দেশ্য ছিল জার্মানি ও রাশিয়ার মধ্যে বিধ্বংসী যুদ্ধ বাধানো। সুতরাং রাশিয়া অত্যন্ত সতর্ক ও সাবধানী নীতি অনুসরণ করছিল। রাহুলও উতলা হয়ে উঠেছিলেন। তিনি লিখছেন, 'স্পেনে এই সময় ফ্যাসিবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলছিল। চীনের কমিউনিস্টরা অত্যাচারিত হচ্ছিল। আমরা ভারতীয়রা ছিলাম দাসত্বের মধ্যে। মনে হচ্ছিল আমার রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত। স্পেন বা চীনেও যেতে পারতাম।...... কিন্তু নিজের দেশই আমার সব চেয়ে ভালো জায়গা। ভারতে গিয়ে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে যোগদান করা উচিত।' ইনস্টিটিউটের কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে দেরি করছিলেন। কিন্তু রাহুল তাড়াতাড়ি ভারতে ফিরতে চাইছিলেন যাতে তিনি পূর্ব প্রস্তুতির পর তিব্বতে যেতে পারেন। বিহার সরকার তিব্বতে যাওয়ার জন্য ছয় হাজার টাকা মঞ্জুর করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত ইনস্টিটিউটের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই রাহুল সিদ্ধান্ত নিলেন ঃ তিনি ভারতে ফিরে যাবেন।

ভারতে গিয়েই তাঁকে তিব্বতে রওনা হতে হবে। তাঁর সিদ্ধান্তে সবচেয়ে বেশি কষ্ট হল লোলার। 'আমরা শুধু দেড়মাস একসঙ্গে ছিলাম। কিন্তু আমার হৃদয় তার কাছেই রেখে এসেছিলাম। তা বুঝতে পেরেছিলাম লোলার কাছ থেকে চলে আসার পর।'

মধ্য-এশিয়া হয়ে ভারতে ফিরলেন

১৩ জানুয়ারি রাহুল ভারতে যাওয়ার জন্য লেনিনগ্রাদ থেকে মস্কোতে চলে এলেন। এতে লোলার পরেই যার সবচেয়ে বেশি কষ্ট হয়েছিল তিনি শ্চের্বাৎসকি। রাহুল যখন লেনিনগ্রাদ থেকে মস্কো গেলেন তখন সুপ্রিম সোভিয়েতের অধিবেশন চলছিল। এবার তিনি আফগানিস্তান হয়ে ফিরবেন স্থির করেছিলেন। ১৫ জানুয়ারি মস্কো থেকে যে গাড়ি ধরলেন তা শুধু তেরমিজই নয়, তাজিকিস্তান প্রজাতন্ত্রের রাজধানী স্তালিনাবাদ পর্যন্ত যায়।

পরদিন (১৬ জানুয়ারি) উঁচুনিচু জমি দেখতে পাওয়া গেল ট্রেন থেকে। পাহাড়ে চারদিকে শুধু সাদা বরফ আর বরফ। অনেক গ্রাম পেরিয়ে যেতে লাগল গাড়ি। গ্রামের ঘরবাড়ির ছাদেও বরফ।

১৭ জানুয়ারি ট্রেন পাহাড়ি প্রান্তর দিয়ে যাচ্ছিল। বেশির ভাগ বাড়ির ছাদই খড়ে ছাওয়া। গ্রামের পাশে পাতা-ঝরা গাছ। ১৮ জানুয়ারি সকালে রাহুল মধ্য-এশিয়ার সমতল ভূমিতে পৌঁছে গেলেন। কাজাকদের ছোটো ছোটো বাড়ি। ছাদ মাটির। অনেকটা

লখনৌ-এর গ্রামের বাড়ির মতো। মাটির ছাদ শুরু হয়েছে ঔরেনবুর্গ থেকে। সারা মধ্য-এশিয়া ও আফগানিস্তান হয়ে উত্তর ভারতের লখনৌ পর্যন্ত চলে এসেছে এই মাটির ছাদ দেওয়ার রীতি।

১৯ জানুয়ারির সকালবেলা সির নদীর উপত্যকা দিয়ে ট্রেন যাচ্ছিল। মধ্য-এশিয়ার দুটি বড় নদী আমুদরিয়া ও সিরদরিয়া। উপত্যকায় পাহাড় নেই। এখানে সমতল; শত শত মাইলব্যাপী বেলে মাটি। মধ্য-এশিয়ার কয়েক হাজার মাইল এই শূন্য ও পরিত্যক্ত প্রান্তরকে দেখে রাহুলের মনে হয়েছিল যে, যদি এখানে পাঁচ-দশ লাখ হিন্দুস্থানিকে বসিয়ে দেওয়া যেত, তাহলে কত ভাল হত। এও মনে হয়েছিল যে, পঁচিশ লাখ ভারতীয়কে গোলামের জীবন যাপনের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা, মরিশাস, ফিজি, গায়না প্রভৃতি দেশে যেতে হয়েছে। অথচ যদি তারা মধ্য-এশিয়ায় যেত, তাহলে আজ সেখানে একটি ভারত-সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র থাকত।

রাত্রিতে দূর থেকে তাসখন্দের বিদ্যুতের আলো দেখা যাচ্ছিল। তাসখন্দ বড় শহর এবং এই শহর দ্রুত বেড়ে যাচ্ছিল। ২০ জানুয়ারি সকালবেলা পাহাড়ি পথে যেতে হয়েছিল। পূর্বদিকে পামিরের তুষারাচ্ছন্ন পর্বত।

বেলা একটার সময় সমরখন্দ পৌঁছোলেন রাহুল। এখানকার আপেল, আঙ্গুর ইত্যাদি ফল কাবুলের ফলের চেয়েও মিষ্টি। স্টেশনের বাইরেই এবড়ো-খেবড়ো পাথরের বেদির ওপর লেনিনের আবক্ষ মূর্তি।

২১ জানুয়ারি সকালবেলা আশেপাশে নগ্ন-পর্বত দেখা যাচ্ছিল। ইতিমধ্যে ট্রেন উজবেকিস্তান প্রজাতন্ত্র পেরিয়ে তুর্কমেনিস্তানে চলে এসেছে। দূরে বক্ষু নদীর বিস্তৃত উপত্যকা। এক লম্বা সুড়ঙ্গ পেরিয়ে এল ট্রেন। ডান দিক দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল বক্ষু নদী। সাড়ে নটা নাগাদ গাড়ি তেরমিজ স্টেশনে পৌঁছোল। তেরমিজে কয়েকদিন থেকে রাহুল আফগানিস্তানের পাসপোর্ট নিয়ে মোটর বোটে বক্ষু নদী পেরিয়ে আফগানিস্তানে পৌঁছে গেলেন। এই নদীই সোভিয়েত দেশ ও আফগানিস্তানের সীমা।

আফগানিস্তান (২৬ জানুয়ারি থেকে ৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৮)

মালপত্র সহ রাহুল মোটর বোট থেকে নেমে এসে আফগান অফিসারকে বললেন যে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তিনি মাজারশরিফ যেতে চান। অফিসার জানালেন যে, তিনি টেলিফোন করে দিচ্ছেন, মাজার থেকে টাঙ্গা এসে যাবে এবং এখান থেকে সঙ্গে একজন সেপাইও তিনি দিয়ে দেবেন। পাঁচ মাইল পরে অস্‌করখানা এল। টাঙ্গা এসে সেখানে দাঁড়িয়েছিল। অস্‌করখানা থেকে টাঙ্গা মধ্যরাতে শাগির্দের ফৌজি চৌকিতে পৌঁছোল। ২৭ জানুয়ারি সকালবেলা শাগির্দ থেকে রওনা হন রাহুল। এক সময় বড় বসতি ছিল শাগির্দ। কিন্তু এখন শাগির্দ জনশূন্য হয়ে গিয়েছিল। এখানে পাহাড় নেই, জঙ্গল নেই। কিন্তু পশুচারণের জন্য ভালো জায়গা আছে।

এই হল পুরোনো বহ্‌লীক দেশ। সড়ক কাঁচা হলেও খারাপ নয়। প্রথম এল বিমান

বন্দর। তারপর একটি মাটির পুরোনো কেল্লা, যার পাশে জানোয়ারের বাজার লেগেছিল। বালখ্, মাজার শরিফ এবং আরো এগিয়ে ঐবক পর্যন্ত উজবেক জাতির প্রদেশ। এই উজবেক জাতিই বক্ষুর অন্য পারে সোভিয়েত উজবেকিস্তানে আছে। অর্থাৎ তাসখন্দ থেকে ঐবক পর্যন্ত সারা প্রদেশ উজবেক জাতির। আফগানিস্তানের ভিতরে এই জাতির লোকেরা জানে যে নদীর ওপারে তাদেরই ভাইয়েরা এক নয়া স্বর্গ বানাচ্ছে এবং তাদের জীবন এক স্বর্গীয় জীবনে পরিণত হচ্ছে। আফগান সরকার চেষ্টা করত যাতে আফগানিস্তানের তাজিক, উজবেক, তুর্কমানরা তাদের সোভিয়েত দেশের ভাইদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না রাখতে পারে। কিন্তু তাদের আমু নদীর তীরে তো যেতেই হয়। সেখানে তারা অনেক মাইল দূর পর্যন্ত তের্‌মিজের বিজলি বাতি দেখতে পায়। সোভিয়েতের সীমা হিন্দুকুশ পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া স্বাভাবিক ছিল, যেমন স্বাভাবিক ছিল তার সীমা পোল্যান্ড ও কার্জন রেখা পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া।

মাজার এক সুন্দর শহর। আফগানি-তুর্কিস্তানের বাণিজ্যকেন্দ্র এই মাজার। এখানে আগে অনেক হিন্দুস্থানি দোকান ছিল। কিন্তু এখন আফগান সরকার আর বিদেশি সদাগরদের পছন্দ করছে না। বাল্‌খ এখান থেকে ছয় ক্রোশ। রাহুল একটা টাঙ্গা ভাড়া করে বাল্‌খ দেখতে গেলেন। এক সময়ে বাল্‌খের (বাহ্লীক) ঘোড়া বিখ্যাত ছিল। অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত বাল্‌খ শহরের ধ্বংসাবশেষ। হাজার বছর আগে বাল্‌খ সারা দুনিয়ার বড় শহরগুলির অন্যতম ছিল।

মাজার শরিফ থেকে সোজা লরি চলে যায় কাবুলে। ৬০টি আফগানি (১৫ টাকা) দিয়ে কাবুল যাওয়ার লরিতে মোটর চালকের পাশে সিট পেয়ে গেলেন রাহুল। ২০ টাকায় পেশোয়ার থেকে মাজার শরিফ পৌঁছে যাওয়া যেতে পারে এবং ২৫ টাকায় সোভিয়েতের সীমার ভেতর চলে যাওয়া যেতে পারে। দুপুরের পর মাজার থেকে রওনা হলেন রাহুল। রাত কাটাতে হল এক সরাইতে। এবার হাজারাদের প্রদেশে এলেন রাহুল। হাজারারা মোঙ্গল। আফগানিস্তানে শিয়া বলতে এরাই। বাকি সব সুন্নি।

পরদিন ৩০ জানুয়ারি বেলা দশটায় লরি ছাড়ল। কোবল-বোবাতক বেশ উঁচু জোত। সেখানে বরফ জমে ছিল। রাহুল দেখলেন লরিতে অনেক তাবিজ (মাদুলি) বাঁধা। কেন তাবিজ বাঁধা হয়েছে মোটর চালককে জিজ্ঞেস করায় সে বলল, 'কিছুটা এগোলেই দেখবেন, রাস্তা ভয়ানক বিপজ্জনক। আমি অনেক বড় বড় পীরের কাছ থেকে তাবিজ এনেছি। যদি তা না আনতাম তবে হয়তো গাড়ি এর মধ্যেই অনেকবার উল্টে যেত।'

পাহাড় থেকে উতরাইয়ের পথ পার হয়ে লরি সমতল ভূমিতে এল। এই হল সেই প্রদেশ যেখানে হিন্দুস্থানের বিজেতা সুলতান শাহাবুদ্দিনের জন্ম হয়েছিল। এখানে শালি-ধানের খেতও অনেক। আরো অনেকটা যাওয়ার পর লরি দোশী পৌঁছোল। রাত্তিরটা সেখানেই কাটাতে হল।

৩১ জানুয়ারি চা-পানের পর আবার লরি চলতে শুরু করল। রাত কাটাতে হল চলবলাতে। পরদিন (১ ফেব্রুয়ারি) হিন্দুকুশের সবচেয়ে বড় দিকচিহ্ন কোতলশঙ্কর

এল। এখানে চারদিকে শুধু বরফ আর বরফ। ক্রমাগতই বরফ পড়ছিল। কিছুটা এগোবার পর শাগির্দের বড় বসতি এল। গুরবন নদীর তীর ধরে যাচ্ছিল লরি। তীর ছেড়ে ডান দিকে গিয়ে মতক শহর। 'মতকতা অতক' (মতক থেকে অর্দক) পাঠানদের দেশ হিসেবে চিহ্নিত। এখানে কপিশার (কোহদামন) বিস্তৃত উপত্যকা ছিল। আড়াই হাজার বছর ধরে আঙুরের জন্য কপিশা বিখ্যাত। চহারেকার এখানকার বড় শহর ছিল। সারা কপিশা বরফে ঢাকা। সারা (কোহদামন) কপিশা তাজিকদের ছিল। এখান থেকে বাদাকশান হয়ে তাজিকিস্তান পর্যন্ত সারা প্রদেশ তাজিকদের। তাজিকরা লেখাপড়াতেও অগ্রসর এবং যুদ্ধে এদের শৌর্য স্বীকৃত। সপ্তম শতাব্দীতে যখন আরবরা মধ্য-এশিয়ায় পৌঁছোয়, তখন তাজিকেরা তাদের দাঁত ভেঙে দিয়েছিল। আজ ১৪ লাখ তাজিকের নিজেদের এক প্রজাতন্ত্র আছে। শিক্ষা, উদ্যোগ, ব্যবসা, সেনাবাহিনীতে এরা দ্রুত উন্নতি করছে। কোহদামনের তাজিকদের কাছে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের তাজিকদের এই প্রগতি বড় স্পৃহনীয় ছিল। বেলা দুটোয় কপিশা পেরিয়ে লরি এক ছোটো জোতে পৌঁছে গেল। এই জোতের একদিকে কপিশা, অন্যদিকে কুভা (কাবুল)। বস্তুত এই দেশই পাঠান ও তাজিক দেশের সীমা। কাবুল উপত্যকার চারদিকেই বরফ দেখা যাচ্ছিল। গাছে পাতা নেই। প্রথম বালাবাগ তারপর কাবুল শহর। বাস রাহুলকে হোটেল-কাবুলে নিয়ে এল। এটা সরকারি হোটেল। হোটেলে একটা বড় ঘর পেয়ে গেলেন রাহুল।

কাবুলে

কাবুলে (৩-৭ ফেব্রুয়ারি) প্রথমেই অকাদেমি-আফগানে (আফগান পরিষদে) গেলেন রাহুল। সেখানে এক ভারতীয় ভাই ইয়াকুব হাসান খাঁর সঙ্গে দেখা হল। ২৩ বছর আগের কথা। জার্মানির সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ চলছিল। সেই সময় লাহোর কলেজের কিছু ছাত্র দেশ থেকে এই উদ্দেশ্যে পালিয়ে আসে যে তারা ভারতের বাইরে গিয়ে নিজের দেশকে স্বাধীন করার চেষ্টা করবে। ইয়াকুব হাসান এই যুবকদের একজন ছিলেন। আজও তাঁর হৃদয়ে দেশভক্তির আগুন জ্বলছিল। কিন্তু এখন তিনি তাঁর বেশির ভাগ সময় সাহিত্যকর্মে নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ায় রাহুলের বড় আনন্দ হল। পাঁচ ঘণ্টা তিনি সেখানেই কাটালেন। অকাদেমি পশ্‌তো সাহিত্যের জন্য অনেক কাজ করছিল। সেখানে এক নতুন ব্যাকরণ ও কোষ তৈরি করা হচ্ছিল। কয়েকটি পুস্তক ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছিল। কাবুলের পাঠানরা ফার্সি ভাষা গ্রহণ করেছিল। কাবুলের রাস্তায় পশ্‌তো ভাষার মতোই ফার্সি বলা হত। প্রথম দিকে পাঠানরা তাদের মাতৃভাষাকে গেঁয়ো মনে করে তাকে উপেক্ষা করত। কিন্তু এখন তাদের মধ্যে জাতীয়তার ভাব জাগ্রত হয়েছে। তারা পশ্‌তোকেই সবার ওপরে রাখতে চাচ্ছে। কাবুলে থাকাকালীন ইয়াকুব হাসান চার-পাঁচ ঘণ্টা করে প্রতিদিন রাহুলের সঙ্গে থাকতেন। পশ্‌তো ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার কী সম্বন্ধ এ নিয়ে প্রচুর আলোচনা হত। পশ্‌তোর ওপর ফার্সি প্রভাব থাকলেও সংস্কৃতের সঙ্গে এ ভাষার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর।

কাবুলের মিউজিয়ামটি নতুন। কিন্তু এর সংগ্রহ ভালো। হড্ডা থেকে পাওয়া একটি মৈত্রেয় মূর্তির দুপাশে শক ও আফগান পরিচ্ছদের সুন্দর চিত্ররূপ দেওয়া ছিল। এই চিত্র দেখে বোঝা গেল যে পাঠানরা দ্বিতীয়, তৃতীয় শতকেও সালোয়ার পরত। শাগির্দ থেকে পাওয়া মাটির অনেক সুন্দর মূর্তি, বেগ্রাম থেকে পাওয়া হাতির দাঁতের ওপর সাঁচি ও ভরহুতের মতো অনেক স্তূপের ছবি উৎকীর্ণ ছিল। পাণিনির সময়ে কপিশার সুরা অত্যন্ত বিখ্যাত ছিল।

কাবুলে ৪০০ হিন্দু পরিবার বাস করে। তাদের ২২টি মন্দির আছে। তারা নিজেদের কয়েকটি তীর্থ গড়ে তুলেছে। অনেক হিন্দু মহিলা হলুদ বোরখা ব্যবহার করে। 'বড্ডা থাওঁ' কাবুলের সবচেয়ে বড় হিন্দু মঠ। কথিত আছে, এখানে গোরখনাথের শিষ্য বীররতন নাথ এসেছিলেন। তিনি প্রাঙ্গণের শুকনো গাছগুলিকে সবুজ করে দিয়েছিলেন। এই মঠের মোহান্ত পেশোয়ারে থাকেন। আশামাঈ-এর মোহান্ত রাঘবদাসও পেশোয়ারে থাকেন। এই মঠে সাধুরা আগে আসা-যাওয়া করতেন। কিন্তু যখন পাসপোর্ট আবশ্যিক হয়ে পড়ল, তখন থেকে সাধুদের আসা বন্ধ হয়ে গেল।

কাবুল ছেড়ে এলেন রাহুল

৮ ফেব্রুয়ারিতে ৫ টাকায় পেশোয়ারের লরিতে মোটর চালকের পাশে বসার জায়গা পেয়ে গেলেন রাহুল। কাবুল থেকে পেশোয়ার ১৩১ মাইল। বেলা ১টায় গাড়ি ছাড়ল। রাত্রি ১১টায় গাড়ি জালালাবাদ পৌঁছোল। এখানে গাছের পাতা সবুজ। গরম লাগছিল রাহুলের। ২২ মাইল আরো যাওয়ার পর রাত দুটোয় লরি দক্কা পৌঁছোল এবং রাতটা সেখানেই কাটাতে হল। দক্কায় পাসপোর্ট অফিসার পাসপোর্ট পরীক্ষা করতে দেরি করলেন। তারপর সেখান থেকে ৩ মাইল হেঁটে তীরখম পৌঁছোবার পর আফগান অফিসাররা পাসপোর্ট দেখে ছেড়ে দিলেন। কয়েক পা হেঁটে গেলেই একটি গেট, যা ইংরেজ-ভারত ও আফগানিস্তানের সীমা। আবার পাসপোর্ট পরীক্ষা হল। দেড় ঘণ্টা পর আবার বাস চলল। সেখান থেকে পেশোয়ার মাত্র ৪৯ মাইল। ৪ মাইলের হালকা চড়াইয়ের পর লান্ডিখান। এই পর্যন্ত রেল এসেছে। তারপর খাইবার গিরিবর্ত্মে ঢুকে চড়াইয়ে যেতে যেতে লান্ডিকোটাল। ১৯২৬-এ একবার রাহুল এই পর্যন্ত এসেছিলেন। সড়ক সব জায়গায়ই ভালো। রাস্তায় পাঠানদের অনেক গ্রাম। পাঠানরা লাঠির মতো বন্দুক নিয়ে ঘুরছিল। জমরুদে আবার মোটর চালকের কাগজপত্র পরীক্ষা করা হল। সামনে পেশোয়ারের সবুজে ভরা উপত্যকা। শিকাবপুরীদের ধর্মশালার খবর পেয়ে মালপত্র নিয়ে রাহুল সেখানে গিয়ে উঠলেন। পরদিন সাহারানবাদের ট্রেন ধরে ১১ ফেব্রুয়ারি সাহারানপুরে পৌঁছোলেন। সেখানে থেকে সারনাথ-নালন্দা-রাজগির হয়ে পাটনা। তারপর আবার তিব্বত।

সোভিয়েত দেশে : তৃতীয়বার

দ্বিতীয়বার সোভিয়েত যাত্রার সময় রাহুল ইরান হয়ে গিয়েছিলেন। তৃতীয়বারও সেই একই পথে কোয়েটা-জাহিদান হয়ে লরিতে তিনি ইরানে যান। কিন্তু ইরানে এসে সোভিয়েত ভিসার জন্য ১৯৪৪-এর ৮ নভেম্বর থেকে ১৯৪৫-এর ৩ জুন পর্যন্ত এমন একটা পরিস্থিতিতে তাঁকে কাটাতে হয়েছিল যা সহনীয় ছিল না। এ সময়ে কখনো কখনো রাহুলের মনে ভারতে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা হত।

ইরান থেকে সোভিয়েত দেশে উড়ে গেলেন রাহুল। শেষপর্যন্ত অনেক ঘোরাঘুরির পর ৩ জুন ফৌজি বিমানে সোভিয়েত দেশে রওনা হলেন রাহুল। রাহুলের এই প্রথম বিমান-যাত্রা। কাস্পিয়ান সাগরের ওপর দিয়ে বিমান উড়ে গেল স্তালিনগ্রাদে। ১৯৪৫-এর জুন। জার্মানি পরাজিত হওয়ার একমাসও কাটেনি। বিধ্বস্ত স্তালিনগ্রাদে নামল বিমান। স্তালিনগ্রাদ এখন বাসযোগ্য শহর নয়। হাজার হাজার ভাঙা মোটর ও বিমানের স্তূপ। প্রায় সবই জার্মান বিমান। অধিকাংশ কারখানাই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে ছিল। স্তালিনগ্রাদের অজেয় ভূমিতে পা রেখে প্রচণ্ড আবেগে অবিভূত হয়ে গেলেন রাহুল। স্তালিনগ্রাদে এসে তাঁর যে নতুন উপলব্ধি হল তা বৌদ্ধধর্ম থেকে মার্কসবাদে উত্তরণ সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি লিখছেন 'একথা বলা যেতে পারে যে ঘোর নিদ্রার পরে এখন আমার রাজনৈতিক চোখ খোলার সুযোগ মিলল। বিপ্লবের প্রকৃত সত্যটি জানতে পারলাম, যা আমার মনকে সোভিয়েতের প্রতি এমনভাবে আকৃষ্ট করল যে বলা যেতে পারে—সোভিয়েত দেশ আমার হৃদয় ছিনিয়ে নিল।'

তাঁর তৃতীয়বার সোভিয়েত ভূমিতে বাস পঁচিশ মাস স্থায়ী হয়েছিল। তাই যুদ্ধের অব্যবহিত পরের সোভিয়েত দেশের সরকার ও মানুষকে তিনি খুব নিকট থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। মিঠেকড়া দুই রকমের অভিজ্ঞতাই তাঁর হয়েছিল। তাদের দোষগুণ দুই-ই তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল। দোষের পাল্লা বেশি ভারি ছিল বলে তাঁর মনে হয়নি। 'সোভিয়েত রাশিয়ার মানবতার প্রতি ভালোবাসা আমাকে বেঁধে ফেলেছিল।' 'ইতিহাসকে আমি মানি এবং চিরকাল মানব।' মানবতার প্রগতির পথে সব চেয়ে বড় বাধা ছিল হিটলারি ফ্যাসিবাদ। সোভিয়েত রাশিয়াই তা ধ্বংস করেছিল। সোভিয়েত দেশের এই বিজয়ে সাম্যবাদের যে বিশ্বব্যাপী প্রসার ঘটবে তাতে রাহুলের সন্দেহ ছিল না। সন্ধ্যা নাগাদ রাহুল স্তালিনগ্রাদ থেকে মস্কো পৌঁছে গেলেন। তারপর ট্রেনে স্তালিনগ্রাদে। গতবার রাহুল লেনিনগ্রাদ এসেছিলেন শীতকালে। এবার এসেছেন গরমের দিনে। এখানকার গরম কেদারনাথ-বদরিনাথের গরমের দিনের মতো। এসময়ে বরফ থাকে না। শুধু সবুজ আর সবুজ। রাত্রি এগারোটাতেও অন্ধকার হল না। লেনিনগ্রাদে তখন সাদা রাত্রি চলছে। যুদ্ধের সময় লেনিনগ্রাদ নয়শো দিন অবরুদ্ধ হয়েছিল। অন্য কোনো নগর হলে হয়তো অনেক আগে আত্মসমর্পণ করত। দীর্ঘকাল নগর অবরোধের অর্থ কি, তা অবরুদ্ধ মানুষ ছাড়া অন্যের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। নশো দিন অবরোধের ছাপ ছিল প্রতিটি মানুষের মুখে। 'লোলাও আর সেই লোলা নেই। লোলাকে বুড়ি বলে

মনে হচ্ছিল।' তাঁর একটি পুত্র সন্তান হয়েছে, সেই খবর শের্বাৎসকি তাঁকে ভারতে জানিয়েছিলেন। পুত্র ঈগরকে যখন তিনি প্রথম দেখলেন তখন ঈগর বালোদ্যানে খেলছিল। বেশ লম্বা হয়েছে ঈগর। তার সঙ্গে রাহুল কথা বলবেন কি করে। তাঁর তো রুশ ভাষার পুঁজি অতি সামান্য। 'কিন্তু ভালোবাসার জন্য ভাষার প্রয়োজন হয় না।'

গতবার রাহুল দেখেছিলেন, লেনিনগ্রাদে বিশ ঘণ্টার দিন ও চার ঘণ্টার রাত। এবার চার ঘণ্টার রাতও নয়। কেননা এই চার ঘণ্টাকে গোধূলি ও উষা ভাগ করে নিয়েছে। বেশির ভাগ সময় রাহুল ঘরেই কাটাতেন। যুদ্ধের প্রভাব ঘরের ভেতরেও দেখতে পেতেন রাহুল। পুরুষের চেয়ে সর্বত্রই স্ত্রীলোকের সংখ্যাধিক্য। ট্রাম চালাত স্ত্রীলোক, টিকিট দিত স্ত্রীলোক, দোকান ও দপ্তরের কাজ করত স্ত্রীলোক। চৌরাস্তায় পুলিশের কাজেও অধিকাংশই ছিল স্ত্রীলোক।

স্বল্পকালের মধ্যেই লেনিনগ্রাদকে রাহুলের নিজের শহর বলে মনে হতে লাগল। ডঃ মেঘনাদ সাহা সোভিয়েত বিজ্ঞান অকাদেমির আমন্ত্রণে লেনিনগ্রাদে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা হল রাহুলের।

লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগের গ্রন্থাগারে চার লাখের বেশি বই ছিল। সারা বিশ্ববিদ্যালয়েও নারীদের রাজ্য। ছাত্রদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ছিল পনেরো বা বিশ শতাংশ। আর গ্রন্থাগারকে স্ত্রীলোকদের বিভাগই বলা উচিত। এ থেকে বোঝা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কত পুরুষ মরেছিল।

ইউরোপে যুদ্ধ শেষ হওয়ার স্বল্পকাল পরেই রাহুল লেনিনগ্রাদ গিয়েছিলেন। যে-ভূমি রাশিয়ার অন্নের যোগান দিত, সেই ভূমি জার্মানির অধিকারে ছিল। তাই অন্নের অভাব ছিল রাশিয়ার। কিন্তু রেশন-ব্যবস্থা ছিল। সেখানে সস্তা দামে আবশ্যিক খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যেত। প্রতি সপ্তাহে যা পাওয়া যেত, তাতে সপ্তাহ কেটে যেত। কিন্তু অতিথি সৎকার করা যেত না।

ব্ল্যাক মার্কেট এখানে ছিল না। রেশনে যা দেওয়া হত তার অতিরিক্ত কোনো সামগ্রী যদি কারুর দরকার হত তাহলে তা পাওয়া যেত সরকারি দোকান থেকে। সরকার এমন দোকান খুলে রেখেছিলেন যেখানে রেশনকার্ড ছাড়া বিশগুণ-ত্রিশগুণ বেশি দাম দিয়ে লোক যত ইচ্ছা জিনিস কিনতে পারত।

লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের প্রোফেসর হয়ে এসেছিলেন রাহুল। বরান্নিকোফ ছিলেন বিভাগীয় অধ্যাপক, আর দুজন লেকচারার ছিলেন।

লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা

এর আগে অধ্যাপনার কাজ রাহুল বিশেষ করেননি। ভারতে ইতস্তত দুয়েক বছর সংস্কৃত পড়িয়েছিলেন। শ্রীলঙ্কায় দেড় বছরের কিছু বেশি সময় সংস্কৃতের অধ্যাপনা করেছিলেন। কিন্তু এখন ইউরোপের একটি প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত পড়াতে হবে আধুনিক পদ্ধতিতে; পড়ানোর মাধ্যম সংস্কৃত নয়, ইংরেজিও নয়। সাধারণ ছাত্র ছাড়াও

বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু অধ্যাপক দর্শন ও কাব্যের উচ্চতর গ্রন্থ রাহুলের কাছে পড়তেন। তাই পড়ানোর নিজস্ব পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হয়েছিল রাহুলকে। ক্লাসে একজন ছাত্র ছিল, বাকি চারজন ছাত্রী। সারা বিশ্ববিদ্যালয়েই ছাত্র-ছাত্রীর এই হার ছিল।

সোভিয়েত শিক্ষাপ্রণালীতে সাত বছর মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ বাধ্যতামূলক। এই বাধ্যতামূলক শিক্ষা শেষ হত ১৪ বছরে। তারপর তিন বছর শিক্ষার পর হাই স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত হত। প্রত্যেক রুশি ছাত্রকে তার মাতৃভাষা ছাড়া ইউরোপের তিনটি ভাষার (ফরাসি, জার্মান ও ইংরেজি) একটি শিখতে হত।

পরীক্ষায় মুখস্থের ব্যাপারটা একেবারেই ছিল না। ভারতের মতো পরীক্ষা এখানে যুদ্ধক্ষেত্রের রূপ নেয় না। এখানে পরীক্ষার জন্য প্রশ্নপত্র ছাপা হয় না। হাজার হাজার পরীক্ষার খাতাও দেখতে হয় না। হাই স্কুলের ছাত্র অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের পরীক্ষা নিতে হত তাদের অধ্যাপকদের। মৌখিক প্রশ্ন করা হত। উত্তর দেওয়ার জন্য ছাত্র-ছাত্রীরা সব বই তাদের সঙ্গে রাখতে পারত। বস্তুত ক্লাসে বেশি অনুপস্থিত না থাকলে কোনো ছাত্রের ফেল হওয়া সম্ভব ছিল না।

হাই স্কুল (দশম শ্রেণি) থেকে পাশ করে ছাত্র মেডিক্যাল, ইনজিনিয়ারিং অথবা টেকনিক্যাল কলেজে ভর্তি হতে পারত। সব কলেজেই পাঁচ বছরের কোর্স। রাহুলের ক্লাসেও হাই স্কুল থেকে পাশ করে ছাত্ররা আসত। নব্বই শতাংশ ছাত্র সরকারি বৃত্তি পেত। বাকি দশ শতাংশকে বেতন দিতে হত। কারণ তাদের অভিভাবকেরা ভালো বেতন পেতেন।

রাহুলের প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগে মিশর থেকে জাপান পর্যন্ত সব বিভাগের ইতিহাস পড়ানোর ব্যবস্থা ছিল। রুশ পণ্ডিতেরা প্রথম দিকে বৌদ্ধধর্ম ও তিব্বতি সাহিত্যের মাধ্যমে ভারতের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। তিব্বতি ও সংস্কৃত পৃথক ভাষা বংশীয় হলেও প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগের ছাত্রদের এই দুই ভাষাই পড়তে হত।

প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগে দেশ ও ভাষা অনুসারে আলাদা আলাদা উপবিভাগ ছিল। আরবি, জাপানি ও চীনা উপবিভাগ ছিল। একটি উপবিভাগ ছিল ইন্দো-তিব্বতি, যাতে সংস্কৃত, ভারতের আধুনিক নানা ভাষা ও তিব্বতি ভাষার পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা ছিল। তিব্বতি ভাষা ও বৌদ্ধধর্ম থেকেই রাশিয়া ভারত সম্পর্কে জানতে পেরেছিল। তাই তিব্বতি ও সংস্কৃত আলাদা জাতের ভাষা হওয়া সত্ত্বেও এই দুটি ভাষাকে একসঙ্গে শেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই উপবিভাগে ভর্তি হয়ে ছাত্ররা শুধু ভাষা শিখত, তাই নয়, যে দেশের ভাষা সেই দেশ সম্পর্কে সব প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয় তাদের জানতে হত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে রাহুলের উপরিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের পাঁচ বছর সংস্কৃত ও হিন্দি পড়া আবশ্যিক ছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে প্রত্যেক বছর তাদের ভারতের দুয়েকটি প্রাদেশিক ভাষা শিখতে হত। ভারতীয় ইতিহাস, ভারতীয় সাহিত্য, ভারতীয় ধর্মই শুধু ছাত্রদের শিখতে হত তা নয়, ভারতীয় অর্থশাস্ত্র শেখাও তাদের পক্ষে আবশ্যিক ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই স্নাতকেরা রাশিয়া ও ভারতের মধ্যে রাজনীতিক, সামাজিক,

সাংস্কৃতিক, বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনে প্রধান ভূমিকা নেবে। তাই তাদের এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় যে তারা যেন ভারতীয় ভাষা ও ভারত বিষয়ক অন্য জ্ঞানও অর্জন করতে পারে।

যেহেতু রাহুল প্রোফেসর হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন, তাই তাঁকে সপ্তাহে বারো ঘণ্টা পড়াতে হত। প্রথম বছর তাঁকে সংস্কৃত ও হিন্দি পড়াতে হত। দ্বিতীয় বছর পড়াতে হত তিব্বতি। তাঁর বিভাগে ১৯৪৭-এর প্রথম দিকে প্রায় চল্লিশজন ছাত্র-ছাত্রী ছিল। অধ্যাপিকা ছিলেন সাত-আট জন। অকাদেমিক বরান্নিকোফ উপবিভাগের অধ্যক্ষ এবং রাহুল প্রোফেসর। অন্য কয়জন ছিলেন লেকচারার। কালিয়ানোফ সংস্কৃতের লেকচারার, বিস্ত্রোবর্নি ও দীনাগোলদ্‌মান হিন্দির লেকচারার ছিলেন। তাছাড়া বাংলা ভাষারও লেকচারার ছিলেন। সুলেকিন রাজনীতি ও অর্থনীতি পড়াতেন।

বলশেভিক রাশিয়া সাম্যবাদী দেশ। এখানে সাম্যবাদী অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত। আলাপ-আলোচনার সময় প্রত্যেকে সমান, এই শিষ্টাচার মানা হত। সাধারণ শ্রমিকের সঙ্গে কথা বলার সময় অকাদেমিক বরান্নিকোফ অথবা যে কোনো প্রোফেসরকে তাঁর সঙ্গে হাত মেলাতে হত, টুপি খুলে শিষ্টাচার প্রদর্শন করতে হত। মন্ত্রীর সমান বেতন পান এমন প্রোফেসরকেও রন্ধনের জন্য কাঠ কাটতে হত, বাসন মাজতে হত, ঘর ঝাঁট দিতে হত, কাপড় কাচতে হত।

বাড়িতে কাঠ কাটার কাজটা করত লোলা। কিন্তু বাসন মাজার কাজটা ছিল রাহুলের। শীতে বাসন মাজার কাজটা রাহুলের পক্ষে সহজ ছিল না। বাড়িতে কাজ করার লোক রাখার মাইনে দিতে পারলেও রেশনে কুলোত না। এখানে স্থায়ীভাবে কোনো লোক রাখা সম্ভব ছিল না। প্রয়োজন হলে বিশেষ কাজের জন্য লোক রাখা হত। সাধারণভাবে এখানে কায়িক শ্রম মর্যাদাহানিকর বলে কেউ মনে করতেন না। বিশ-পঁচিশ সের খাদ্যসামগ্রী পিঠে বয়ে আনতে কোনো অধ্যাপকই লজ্জিত বোধ করতেন না। তার কারণ রুশ বিপ্লব শ্রমের মর্যাদা দিয়েছে। রুশ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিমণ্ডল ছিল ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিমণ্ডল থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে যাদের প্রথম শ্রেণির মস্তিষ্ক তাদের বেশি বেতনের জন্য অন্য কোনো সরকারি চাকরিতে যেতে হয় না। এখানে প্রোফেসর ও মন্ত্রীর বেতনে কোনো পার্থক্য ছিল না। বরং অধ্যাপকদের সম্মান বেশি ছিল।

পুঁজিবাদী দেশের কাগজ ও লেখকেরা প্রচার করে যে, সোভিয়েত রাশিয়ায় মত-প্রকাশের স্বাধীনতা নেই। একথা সত্য যে, পুরোনো স্বার্থের প্রতিনিধিদের জন্য খবরের কাগজের দরজা আগের মতো খোলা নেই। সোভিয়েত দেশে ব্যক্তিগত মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নেই একটি বিশেষ অর্থে। এখানকার দৈনিক, মাসিক বা সাপ্তাহিক কাগজ যেমন *ইজভেস্তিয়া, প্রাভদা* প্রভৃতি খবরের কাগজ অথবা ইউনিভার্সিটি, মজদুর, সৈনিক ও ছাত্র সংগঠনের কাগজ বের হয়। যে সংগঠন কাগজ বার করে, সে তার বিরুদ্ধে প্রচারের সহায়তা করতে পারে না। প্রকাশ্য বক্তৃতা সম্পর্কেও একথা বলা চলে। পুঁজিবাদী দেশে পুঁজিপতিদের মালিকানাধীন সংবাদপত্রে মত-প্রকাশের স্বাধীনতা আছে।

কিন্তু পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে লিখলেও তারা তাদের কাগজের দরজা বন্ধ করে দিতে পারে। সুতরাং পুঁজিবাদী দেশে মতপ্রকাশের যে স্বাধীনতা আছে তারও সীমাবদ্ধতা আছে।

কিন্তু সোভিয়েত দেশে তা সম্ভব নয়। এ বিষয়ে এ কথা মনে রাখতে হবে যে সোভিয়েত দেশে আর্থিক ও শিক্ষা ক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ব সাফল্য এসেছে তা কেবল অভূতপূর্ব নয়, তার পরিমাণ এত বেশি যে তা থেকে জনতার নিরানব্বই শতাংশ মানুষ লাভবান হয়েছে। নিজেদের চোখের সামনে তারা এই লাভ দিনের পর দিন বাড়তে দেখেছে। সোভিয়েত শাসন জনতার হৃদয়ে স্থায়ী স্থান করে নিয়েছে। জনতার নিরানব্বই শতাংশ সোভিয়েত শাসনের অন্ধ ভক্ত। স্তালিন তো তাদের জন্য জীবন্ত ভগবান। তাঁর বিরুদ্ধে একটি শব্দও সোভিয়েত জনতা শুনতে প্রস্তুত নয়।

অবশ্য রাহুল স্বীকার করেছেন যে, বিরোধী মতাবলম্বী লোকও আছে। তারা নিজেদের মতপ্রকাশ করে না তাও নয়। তবে তা প্রকাশ করে নিজেদের বন্ধু-বান্ধব মহলে। রাহুলের এই ছেলেমানুষি মন্তব্য যে ধোপে টেকে না তা রাহুল বুঝতে পারেননি। মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অর্থই হল প্রকাশ্যে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা। বন্ধু-বান্ধব মহলে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কখনোই কেউ কেড়ে নিতে পারে না। কিন্তু রাশিয়ায় তাও ছিল, সেকথাও বলা চলে না। তার কারণ কেজিবি-র সর্বত্র উপস্থিতি। রাহুল একথা বুঝতে পারেননি, তার কারণ রাহুলও ছিলেন সোভিয়েত দেশের অন্ধ ভক্ত। ১৯৪৫-এর বিধ্বস্ত, বিজয়ী রাশিয়ায় গিয়ে যে কোনো মানুষেরই সোভিয়েত ব্যবস্থা ও স্তালিনের প্রতি অন্ধ ভক্তি হতে পারে। কিন্তু অন্ধ ভক্তির অন্ধতাও স্বীকার্য। প্রতিবাদ কণ্ঠরুদ্ধ করে রাখাই সোভিয়েত ব্যবস্থার fatal blow—একথা সেই সময়ে যদি রাহুল বুঝতে পারতেন, তাহলে হয়তো তা রাহুলের চরিত্রানুগ হত না। এক ধরনের একদেশদর্শিতা রাহুলের চরিত্রে ছিল যা থেকে তিনি কখনোই নিজেকে মুক্ত করতে পারেননি। রাশিয়ায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নেই, এই সত্যটিকে তিনি মধ্যবিত্ত শ্রেণির পুরোনো মনোবৃত্তির প্রকাশ বলেই মনে করতেন। রাহুলের মতে, এই মনোবৃত্তি পালটাতে সময় লাগবে। পত্র-পত্রিকার ব্যক্তিগত মালিকানা নেই, মালিকানা বিভিন্ন সংগঠনের। এই সব সংগঠন তাদের বিরুদ্ধে লেখা ছাপে না। নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যে তাদের মতবাদ প্রকাশ করতে কেউ দ্বিধা করে না। রাহুল একথা স্বীকারই করেছেন যে ব্যক্তি হিসেবে মানুষের কোনো স্বীকৃতি দেয় না সোভিয়েত দেশ। এই অস্বীকৃতি যুদ্ধ অথবা ঠাণ্ডা লড়াইয়ের প্রয়োজনে আবশ্যিক—যদি একথা রাহুল বলতেন তবে তা হয়তো মেনে নেওয়া যেত। কিন্তু রাহুলের উক্তিটি মানুষের প্রাতিস্বিক অস্তিত্বের, তার মনুষ্যত্বের বিরুদ্ধে যায়।

মস্কোতে একপক্ষ

লেনিনগ্রাদে আসার এক মাসের মধ্যেই রাহুল মস্কোতে পক্ষকাল কাটিয়ে আসার সুযোগ পান। এ সময় তিনি মস্কো শহরকে খুঁটিয়ে দেখার সুযোগ পান। বিশেষ করে

তিনি লেনিন মিউজিয়ামের অনুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন এই সময়। লেনিনের জীবন ও ব্যক্তিত্ব বোঝার জন্য এখানে সব রকমের সামগ্রী একত্র করা হয়েছিল। লেনিনের জীবনের সব অবস্থার ফোটো তুলে ও ছবি এঁকে তাঁর জীবনের ইতিহাসের বাস্তব রূপ দেওয়া হয়েছিল। লেনিনের সব বই এবং ভিন্ন ভাষায় তার অনুবাদের চমৎকার সংগ্রহ ছিল এই মিউজিয়ামে। মস্কোর রঙ্গমঞ্চে এবার তিনি তলস্তয়ের 'অ্যানা কারেনিনা' দেখে মুগ্ধ হন।

লেনিনগ্রাদে এসে রাহুল স্থির করেছিলেন যে, মধ্য-এশিয়া সম্পর্কে তিনি একটি বই লিখবেন। কেননা মধ্য-এশিয়া সম্পর্কে শিক্ষিত মানুষেরও জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। ১৯৪৭-এ ভারতে ফিরে যাওয়ার আগেই তিনি সোভিয়েত মধ্য-এশিয়া সম্পর্কে একটি বই লিখে ফেলেছিলেন। কিন্তু মধ্য-এশিয়া সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা সহজ ছিল না। ইংরেজি, জার্মান, ফরাসি ও রুশ ভাষাতেও এবিষয়ে কোনো সুসমৃদ্ধ পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস ছিল না।

মধ্য-এশিয়ার ইতিহাস অধ্যয়ন

মধ্য-এশিয়ার ইতিহাসের *ভক্তিরস* অধ্যয়ন করার সময় তাঁর দৃষ্টি বেদেদের দিকে আকৃষ্ট হয়। প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ বরান্নিকোফের সংস্কৃত ও অন্যান্য অনেক ভারতীয় ভাষায় ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি রোমনি অথবা সিগান অর্থাৎ বেদেদের ভাষা বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। রাহুল তাঁর বই পড়ে রোমনির উৎপত্তি সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেন। ক্রমে রাহুলের দৃঢ় ধারণা জন্মে যে, রোম (যা থেকে রোমনি ভাষার নামটি এসেছে) আসলে ভারতীয় ডোম শব্দের পরিবর্তিত রূপ। ডোমেরা ছিল ভবঘুরে। কোনো একসময় তারা ভারতের বাইরে পশ্চিমদিকে চলে যায়। এরা এক সময় লোলো নামেও অভিহিত হতে থাকে। ইরান ও মধ্য-এশিয়ায়ও এদের অনেকে চলে গিয়েছিল। অন্যান্য অনেক দেশেও এরা চলে যায়। কিন্তু সর্বত্র এরা এদের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারেনি। কিন্তু ইউরোপে এরা এদের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। রাহুল এদের ভাষায় ভোজপুরি, বুন্দেশখন্ডি, ব্রজ ও অওয়ধির বিশেষত্ব লক্ষ করেছিলেন। রাহুলের মতে অধিকাংশ রোম (ভারতীয় ডোম) খ্রিস্টিয় ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও এদের এখনো পেশোয়ার থেকে রেঙ্গুন এবং হরিদ্বার থেকে মাদ্রাজ পর্যন্ত ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। যখন রাজনৈতিক বাধা ছিল না তখন এরা ভারত থেকে মধ্য-এশিয়া ও ইরান পর্যন্ত ঘুরে বেড়াত। তারপর এক সময়ে রাজনৈতিক উথাল-পাথালের জন্য এদের ভারতে ফিরে আসার রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর ভারতের সঙ্গে এদের সম্পর্ক আর জোড়া লাগেনি। ক্রমে এরা পশ্চিম থেকে আরো পশ্চিমে চলে যায়। বাঁদর ও ভালুক নাচানো, হাত দেখা ইত্যাদির সঙ্গে এরা পশ্চিমে গিয়ে ঘোড়া পালন ও বেচার পেশাও গ্রহণ করে।

বেদেদের সম্পর্কে রাহুলের ঔৎসুক্যের কারণ মধ্য-এশিয়ার প্রতি তাঁর আকর্ষণ। ভ্রাম্যমান রাহুলের রাশিয়া ও মধ্য-এশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ হয়েছিল। কিন্তু কোনো দেশের ইতিহাস সম্পর্কে সম্যক ধারণা করতে হলে সেই দেশের ইতিহাসের পটভূমিকে জানা আবশ্যিক। মধ্য-এশিয়ার ইতিহাস ভারতের ইতিহাসের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। দ্রাবিড় জাতি হরপ্পা সভ্যতা সৃষ্টি করেছিল বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন। এই দ্রাবিড় জাতির মধ্য-এশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। পুরাতাত্ত্বিক গবেষণা থেকে জানা যায় যে, আর্যদের দ্রাবিড় জাতির সঙ্গে সংযোগ সিন্ধু উপত্যকায় ঘটেনি, ঘটেছিল খ্বারেজম্-এ। সেখানে দ্রাবিড়দের পরাজিত করে আর্যরা ভারতের দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু ভারতের দিকে এগিয়ে এলেও তারা পেছনের বিজিত ভূমির ওপর তাদের অধিকার ছেড়ে দিয়ে আসেনি। হূনরাও মধ্য-এশিয়া থেকেই ভারতের দিকে এগিয়ে আসে। মধ্য-এশিয়া থেকে অনেক ঢেউ ভারতে এসে পরপর আছড়ে পড়ে। ব্যাকট্রিয়া থেকে গ্রিকরাও ভারতে এসে ভারতের কিছু অংশ শাসন করে। শক-কুষাণ ও তথাকথিত হূনেরাও মধ্য-এশিয়া থেকে ভারতের দিকে আসে। ইসলামও মধ্য-এশিয়া থেকেই এসেছিল। ভারতের এইসব শাসক জাতির সবাই সবশুদ্ধ চলে আসেনি। তাদের কিছু কিছু অংশ মধ্য-এশিয়াতেই থেকে যায়। তাই মধ্য-এশিয়ার ইতিহাস না জানলে ভারতের ইতিহাসের সম্যক জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়।

মুখ্য চীন, ভারত-আফগানিস্তান, ইরান ও কাস্পিয়ান সমুদ্র দ্বারা ঘেরা ভূমির মধ্যেই রাহুল মধ্য-এশিয়াকে সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছেন। কিন্তু এই মধ্য-এশিয়ার সীমান্তবর্তী দেশেও তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। কেননা তা না হলে মধ্য-এশিয়ার ইতিহাস ভালো করে বোঝা যাবে না বলে তিনি মনে করতেন। সুতরাং বলশেভিক রাশিয়ার অনুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ ও মধ্য-এশিয়ার ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ এই দুটি প্রবল ইচ্ছার দ্বারা তাড়িত হয়ে তিনি তিনবার রাশিয়ায় এসেছিলেন। লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা তাঁর এই দুটি ইচ্ছা পূরণেরই সুযোগ দিয়েছিল। লোলা ও ঈগরের ভালোবাসা তাঁকে দিয়েছিল ক্ষণিক বিশ্রামের পরিতৃপ্তি।

মধ্য-এশিয়ার ইতিহাসের অধিকাংশ উপাদানই তিনি সংগ্রহ করেছিলেন তাঁর পঁচিশ মাসের রাশিয়া প্রবাসের সময়। মধ্য-এশিয়ার ইতিহাসের যত উপাদান রাশিয়ায় ও রুশ ভাষায় আছে, তত আর কোথাও নেই। তাছাড়া মধ্য-এশিয়া বিশেষজ্ঞ রুশ পুরাতাত্ত্বিক তালস্তোফ ও বের্নস্তামের সঙ্গেও তাঁর মধ্য-এশিয়ার পুরাতত্ত্ব ও ইতিহাস সম্পর্কে অনেক আলোচনা হয়েছিল। আড়াই বছর পরে সোভিয়েত রাশিয়া থেকে রাহুলের চলে আসার বড় কারণ ছিল রাশিয়ায় মধ্য-এশিয়া সম্পর্কে অধ্যয়ন ও সংগৃহীত উপাদানকে পুস্তকাকারে ধরে রাখার আকাঙ্ক্ষা। রাশিয়ায় রাহুল মধ্য-এশিয়া সম্পর্কে চার-পাঁচ মন বই সংগ্রহ করেছিলেন। তাছাড়া রাশিয়ায় থাকাকালীন তিনি মধ্য-এশিয়া সম্পর্কে অনেক নোট নিয়েছিলেন। রাশিয়ায় বসে বই লিখলে তা সূর্যের আলো দেখবে এমন ভরসা রাহুলের ছিল না।

লেনিনগ্রাদের নৃতাত্ত্বিক মিউজিয়ামে সোভিয়েত মধ্য-এশিয়ায় প্রাপ্ত সবচেয়ে পুরোনো মানুষের মাথার খুলির নমুনা দেখেছিলেন রাহুল। এই খুলি দেখে মানুষের মূর্তিটি কীরকম হতে পারে, তা সোভিয়েত শিল্পী তৈরি করে দেখিয়েছিলেন। তৈমুরের মাথার খুলি দেখে শিল্পী যে আকৃতি বানিয়েছিলেন তা তৈমুরের সমকালীন চিত্রের সঙ্গে বেশ মিলে যায়। মধ্য-এশিয়ার বিভিন্ন চলমান জাতি সম্পর্কে রাহুলের গভীর কৌতূহল ছিল। মধ্য-এশিয়ার শকেরা রাহুলের কাছে একটা সমস্যার মতো ছিল। শকদের সম্পর্কে রাহুলের নিজস্ব কিছু মতামত ছিল। তাঁর ধারণা জন্মেছিল যে, খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে শক জাতি কাস্পিয়ানের উত্তর-পশ্চিমে দানিয়ুব পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। তারপর তারা ককেশাস ও সিরদরিয়ার উত্তরে আরো এগিয়ে চলে গিয়েছিল। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে আলেকজান্ডারের সময় তারা সিরদরিয়া থেকে দানিয়ুব পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে নীল চোখ ও লাল চুল শক দেখা যেত। এই সময়ে শকেরা থাকত তরিম উপত্যকায়। পরে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে হুনদের আক্রমণের ফলে তাদের দক্ষিণ থেকে পশ্চিম দিকে পালাতে হয়েছিল। রাহুল মনে করতেন যে, কৃষ্ণসাগরের উত্তর-পূর্বে শকরাজ্য খ্রিস্টিয় চতুর্থ শতক পর্যন্ত ছিল। সোভিয়েত পুরাতাত্ত্বিকদের উৎখনন থেকেও তার প্রমাণ মেলে। উৎখনন থেকে জানা যায় যে খ্রিস্টিয় চতুর্থ শতকে এক প্রাচীর বেষ্টিত শক নগরী ছিল। শকদের ওপর গ্রিক সংস্কৃতির প্রভাব পড়েছিল—তাও জানা যায়।

সোভিয়েত মধ্য-এশিয়া যাওয়ার অনুমতি পেলেন না

রাহুল মধ্য-এশিয়ায় যাওয়ার সুযোগ খুঁজছিলেন। সোভিয়েত মধ্য-এশিয়া তাঁকে প্রবলভাবে টানছিল। কিন্তু একজন বিদেশির পক্ষে সোভিয়েত দেশের এতটা ভেতরে যাওয়ার জন্য মস্কোর বিদেশদপ্তর থেকে অনুমোদন নেওয়া আবশ্যিক ছিল। রাহুলের এক বন্ধু বিদেশদপ্তরের অনুমোদন যাতে পাওয়া যায় তার জন্য চেষ্টাও করেছিলেন। মস্কো থেকে কখনো তাঁর চিঠি আসছিল—অনুমোদন পাওয়া যাবে। কখনো চিঠি আসছিল—পাওয়া যাবে না। অতএব রাহুল মস্কো চলে গেলেন যাতে তাড়াতাড়ি অনুমতিপত্র পাওয়া যায়। ২৬ মার্চ তিনি মস্কো আসেন। সেখানে তিনি সওয়া মাস কাটিয়েছিলেন। এই সময়ে মস্কো শহরটাকে ভালোভাবে দেখে নিয়েছিলেন।

৩ এপ্রিল রাত্রিতে তিনি বলশই তেয়াত্র দেখেন। বলশই তেয়াত্র রাশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ রঙ্গশালা। এর টিকিট পাওয়া দুর্লভ। এই রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সংখ্যা দুশোর মতো। তাদের অভিনয় ও নৃত্য তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। ৬ এপ্রিল আবার বলশই তেয়াত্রে চেইকোভস্কির অপেরার অভিনয় দেখেন। কোনো ব্যালেরই লিব্রেতো রাহুলের ভালো লাগেনি।

মস্কোতে সওয়া মাস থেকে নানা রকমের চেষ্টা করেও শেষপর্যন্ত রাহুল বিদেশ দপ্তর থেকে মধ্য-এশিয়ায় যাওয়ার অনুমোদন পাননি। অথচ সেখানে যাওয়ার অনুমোদন না পাওয়ার কোনো কারণ ছিল না। সেখানকার পার্টির লোকেরা তাঁকে চাইছিল। ভোক্‌স

সংগঠন সব রকম সহায়তা করতে প্রস্তুত ছিল। তিতিবিরক্ত হয়ে রাহুল লিখছেন, 'সোভিয়েত শাসনে সব চেয়ে বড় দোষ যদি কিছু থাকে তবে তা হল এই যে, এখানে সন্দেহের মাত্রা চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল।'

মস্কোতে সওয়া মাস

রাহুল মধ্য-এশিয়ায় যেতে পারলেন না, সে কথা ঠিক। কিন্তু তাঁর মস্কোতে সওয়া মাস থাকাটা একেবারে ব্যর্থ হয়েছিল, তা নয়। প্রথমত বলশই তেয়াত্র দেখার অসামান্য অভিজ্ঞতা হয়েছিল মস্কোতে। দ্বিতীয়ত, ২৬ এপ্রিল সোভিয়েত মধ্য-এশিয়ার পুরাতত্ত্বের বিরাট পণ্ডিত তালস্তোফ-এর সঙ্গে তিনি মধ্য-এশিয়ার পুরাতত্ত্ব নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার সুযোগ পেয়েছিলেন। মধ্য-এশিয়ার ধ্বংস হয়ে যাওয়া নগরীতে পুরাতাত্ত্বিক অভিযান পরিচালনা করেছিলেন তালস্তোফ। তালস্তোফের মতে য়ুচী ও শকেরা মোঙ্গল নয়। তারা ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির অন্তর্গত। এ বিষয়ে রাহুলের সঙ্গে তাঁর ঐকমত্য হয়েছিল। তালস্তোফের মতে তাদের সম্বন্ধ ছিল মেসাগিত (মহাশক) জাতির সঙ্গে। শক ও ইন্দো-ইরানি জাতির সম্বন্ধ অত্যন্ত কাছাকাছি ছিল।

মধ্য-এশিয়া বিশেষজ্ঞ তালস্তোফ

মধ্য-এশিয়ার পুরাতাত্ত্বিক সামগ্রী রক্ষিত আছে অশকাবাদ, সমরখন্দ, তাসখন্দ, তেরমিজ, স্তালিনাবাদ এবং আলমা আতা মিউজিয়ামে। নিজের বিষয়ে তালস্তোফ ডঃ শ্চের্বাৎসকির মতো বিরাট পণ্ডিত। শ্চের্বাৎসকির মতো তাঁরও জিজ্ঞাসার অন্ত ছিল না। ২৯ এপ্রিল আবার প্রোফেসর তালস্তোফের সঙ্গে আলোচনা হল।

মধ্য-এশিয়ার মানুষ সম্পর্কে তালস্তোফের বক্তব্য ছিল এই যে, উত্তর অথবা দক্ষিণে সিরবক্ষু উপত্যকাতে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় ও প্রথম শতাব্দীতে হুনদের আগে মোঙ্গলিয়ার মানুষ সম্পর্কে কোনো খবর পাওয়া যায় না। হুনদের আক্রমণকাল খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় ও প্রথম শতাব্দীর প্রথম দিকে। মোঙ্গলদের দেখা যেত অলতাই থেকে পশ্চিমে। সেই সময় অলতাই মোঙ্গল ও ইন্দো-ইউরোপীয় জাতিদের সীমারেখা ছিল। শ্বেত হুন বা ইফথালো শ্বেত হুনদের সম্পর্কে রাহুলের বক্তব্য তিনি সমর্থন করেছিলেন। তালস্তোফের মতে গ্রিক লেখকদের শ্বেত হুনদের সম্পর্কে ধারণা ভ্রান্ত। শ্বেত হুনদের চেহারা ইন্দো-ইউরোপীয়দের মতো।

প্রোফেসর তালস্তেফ বলেছিলেন যে পশ্চিমে মোঙ্গলিয়দের তিনটি ঢেউ এসেছিল। (১) লাপ ঃ এরা নব্য প্রস্তর যুগে পশ্চিমে ফিনল্যান্ড ও নরওয়ে পর্যন্ত এসেছিল। এদের বংশধরদেরই এখন লাপ বলা হয়। (২) হুন ঃ খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় থেকে প্রথম শতাব্দীতে হুনেরা তাদের পুরোনো দেশ (হোয়াঙ থেকে মোঙ্গলিয়া) ছেড়ে পশ্চিম দিকে যাত্রা করে। এই ঢেউ এ্যাটিলার হুনদের রূপ ধরে চতুর্থ শতাব্দীতে মধ্য দানিয়ুব উপত্যকা (হাঙ্গেরি) পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আজকাল হাঙ্গেরিতে তাদের ইউরোপীয়দের সঙ্গে মিশ্রিত

বংশধরেরা থাকে। এই ঢেউয়ের অবশেষ ভোল্‌গার আশপাশের চুবাশ বোল্গার ও কাজার আজও আছে। তাদের ভাষায় মোঙ্গলীয় প্রভাব বেশি। কিন্তু তাদের শরীর লক্ষণ বেশি প্রভাবিত হয়েছে ইন্দো-ইউরোপীয় মিশ্রণের দ্বারা। (৩) তুর্ক : এই ঢেউ ষষ্ঠ শতাব্দীতে পশ্চিমাভিমুখে যেতে থাকে এবং দ্রিয়েপরের তীর পর্যন্ত পৌঁছোয়। এদের দুভাগ ছিল : (ক) কিপচক, (খ) আগুজ।

মোঙ্গলদের ভাষার বিকাশ সম্পর্ক তালস্তোফের মত ছিল এই যে, তুর্কিরা প্রথম দুভাগে বিভক্ত ছিল : (১) সপ্তনদে যারা প্রথম এসেছিল। এদেরই বংশধর বর্তমান কাজাক ও কিরগিজ। কাজাকদের ত্রয়োদশ শতাব্দীর আগে কোনো লিখিত সাহিত্য ছিল না। তুর্কিদের অন্য শাখাটি সির-বক্ষু উপত্যকায় আসে। এদের প্রথম লেখক দ্বাদশ শতকের মহম্মদ কাশগরী। তিনি তাঁর সময়ের ভাষা ও জাতি সম্পর্কে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য লিখেছেন। তাই হল উজবেক ভাষার মূল রূপ। উজবেক ভাষার ওপর ইরানি ভাষার বিশেষ প্রভাব পড়েছে। তুর্কিদের থেকে আলাদা গুজ (অথবা আগুজ) হূন শাখার বংশজ—বর্তমান তুর্কমান, আজুর বাইজান এবং ওসমানি তুর্ক।

তুর্কমানদের সম্পর্কে তালস্তোফ বলেছিলেন যে, এদের ওপর ইন্দো-ইউরোপীয়দের প্রভাব বেশি। এদের ভাষা মোঙ্গলায়িত এবং সংস্কৃতি ইরানি। উজবেকরাও এই কথা বলে। কিরগিজদের মধ্যে মোঙ্গল রক্ত বেশি।

মস্কোতে সওয়া মাস থাকার আর একটি লাভ হয়েছিল—তিনি মে দিবসের মহোৎসব দেখে যেতে পেরেছিলেন। পাস ছাড়া কেউ সেখানে যেতে পারে না। ভোক্‌স পাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। যদিও রাহুলের হোটেল থেকে কয়েক পা গেলেই রেড স্কোয়ার। কিন্তু মে দিবসে সেখানে পৌঁছোতে অনেকটা রাস্তা যেতে হয় আঁকাবাঁকা পথে। এক ডজনেরও বেশি বার পাস দেখাতে হয়। এভাবে আধ-ঘণ্টা চক্কর দিতে দিতে রেড স্কোয়ারে পৌঁছোলেন রাহুল। গ্যালারিতে সব লোক দাঁড়িয়ে ছিল। ময়দানের শেষে দালানের ওপর বিশাল সোভিয়েত পতাকা টাঙানো। ঠিক তার নিচেই ছিল মে দিবসের অভিনন্দন ও অন্যান্য শ্লোগান, লেনিন ও স্তালিনের বিশাল চিত্র।

তিনটা নাগাদ সব জায়গা ভরে যেতে লাগল। ময়দানে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির সেনা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দশটায় নেতারা এলেন। প্রথম এলেন সৈনিক বেশ পরিহিত স্তালিন, মার্শাল রোকোস্‌ভস্‌কি ও অন্যান্য মন্ত্রীরা। তাঁদের মধ্যে অনেক মার্শাল এবং জেনারেলও ছিলেন। প্যারেডের নেতৃত্ব দিলেন মার্শাল রোকোস্‌ভস্‌কি। প্রথমে পদাতিক ও তারপর নৌসেনা মার্চ করে গেল। তারপর ঘোড়সওয়ার ও অন্য সেনা, ঘোড়ায় টানা কামান, মোটর ও ট্যাংক-বাহিত সেনা। এ সময়ে আকাশে ছয়টি বিমানের গ্রুপ এক সঙ্গে দেখা গেল। দেড় ঘণ্টা কাটল। দর্শকের সামনে দিয়ে অসংখ্য সেনা চলে গেল। সাড়ে এগারোটা নাগাদ নাগরিকদের প্রদর্শন শুরু হল। নানা ধরনের কামান দেখা গেল। প্যারাশুটি সৈন্যরা গেল। রাহুল ঘণ্টা দুয়েক থেকে হোটেলে ফিরে গেলেন।

৩ মে রাহুল লেনিনগ্রাদ পৌঁছে গেলেন। লেনিনগ্রাদে এখন গাছে সবুজ পাতা;

নেভার বরফবন্দি জল এখন মুক্ত। রাহুল আর এক বছর লেনিনগ্রাদে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। মধ্য-এশিয়া যাওয়া হল না। কিন্তু আরো বছর খানেক থাকলে তাঁর পরিকল্পিত মধ্য-এশিয়ার ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে পারবেন।

১২ মে শ্রীমতী শের্বাৎস্কি তাঁদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। ডঃ শের্বাৎস্কির সঙ্গে রাহুলের অসাধারণ স্নেহের সম্পর্ক ছিল। ইতিমধ্যে তাঁর দেহাবসান হয়েছিল। জাতিতে জার্মান শ্রীমতী শের্বাৎস্কির বয়স অনেক। যৌবনে তিনি কোনো রুশ জমিদারের পরিচারিকা হয়ে রাশিয়া এসেছিলেন। পরে যত দিন আচার্য শের্বাৎস্কি জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি তাঁর রান্নাবান্না করেন। বিপ্লব শের্বাৎসকির বিশাল জমিদারির বিলুপ্তি ঘটিয়েছিল, কিন্তু 'বিদ্যা ধনং সর্ব ধন প্রধানম্।' শের্বাৎস্কি আগেই তাঁর বিদ্যার প্রভাবে অকাদেমির সদস্য হয়েছিলেন। কিন্তু তাতে তাঁর মাথা ঘুরে যায়নি। তিনি রাজনীতি থেকে নিজেকে আলাদা রেখেছিলেন আর বলশেভিকদের সঙ্গে আলোচনা করে জেনে নিয়েছিলেন যে, তাঁরা বিদ্যার আরও বেশি মর্যাদা দেবে। তাই তিনি একাগ্র চিত্তে নিজের কাজ করছিলেন। প্রথমদিকে জমিদারি দেখাশোনার জন্য তাঁর কিছু সময় দিতে হত। কিন্তু জমিদারির অবসান হওয়ার পরে তিনি তাঁর গোটা সময়টাই পড়াশোনা করে কাটিয়ে দিতেন। যখন খাদ্যের আকাল ছিল তখন অকাদেমির সদস্যদের দিকে সরকার সব চেয়ে বেশি দৃষ্টি দিত। ১৯৩৭ পর্যন্ত শ্রীমতী শের্বাৎস্কি তাঁর রাঁধুনি ছিলেন মাত্র। পরে সত্তর বছরের বর শের্বাৎস্কি পঞ্চান্ন বছরের কনেকে বিয়ে করলেন। আচার্য শের্বাৎস্কি প্রায় সারাজীবন অবিবাহিত ছিলেন। পারিবারিক ঝামেলা তিনি তাঁর মাতৃভক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। মা অনেকদিন বেঁচে ছিলেন। মৃত্যুর কাছাকাছি এসে শের্বাৎস্কি ভাবলেন তিনি যদি তাঁর বৃদ্ধা রাঁধুনিকে বিয়ে করেন তবে অকাদেমির সদস্য হিসাবে তাঁর পেনশন তাঁর স্ত্রী সারা জীবন পাবেন। তাই তিনি বিয়ে করলেন। অকাদেমি সোভিয়েত বিদ্যাচর্চার সবচেয়ে বড় পীঠস্থান। যে কোনো পণ্ডিতের সবচেয়ে বড় সম্মান হল অকাদেমির সদস্য হওয়া অথবা অকাদেমিক হওয়া। নিজের বিষয়ে যিনি সর্বোচ্চ জ্ঞানের অধিকারী এবং সেই জ্ঞানের আলোকপাত যিনি করতে পারেন তাঁকেই অকাদেমির সদস্য করা হয়। সোভিয়েত রাশিয়াতে আজকালও অকাদেমিকের সংখ্যা ১৫০-এর বেশি নয়। অকাদেমিক সারাজীবন মাসিক ছয়শো রুবল বেতন পান। শ্রীমতী শের্বাৎস্কি এখন সেই বেতনই পাচ্ছিলেন এবং যতদিন তিনি জীবিত থাকবেন সেই বেতন পাবেন। তাছাড়া শের্বাৎস্কির অন্যান্য সম্পত্তিও তিনি পাবেন। শের্বাৎস্কির বইয়ের সংগ্রহের অধিকাংশই পঞ্চাশ হাজার রুবল দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কিনে নিয়েছিল।

শ্রীমতী শের্বাৎস্কির রান্নার খ্যাতি ছিল বন্ধুবান্ধব মহলে। রান্নাবান্না করে বন্ধুবান্ধবদের খাওয়ানোর প্রচণ্ড শখ ছিল তাঁর। কিন্তু তাঁর জন্য খরচার একটা ব্যবস্থা হওয়ারও প্রয়োজন ছিল। নানারকমের রান্না করতেন শ্রীমতী শের্বাৎস্কি। খাওয়া-দাওয়া আর কথাবার্তা বলার জন্য রাহুলরা অনেক রাত পর্যন্ত সেখানে বসে থাকতেন। মাঝে মাঝে রাহুলের মনে হত আচার্য শের্বাৎস্কি যদি এখন বেঁচে থাকতেন!

মধ্য-এশিয়া বিশেষজ্ঞ বের্নস্তাম

মধ্য-এশিয়া যাত্রার ভূত রাহুলের মাথা থেকে নেমে গিয়েছিল। কিন্তু মধ্য-এশিয়ার ইতিহাস লেখার ভূত তখনো মাথায় চড়ে বসেছিল। তালস্তোফের কাছ থেকে তিনি অনেক কিছু জানতে পেরেছিলেন। রাহুল তাঁর কল্পনার অনেক সত্যতা যাচাই করে নিয়েছিলেন। ১৩ জুন রাহুল মধ্য-এশিয়ার ইতিহাসের আরেকজন বিশেষজ্ঞ প্রোফেসর ডঃ বের্নস্তাম-এর কাছে গেলেন। ডঃ বের্নস্তাম ও তাঁর স্ত্রী দুজনেই পুরাতত্ত্ব ও ইতিহাসের বিশেষজ্ঞ। আড়াই ঘণ্টা ধরে কিরগিজিয়া ও কাজাকস্তান সম্পর্কে আলোচনা হল। তিনি জানলেন, সোভিয়েত যুগে সেখানে অনেক জায়গায় উৎখনন হয়েছে এবং অনেক ঐতিহাসিক সামগ্রীও মিলেছে।

সপ্তনদ

তিনি জানলেন যে সপ্তসিন্ধুর সপ্ত ইন্দো-ইউরোপীয় শব্দ অথবা শকার্য জাতির শব্দ। এতে ইন্দো-ইউরোপীয় অথবা শকার্য জাতির নদীর প্রতি ভালোবাসার কথা বোঝা যায়। ভারতীয় আর্যদের দেশকে ইরানিরা সপ্তসিন্ধু বলত। সপ্তসিন্ধু হল সিন্ধু নদ ও তার ছয়টি শাখা নদী। মুসলমানরা সপ্তসিন্ধুর নাম দিয়েছিল পঞ্জাব। কিন্তু এর আগে থেকেই তাজাকিস্তানে আর একটি পঞ্জাব ছিল। উত্তর-মধ্য-এশিয়াতেও সপ্তসিন্ধু ছিল। রুশিরা এর অনুবাদ করেছে সেমিরেকে (সপ্তনদ)। রাহুলও ইতিহাসের সপ্তনদের কথা বাদ দিয়ে মধ্য-এশিয়ার সপ্তনদ কথাটির ব্যবহার করেছেন। ডঃ বের্নস্তান-এর মতে এই সাতটি নদী হল—আরিস, অতলস, চূ, ইলি, কোকসু-করতাল, লেপ্সা ও য়াংগুজ। এই সব নামই তুর্কি, যাতে চু আর সূ জল আর নদী বোঝায়। কোকসূ-অর্থ নীল নদ। আর করতাল-এর অর্থ কালো সমুদ্র।

ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অনেক বৌদ্ধ অবশেষ সপ্তনদে পাওয়া গেছে। চূ উপত্যকায় ফ্রুঞ্জের কাছাকাছি অস্মিকঅতায় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বৌদ্ধদের নিবাস ছিল। তা এখানকার পুরাতাত্ত্বিক অবশেষ থেকে জানা যায়। সারিগ (ফ্রাসনয়ারেচকালোহিত নদী) উপত্যকায়ও ষষ্ঠ শতাব্দীর বৌদ্ধ ভিত্তি-র চিত্র ও মানী ধর্মের ভিত্তি-চিত্র পাওয়া গেছে। বলাসাগুনেও বুদ্ধের মূর্তি পাওয়া গেছে। তলসে ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীর মানীধর্মের অবশেষ থেকে গেছে। সপ্তনদে নেস্তোরীয় খ্রিস্টানদের সিলমোহর ও অন্যান্য সামগ্রী পাওয়া গেছে। ডঃ বের্নস্তাম রাহুলকে অনেক ফোটো দেখিয়েছিলেন। সে সব ফোটোর মধ্যে সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর একটি পিতলের বৌদ্ধ মূর্তির ওপর উৎকীর্ণ ছিল—'দেয় ধর্মোয়ং শ্রী.....'। তা থেকে বোঝা যায় যে আরও অভিলেখ এখানে পাওয়া গিয়েছে। তিনি চাইছিলেন যে, বৌদ্ধ সামগ্রীর পরিচয়ের ব্যাপারে রাহুল তাঁকে সহায়তা করেন। রাহুল তাঁর মধ্য-এশিয়া সম্পর্কিত অনুসন্ধানের ব্যাপারে তাঁকে বলেন। আধুনিক জাতিসমূহ কীভাবে প্রাচীন জাতির বিকাশ ও সংমিশ্রণ থেকে উদ্ভূত হয়েছে, সে বিষয়েও তাঁর মতামত জানান। ডঃ তালস্তোফ-এর মতো ডঃ

বের্নস্তামও বহু ভাষাবিদ, বহুশ্রুত ও বিদ্যাপ্রেমী পণ্ডিত ছিলেন। ইংরেজি অথবা অন্য বিদেশি ভাষায় নিজের মতামত ব্যক্ত করতে পারেন এমন রুশি বিদ্বান অনেক কষ্টে খুঁজে পাওয়া যায়। আসলে বলাটা আসে অভ্যাস থেকে, কিন্তু রুশ পণ্ডিতেরা ইংরেজি, ফরাসি এবং জার্মান এমনভাবে শিখেছেন যে তাঁরা নিজেদের বিষয় সম্পর্কিত গবেষণা-পত্রিকা ও গ্রন্থই শুধু পড়তে পারেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

রাহুলের ঘরকন্না

মেরী জীবনযাত্রা-র দ্বিতীয় খণ্ডে রাহুল লিখেছেন, 'অবশেষে ২২ ডিসেম্বর (১৯৩৭) এল, যেদিন আমরা দুজনে পরস্পরের হয়ে গেলাম।' দ্বিতীয়বার সোভিয়েত বাসের সময় তাঁদের পরিচয় হয়েছিল। স্বল্পকাল তাঁরা একসঙ্গে ছিলেন। ২২ ডিসেম্বর (১৯৩৭) থেকে ১৩ জানুয়ারি (১৯৩৮) পর্যন্ত। ঘর বাঁধেননি বললে অন্যায় হবে না। পুত্র ঈগরের জন্মের সংবাদ তাঁকে ভারতে টেলিগ্রাম করে জানিয়েছিলেন আচার্য শ্চের্বাৎস্কি।

সাত বছর পরে যখন রাহুল লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের প্রোফেসর হয়ে লেনিনগ্রাদ গেলেন, তখন প্রথমেই দেখা হল লোলার সঙ্গে। রাহুল দেখলেন—লোলা আর সেই লোলা নেই। *মেরী জীবনযাত্রা*-য় তিনি লিখছেন, 'নয়শো দিন লেনিনগ্রাদ অবরোধের প্রভাব প্রায় প্রত্যেকের মুখেই দেখা যাচ্ছিল। লোলাকে বুড়ি মনে হচ্ছিল। দত্ত ভাইয়ের (প্রমথনাথ দত্ত) স্ত্রী ল্যুবার অবস্থাও একইরকম।' 'দীর্ঘকাল নগর অবরোধের অর্থ কি তা অন্য লোকের পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব নয়। ১৯৪১-৪২-এর শীতে অবরোধ বড় ভীষণ রূপ ধারণ করেছিল।' লোলাকে নিয়ে বালোদ্যানে দেখতে গেলেন পুত্র ঈগরকে। প্রায় সাত বছরের পুত্র ঈগরকে এই প্রথম দেখলেন রাহুল। কিন্তু তাঁর ছেলেকে তিনি কি বলবেন। রাহুলের রুশ ভাষার পুঁজি বিশেষ নেই। 'কিন্তু ভালোবাসার জন্য ভাষার প্রয়োজন হয় না।'

লোলা ও ঈগরকে নিয়ে এবার ঘর বাঁধতে হল এই উড্ডীন পাখির। পঁচিশ মাসের জন্য। যুদ্ধের অব্যবহিত পরে সোভিয়েত দেশের কঠিন রেশন ব্যবস্থার মধ্যে রাহুল লেনিনগ্রাদে ঘর বাঁধলেন।

সাম্যবাদী রাশিয়ায় বাড়িতে ঝি-চাকর রাখা সহজ ছিল না। মন্ত্রীর সমান বেতন পান এমন প্রোফেসরকেও রন্ধনের জন্য লকড়ি কাটতে হত, বাসন মাজতে হত, ঘরে ঝাড়ু দিতে হত এবং কাপড় কাচতে হত। রাহুল অবশ্য লকড়ি চেরার কাজ থেকে অব্যাহতি পেয়েছিলেন। কারণ লকড়ি চিরতো লোলা। কিন্তু বাসন মাজতে হত রাহুলকে। ঠাণ্ডায় তাঁর খুব কষ্ট হত। লোলা তাঁর জন্য গরম জল করে রেখে দিত। বাড়িতে চাকর রাখা যেত না, তা নয়। চাকর পাওয়াও যেত। কিন্তু যার বেতন হওয়ার কথা তিনশো রুবল, সে চাইত ছশো। শেষ পর্যন্ত চাকর রাখতে হয়েছিল। কিন্তু যা রেশন পাওয়া যেত তা চাকর ও অতিথিদের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। আরো একটা ব্যাপার ছিল ঃ সোভিয়েত দেশের সঙ্গে পুঁজিবাদী দেশের পার্থক্য খুব বেশি। সোভিয়েত দেশে খাওয়া-দাওয়া এবং চাল-চলনে প্রোফেসর ও তাঁর চাকরের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। এখানে খুব কম বাড়িতেই চাকর ছিল। স্থায়ীভাবে কোনো লোক রাখা হত না। কেননা, বাসন মাজা,

বিশ-পঁচিশ সের খাদ্যসামগ্রী পিঠে বয়ে নিয়ে আসায় প্রোফেসরের মর্যাদাহানি হত না। কোনো বিশেষ কাজের জন্য লোক রাখা হত। হয়তো দেড় মন লকড়ি কাটতে হবে, তখন লোক রাখা হত। কিন্তু তার জন্য দিতে হত পঁচিশ-ত্রিশ টাকা। দুঘন্টার জন্য একটা মুটেকেও পঁচিশ-ত্রিশ টাকা দিতে হত। সুতরাং এখানকার লোকেরা শারীরিক শ্রমকে অবজ্ঞা করত না।

ছেলে ঈগর লোলার চোখের মণি। ঈগরের প্রতি তাঁর এই ভালোবাসা স্বাভাবিক। যখন লেনিনগ্রাদ নশো দিন অবরুদ্ধ ছিল, তখন ঈগরের জন্য নিজের প্রাণ বলি দিতে তাঁর কোনো দ্বিধা ছিল না। নিজের বুকের মধ্যে তিনি তাকে আগলে রেখেছেন। যখন রেশন ছিল এক থেকে দেড় ছটাক, তখন নিজে না খেয়ে তিনি ঈগরকে খাইয়েছেন। তবু অনেক সময় রাহুলের মনে হয়েছে—এই ভালোবাসা অন্ধ ভালোবাসা। ছেলে জানত যে, সে যা চাইছে, মা তা না দিয়ে পারবে না; তাই সে অতিরিক্ত জেদি হয়ে উঠেছিল। সকালবেলা উঠেই লোলা ঈগরকে ডেকে বলতেন—'ওঠ, ওঠ, উঠে পড়। জামাকাপড় পর ঈগরসোনা।' কিন্তু সে ঘুমিয়ে থাকত। দুঘন্টা কেটে যেত। তবু উঠত না। মা আবার বলতেন 'সোনা উঠে পড়'। কিন্তু ঈগর কথা শুনত না। অথচ ঈগরকে যথাসময়ে বালোদ্যানে যেতে হবে। সোভিয়েত দেশে শিক্ষার খুব সুন্দর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। স্কুলে যাওয়ার আগে প্রথম সাত বছরের জন্য তাদের শিশুভবন বালোদ্যানে পাঠাতে হত। শিশুভবন ও বালোদ্যান এত বেশি স্থাপিত হয়েছিল যে সেখানে রাষ্ট্রের সব ছেলে মেয়েকে রাখা যেত। বালোদ্যানে প্রাতরাশ মিলত। কিন্তু লোলা তাঁর খোকাকে কিছু না খাইয়ে পাঠাতেন না। এক গ্লাস দুধ খেতে ঈগরের পনেরো মিনিট সময় লেগে যেত। মাঝে মাঝেই লোলা ঈগরকে দুধ খাওয়ানোর জন্য চেঁচামেচি করতেন। এই বছরই পয়লা সেপ্টেম্বর ঈগরের স্কুলে ভর্তি হওয়ার বয়স হয়েছিল। কিন্তু লোলা চাইতেন না ঈগর স্কুলে গিয়ে মজুরদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করে বিগড়ে যায়। কিন্তু বালোদ্যানেও তো অধিকাংশ ছেলে মজুরদের ছিল। কিন্তু যুক্তি কে শুনবে। লোলা বলতেন, বেলা একটায় স্কুল ছুটি হয়ে যাবে, তারপর গোটা মহল্লার গুন্ডাদের সঙ্গে মিশে ঈগর গুন্ডা হয়ে যাবে। তাই সাত বছর পূর্ণ হওয়ার চার দিন বাকি আছে, এই অছিলায় স্কুলে পাঠালেন না।

শিশুরা চার বছর থেকে সাত বছর পর্যন্ত বালোদ্যানে থাকে। শিশুদের ঘুমানোর জন্য খাটিয়া দেয়ালের সঙ্গে যুক্ত। পরিচ্ছন্ন বিছানা, পরিস্কার টয়লেট, জিনিসপত্র রাখার জন্য ছোটো দেয়াল আলমারি। গল্প শোনার, খেলনা রাখার ঘর আলাদা। ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে থাকত। টাকা পয়সার ব্যাপারে এটা মনে রাখা হত যে, কার পক্ষে কতটা দেওয়া সম্ভব। রাহুল আসার আগে লোলাকে ঈগরের জন্য দিতে হত সত্তর টাকা। রাহুল আসার পর তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে একশো চল্লিশ টাকায়। যাদের বেশি ছেলেমেয়ে তাদের কিছুই দিতে হত না। ছেলেমেয়েরা নটায় বালোদ্যানে যেত। ফিরত পাঁচটায়। খাওয়া-দাওয়ার সব ব্যবস্থা করত বালোদ্যান। এখানে বই পড়ানো হত না। শুধু অক্ষর শেখানো হত।

স্বাবলম্বী হওয়ার শিক্ষা দেওয়া হত। যুদ্ধ শেষ হওয়ার একমাসও হয়নি। এরই মধ্যে বিশ লক্ষ শিশু বালোদ্যানে এসে গেছে। ১৯৪২-এ শিশুদের সংখ্যা ছিল আঠারো হাজার।

রাহুল লেনিনগ্রাদের সামাজিক জীবনে বেশ মিশে গিয়েছিলেন। ছুটির দিনে লোলার বান্ধবীদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ লেগেই ছিল। লোলার বাড়িতেও বন্ধুবান্ধবরা আসতেন। তখন নাচগান খানাপিনা খুব হত। অঢেল মদ চলত। মদকে রুশিরা সাধারণ পানীয়ের বেশি গুরুত্ব দিত না। মদ না খাওয়াটা অসামাজিক বলে মনে করা হত। কিন্তু রাহুল মদ্যপান একেবারেই করতেন না। এতে তাঁর বেশ অসুবিধা হত। অনুরোধ-উপরোধেও মদ্যপান করতে রাজি ছিলেন না তিনি। কারণ 'আমি সারা জীবন একটা জিনিস কখনো ছুঁইনি, সেই রেকর্ড বজায় রাখার লোভ আমার নিশ্চয় ছিল।'

ছুটির দিনে নির্দিষ্ট বিশ্রামের জায়গায় বেড়াতে যাওয়ার টিকিট পাওয়া যেত। বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, দোকান, কারখানা, অফিস এসব জায়গায় যারা কাজ করত, তারা এই সুবিধা পেত। টিকিটের দাম ত্রিশ রুবল (প্রায় বিশ টাকা)। যে টিকিট কিনত, তাকে দিতে হত তিন রুবল। বাকি টাকা দিত মজদুর সঙ্ঘ। এখানে প্রোফেসর, কারখানার ম্যানেজার, দোকানদার, চাপরাশি, স্ত্রী-পুরুষ সবই মজদুর সঙ্ঘের সদস্য। তাদের বেতন থেকে সঙ্ঘের চাঁদা কাটা হত। সঙ্ঘ সেই টাকা থেকে সদস্যদের চিত্তবিনোদন, স্বাস্থ্য, বেকারির ব্যবস্থা করত। এই একদিনের ছুটির ব্যবস্থা করে দিত মজদুর সঙ্ঘ।

রাহুল সপরিবারে কিরোফ-পার্ক-কুলতুরে গিয়েছিলেন। সেখানে একদিনের বিশ্রাম কেন্দ্র ছিল। আরো অনেক স্ত্রী-পুরুষ বিশ্রাম কেন্দ্রে এসেছিলেন। এই কেন্দ্রে দোতলা বাড়িতে আটটি কামরা। এগারোটা নাগাদ আহার তৈরি হল। রুটি নিতে হল নিজেদের রেশন কার্ড দেখিয়ে। অন্যান্য আহার্যের দাম বিশ্রাম টিকিটের মধ্যেই ধরা ছিল। প্রাতরাশ ছিল লপসা যা ভারতের লপসির মতো এবং মাছ ও মিষ্টি চা এক গ্লাস। মধ্যাহ্নভোজন একটার কাছাকাছি। তাতে ছিল বিন, শাকের স্যুপ, টিনের মাংস এবং খুবানি মেশানো মিঠা সরবত। কোনো খাবারই রাহুলের কাছে স্বাদু মনে হয়নি। অবশ্য স্বাদু না হলেও পুষ্টিকর। সন্ধ্যায় মূলোর পাতলা টুকরো ভর্তি কচুরি ও এক গ্লাস মিঠা চা। এই হল সন্ধ্যার চা। রাত্রির ডিনার আলাদা।

কিন্তু বিশ্রাম কেন্দ্রে সারাদিন খাওয়া-দাওয়া করেই কাটাননি রাহুল ও লোলা। নদীতে স্নান করেছিল সবাই। পুরুষেরা জাঙ্গিয়া পরে, মেয়েরা বিকিনি পরে। তারপর নদীর তীরে শুয়ে রৌদ্রস্নান। সপ্তাহখানেক রোদে স্নান করার পর রঙটা তামাটে হয়ে যায়। রাহুল ও লোলা স্নান করে অনেকটা বেড়িয়ে বিশ্রাম কেন্দ্রে ফিরে আসতেন। দুটোয় লাঞ্চ। বিকেলে নৌকাবিহার। জারের আমলে জায়গাটা রাজপ্রাসাদের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তখন রাজপরিবারের লোক ও তাদের অনুচররা ছাড়া এখানে কেউ আসতে পারত না। এখন মজুররা এই রাজপ্রাসাদের মহলে ঘুরে বেড়াতে পারে।

গ্রীষ্মকালে জুনের শেষদিকে দু মাসের ছুটি পাওয়া যেত। ১৯৪৬-এর গ্রীষ্মকালটা কাটানোর জন্য রাহুল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্রাম ভবন তিরয়োকীতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত

নিয়েছিলেন। সেখানে থাকার টিকিটও অনায়াসে পেয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু লোলার সব কাজ ঠিক যাওয়ার আগে মনে পড়ত। ঈগরের ওভারকোট সেলাই করতে হবে; পয়লা জুলাই সারা রাত বসে ওভারকোট সেলাই করলেন লোলা। রাহুল বলেছিলেন দর্জিকে দিয়ে ওভারকোটটা সেলাই করিয়ে নিতে। লোলা তাতে রাজি হননি। বিশ্রামভবনে শিশুদের নিয়ে যাওয়ার নিয়ম ছিল না। লোলা জোর করে সব নিয়মকানুন ভেঙে ঈগরকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। অথচ ঈগরকে অনায়াসে বালোদ্যানে রেখে যাওয়া যেত। কিন্তু বেচারি লোলা ছেলেকে তাঁর চোখের আড়াল করতে চাইতেন না এবং জোর করেই তাঁর নিজের কাছে রেখেছিলেন। ঐ ব্যাপারটা রাহুলের ভালো লাগেনি। কিন্তু কী করা যাবে। ক্যাঙারু মায়ের দায়িত্ব সেই জানে। লোলা বিশ্রাম ভবনের ম্যানেজারের কাছ থেকে ঈগরকে সঙ্গে রাখার অনুমতি আদায় করে রেখেছিলেন।

তিরয়োকী রাহুলের খুব ভালো লাগল। এখানে সর্বত্র দেবদারু। বিশ্রাম ভবনের চারপাশে প্রায় এক হাজার একর জমির ওপর এক বিশাল জঙ্গল। তাতে অসংখ্য দেবদারু। দেবদারু দেখে রাহুলের কেবলই হিমালয়ের কথা মনে হতে লাগল। রাহুলের মনে হচ্ছিল, তিনি তিব্বতে এসে গেছেন।

১৭ জুলাই তাঁরা ফিনল্যান্ড ঘুরে এলেন। তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ভোজ দেওয়া হল। জর্জিয়ার আঙুরের মদের ব্যবস্থা ছিল। রাহুলের জন্য ছিল একটি লেমনেড। মদ ছাড়াও ছিল মাছ, রুটি ও অন্যান্য স্বাদু আহার্য। মাতৃভূমির জন্য টোস্ট প্রস্তাব করা হল, নানারকম মজার বক্তৃতা হল। নাচগান হল। রাহুলের পক্ষে নাচাটা সম্ভব হল না। তিনি নাচতে শেখেননি।

তিরয়োকী থেকে ফিরে আসার পরও বিশ্ববিদ্যালয় খুলতে আরো এক মাস দেরি ছিল। তাই রাহুল আবার তাঁর পড়াশোনা ও নোট নেওয়া শুরু করলেন। কিন্তু এ সময়ে ঘরদোর মেরামতের কাজ হচ্ছিল। সপ্তাহে একদিন কাঠের মেঝে ধোয়া দরকার। কিন্তু তার জন্য একটি স্ত্রীলোক চাইছিল ৫০ রুবল। লোলা অন্য একটি স্ত্রীলোককে ১৪ রুবল ও এক কিলো আটা দিয়ে কাজটা করতে রাজি করিয়েছিলেন। কিন্তু ঘরদোর মেরামত যে করবে সে আড়াইশো রুবল চাইছিল। মালপত্র আবার ঠিকঠাক করে যথাস্থানে রেখে দেওয়া হয়েছিল। 'সর্ব সংগ্রহঃ কর্তব্য যঃ কালে ফলদায়কঃ'—এই মহামন্ত্র লোলা আক্ষরিক অর্থে অনুসরণ করতেন। দুটো কামরা ও রান্নাঘর একেবারে মালপত্র দিয়ে ভরা ছিল। লোলা কোনো জিনিস ফেলে অথবা কাউকে দিয়ে দিতে রাজি ছিলেন না। কবে ভেঙে গেছে কেটলি। কিন্তু সেটা তার জায়গা দখল করে আছে। বোতল ও শিশি জমে ঘর ভর্তি হয়ে গেছে। এই পরিস্থিতিতে খাওয়ার ও শোওয়ার ঘর যদি মাল গুদাম হয়ে ওঠে তবে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

যে মা ছেলেকে অতিরিক্ত ভালোবাসে সে তার স্বাস্থ্যের শত্রু হয়। রাহুল প্রতিদিনই তার প্রমাণ পাচ্ছিলেন। ঈগরের পেট সব সময়ই খারাপ। কেননা তার মা তাকে সব সময় ঠুসে ঠুসে খাওয়াতেন। কিন্তু হজম শক্তিরও তো একটা সীমা আছে। রাহুলের

অবস্থাও ঈগরের চেয়ে বেশি ভালো ছিল না। ১৪ অগস্ট রাহুল ডায়েরিতে নোট করলেন, 'পেট প্রায়ই খারাপ হচ্ছে। কারণ লোলার চর্বিবহুল রান্না।'

পয়লা সেপ্টেম্বর ঈগরকে স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হল। লোলা তাকে নানাভাবে খাওয়াবার চেষ্টা করছিলেন। মিস্‌কাকে (ঈগরের আদরের নাম) ঠুসে না খাইয়ে মা কী করে থাকতে পারে!

অনেকদিন ধরে ঝি খুঁজছিলেন লোলা। অনেক খোঁজাখুঁজির পর ঝি পাওয়া গেল। কিন্তু ঝি রেখে লোলা অনুতাপে ভুগছিলেন। ঝিকে দুশো রুবল ও খেতে দিতে হত। কিন্তু দুশো রুবলের জায়গায় পাঁচশো রুবল দিয়েও যদি খেতে না দিতে হয়, তাহলে লোলা খুশি হয়েই তা দিতেন। এ সময়ে রেশন কার্ড বন্ধ ছিল। তাই ঝিকে খাওয়ানো মুশকিল। কিন্তু তাকে ছাড়িয়ে দিলেও সংসার চালাতে নানা অসুবিধা। তাকে রাখতেই হল।

দেড় মাস জ্বরে ভুগে ঈগর স্কুলে গেল। তার গণিত রাহুল দেখে দিয়েছিলেন। আর লোলা অন্য বই পড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাই দেড়মাস স্কুলে অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও অন্য ছেলেদের চেয়ে সে পিছিয়ে যায়নি। প্রথমদিকে রাহুলের ভয় ছিল যে ছেলেটার বুদ্ধিশুদ্ধি হবে না। কিন্তু অল্প দিনেই সেই ভয় দূর হয়ে গেল যখন সে পুরো নম্বর পেতে শুরু করল।

'লোলা ঈগরকে পুরোপুরি খ্রিস্টান বানানোর চেষ্টা করছিল। তাকে ত্রিমূর্তির (পিতা-পুত্র-পরিত্রাতা) নাম নিয়ে ক্রুশ বানানো শিখিয়ে দিয়েছিলেন। ভগবানের প্রতি তার কিছুটা বিশ্বাসও এসে গিয়েছিল। আমি ভারতে ফিরে যেতে পারি—একথা শুনে মাঝে মাঝে আমি যাতে ভারতে না যাই তার জন্য সে প্রার্থনা করত। আবার কখনো কখনো সে প্রার্থনা করে বলত, হে ভগবান, তুমি এমন কর যেন আমার মা বেশি চেঁচামেচি বন্ধ করে। কিন্তু ভগবান তার কথা শুনছিলেন না।'

এদিকে রাহুলের লেনিনগ্রাদ থেকে ভারতে ফেরার দিন ঘনিয়ে আসছিল। অথচ এ সময়েই তাঁর কাছে নানা ধরনের কাজ আসছিল। যা থেকে প্রচুর অর্থ আসত, যেমন রুশি ফিল্মের স্ক্রিপ্টের হিন্দি ভাষান্তর এবং অনেক অনুবাদের কাজ। অতএব রাহুলের কাছে একটা নির্বাচনের প্রশ্ন এসে দাঁড়িয়েছিল : সোভিয়েত দেশে থেকে তিনি কী আরামে জীবন কাটাবেন অথবা আবার ভারতে ফিরে গিয়ে সাহিত্য কর্মে লিপ্ত হবেন। কিন্তু তিনি এখানে আরামের জীবন কাটিয়ে কী করবেন। তাঁর আসল কাজ তো তিনি এখানে থেকে করতে পারবেন না। তাই রাশিয়ায় থাকার অর্থ জীবিত অবস্থায় মৃত্যু। আড়াই বছর হল তিনি ভারত থেকে এসেছেন। ভারতে থাকলে এ সময়ের মধ্যে তিনি আড়াই হাজার পৃষ্ঠা লিখতে পারতেন। এই আড়াই বছর তিনি তাঁর মস্তিষ্ককে বিশ্রাম দেননি। কয়েকটি বই লিখেছেন। *দাখুন্দা* ও *গোলামান* এই দুটি গ্রন্থ তিনি অনুবাদ করেছিলেন। পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৩৯৪। তাছাড়া আরো অনেক বইয়েব ছক মাথায় এসেছিল। কিন্তু রাশিয়ায় এসব বই প্রকাশ করার কোনো পথই ছিল না। সেন্সরের হাত পেরিয়ে তা প্রেস পর্যন্ত পৌঁছোত কিনা সন্দেহ। অতএব জীবন্মৃত অবস্থায় রাশিয়ায়

শুধু টিকে থাকা রাহুলের পক্ষে সম্ভব ছিল না। রাহুল মনস্থির করে ফেললেন, তাঁকে ভারতে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু লোলা ও ঈগর?

এপ্রিলে ইস্টারের উৎসবে লোলা ও ঈগর চার্চে গিয়েছিল। বাড়িতে ঈগর প্রতিদিনই খ্রিস্টের কাছে প্রার্থনা করে। কিন্তু এবার ইস্টারে সে প্রথম চার্চে গেল। ভগবানকে দর্শনের জন্য সে বেশ উতলা হয়ে পড়েছিল। তার এই বিশ্বাস জন্মেছিল যে, গির্জার ভেতরে নিশ্চয়ই ভগবান বিরাজ করছেন। রাহুল চার্চে যাননি। লোলা ও ঈগরের মুখে সব শুনেছিলেন। ঈগর চেয়েছিল, সে একেবারে ভগবানের পাশে চলে যাবে। কিন্তু চার্চে বেশ ভিড় হয়েছিল। তাই সেখানে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তারপরেইসে চলে আসার জন্য বেশ ছটফট করতে থাকে। মাকে বলে, 'তাড়াতাড়ি কর, নয়তো সিনেমা শেষ হয়ে যাবে।' অতএব ভগবান দর্শনের চেয়ে তাকে ফিল্ম বেশি টানছিল। রাত্রিতে রাহুল কখনো কখনো ঈগরকে ভগবান সম্পর্কে বলতেন। দুনিয়ার সব সুখ-দুঃখ, অন্যায় পক্ষপাতের জন্য এই সর্বশক্তিমান ভগবান দায়ী। ভগবানকে এমনভাবে তার কাছে তুলে ধরতেন রাহুল, যে ঈগর ভগবানের বদলে শয়তানকে দেখতে পেত। লোলার কাছে এ সব কথা খুব খারাপ লাগত। তিনি ঝাঁঝিয়ে উঠে বলতেন, শিশুকে এসব কথা বলা ঠিক নয়। রাহুল উত্তর দিতেন, শিশুর হৃদয়কে সাদা স্লেটের মতো থাকতে দেওয়া উচিত। আস্তিক বা নাস্তিক হওয়াটা তার ওপরেই ছেড়ে দেওয়া উচিত।

এদিকে রাহুলের ভারতে ফিরে যাওয়া সম্পর্কে আর কোনো সন্দেহ ছিল না। স্থির হয়েছিল, রাহুল ৫ জুলাই জাহাজে লন্ডন হয়ে ভারতে পৌঁছোবেন।

চলে আসার আগে রাহুল ঈগরের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন তিরয়োকীতে। অসুস্থতার জন্য সে সেখানে ছিল। ওকে ছেড়ে আসার সময় ঈগর কাঁদতে লাগল। রাহুল তাকে অনেক বোঝালেন; কিন্তু সে বুঝতে চাইল না। সে বলতে লাগল, 'তুমি আর আসবে না।' তার কথা হয়তো ফলে যেতে পারে, একথা রাহুলের মনে এসেছিল। কিন্তু মায়া মোহের ফাঁদে জীবনের কর্তব্যকে ভুলে যেতে চাননি রাহুল। অনেক কষ্টে ঈগরকে কিছুটা ঠাণ্ডা করে, রাহুল বিদায় নিলেন। লোলা থেকে গেল ঈগরের কাছে।

৫ জুলাই রাহুল লন্ডনে রওনা হয়ে গেলেন। 'তুমি আর ফিরে আসবে না'—ঈগরের এই কথা প্রায় ফলে গিয়েছিল। জীবনের অন্তিমলগ্নে রাহুল আর একবার রাশিয়া এসেছিলেন। লোলা ও ঈগর তাঁকে দেখতে এসেছিল। কিন্তু রাহুল কথা বলতে পারেননি। কথা বলেছিল তাঁর চোখের জল।

লেনিনগ্রাদে রাহুলের গার্হস্থ্যের কথা মনে হলে স্বভাবতই একটা প্রশ্ন জাগে। লেনিনগ্রাদে এসে কি রাহুল পাখা কেটে ফেলেছিলেন? ১৯৩৭-এর ২২ ডিসেম্বর লোলা ও রাহুল পরস্পরের হয়ে গিয়েছিলেন এবং ১৯৩৮-এর ১৩ জানুয়ারি তিনি ভারতে ফিরে আসেন। ঘুমক্কড়ের এই ধরনের পথের প্রেম 'ঘুমক্কড় শাস্ত্রে' অনুমোদিত। কিন্তু চতুস্পদ থেকে ষটপদ হয়ে যাওয়ার তীব্র ভর্ৎসনা আছে ঘুমক্কড় শাস্ত্রে। ঘুমক্কড়ের পক্ষে বিবাহ ও সন্তানের জন্ম দেওয়ার অর্থ কলুর বলদ হয়ে যাওয়া।

সাত বছর পরে লেনিনগ্রাদ এসে লোলা ও পুত্র ঈগরকে নিয়ে রাহুল গৃহস্থের জীবন যাপন করেন পঁচিশ মাস। রাহুল অধ্যাপনা করছেন; ঘরকন্নার কাজ করছেন। ঈগরকে গণিত শেখাচ্ছেন, সামাজিক কর্তব্য পালন করছেন, পার্টিতে যাচ্ছেন, ছুটিতে বেড়াতে যাচ্ছেন, সময় পেলেই বইয়ের জগতে ডুব দিচ্ছেন। পুরোপুরি গৃহস্থ অধ্যাপকের জীবন। *মেরী জীবনযাত্রা*-য় তিনি লোলাকে ক্যাঙারু মা বলেছেন। নশো দিন লেনিনগ্রাদে লোলা নিজে না খেয়ে ঈগরকে খাইয়েছেন। লোলা ঈগরকে অতিরিক্ত আদর দিতেন, ঠুসে খাওয়াতেন। তাকে স্কুলে পাঠাতে চাইতেন না। অর্থাৎ ঈগর চোখের আড়াল হলেই লোলা অস্থির হয়ে যেতেন। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হল এই যে, *মেরী জীবন যাত্রা*-য় এই স্বল্পকালের গার্হস্থ্য জীবনে লোলা ও রাহুলের কি সম্পর্ক ছিল, সে বিষয়ে একটি কথাও নেই। বড় বিস্ময় লাগে। *মেরী জীবনযাত্রা*-য় রাহুল তাঁর আন্তরজীবনের কথা একেবারেই লেখেননি। হৃদয়ের কথা লিখতে চাননি। সেই কারণেই কি এই বাকসংযম! লোলা রান্না করছে, কুড়ুল দিয়ে কাঠ চিরছে, ঈগরের দেখাশোনা করছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছে—এই সব কিছুরই অনুপুঙ্খ বিবরণ আছে। অবরুদ্ধ লেনিনগ্রাদে নশো দিন কাটিয়েছে লোলা। নিজে না খেয়ে ঈগরকে বাঁচিয়ে রেখেছে, তারও সপ্রশংস উল্লেখ আছে। কিন্তু লোলার সাত বছরের বিরহ-যন্ত্রণার দিনগুলি কীভাবে কেটেছে, তা লেখেননি রাহুল। তাঁর পঁচিশ মাসের গৃহস্থ জীবনযাত্রার যে বিবরণ রাহুল লিপিবদ্ধ করেছেন, তা থেকে মনে হয় সাধারণ মানুষের গার্হস্থ্যে যে কঠিন নিগড় থাকে, যে ঐক্যানুভূতি থাকে, যা এই জীবনকে বেঁধে রাখে রাহুলের গৃহস্থ জীবনে তা হয়তো ছিল না। মনে হয় তিনি যেন লোলার অতিথির মতো। তিনি যুদ্ধোত্তর বলশেভিক রাশিয়ার নবনির্মাণকে প্রাণভরে দেখছিলেন। সোভিয়েত মধ্য-এশিয়ার ইতিহাস ও আরো অনেক বই লেখার স্বপ্নে বিভোর হয়ে ছিলেন। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়ায় থাকা হল না, কারণ সোভিয়েত রাশিয়ায় তাঁর বই প্রকাশিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। অথচ সোভিয়েত রাশিয়ায় সারা জীবন কাটিয়ে দেওয়ার সুযোগ এসেছিল তাঁর কাছে, তবু তিনি চলে এসেছিলেন। এ ব্যাপারেও কি লোলা কিছু বলেননি রাহুলকে? রাহুল যাতে চলে না যায় তার জন্য চোখের জল ফেলেননি? অথবা রাহুল যখন ঘর বাঁধলেন, তখন থেকেই কি তিনি জানতেন যে, এই পথেব প্রেম ক্ষণিকের। রাহুলকে লোলা বেঁধে রাখতে পারবেন না। ঈগরের কান্না তাঁকে বেঁধে রাখতে পারেনি। কারণ মায়ামোহের ফাঁদে তিনি ধরা দেবেন না, এই সংকল্প ছিল তাঁর। সার্ত্র যাকে bad faith বলেছেন, এখানে রাহুলের বিরুদ্ধে সেই অভিযোগ আনা যায়। মায়ামোহের ফাঁদে ধরা দেবেন না—এই সংকল্প যদি তাঁর ছিল, তবে তিনি সন্তানের জন্ম দিলেন কেন? পঁচিশ মাসের মায়ামোহের ফাঁদে ধরা দিলেন কেন? *মেরী জীবনযাত্রা*-য় এই প্রশ্নের উত্তর তাঁব দেওয়া উচিত ছিল। তিনি তা দেননি। তাঁর অবচেতনে এই ফাঁকি ছিল, তাও বলা চলে না। তিনি জেনেশুনেই এই ফাঁকি দিয়েছিলেন। একটি সংসার ভেঙে দেওয়ার দায়িত্ব কার? মধ্য-এশিয়ার স্বপ্ন, হাজার হাজার পৃষ্ঠা লেখার স্বপ্ন এবং ঘুমক্কড়ের লেখক হয়ে ফিরে যাওয়ার স্বপ্ন

('ঘুমক্কড় শাস্ত্রে' এভাবে ঘুমক্কড়ী থেকে ফিরে আসাকেই প্রথম শ্রেণীর ঘুমক্কড়ের কাজ বলা হয়েছে) সেই স্বপ্নও রাহুলের আচরণকে যুক্তিসহ করে তোলেনি। স্পষ্টতই এই আচরণ সার্ত্রীয় bad faith।

আরো একটি কথা। ঈগরের প্রতি লোলার ভালোবাসার কথা বাদ দিলে *মেরী জীবনযাত্রা*-য় লেনিনগ্রাদে রাহুলের গার্হস্থ্য জীবনের চিত্রণে লোলা প্রায় অনুপস্থিত। রাহুলের দু হাজার সাতশো সত্তর পৃষ্ঠার *মেরী জীবনযাত্রা*-র পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় অসংখ্য মানুষ ও প্রাণীর অবিস্মরণীয় ক্যামিও (cameo) জীবন্ত। অথচ লোলা প্রায় অনুপস্থিত এই অর্থে যে, তিনি লোলার কথা অনেক বলেছেন অথবা প্রায় কিছুই বলেন নি। *মেরী জীবনযাত্রার* পৃষ্ঠায় লোলা জীবন্ত হয়ে ওঠেনি। হতে পারে লোলার প্রতি এক ধরনের নিরাবেগ শীতলতা ছিল রাহুলের। ঈগরের কান্না থামিয়ে তিনি তার কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার কথা লিখেছেন। কিন্তু লোলার কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সম্পর্কে একটি নিরুত্তাপ বাক্য ঃ 'ওকে (ঈগরকে) কিছুটা ঠাণ্ডা করে আমি বিদায় নিলাম। লোলা ওখানেই থেকে গেল।'

১৯৪৫-এর ৪ জুন রাহুল লেনিনগ্রাদে এসেছিলেন। পঁচিশ মাস ৩ দিন থেকে তিনি সোভিয়েত ভূমি থেকে বিদায় নিলেন।

সোভিয়েত ভূমিতে রাহুল স্বপ্নাবিষ্টের মতো ছিলেন। বিশেষত সোভিয়েত রাশিয়ার প্রচণ্ড বিজয়ের পর এক মাসও কাটেনি এমন সময় তিনি লেনিনগ্রাদে পৌঁছেছিলেন। যে অসাধারণ দ্রুতিতে বিধ্বস্ত রাশিয়া নতুনভাবে নির্মিত হচ্ছিল, তা দেখে রাহুল হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। রাশিয়ায় যে সাম্যবাদী নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, তা রাহুলের কাছে স্পষ্টভাবে ধরা দিয়েছিল। কিন্তু এই নতুন সভ্যতায় যে কিছু কিছু অসঙ্গতিও ঢুকে পড়েছিল, তাও রাহুল লক্ষ করেছিলেন। সোভিয়েত রাশিয়ায় বিদেশিদের প্রতি সীমাহীন সন্দেহ। রাহুলের মতো বিদেশি সাচ্চা কমিউনিস্ট হলেও এই সন্দেহ কিছুমাত্র কমত না। রাহুল সোভিয়েত মধ্য-এশিয়ায় গিয়ে যে মধ্য-এশিয়ার ইতিহাস লেখার পরিকল্পনা করেছিলেন, তিনি তার উপাদান সংগ্রহ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কোনো বিদেশির পক্ষে সোভিয়েত মধ্য-এশিয়ায় যেতে হলে সোভিয়েত বিদেশ দপ্তরের অনুমোদন নিতে হত। লেনিনগ্রাদে থেকে অনেক চেষ্টা করেও তিনি বিদেশ দপ্তরের অনুমোদন পাননি। অনুমতিপত্রের তদবির করার জন্য তিনি পাঁচ সপ্তাহ মস্কো গিয়ে থেকেছিলেন। কিন্তু লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোফেসর হওয়া সত্ত্বেও তিনি শুধুমাত্র বিদেশি বলেই সোভিয়েত মধ্য-এশিয়া যাওয়ার অনুমতি পাননি।

বিদেশিদের সম্পর্কে সন্দেহ অনেক সময় এমনভাবে প্রকাশিত হত যাকে নিষ্ঠুর নির্যাতন বলা হয়তো অসঙ্গত হবে না। রাহুল দুটি নির্যাতনের ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ঘটনা দুটি তাঁর *মেরী জীবনযাত্রা* থেকে তুলে দিচ্ছি ঃ

১৯৪৭-এর মার্চে একটা ঘটনায় তিনি দুঃখ পেয়েছিলেন। লিথুয়ানিয়ার বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত ডঃ সিল্‌ভোচিক্‌স-এর মৃত্যুতে তিনি দুঃখ পেয়েছিলেন। ডঃ সিল্‌ভোচিক্‌স

লন্ডনের পি. এইচ. ডি.। বেশ কিছুকাল লন্ডনে ছিলেন। ইউরোপের নতুন ও পুরোনো অনেক ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। লিথুয়ানিয়ার বিরুদ্ধে যখন জার্মানি যুদ্ধ ঘোষণা করে, তখন তিনি সেখান থেকে সোভিয়েত রাশিয়ায় পালিয়ে আসেন। গোটা যুদ্ধের সময় তিনি কোনো না কোনো কাজ করে অন্নবস্ত্রের সংস্থান করেছিলেন। তিনি জাতিতে ইহুদি; এবং জার্মানিকে ভীষণ ভয় করতেন। তাই কোনোভাবেই তাঁর সোভিয়েত-বিরোধী হওয়া সম্ভব ছিল না। চার-পাঁচ বছর সোভিয়েত শরণার্থী হয়ে ঘুরেফিরে তিনি লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক চাকরি খালি ছিল। তিনি আশা করেছিলেন, হয়তো কোনো কাজ মিলে যাবে। প্রাচ্য-বিভাগে তিনি প্রতিদিন আসতেন। ধীরে ধীরে অনেক লোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তাঁর কাজ না থাকায় তাঁর রেশনকার্ডও ছিল না। স্ত্রী ও একটি সন্তান নিয়ে সিল্‌ভোচিক্‌স বড় বিপন্ন হয়ে পড়েন। এই পণ্ডিত রেশনকার্ডের জন্য অনেক ছোটাছুটি করেন। কারণ রেশনকার্ড ছাড়া তিন জনের আহার জোটানো খুব মুশকিল ছিল। কিন্তু মুর্খ পার্টি সেক্রেটারি তাঁদের রেশনকার্ড দিতে অস্বীকার করলেন। তিনি লন্ডনের পি.এইচ. ডি.; অতএব হয়তো ইংল্যান্ডের গুপ্তচর। তাঁর বিরুদ্ধে যাওয়ার সাধ্য কারো ছিল না। 'আমাদের বিভাগীয় ডীন প্রোফেসর স্টাইন ছিলেন ইহুদি। তাই তিনিও তাঁর হয়ে কোনো কথা বলতে সাহস পাননি। অল্প-স্বল্প যে খাবার সিল্‌ভোচিক্‌স জোটাতে পারতেন তা তিনি তাঁর শিশু ও পত্নীকে দিয়ে দিতেন। তিনি নিজে কোনো না কোনো অছিলায় না খেয়ে থাকতেন। অর্ধাহার ও অনাহারে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে যায় এবং একদিন তাঁর মৃত্যু হয়। এভাবে সোভিয়েত দেশ এক প্রতিভাশালী ভাষাতত্ত্ববিদকে হারাল। কিন্তু এই অপরাধ সাম্যবাদ বা রুশ কমিউনিষ্ট পার্টি করেছিল তা আমি বলতে পারব না। লেনিনগ্রাদে কিছু মুর্খ এই সময়ে পার্টির সর্বেসর্বা হয়ে গিয়েছিল। দু বছর পরে তারা শাস্তি পেয়েছিল। কিন্তু এই দু বছরে তারা অনেক অত্যাচার করেছিল।'

অধ্যাপক সিল্‌ভোচিক্‌স-এর মৃত্যু সম্পর্কে রাহুলের এই সাফাই ধোপে টেঁকে না। লেনিনগ্রাদের মতো শহরে যদি পার্টির সেক্রেটারি মূর্খ হতে পারে, তবে ছোটোখাটো শহরে ও গ্রামে পার্টির সেক্রেটারিরা মূর্খতর হবে তাই স্বাভাবিক। প্রোফেসর সিল্‌ভোচিক্‌স-এর মতো জার্মান বিরোধী ইহুদি পণ্ডিতকে শুধুমাত্র লন্ডনের পি. এইচ. ডি. বলে কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারি যদি তাঁকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মতো সৎসাহস যদি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের না থাকে, তবে সাম্যবাদ কথাটা অর্থহীন হয়ে যায়। সিল্‌ভোচিক্‌স-এর মৃত্যু এই সত্যটিকেই তুলে ধরে যে, বিদেশিদের প্রতি সর্বব্যাপী রাষ্ট্রীয় সন্দেহ রুশিদের মনে এক ধরনের বিষক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। তাছাড়া সিল্‌ভোচিক্‌স-এর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে রাশিয়ায় একটি পুরোনো ব্যাধির পুনরাবির্ভাব লক্ষ করা যায়। এই ব্যাধির নাম ইহুদি-বিরোধিতা। হিটলার ইহুদি-বিরোধিতার চরম দৃষ্টান্ত ও প্রতীক। ইহুদিদের বিরুদ্ধে হিটলারের মারণযজ্ঞ দেখে অনেকেরই এই ধারণা হয়ে থাকতে পারে যে, হিটলারের জার্মানির ইহুদি হত্যা একটি

অমানবিক ব্যতিক্রম। কিন্তু তা সত্য নয়। যুদ্ধ-পূর্ব প্রায় সমগ্র ইউরোপেই ইহুদিদের প্রতি অমানবিক ব্যবহার করা হত। ট্রট্স্‌কির আত্মজীবনী ও আইজাক ডয়েটসার লিখিত ট্রট্স্‌কির জীবনীতে জারের আমলে ইহুদি নির্যাতনের কাহিনি আছে। কিন্তু সাম্যবাদী রাশিয়াতে ইহুদি নির্যাতন না হলেও সোভিয়েত দেশের ইহুদিরা যে ভয় থেকে মুক্ত হয়নি, তা সিল্‌ভোচিক্‌স-এর কাহিনি থেকে বোঝা যায়। মনে হয় শুধু লন্ডনের পি. এইচ. ডি. বলেই যে সিল্‌ভোচিক্‌সকে চাকরি দেওয়া হয়নি তা নাও হতে পারে। তিনি ইহুদি এও হয়তো একটা অপরাধ হতে পারে। তা মনে হয় এই কারণে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন প্রোফেসর স্টাইন নিজে ইহুদি ছিলেন বলে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলতে সাহস পাননি।

বিদেশিদের প্রতি সন্দেহের আরো একটি দৃষ্টান্ত রাহুলের চোখে পড়েছিল। একজন মোঙ্গল পণ্ডিত অধ্যাপকের কাজ খুঁজতে লেনিনগ্রাদ এসেছিলেন। এই পণ্ডিত কিছুদিন জেলে ছিলেন। জেলে থেকে তিনি সদ্য ছাড়া পেয়েছিলেন। এই বৌদ্ধ মোঙ্গল পণ্ডিত প্রথম তাঁর ধর্মের ভাষা তিব্বতি পড়েন। জেলে বসে তাঁর আরো পড়াশোনা করার সুযোগ মিলে যায়। তিনি তিব্বতিতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। লেনিনগ্রাদে প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগের গ্রন্থাগারে এই রকম একজন লোকের প্রয়োজন ছিল। মাঝে মাঝে তিনি গ্রন্থাগারে এসে পড়াশোনা করতেন। যাঁরা তিব্বতি ভাষায় প্রবন্ধ লিখতেন, তিনি তাঁদের সাহায্য করতেন। কিন্তু সিল্‌ভোচিক্‌স-এর সঙ্গে যে মূর্খ অন্যায় করেছিল, সেই মূর্খই আবার বাধা দিল। তাঁর মতে রাজদ্রোহের অভিযোগে যাঁর শাস্তি হয়েছে, তাঁকে কীভাবে চাকরি দেওয়া যায়। কিন্তু মোঙ্গল পণ্ডিতের অবস্থা সিল্‌ভোচিক্‌স-এর মতো হয়নি। কিছু মোঙ্গল লেনিনগ্রাদে থাকত। তারা তাঁকে সাহায্য করে এবং সে নিজের দেশে ফিরে যায়। 'সন্দেহ নেই এটা সোভিয়েতের ঝক্‌ঝকে সাম্যবাদী পোশাকের ওপর একটা কালো দাগ।' রাহুলের মতে, প্রথম শ্রেণির ঘুমক্কড় যেভাবে দেশে ফিরে আসেন রাহুল ঠিক সেই ভাবেই লেখক হিসেবে ফিরে এসেছিলেন। তিনি এখন পুরাতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, ভাষাতত্ত্ববিদ, সাহিত্যিক ও হিন্দি গদ্য সাহিত্যের অন্যতম স্রষ্টা রাহুল সাংকৃত্যায়ন; এখন আর কোনো অখ্যাত কপর্দকহীন পায়দল সম্বল ভিক্ষু ঘুমক্কড় নন। তিনি আর এখন ভিক্ষুও নন। তিনি মার্কসবাদী রাহুল সাংকৃত্যায়ন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

স্বাধীন ভারতে প্রত্যাবর্তন

১৯৪৭-এর ১৭ অগস্ট রাহুল লন্ডন থেকে বোম্বাই পৌঁছোন। ১৯৪৫-এ তিনি পরাধীন ভারত থেকে ইরান হয়ে রাশিয়া যান। ফিরে আসেন স্বাধীন ভারতে। কিন্তু এই স্বাধীন ভারত দাঙ্গা-পীড়িত। এই পীড়া এখন ভারতের স্থায়ী পীড়ায় পরিণত হবে। রাহুলের কাছে বক্তৃতা দেওয়ার ডাক আসতে লাগল। প্রায় প্রতিদিনই তাঁকে বক্তৃতা দিতে হত। শুধু হিন্দিভাষীদের কাছেই নয়, অহিন্দিভাষীদের কাছেও তিনি বক্তৃতা দিতেন। অহিন্দিভাষীদের কাছে বক্তৃতা দেওয়ার সময় তিনি দেখেছিলেন যে, যদি সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে হিন্দি ভাষার ব্যবহার করা যায়, তাহলে শ্রোতাদের পক্ষে তা বোঝা সহজ হয়। বাঙলায়ও তাঁর এই সফল অভিজ্ঞতা হয়েছিল। রাহুল জানতেন যে, একমাত্র উর্দু ভাষা ছাড়া আমাদের দেশের সব সাহিত্য-ভাষাতেই কোনো না কোনোভাবে সংস্কৃত ব্যবহৃত হয়। প্রয়াগে প্রগতিশীল লেখক সঙ্ঘের সভাপতি হিসেবে তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, উর্দু দেবনাগরি অক্ষরে লেখা হলে হিন্দি-উর্দু সমস্যার সমাধান হবে। প্রয়াগ থেকে তিনি বেনারস ও সারনাথ হয়ে ছাপরা ও পাটনা যান। এখন আর পায়দলে নয়, ট্রেনে। শুধু ঘুমক্কড়ী নয়, বক্তৃতা দিতে হচ্ছিল—তিনি যেখানে যাচ্ছিলেন সেখানেই। ট্রেনে যাওয়াটাও রাহুলের পক্ষে বেশ মুশকিল হয়ে উঠেছিল। কারণ যত্রতত্র গাড়ি থামিয়ে দিত এবং তাঁকে বক্তৃতা দিতে হত।

তিনি পাটনায় তিনদিন খুব ব্যস্তভাবে কাটিয়েছিলেন। পাটনায় যখন কোথাও ভাষণ দিতে যেতেন অথবা বেড়াতে যেতেন তখনো ঘরে লোক বসে থাকত। বলশেভিক রাশিয়ায় রাহুল পঁচিশ মাস কাটিয়ে এসেছিলেন। তাই তাঁর কাছে অনেকের অনেক প্রশ্ন ছিল। রাহুল জেনে খুশি হলেন যে, বিহারের কমিউনিস্ট পার্টি ইতিমধ্যে বেশ কিছুটা প্রসারিত হয়েছে। পার্টি মেম্বারের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬০০-তে। পার্টির প্রেস হয়েছে। কাগজ বেরোচ্ছে।

আবার ঘুমক্কড়ী। ২১ সেপ্টেম্বর পাটনা থেকে রাহুল কলকাতা চলে যান। সেখানে তিনি ব্যারিস্টার স্নেহাংশুকুমার আচার্যের অতিথি হন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গেও তাঁর দেখা হয়।

২৩ সেপ্টেম্বর তিনি বিধুশেখর শাস্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যান। স্নেহের প্রতিমূর্তি সরল সংস্কৃত পণ্ডিতদের জীবন্ত-জাগ্রত প্রতিনিধি ছিলেন তিনি। তাঁর সঙ্গে বিদ্যার সম্বন্ধই ছিল সব চেয়ে বড় সম্বন্ধ। আচারে প্রাচীন হলেও তিনি বিচারে ছিলেন একেবারে আধুনিক। অনুসন্ধান, গবেষণা ও সত্যের চেয়ে মহত্তর বস্তু তাঁর কাছে আর কিছু ছিল

না। মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী রাহুলের সঙ্গে অকৃত্রিম বাৎসল্য নিয়ে দেখা করলেন। অসঙ্গের মহান গ্রন্থ *যোগাচারভূমি* রাহুল তিব্বত থেকে নিয়ে এসেছিলেন। তার সম্পাদনা করছিলেন মহামহোপাধ্যায়। যে রকম ঢিমেতালে প্রেসের কাজ চলছিল, তাতে তিনি হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি রাহুলকে বলেছিলেন যে, এই কাজ তিনি শেষ করে যেতে পারবেন না। কিন্তু ভাগ্যক্রমে তিনি তাঁর জীবদ্দশায়ই *যোগাচারভূমি* শেষ করে যেতে পেরেছিলেন। পণ্ডিত ও গবেষণাকারীদের জন্য মহামহোপাধ্যায় ছিলেন আদর্শ পুরুষ।

কলকাতায় কয়েকদিন কাটিয়ে তিনি বালেশ্বর হয়ে ওয়ার্ধা চলে যান। ওয়ার্ধা গান্ধিবাদী উদ্যোগের কেন্দ্র। গান্ধিবাদ চাইছিল যে, গান্ধীবাদী উদ্যোগ আধুনিক উদ্যোগের স্থান নিক। রাহুল প্রশ্ন করেছেন, এর মানে কি পাষাণ যুগের সঙ্গে বিদ্যুৎযুগের মোকাবিলা নয়? সেবাগ্রামে গান্ধিজি যে বেসিক ট্রেনিঙের পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিলেন তাও রাহুল ভারতের উপযোগী শিক্ষা বলে মনে করেননি।

সেবাগ্রাম থেকে জব্বলপুর হয়ে ডেরাঘাটে চৌষট্টিযোগিনীর মন্দির দেখতে গেলেন রাহুল। কলচুরী আমলের এই মন্দিরে অনেক ভাঙাচোরা মূর্তি ছিল। কলচুরীরা পাশুপত ধর্ম মানত। সেই সময়ে শৈবধর্ম তার প্রকৃতরূপ নিয়ে জীবিত ছিল। রাহুলের সঙ্গিনী শিবলিঙ্গ দেখে ওটা কী জানতে চাইলেন। একই দেশে জন্ম নেওয়া সত্ত্বেও পরস্পরের সংস্কৃতি সম্পর্কে অজ্ঞতার দৃষ্টান্ত হল এই প্রশ্ন। হরগৌরী মন্দিরের ডান দিকে হাঁটু পর্যন্ত বুট পরা ত্রিভুজ সূর্যমূর্তি দেখা গেল। রাহুলের মনে হয়েছিল, এই মূর্তি শকেরা ভারতে প্রথম প্রচার করেছিল। এই ধরনের বুট এখনো শীতের দিনে রুশিরা পরে। রাহুলের মতে রুশিরা এই শকদেরই সন্তান—যাদের পূর্বাঞ্চলীয় শাখা শত্রুর আক্রমণে বাধ্য হয়ে ভারতের দিকে এসেছিল।

বুন্দেলখণ্ডের পুরোনো নাম দর্শন। কালিদাসের সময় এই নাম বিখ্যাত ছিল। কিন্তু বুন্দেলখণ্ডে ঘুরে বেড়ানোর সময় হল না। স্বল্পকালীন ঘুমক্কড়ী শেষ করে প্রয়াগে ফিরে আসতে হল রাহুলকে। আবার কলম ধরতে হল। একটানা ছেচল্লিশ দিন। লেনিনগ্রাদে থাকাকালীন মধ্য-এশিয়ার তাজিক ঔপন্যাসিক সদরুদ্দীন আইনীর কয়েকটা বইয়ে সমাজ পরিবর্তনের কথা ছিল। তাঁর উপন্যাস *দাখুংদা* ও *গুলামান*-এর (জো দাস খে) তাজিক-ফার্সি থেকে অনুবাদও করে ফেলেছিলেন তিনি। কিন্তু উর্দুর প্রকাশক পাওয়া কঠিন। তাই *দাখুংদা* বইটি হিন্দিতে অনুবাদ করে ফেললেন। প্রকাশকও পেয়ে গেলেন।

দাখুংদা শেষ করে *সোভিয়েত ভূমি-র* দ্বিতীয় সংস্করণে হাত দিলেন রাহুল। একদিন দুপুরে রাহুল মহাদেবীজির কাছে গেলেন। তিনি নারী—এই জন্যে মহাদেবীজিকে হিন্দি কবি হিসেবে গণ্য করা হত না। কিন্তু পরে তিনি তাঁর যোগ্যতার দ্বারা সাহিত্য জগতে নিজের যথোচিত স্থান করে নিয়েছেন। রাহুলের তখনোই এই স্থির ধারণা হয়েছিল যে, পন্থ-প্রসাদ-নিরালার প্রজন্মের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতমা মহাদেবীজি।

১৯৪৭-এ বোম্বাই হিন্দি সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন রাহুল।

স্বাধীনতার পর হিন্দি সাহিত্যের এই প্রথম সম্মেলন। তাই প্রতিনিধির সংখ্যা আগের চেয়ে এবার অনেক বেশি। রাহুল সভাপতির দায়িত্ব হালকাভাবে গ্রহণ করেননি। রাহুলের লক্ষ্য ছিল লিপি সংস্কার ও পারিভাষিক শব্দ তৈরির দিকে। এর আগেও একবার তিনি লিপি সংস্কারের পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন। পরিভাষা তৈরির কাজ খুব কঠিন ছিল। কিন্তু তা রাহুলের কাছে অসম্ভব মনে হয়নি।

২৬ ডিসেম্বর রাহুল পার্টির কেন্দ্রীয় অফিসে গিয়েছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে রাহুলের সম্পর্ক যদিও আট বছর আগে হয়েছিল, তবু রাহুলের মনে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ হওয়ার পর থেকেই তিনি কমিউনিস্ট পার্টিকে নিজের পার্টি বলে মনে করেছিলেন। ১৯১৭-র বলশেভিক বিপ্লবের মাস দুয়েক পর তার খবর রাহুল খবরের কাগজে পড়েছিলেন। তখন থেকেই এই বিপ্লবের প্রতি রাহুলের প্রবল আসক্তি জন্মে। তখন থেকেই সাম্যবাদ তাঁর আদর্শ।

কমিউনিস্ট পার্টিতে

তৃতীয়বার রাশিয়া থেকে ফিরে রাহুল দশ দিন কলকাতায় ছিলেন। কিন্তু প্রথম দিনই তিনি সাংবাদিকদের বলে দেন যে, তিনি এখন থেকে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ নেবেন। এভাবে সুস্পষ্ট ঘোষণা করে কমিউনিস্টদের সঙ্গে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা রাহুলের চরিত্রের সঙ্গে বেশ মেলে। সোভিয়েত রাশিয়ায় কীভাবে সাম্যবাদকে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে তা দেখে এসে, ভারতে পরাধীন জীবনের যে নির্লজ্জ শোষণ চলছে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করে সমাজ-বিমুক্ত ভ্রাম্যমান পণ্ডিতের জীবনকে তিনি অনৈতিক মনে করেছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার সময় যে স্বাধীন ভারতের কথা তিনি কল্পনা করেছিলেন, সেই ভারত কালোবাজারি শেঠ বা বাবুদের ভারত নয়, কৃষক-মজুরের ভারত। তাই ভারতের মুক্তি সংগ্রামে কোন পথ অনুসরণ করবেন, তা ২০ বছর আগেই তিনি ঠিক করে ফেলেছিলেন। মার্কসবাদের অধ্যয়ন ও রাশিয়ার বলশেভিক পার্টির সংগ্রামের কৌশল থেকে তিনি এই শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন যে, এই পার্টি কৃষক-মজুরের পুরোভাগে থেকে সংগ্রাম পরিচালনা করেছিল বলেই সংগ্রাম সফল হয়েছিল। তাই একথা বলা যেতে পারে যে, বলশেভিক বিপ্লব রাহুলের চোখ খুলে দিয়েছিল।

১৯৩৮-এ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু রাহুল খোঁজাখুঁজি করে সোমনাথ লাহিড়ীর সঙ্গে দেখা করেন। লাহিড়ী তাঁকে জানালেন যে বিহারে কমিউনিস্ট-পার্টি তৈরি হয়নি। তাই আপাতত তাঁকে পার্টির অন্যান্য কর্মীদের মতো বিহারের সোস্যালিস্ট পার্টির সঙ্গে কাজ করতে হবে। লাহিড়ীর এই উপদেশ রাহুলের ভালো লাগেনি। যে পার্টিতে মাসানির মতো লোক আছে, সেই পার্টির সঙ্গে কীভাবে কাজ করবেন ভেবে পাননি তিনি।

সেই বছরই বিহারের প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন হচ্ছিল দ্বারভাঙ্গাতে। এই কৃষক সম্মেলনে যোগ দিয়ে ও কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকে তাঁর কাছে একটা কথা

স্পষ্ট হয়ে গেল, যে-সব কংগ্রেসি নেতা এতকাল স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং যারা এখন সরকার গঠন করেছেন, তাদের অধিকাংশই প্রজাশোষক জমিদার অথবা তাঁদেরই অনুগামী।

শেষপর্যন্ত জয়প্রকাশের অনুরোধে রাহুল সোস্যালিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু মাসানি সম্পর্কে তাঁর আপত্তি থেকেই গিয়েছিল।

কৃষকদের শোষণ যে কংগ্রেসি শাসনে অব্যাহত ছিল শুধু তাই নয়, চিনিকলের মজুরদের ওপর তাদের শোষণ ও অত্যাচারের সীমা ছিল না। চিনিকলের মজুরদের নভেম্বরের হরতাল যে রকম নির্মমভাবে কংগ্রেসি রাজ ভেঙে দিল, তা দেখে রাহুল হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। রাহুল বিস্মিত হয়ে এ সময়ে লিখেছিলেন, 'এখনও আমাদের দেশ ইংরেজের গোলাম। কংগ্রেসিরা কি জানে না, যে-জনতার ওপর এত অত্যাচার হচ্ছে, তাদের শক্তির ওপর নির্ভর করেই তাদের বিদেশিদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। কংগ্রেসি নেতারা এ-রকম করবেন, আমি ভাবতে পারিনি।'

রাঁচিতে প্রাদেশিক হিন্দি সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি হিসেবে রাহুল গান্ধিজি অনুমোদিত হিন্দি-উর্দু মিশ্রণে জাত হিন্দুস্থানির বিরুদ্ধে বলেছিলেন।

কৃষক সত্যাগ্রহ, ১৯৩৯

১৯৩৯-এর পয়লা জানুয়ারি নাগার্জুনকে সঙ্গে নিয়ে রাহুল পাটনা আসেন। পরদিন সেখান থেকে ছাপরা যান। ছাপরায় জেলার সব কৃষক কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা হল। আমওয়ারীর কৃষকরা জানাল যে জমিদার তাঁদের খেত ছিনিয়ে নিয়েছে। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে কংগ্রেস কর্তারা কোনো সাহায্য করেনি। রাহুল আমওয়ারী গিয়ে জানতে পারলেন যে, সত্যিই কৃষকদের খেত কেড়ে নেওয়া হয়েছে। জমিদার ও কৃষকের ঝগড়াটা শুরু হয়েছে হরী-বেগারী নিয়ে। অর্থাৎ হরী-বেগারী প্রথা অনুযায়ী চাষিকে আগে জমিদারের খেত চাষ করতে হত, তারপর সে নিজের খেত চাষ করতে পারত। জমিদারের খেত চাষ করার জন্য সে কোনো পারিশ্রমিক পেত না।

অনেকদিন ধরেই বিহারে কিষান আন্দোলন চলছিল। ১৯২৭ থেকে ১৯৩৬-এর মধ্যে কৃষকসভা গড়ে উঠতে থাকে। বিহারে স্বামী সহজানন্দ তাঁর আশ্রমকে কংগ্রেসের ও কৃষক আন্দোলনের কেন্দ্রে পরিণত করেছিলেন এবং ১৯২৮ থেকে ক্রমে সারা বিহারে কিষান সভার শাখা-প্রশাখা বিস্তারিত হতে থাকে।

বিহারে জমি বিভক্ত ছিল তিন ভাগে ঃ কস্তকারি বা রায়তি জমি, বকস্ত জমি ও জিরাতি জমি। জমির এই ধরনের বিভাজন যদি স্থির থাকত তাহলে কৃষক আন্দোলনের সমস্যার সমাধান সহজ হত। কিন্তু এই বিভাজন রেখা ক্রমাগতই পরিবর্তিত হচ্ছিল। এবং তাতেই সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছিল। রাজেন্দ্রপ্রসাদ এই সমস্যাকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেছিলেন ঃ প্রথমত, খাজনা বৃদ্ধি করে বকেয়া খাজনার দায়ে কৃষকের জমি নিলাম করে আত্মসাৎ করেছিলেন জমিদাররা, এতে ক্রমে কস্তকারি বা রায়তি জমি বকস্ত

জমিতে পরিণত হয়েছিল। বকস্তু জমি অর্থাৎ এই জমিতে কৃষকদের স্বল্পকাল চাষ করার অধিকার ছিল। অর্থনৈতিক মন্দা, জমিদারের বাহুবল ও অন্যান্য কারণে কৃষকের কস্তকারি জমি বকস্তু হয়ে যাওয়াই ছিল প্রধান সমস্যা।.বেগারী আরো একটি সমস্যা ছিল। এই বেগারীর রকমফের ছিল হরী-বেগারী।

১৯৩৯-এর পয়লা জানুয়ারি নাগার্জুনকে সঙ্গে নিয়ে রাহুল পাটনায় আসেন। পরদিন সেখান থেকে ছাপরা যান এবং ছাপরা জেলার সব কৃষক কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করেন। আমওয়ারীর কৃষকদের কাছ থেকে তিনি জানতে পারেন যে জমিদার কৃষকদের খেত কেড়ে নিয়েছে। আমওয়ারীর কৃষকরা রাহুলকে জানায়, 'আমাদের খেত ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, আমরা এদিক-ওদিক অনেক ছোটাছুটি করেছি। কংগ্রেস নেতাদের কাছে গিয়েছি, কিন্তু কেউ আমাদের কথা শোনেনি।' জানুয়ারিতে রাহুল আমওয়ারী পৌঁছোন। সেখানে গিয়ে তিনি বুঝতে পারলেন যে, সত্যি সত্যি অনেক কিষানকে খেত থেকে উৎখাত করা হয়েছে এবং এও বুঝতে পারলেন যে, ঝগড়াটা শুরু হয়েছে বেগারী নিয়ে। সত্যযুগ থেকেই ব্যবস্থাটা চলে আসছে যে, কিষান তার হাল ও বলদ দিয়ে মালিকের খেত প্রথম চাষ করবে, তারপর তার নিজের খেতে নিয়ে যেতে পারবে। রামধনী মাহাতো নিজের খেত চাষ করছিল। জমিদার এসে বললেন, হাল আমার খেতে নিয়ে চল। রামধনী বলল, এই খেত চাষ করে আমি আপনার খেতে চাষ করতে যাব। বাবু তাকে তিনটি লাঠির বাড়ি মারেন, পুলিশের কাছেও রায়তের বিরুদ্ধে রিপোর্ট দেন। অন্যান্য কৃষকদের কাছেও ব্যাপারটা খুব খারাপ লাগে। পুলিশের রিপোর্ট পড়ে ম্যাজিস্ট্রেট কিষানদের ওপর ১৪৪ ধারা জারি করেন। সারা মামলাটা এক তরফা এবং তা হচ্ছিল কংগ্রেসি মন্ত্রীদের আমলেই।

রাহুল পরদিন (২ জানুয়ারি) পাশের গ্রামের দিকে যান। আমওয়ারী প্রাইমারি স্কুলের ছেলেরা তাঁকে বিশ্রী গালাগালি করে। স্কুলের শিক্ষক জমিদারি সেরেস্তায় চাকরি করতেন। জমিদারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জন্য তিনি ছেলেদের রাহুলকে গালাগালি দিতে শিখিয়ে দিয়েছিলেন। এক বছর ধরে কিষানদের ওপর জমিদারের অত্যাচার চলছিল। শেষ পর্যন্ত কিষানরা ঠিক করল যে, তারা খেতের ওপর তাদের দাবি ছাড়বে না। অনেক চেষ্টা করেও জমিদার এ ব্যাপারে কিষানদের ঐক্য ভাঙতে পারেনি। রাহুল সুলতানপুর গ্রামে গিয়ে দেখলেন, কংগ্রেসি নেতারা একই রকমের অত্যাচার করছিল। কিষানরাও প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠছিল। রাহুল ছাপরা জেলার বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

ছাপরার সব চেয়ে বড় জমিদার হাথুয়ার মহারাজা। অসহযোগ আন্দোলনের সময় রাহুলের সঙ্গে তার বিশেষ পরিচয় হয়েছিল। তাই তাঁর আশা ছিল যে, মহারাজা হয়তো তাঁর কথা শুনবেন। কিন্তু মহারাজা তাঁকে হাথুয়া পর্যন্ত পৌঁছোতেই দেননি।

রাহুল গ্রামে গ্রামে ঘুরতে থাকেন। মেহরামচক গ্রামে গিয়ে দেখেন, গোটা গ্রাম পুলিশ ঘিরে রেখেছে। এমনকি মেয়েদেরও বাইরে যাওয়ার রাস্তা রাখেনি। একটা খড়ের

বাড়িতে গিয়ে দেখলেন, বাড়ির লোকদের ঘর থেকে বার করে দেওয়া হয়েছে এবং সেই ঘরে ভূষি রাখা হয়েছে। কৃষকদের সীমাহীন দারিদ্র্য ও অসহায়তা। ক্ষুধার্ত এই সব কৃষকদের ভেতর থেকে ভয় দূর হয়ে গিয়েছিল। তাদের উৎসাহ দেখে রাহুলের বড় আনন্দ হল। রাহুল বললেন, বিপ্লব, তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি।

২৩ জানুয়ারি কার্যানন্দ শর্মার সঙ্গে তিনি হক্কৌরা যাচ্ছিলেন। গয়ার কিষান-নেতা পণ্ডিত যদুনন্দন শর্মা কিষানদের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাই তাঁর বিরুদ্ধে মামলা চলছিল। পঞ্চাশ হাজার কিষান তাদের বীর নেতাকে দেখার জন্য গয়া যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। তাদের কাছে রেলের টিকিট চাইবে এমন সাহস ছিল না কোনো টিকিট চেকারের।

রাহুল ও কার্যানন্দ লরিতে বথোড়া গেলেন। এখানেও দারিদ্র্যের সীমা-পরিসীমা ছিল না। বহু বাড়ির ছাদেই অনেক বছর খড় দেওয়া হয়নি। এখানে উঁচু জাতের কিষান অনেক থাকেন। জমিদারও উঁচু জাতেরই। এক-এক করে এরা গরিব কিষানদের সব জমি নিলাম করে দখল করেছে। এখন এই গরিব কিষানদের টাকা রোজগারের দুটো পন্থা ছিল। বলদের গাড়ি বোঝাই করা অথবা মেয়ের জন্ম দিয়ে তাকে নিজের জাতের মধ্যেই বেচে দেওয়া। এখানে এমন দারিদ্র্য অথচ এখানকার পুরুষ ও স্ত্রীলোকের শরীরে এখনো সৌন্দর্যের ঝলক দেখা যায়। পুলিশ ও সরকারি অফিসারদের বরদ-হস্ত ছিল জমিদারদের ওপর, কেননা তারা নিজেদের পাক্কা ইংরেজ ভক্ত প্রমাণ করেছিলেন। চারজন কংগ্রেসি মন্ত্রীর মধ্যে তিনজন ছিলেন জমিদার। চতুর্থজন জমিদার হওয়ার পথে এগোচ্ছিলেন। কিষানদের প্রতি তাদের সহানুভূতি কেনই বা থাকবে! কিন্তু কিষানরা এখন ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। তারা তাদের নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্য একসঙ্গে লড়তে, জেলে যেতে ও মার খেতে প্রস্তুত। গ্রামের মেয়েরা তাদের দেখে গাইত, 'চলু চলু সখিয়া জেলকে জবৈয়া গে।'

গ্রামে ঘুরে বেড়ানোতে একটা কথা স্পষ্টভাবে রাহুলের কাছে ধরা দিয়েছিল : গ্রামে গ্রামে জমিদার ও কিষানদের মধ্যে সংঘর্ষ চলছে। এই সংঘর্ষের কারণ হল এই যে, কংগ্রেসি মন্ত্রীমণ্ডল ক্ষমতায় আসার পর জমিদারের ভয় হয়েছিল যে, তারা জোর করে যে-সব কৃষকের জমি কেড়ে নিয়েছে তারা সেই জমি আবার দখল করে নিতে পারে। তাই সারা বিহারে কিষানদের নিজস্ব চাষের জমি (কস্তকারি) থেকে উৎখাত করতে থাকে তারা। কিষানরাও তাদের জমির ওপর দখল বজায় রাখার জন্য লড়াই করতে প্রস্তুত হতে থাকে। এই হল জমিদার-কৃষক সংঘর্ষের আসল কারণ। তাছাড়া বেগারীর মতো আরো অন্যান্য অনাচার তো জমিদাররা করতই। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে :

যে সব গ্রামে বড় বড় জমিদার থাকতেন, সেই গ্রামের মেয়েদের ইজ্জত বজায় রাখা কঠিন ছিল। জমিদারের নিজের ঘরে পর্দা প্রথা ছিল। সাধারণ স্ত্রীলোকদের মধ্যে তা ছিল না। তাছাড়া কয়েকশো বছর ধরে তারা কয়েকটি জাতকে তাদের খাওয়াস-

গৃহসেবক বানিয়ে রেখেছে। এদের অবস্থা ক্রীতদাসের চেয়ে ভালো নয়। মালিকের এঁটো ভাতে তারা পেট চালায়, ছেড়ে দেওয়া কাপড় দিয়ে তাদের শরীর ঢাকে। মাসে আট আনা বা বারো আনা তাদের বেতন মেলে, আর কাজের জন্য রাতের প্রথম প্রহর থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। মেয়ের বিয়ে হলে যেমন—মোটর, হাতি, সোনা-রূপার পণ দেয়া হয়, সেই রকম খাওয়াসিন গৃহসেবিকাও পণের সঙ্গে দেওয়া হয়।

আমওয়ারী সত্যাগ্রহ (২৪ ফেব্রুয়ারি)

২০ ফেব্রুয়ারি ছাপরা এসে রাহুল জানতে পারলেন যে, আমওয়ারীতে তাঁর নামে ১৪৪ ধারা জারি হয়েছে। সেখানে যাওয়ার অর্থ জেলে যাওয়া। কিন্তু সরকারি ১৪৪ ধারার এই চ্যালেঞ্জকে উপেক্ষা করে রাহুল আমওয়ারীতে সত্যাগ্রহ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ছাপরা থেকে রাহুল টজজোরী, নর্দিয়ার, দেবগুরু, হরিনাথপুর প্রভৃতি গ্রামে সভা করে নিখতি থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারি সকাল আটটায় আমওয়ারী রওনা হন। গ্রামের পাশে দুটো হাতি তৈরি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পেছনে ছিল কয়েকশো লাঠিয়াল। কিষান নেতা লালজি ভগতের বাথানে শয়ে শয়ে কিষান জমা হয়েছিল। রাহুল স্থির করেছিলেন যে, একজন নেতা সহ দশজন কিষাণের পাঁচটি দল পর্যায়ক্রমে একটি খেতে আখ কেটে সত্যাগ্রহ করবে। থানার বড় দারোগা খুব চিন্তিত ছিলেন। রাহুল তাঁকে বলেছিলেন যে, ঠিক বেলা দশটায় তাঁরা 'অমুকের' খেতে আখ কাটতে যাবেন।

ঠিক দশটায় রাহুল দশজন লোক ও হাঁসুয়া নিয়ে খেতে পৌঁছে যান। হাতি দুটোকে মদ খাইয়ে মাতাল করে রাখা হয়েছিল। কয়েকশো লাঠিয়াল সার বেঁধে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু পঞ্চাশজন সশস্ত্র পুলিশের দলটি দাঁড়িয়েছিল তিন ফার্লং দূরে এক বাগানে। খেতে এসেছিল দুজন দারোগা, একজন সেপাই ও দুজন চৌকিদার। এই হল আমওয়ারী সত্যাগ্রহের প্রথম দৃশ্য।

জমিদারের উস্কানি সত্ত্বেও কিন্তু লাঠিয়ালরা রাহুলের ওপর লাঠি চালায়নি। রাহুল বুঝতে পারলেন, তাঁর গায়ের হলুদ চীবরের জন্যই কেউ লাঠি চালাতে সাহস পায়নি। রাহুল দুটো আখ কেটেছিলেন। দারোগা তাঁকে গ্রেপ্তার করলেন। তাঁর সত্যাগ্রহী সঙ্গীদেরও গ্রেপ্তার করা হল। তারপর জমিদারের হাতির মাহুত কুরবান হাতি থেকে নেমে রাহুলের মাথায় লাঠির বাড়ি মারল। *মেরী জীবনযাত্রা*-য় (২য় খণ্ড) রাহুল লিখছেন, 'আমি পেছন দিকে মাথা ঘোরালাম, দেখলাম জমিদারের মাহুত কুরবান হাতি থেকে নামল। আমি যেই অন্যদিকে মুখ ঘোরালাম সেই সময়ে মাথার বাঁদিকে জোরে লাঠি লাগল। আমি কোনো ব্যথা অনুভব করিনি, শুধু দেখলাম যে মাথা থেকে রক্ত বেরোচ্ছে।' রাহুলকে গ্রেপ্তার করার আগে অথবা পরে কুরবান রাহুলের মাথায় লাঠির বাড়ি মেরেছিল—এই প্রশ্ন নিয়ে পরে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। সেকথা যথাস্থানে বলা যাবে। দারোগা কুরবানকে গ্রেপ্তার করে নিয়েছিলেন। জমিদারের অনুরোধে তিনি অবশ্য

তাকে ছেড়ে দেন। অন্যদের মোটরে সিওয়ানে নিয়ে যায়। পথে প্রস্রাব করার জন্য গাড়ি থামাতে বলেছিলেন রাহুল। কিন্তু পুলিশ গাড়ি থামায়নি।

সিওয়ান জেল থেকে তাঁদের ছাপরা জেলে পাঠানো হতে লাগল। নাগার্জুন, জলিল, মজহর, বাসুদেব নারায়ণ, মহারাজ পাণ্ডে ও আরো অনেক আমওয়ারীর কিষান সত্যাগ্রহী জেলে এসেছিল। অন্যদের হাতে হাতকড়ি লাগানো সত্ত্বেও রাহুলের হাতে হাতকড়ি লাগানো হল না। রাহুল দাবি করলেন যে, হয় তাঁর হাতে হাতকড়ি লাগাতে হবে, নয়তো কারুর হাতেই হাতকড়ি লাগানো চলবে না। অতএব হাতকড়ি খুলে দিতে হয়। রাস্তায় রাহুল ও তাঁর সঙ্গীরা ইনকিলাব জিন্দাবাদ, কিষানরাজ কায়েম হো, মজুররাজ কায়েম হো, জমিদারি প্রথা নাশ হো ইত্যাদি স্লোগান দিতে দিতে যাচ্ছিলেন। শহরের লোকদের কাছে এটা একেবারে নতুন জিনিস। এই জন্যে নয় যে, রাহুল বাবার মাথা ফাটানো হয়েছে বা তাঁকে দড়ি বেঁধে সড়ক দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, বরং এই জন্যে যে, এ সব কিছুই গান্ধিবাবার রাজত্বে হচ্ছে। স্টেশনে একজন সাংবাদিক তাঁর বক্তব্য লিখে নেয়। ছাপরা পৌঁছেও তিনি পায়ে হেঁটে জেলে যান। প্রচারের জন্য পায়ে হেঁটে যাওয়াটা প্রয়োজন ছিল।

খবরের কাগজে সংবাদ পৌঁছে গিয়েছিল। জেলের বাইরের নেতারাও আসতে শুরু করেছিলেন। শিউবচ্চন সিংহ ও অন্যান্য নেতারা আমওয়ারী এসে সত্যাগ্রহ পরিচালনা করছিলেন। ২৮ ফেব্রুয়ারি কালেকটর এসে এক পঞ্চায়েতের হাতে এই বিবাদের মীমাংসার ভার দিলেন। এই পঞ্চায়েতে একজন কিষান প্রতিনিধি, একজন সরকারি প্রতিনিধি ও একজন জমিদার প্রতিনিধি ছিলেন। মিটমাটের কথাবার্তা চলছিল। তাই সত্যাগ্রহ স্থগিত ছিল। কিন্তু জমিদার আপোষের পথে গেলে তো মিটমাট হবে। সরকারি প্রতিনিধি তো জমিদারের আজ্ঞাবহ্।

ইতিমধ্যে পুলিশ সত্যাগ্রহী কৃষকদের না ধরে কৃষক নেতাদের গ্রেপ্তার করতে লাগল। রাহুল দাবি করলেন, সরকার কৃষকদের রাজনৈতিক বন্দির স্বীকৃতি দিক, নয়তো তিনি অনশন ধর্মঘট করবেন। এই দাবি মেনে নেওয়ার জন্য রাহুল কিছুদিন সরকারকে সময় দিয়েছিলেন।

রাহুলের প্রথমবারের অনশন ধর্মঘট ১৮-২২ মার্চ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। ২০ মার্চ অর্থাৎ অনশনের তৃতীয়দিন তিনি 'তুমহারী ক্ষয়' লিখে শেষ করেন। ২২ মার্চ ইনস্‌পেকটর জেনারেল জানালেন যে তিনি সাময়িকভাবে রাহুলের সব দাবি মেনে নিয়েছেন।

রাহুলের বিরুদ্ধে ৩৭৯ ধারায় মামলা রুজু করা হল সিওয়ানের ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে। ৩৭৯ ধারা মানে চুরির অপরাধ। রাহুলকে হাতকড়া পরিয়ে আদালতে নিয়ে আসা হয়েছিল।

ম্যাজিস্ট্রেটের প্রশ্নের উত্তরে রাহুল স্বীকার করলেন, তিনি অপরের খেতে আখ কেটেছেন। মামলার পরবর্তী তারিখ পড়ল ১৪ এপ্রিল।

রাহুলের মাথা ফাটানো ও মোটরে রাহুল ও তাঁর সঙ্গীদের সিওয়ানে নিয়ে যাওয়ার সময় রাহুল প্রস্রাব করার জন্য গাড়ি থামাতে বলা সত্ত্বেও গাড়ি না থামানো এই দুটি প্রশ্ন নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। মাথা ফাটানোর ব্যাপারে প্রশ্ন হল রাহুলকে গ্রেপ্তার করার আগে তাঁর মাথায় লাঠি পড়েছিল অথবা পরে। *মেরী জীবনযাত্রা*-য় রাহুল লিখেছেন যে তাঁকে গ্রেপ্তার করার পরে তাঁর মাথায় কুরবান লাঠির বাড়ি মারে। যদি তা হয় তবে একথা স্বীকার করতে হবে যে, তিনি পুলিশ হেফাজতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তার অর্থ হল এই যে সরকার তাঁকে জমিদারের লোকের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেনি অথবা করেনি। এ ব্যাপারে *সার্চ লাইট* কাগজে একটি রিপোর্ট বেরিয়েছিল। ঠিক কখন রাহুলকে কুরবান আক্রমণ করেছিল তা বিহারের মুখ্যমন্ত্রী (তখন প্রধানমন্ত্রী বলা হত) পুলিশের ইনস্‌পেকটর জেনারেলের কাছে জানতে চেয়েছিলেন। তাতে ইনস্‌পেকটর জেনারেল 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি'-র মতো একটি রিপোর্ট দিয়েছিলেন। চিফ সেক্রেটারিকে ইনস্‌পেকটর জেনারেলের লিখিত উত্তর ছিল এই যে, আই. জি. পি. এ ব্যাপারে একটি দ্ব্যর্থশূন্য সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। কিন্তু একথা স্পষ্ট যে দুটো ঘটনা যুগপৎ ঘটেছিল এবং পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের কথা মেনে নিলেও একথা বলা চলে যে সাব-ইনস্‌পেকটর যখন তাঁর পিঠে হাত দেন এবং মাহুত যখন তাঁকে লাঠির বাড়ি মারে তার মধ্যে দুয়েকটি মুহূর্ত অতিক্রান্ত হয়েছিল। আই. জি. পি. এ নিয়ে যে তদন্ত করেছেন, তা থেকে একথা বলা চলে যে, পণ্ডিত রাহুল কার্যকরভাবে পুলিশ হেফাজতে ছিলেন না।

রাহুলকে কুরবান মারতে সক্ষম হল কেন এবং কেন তাকে গ্রেপ্তার করা হল না। এ বিষয়ে আই. জি. পি.-র বক্তব্য হল ঃ পণ্ডিতের বিবৃতি সঠিক বলে ধরে নিলে দেখা যায় যে, সাব-ইনস্‌পেকটর এসে তাঁর কাঁধে হাত রেখে বলে যে, পণ্ডিতকে তিনি গ্রেপ্তার করছেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই জমিদারের লোকেরা যাতে এগিয়ে না আসে তা ঠেকাতে চলে যান। আপাতদৃষ্টিতে একটিমাত্র লোক ছুটে এসে তাঁকে মাথায় আঘাত করে, তখন পণ্ডিত একা ছিলেন।

এই কারণেই মাহুতকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। অথবা তার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়নি। মাহুতের অপরাধ বিচারালয়ের দৃষ্টির অন্তর্গত অপরাধ নয়। অতএব পুলিশের তাকে গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা ছিল না এবং সাধারণভাবে কেউ অভিযোগ না করলে একটি সাধারণ আঘাতের জন্য পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নেয় না। অবশ্য একথা সত্য যে, পুলিশ অফিসাররা এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী, তাদের কেউ অভিযোগ করে মামলা দায়ের করতে পারতেন এবং সেই পরিস্থিতিতে সেটাই বিচক্ষণতার পরিচায়ক হত। কিন্তু বিচারালয়ের দৃষ্টির অন্তর্গত নয় এমন অপরাধের জন্য মামলা দায়ের করা পুলিশের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। তাই এই ব্যাপারটাকে তখন তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। প্রকৃতপক্ষে মাহুতকে পুলিশ ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল ; যেহেতু বিচারালয়ের দৃষ্টির অন্তর্গত কোনো অ[illegible] বিরুদ্ধে ছিল না। কিন্তু পণ্ডিত

সাংকৃত্যায়নের প্রধান অভিযোগ হল এই যে, জমিদার ও ইনস্‌পেকটর বিক্রমজিৎ সিংহের যোগসাজসেই তাঁকে মারা হয়েছে। আই. জি. পি. খুব সতর্কভাবে এই অভিযোগটি পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে এসেছেন যে এই অভিযোগ ভিত্তিহীন। ইনস্‌পেকটর পুলিশ ফোর্সকে যথাযথভাবে বিন্যস্ত করেছিলেন।

আই. জি. পি.-র রিপোর্টে রাহুলের আর একটি অভিযোগ একেবারে নস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছে।

রাহুলের অভিযোগ—আই. জি. পি. তদন্তের সময় সাক্ষ্য প্রমাণের বিকৃতি ঘটিয়েছেন, তা বিশ্বাসের অযোগ্য—২২ মে (১৯৩৯) চিফ সেক্রেটারি এই নোট দেন। এ ব্যাপারে পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি কে. বি. সহায়-এর ১৯ জুনের (১৯৩৯) নোটে বলা হয় যে আই. জি. পি.-র তদন্তের সম্পর্কে রাহুলের বক্তব্য অযৌক্তিক ছিল—একথা বলা চলে না। সাব-ইনস্‌পেকটর, ইনস্‌পেকটর ও আই. জি. পি. তাঁকে আমওয়ারীতে এনে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেন। কিন্তু তিনি যখন কোনো প্রশ্ন করতে চান, তখন তাঁকে বলা হয় যে, একমাত্র জেলে গিয়েই তিনি প্রশ্ন করতে পারবেন। রাহুলের কাছ থেকে তাঁরা অনেক প্রশ্নের উত্তর আদায় করে নিচ্ছিলেন। কিছু প্রশ্ন তো তাঁকে অপমান করার জন্যই করা হয়েছিল। যেমন, 'নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনাই কি আপনাদের সংগঠনের মতবাদ?' এই প্রশ্ন করার অনুমতি দিয়েছিলেন আই. জি. পি. এবং তিনি মনে করেন যে, তিনি রেভারেন্ড সাংকৃত্যায়নকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করেছেন। এ সবের পরে যদি এ কথা সত্য হয়ে থাকে যে, তাঁর বক্তব্যে বিকৃতি ঘটানো হয়েছে এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ জায়গা বাদ দেওয়া হয়েছে, তবে রাহুলের বিরক্ত হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল।

মুখ্যমন্ত্রী আই. জি. পি.-র রিপোর্ট পরীক্ষা করে দেখে আরো কিছু তথ্য জানতে চান। তা হল ঃ

১। আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গের এমন কী আশংকা দেখা দিয়েছিল যার ফলে আমওয়ারীতে একটি বৃহৎ পুলিশ ফোর্স পাঠাতে হয়েছিল? তার উত্তরে চিফ সেক্রেটারি জানান যে রেভারেন্ড রাহুলের সম্ভাব্য সত্যাগ্রহের জন্যই সেখানে পুলিশ পাঠাতে হয়েছিল। পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি লিখছেন যে, মুখ্যমন্ত্রী সম্ভবত একথা বলতে চেয়েছিলেন যে, বেশ কিছুকাল থেকেই জমিদার শক্তিপ্রয়োগের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন এবং জমিদার যাতে শান্তিভঙ্গ না করেন, সেইজন্যই পুলিশ পাঠাতে হয়েছিল। ....সত্যাগ্রহীদের শান্তিপূর্ণ থাকারই কথা। মুখ্যমন্ত্রী হয়তো সেই সময়ের পুলিশ ডায়েরি চেয়ে পাঠাতে পারেন।

২। ২৪ ফেব্রুয়ারিতে পুলিশবাহিনীর বিন্যাস যুক্তিযুক্ত হয়েছিল কিনা এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সন্দেহ আছে। পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি লিখছেন, তাঁর ধারণা পুলিশবাহিনীর বিন্যাস যুক্তিযুক্ত হয়নি। গ্রামের সবদিকে পুলিশবাহিনীকে ছড়িয়ে রাখার কোনো যুক্তি ছিল না। যেসব জায়গাগুলিকে পাহারা দেওয়ার জন্য পুলিশবাহিনী বিন্যাস করা উচিত ছিল তা হল ঃ (১) জমিদারের বাড়ি—যেখানে একটি বড় লাঠিয়ালবাহিনী জড় হয়েছিল;

(২) সত্যাগ্রহের স্থানে। তাঁর অধীনে ৩ জন সাব-ইনস্পেকটর, ১ জন এ্যাসিস্টান্ট সাব ইনস্পেকটর, ২ জন হাবিলদার ও ১৮ জন কনেস্টবল, ৩ জন দফাদার ও ৬২ জন চৌকিদার থাকা সত্ত্বেও ইনস্পেকটর একজন কনস্টেবল ও ৫৭ জন চৌকিদারকে জমিদারের বাড়ির সামনে মোতায়েন করেন।

যেখানে সত্যাগ্রহ হবে, তা আগে থেকে জানার কথা ছিল না। তবে জায়গাটা খুঁজে বার করা কঠিন ছিল না। রেভারেন্ড রাহুল স্বয়ং বলেছিলেন তিনি কোথায় সত্যাগ্রহ করবেন। ঠিক যে জায়গাটায় সত্যাগ্রহ করবেন তা না জানা থাকলেও বামজাসের বাড়ির কাছাকাছি যদি পুলিশ থাকত, তাহলেও তারা তাঁর সুরক্ষার অধিকতর সুবন্দোবস্ত করতে পারত। রেভারেন্ড রাহুল পুলিশের সঙ্গে লুকোচুরি করছিলেন না। কোথায় তিনি সত্যাগ্রহ করবেন, পুলিশ তাঁর কাছে জানতে চাইলে তিনি সঠিক জায়গাটা দেখিয়ে দিতেন। আমার সিদ্ধান্ত হল এই যে, জমিদারের বাড়িতে একটি বৃহৎ লাঠিয়ালবাহিনী একত্রিত হয়েছিল। সেখান থেকে তারা সত্যাগ্রহের খেতে অগ্রসর হয়। যেখানে রাহুল সত্যাগ্রহ করছিলেন তা পুলিশের প্রহরাধীনে ছিল না। গ্রামে আসার সব পথ পাহারা দিয়ে পুলিশ অনর্থক তাদের উদ্যমের অপচয় ঘটিয়েছিল। ইনস্পেকটরের ঘটনাস্থলে থাকা উচিত ছিল ; অথচ ৪ জন কনস্টেবল, ১ জন দফাদার ও ১৫ জন চৌকিদার নিয়ে তিনি ছিলেন ঘটনাস্থল থেকে আধ মাইল দূরে।

আর একটি প্রশ্ন হল, পুলিশ জমিদারের লাঠিয়ালবাহিনীর বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নিয়েছিল। জমিদারের আত্মরক্ষার জন্য লাঠিয়ালবাহিনী জড়ো করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। তাকে রক্ষা করার জন্য একটি বৃহৎ পুলিশবাহিনী ছিল। লাঠিয়ালবাহিনী জড়ো করা সত্ত্বেও জমিদারের বাড়ির কাছাকাছি কোনো পুলিশ ছিল না অথবা সেখানে ১৪৪ ধারাও জারি করা হয়নি। অতএব দেখা যাচ্ছে যে পুলিশ লাঠিয়ালবাহিনীর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই নেয়নি।

কুরবানের বিরুদ্ধে পুলিশ কেন কোনো ব্যবস্থা নিল না, তাও বোঝা যাচ্ছে না। গ্রেপ্তারের আগে অথবা পরে কুরবান রেভারেন্ড রাহুলকে আঘাত করেছিল, এবিষয়ে আই. জি. পি.-র কোনো ধারণা ছিল না। কিন্তু ১৪ মে আমি নিজের পরিচয় গোপন করে গ্রামে যে তদন্ত করেছি তাতে গ্রামের প্রায় সবাই আমাকে বলেছে যে গ্রেপ্তারের পর তাঁকে আঘাত করা হয়েছিল। যদি কুরবান নির্দোষ হয়ে থাকে তবে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল কেন। তার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, তাকে গ্রেপ্তার না করলে সে হিংসাত্মক কাজ করতে পারত। এই যুক্তি বড় অদ্ভুত। সম্ভবত জমিদার চন্দ্রেশ্বর প্রসাদের ক্রুদ্ধ গালাগালিতে ভয় পেয়ে এবং ইনস্পেকটরের নির্দেশে গ্রেপ্তার করা সত্ত্বেও কুরবানকে পুলিশ ছেড়ে দেয়। পুলিশ জানত যে, পুলিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে চন্দ্রেশ্বর প্রসাদের খুব মাখামাখি। সুতরাং তার কোনো লোকের বিরুদ্ধে কিছু করাটা বিপজ্জনক হবে।

সিওয়ানের পথে রাহুলকে মূত্রত্যাগ করতে দেওয়া হয়নি এই প্রশ্নেরও উত্তর দরকার। পণ্ডিত রাহুল বলেছেন যে, তিনি মূত্রত্যাগ করার জন্য গাড়ি থামাতে

বলেছিলেন। কিন্তু গাড়ি থামানো হয়নি। এই উক্তির বিরুদ্ধে কনস্টেবলের উক্তি হল, কথাটি সত্য নয়। এই পরিস্থিতিতে রেভারেন্ড রাহুলের উক্তিকে সত্য বলে মেনে নিতে হবে। এ কথা ভাবা যায় না—রাহুলজির মতো একজন মর্যাদাসম্পন্ন লোক, একজন সাধারণ কনস্টেবল যার বিরুদ্ধে তাঁর কোনো শত্রুতা ছিল না তাঁকে জড়িয়ে এ ধরনের মিথ্যা কথা বলতে পারেন। রেভারেন্ড রাহুলের মতো গুরুত্বপূর্ণ মানুষের চেয়ে যদি একটি সাধারণ কনস্টেবলের কথায় আস্থা বেশি হয় তবে পুলিশি অত্যাচারের আর সীমা-পরিসীমা থাকবে না।

এইসব সত্য পরীক্ষা করে পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, ২৪ ফেব্রুয়ারি আমওয়ারীতে জমিদারের বাড়ির কাছে এবং যেখানে সত্যাগ্রহ হয়েছিল সেখানে যথেষ্ট পুলিশ না রাখার জন্য পুলিস ইনস্‌পেকটর দায়ী। সে কুরবানকে গ্রেপ্তার করেনি। অথচ তাকে মারদাঙ্গার জন্য গ্রেপ্তার করা যেত। কারণ তার আঘাত রাহুলজির মৃত্যুর কারণ হতে পারত। সে কুরবানকে গ্রেপ্তার করেনি। কিন্তু রাহুলজির সঙ্গীদের গ্রেপ্তার করেছে। অথচ তাঁরা শান্তি ভঙ্গ করেননি। সিওয়ানের পথে রাহুলজিকে মূত্রত্যাগ করতে না দেওয়ার জন্য কনস্টেবলকে দায়ী করা যেতে পারে। আই. জি. পি. যেভাবে আমওয়ারীতে রাহুলকে নিয়ে তদন্ত করেছিলেন সে বিষয়ে রাহুল তার প্রতিবাদ মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছিলেন। পাটনা মহাফেজখানায় রাহুল স্বাক্ষরিত সেই দলিলটি আছে। আই. জি. পি.-র তদন্তের রিপোর্ট পড়ে মুখ্যমন্ত্রী সন্তুষ্ট হননি। আমওয়ারীতে আই. জি. পি.-র তদন্ত ও রাহুলকে রক্ষা করতে পুলিশের ব্যর্থতা সম্পর্কে পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি স্বয়ং তদন্ত করে যে মন্তব্য করেছেন তা থেকে বোঝা যায় যে, ইনস্‌পেকটর বিক্রমজিৎ সিংহ ও জমিদার চন্দ্রেশ্বর প্রসাদের সত্যাগ্রহীদের বিরুদ্ধে রাহুল যে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করেন, তা মিথ্যা নয়। আমওয়ারীতে তদন্তের সময় রাহুলের সঙ্গে আই. জি. পি.-র ব্যবহার সম্পর্কে পার্লামেন্টারি সেক্রেটারির মন্তব্য তো ভর্ৎসনার মতো।

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি এই নোট পাঠাবার সময় চিফ সেক্রেটারি এই নোট সম্পর্কে যে নোট দেন তা অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। আই. জি. পি.-র তদন্ত অন্যান্য পুলিশ অফিসারদের বক্তব্য এবং চিফ সেক্রেটারির নোট ১৯৩৫-এর আইন অনুযায়ী গঠিত প্রাদেশিক কংগ্রেস সরকার ও ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের সম্পর্কের ওপর নতুন আলোকপাত করে।

রাহুলের আমওয়ারী সত্যাগ্রহের পরবর্তী ঘটনাবলি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করলে যে সত্যটি প্রথমেই চোখে পড়ে তা হল সত্যাগ্রহীদের বিরুদ্ধে জমিদার ও স্থানীয় পুলিশের ষড়যন্ত্রী সহযোগিতা। এর সঙ্গে জাতপাতের ব্যাপারটা তো ছিলই। বিহারের যে কোনো কৃষক আন্দোলনেরই তা একটি উপাদান। কিন্তু রাহুল তাঁর *মেরী জীবনযাত্রা*য় আগের দিকে একটি অভিযোগ এনেছেন যে বিহারে কংগ্রেসি রাজত্বেও জমিদার ও পুলিশ যুক্তভাবে শান্তিপূর্ণ কিষান সত্যাগ্রহীদের বিরুদ্ধে যে দমননীতি চালাতে পারছিল তার কারণ এই যে, কংগ্রেসি শাসকেরাও শেষ পর্যন্ত জমিদারদেরই প্রতিনিধি। কিন্তু

মেরী জীবনযাত্রা-য় তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেছেন যে কংগ্রেসিরা কি জানে না যে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার শেষ সংগ্রামের জন্য এই কিষানদের ওপরই তাঁদের নির্ভর করতে হবে? গান্ধিবাবার রাজত্বে এটা কীভাবে সম্ভব?

বিহারের কংগ্রেসি শাসকেরা জমিদারদের প্রতিনিধি একথা শ্রেণিগতভাবে অসত্য না হলেও আমওয়ারী সত্যাগ্রহে কংগ্রেসি শাসকেরা একটি বিশেষ প্রদেশে তাঁদের শ্রেণিস্বার্থের কথাই মনে রেখেছিলেন, আসন্ন স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা ভাবেননি—একথা ঠিক নয়। পাটনা মহাফেজখানায় রক্ষিত আমওয়ারী সত্যাগ্রহের দলিল পড়লে রাহুলের উক্তি যে সঠিক নয় তা বোঝা যাবে।

সত্যাগ্রহের সময় পুলিশের আচরণ (যা প্রায় জমিদারের সঙ্গে সহযোগিতারই নামান্তর) সম্পর্কে কংগ্রেসি শাসকেরা জমিদার ও পুলিশের পক্ষ নিয়েছিলেন মহাফেজখানার দলিলের সাক্ষ্য মেনে নিলে তা বলা সম্ভব নয়। আই. জি. পি.-র তদন্তের রিপোর্ট পড়ে মুখ্যমন্ত্রী ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। চিফ সেক্রেটারিকে তিনি যে নোট দিয়েছিলেন তা থেকে তা বোঝা যায়। পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি কংগ্রেসি নেতা কৃষ্ণবল্লভ সহায় তদন্তের পর জমিদারের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য আই. জি. পি.-র রিপোর্টকে অগ্রাহ্য করেন এবং পুলিশকে ভর্ৎসনা করে যে রিপোর্ট দেন, তা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পেশ করার সময় চিফ সেক্রেটারি তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন। আই. জি. পি.-র রিপোর্ট, মুখ্যমন্ত্রীর নোট, পার্লামেন্টারি সেক্রেটারির রিপোর্ট, চিফ সেক্রেটারির প্রতিবাদ পড়লে বোঝা যায় যে, কিষান সত্যাগ্রহ ও রাহুলকে আঘাত করা নিয়ে ব্রিটিশ আমলাতন্ত্র ও কংগ্রেসি মন্ত্রীদের মধ্যে অঘোষিত যুদ্ধ চলছিল। তা রাহুলের পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না। রাহুল তাই *মেরী জীবনযাত্রা*-য় প্রশ্ন করেছেন, কংগ্রেসি শাসকেরা কি জানেন না যে, স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য তাদের কৃষকদের ওপরেই নির্ভর করতে হবে।

কংগ্রেসিরা জমিদারদের প্রতিনিধি হতে পারে, উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণির প্রতিনিধি অথবা গান্ধিবাবার শিষ্য হতে পারে, কিন্তু তাঁরা নির্বোধ ছিলেন না। পার্লামেন্টারি সেক্রেটারির রিপোর্টের তারিখ ১৯.৬.৩৯। চিফ সেক্রেটারি প্রতিবাদ করে যে নোট পাঠান তার তারিখ ২৩.৬.৩৯। সময়টি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে। কংগ্রেসি শাসকদের সঙ্গে ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের এই পারস্পরিক নোট বিনিময়ের মধ্যে যে তিক্ততা লক্ষ করা যায়, তা থেকে বোঝা যায় যে, ইংরেজ আমলা ও তাদের অনুচরদের সঙ্গে কংগ্রেসিদের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলছিল। ইংরেজ আমলারা কংগ্রেসি শাসকদের আধিপত্য মেনে নিতে পারেনি এবং কংগ্রেসি শাসকদের পক্ষেও ইংরেজ গভর্নর ও ইংরেজ আমলাদের মধ্যবর্তী অবস্থান অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছিল। ১৯৩৯-এর জুনের শেষ সপ্তাহে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যে কোনোদিন শুরু হয়ে যেতে পারে কংগ্রেসি শাসক ও ইংরেজ আমলারা তা জানত। যে কোনো দিন গদি ছেড়ে দিতে হতে পারে, আবার ইংরেজের সঙ্গে সংগ্রাম শুরু হয়ে যেতে পারে, সে কথা রাজেন্দ্রপ্রসাদের মতো কংগ্রেসি নেতার না জানার কথা ছিল না। কংগ্রেসি শাসক ও ইংরেজ আমলা, এই দুই

পক্ষই অনিশ্চয়তায় ভুগছিল। পরিস্থিতির এই অনিশ্চয়তার কথা মনে রাখলে কংগ্রেস সরকার যে ভূমিকা নিয়েছিল, তা যুক্তিসহ ছিল। পুলিশ ও আমলারা জমিদারের পক্ষ নিয়েছিল বলে কৃষ্ণবল্লভ সহায়ের নোটে যে ভর্ৎসনা ছিল, তার বেশি কিছু করা সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিল না। শেষপর্যন্ত আমলাদের কিন্তু কুরবানের বিরুদ্ধে মামলা চালাতে হয়েছিল। রাহুল তাতে সাক্ষী দিতে গিয়েছিলেন। তিনি কুরবানকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য আদালতে দরখাস্ত দিয়েছিলেন। 'কুরবানের কি দোষ। লাঠি তো সে চালায়নি, তার মালিক চালিয়েছিল।'

সিওয়ানে রাহুলের বিরুদ্ধে সরকারের মামলার প্রথম শুনানি হয়েছিল পয়লা এপ্রিল। শুনানির পরবর্তী তারিখ ১৪ এপ্রিল রাহুলকে হাত কড়া দিয়ে সশস্ত্র পুলিশ পাহারায় সিওয়ানের কাছারিতে নিয়ে যাওয়া হল। হাজার হাজার মানুষ সিওয়ান স্টেশন থেকে রাহুলের পেছনে পেছনে গেল। ১৫ এপ্রিল জেলের ভেতরে মামলা চলল। রাহুলের ও তাঁর সঙ্গীদের সশ্রম কারাদণ্ড হল। এবার গ্রেপ্তার হওয়ার পর রাহুল হাফ-হাতা কুর্তা ও হাফ প্যান্ট পরতে শুরু করেছিলেন। জেলে এসে তিনি কয়েদির পোশাক পরতে শুরু করেছিলেন। হলুদ চীবরের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ। ২৭ এপ্রিল রাহুল শ্চের্বাৎস্কির চিঠি এবং লোলা ও তাঁর শিশুপুত্র ঈগরের ফোটো পেলেন।

রাহুলের প্রথম অনশনের পর সাময়িকভাবে সরকার তাঁর দাবি মেনে নিয়েছিল। তিনি কৃষক সত্যাগ্রহীদের জন্য রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা দাবি করেছিলেন। সেই দাবি যাতে সরকার মেনে নেয়, সেই জন্য তিনি আবার দশদিন (১-১০ মে) অনশন ধর্মঘট করেন। ধর্মঘটের প্রথম তিনদিন তিনি *জীনে কি লিয়ে* বইটি নাগার্জুনকে দিয়ে লিখিয়েছিলেন। জেল-বিভাগের আই. জি. রাহুলকে অনুরোধ করেন যে, তিনি যেন এই সামান্য ব্যাপারের জন্য তাঁর প্রাণটা না দেন। দশদিন পরে জেল গেট পর্যন্ত তাঁকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে কালেক্টর তাঁকে জানালেন যে, সরকার তাঁকে জেল থেকে ছেড়ে দিয়েছে। এবং গাড়িতে করে তাঁকে হাসপাতালে রেখে গেলেন। ২৪২ ঘন্টার পর অনশন ভঙ্গ করলেন রাহুল।

এদিকে আমওয়ারী সত্যাগ্রহের প্রথম দিন রাহুলের মাথা ফাটানো থেকে শুরু করে জেলে দ্বিতীয়বার অনশন পর্যন্ত গোটা সময়টা ছাপরা জেলার কৃষক, সাধারণ মানুষ ও ছাত্ররা আবেগে উত্তাল হয়ে উঠেছিল। ইংরেজি খবরের কাগজ *সার্চলাইট*, হিন্দি কাগজ *জনতা* সত্যাগ্রহীদের ওপর সরকারের দমননীতির বিরুদ্ধে বিশেষত রাহুলের ওপর জমিদারের গুণ্ডার আক্রমণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করে। রাজেন্দ্র কলেজের অধ্যাপক মনোরঞ্জনের কবিতা 'রাহুল কা খুন পুকার রহে' খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। কৃষক, সাধারণ মানুষ ও ছাত্ররা প্রতিদিন মিছিল বার করতে থাকে। আমওয়ারী সত্যাগ্রহ একটি ব্যাপক আন্দোলনে পরিণত হওয়ার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। শুধু জেলে রাহুলের অনশন ধর্মঘট নয়, জেলের বাইরের আন্দোলনও সরকারকে রাহুলকে জেল থেকে ছেড়ে দিতে বাধ্য করে।

দশদিন অনশনের পর সবল হতে কিছুটা সময় লাগল রাহুলের। শরীরে বল ফিরে আসা মাত্রই ২৫ মে রাহুল আমওয়ারীতে ৮-১০ হাজার মানুষের (যার মধ্যে পাঁচ-ছশো মহিলা ছিলেন) সভা করলেন। *মেরী জীবনযাত্রা*-য় রাহুল লিখছেন, 'ওদের দেখে মনে হয়েছিল যে কৃষকদের কাছে অটুট শক্তি রয়েছে, ওরা অপরাজেয়। মেয়েরা নতুন ধরনের গান গাইছিল। যার মধ্যে কৃষকদের দুঃখ ও অত্যাচারের কথা ছিল।'

হিতৌলীর সত্যাগ্রহ (জুন ১৯৩৯) ঃ সরযুতে বন্যা হওয়ায় কয়েকটি থানার লোকজনের ফসল কয়েক বছর ধরে নষ্ট হচ্ছিল। কংগ্রেসি সরকার নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছিল। এই ব্যাপারে ১৮ জুন একটা বড় মিছিল হয়। অনেক দূর থেকে কিষানরা পায়ে হেঁটে এসেছিল। পরদিন হিতৌলীর কৃষকেরা আবার ছুটে এল। সেই দিন রাহুল তাঁর তিন সঙ্গী ইব্রাহিম, রামভবন ও অখিলানন্দকে নিয়ে হিতৌলী চলে এলেন। থাকলেন গরিব চাষীদের কুটিরে, তারা যা খায় তাই খেলেন।

তিনটা নাগাদ তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা যেখানে সভা হওয়ার কথা ছিল, সেখানে গেলেন। জায়গাটাকে আশরফি সাহুর লাঠিয়ালেরা ঘিরে ফেলেছিল। রাহুল সোজা আশরফির বাড়ি গিয়ে তাকে স্পষ্ট ভাষায় নিন্দা করলেন। তারপর 'সেই সময় কিছু হৈ চৈ হয়েছিল। এসে দেখি যে, আশরফি সাহুর ছেলে জগন্নাথ বন্দুক নিয়ে এসেছে এবং বহুলোক বর্শা ও তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।' তাদের তাঁর ওপর বন্দুক অথবা বর্শা চালাতে চ্যালেঞ্জ জানান রাহুল। কিন্তু রাহুলের ওপর আঘাত না করলেও রামভবন ও অখিলানন্দ লাঠির আঘ'তে আহত হন। রাহুলকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর বিরুদ্ধে অন্যের জমি দখল করার অপরাধে ১১৭ ধারায় মামলা চালানো হয়; এবং রাহুলের সাজা হল দু বছরের কারাদণ্ড।

আবার হাজারিবাগ জেলে যেতে হল রাহুলকে। কিন্তু জেলে পৌঁছোনোর আগে থেকেই তিনি অনশন শুরু করে দেন। এবারের অনশন স্থায়ী হয় ১৭ দিন। অনশনের সতেরো দিনে তাঁকে জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হল। ৩৮০ ঘণ্টা অনশনের পর জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্টের বাংলোয় আনারসের রস খেয়ে তিনি অনশন ভঙ্গ করলেন।

১৪ জুলাই পাটনা গিয়ে রাহুল জানতে পারলেন যে, বিহারের প্রতিটি জেলায় কৃষক আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে তিনি খবর পেলেন ভারতীয় বিদ্যাভবন তাঁর *বার্তিকালংকার* ছাপাতে চায়। অতএব ২১ জুলাই তিনি বোম্বাই চলে গেলেন। কিন্তু *বার্তিকালংকার* ছাপার ব্যবস্থা হল না। তিনি আবার হিতৌলী ফিরে এলেন। বৃষ্টি হচ্ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও দু হাজার কৃষক জমা হয়েছিল।

১৯৩৯-এর অক্টোবর ওয়ার্ধায় আহুত কংগ্রেস কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকে কমিউনিস্ট নেতারা একত্র হয়েছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টি তখনো বেআইনি। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যারা এসেছিলেন। বিহারে তখনো পার্টি গঠিত হয়নি। কিন্তু পার্টির সদস্য হিসেবে গিয়েছিলেন রাহুল ও সুনীল মুখার্জি। প্রায় ৩০ জন পার্টি সদস্য সেখানে এসেছিলেন। তাঁদের দেখে রাহুল উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন।

বেআইনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হওয়ায় রাহুলের পেছনে গোয়েন্দা পুলিশ লেগেছিল। রাহুল কৃষক আন্দোলন করছিলেন। ১৯৪০-এ তিনি অখিল ভারতীয় কৃষক সম্মেলনের ও কৃষকসভার সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৪১-এর ১৫ মার্চ রাহুলকে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করে হাজারিবাগ জেলে পাঠানো হয়। এবার তাঁকে জেলে থাকতে হয়েছিল উনত্রিশ মাস। ২৪ ডিসেম্বর রাহুল, সুনীল মুখার্জি, আলি আশরফ, কিশোরী প্রসন্ন সিংহ ও বিশ্বনাথ মাথুরকে হাজারিবাগ জেল থেকে দেওলি ক্যাম্পে পাঠানো হয়। দেওলি ক্যাম্পে কমিউনিস্ট ও অ-কমিউনিস্ট রাজনৈতিক বন্দীদের রাখা হয়েছিল। সেখানে বন্দীদের ওপর ব্রিটিশ সরকারের অকথ্য নির্যাতনের ও ১৬ দিনের অনশন ধর্মঘটের অবিস্মরণীয় কাহিনি রাহুল তাঁর *মেরী জীবনযাত্রা*-য় লিপিবদ্ধ করেছেন। এক বছর অর্থাৎ গোটা ১৯৪০ সাল রাহুল দেওলি ক্যাম্পে কাটিয়েছিলেন। ১৯৪১-এর ৪ জানুয়ারিতে রাহুল সহ বিহারের বারো জন রাজনৈতিক বন্দীকে আবার হাজারিবাগ জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। হিটলার সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করার পর সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ জনযুদ্ধে পরিণত হয়েছে এবং কমিউনিস্টরা সক্রিয়ভাবে যুদ্ধকে সমর্থন করবে—কমিউনিস্ট পার্টি এই নীতি গ্রহণ করায় কমিউনিস্ট বন্দীরা জেল থেকে মুক্তি পায়। ১৯৪২-এর ২৩ জুলাই রাহুলকে জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

১৯৪২-এর ২৩ জুলাই রাহুলের জীবনের একটি অধ্যায় শেষ হল বলা যেতে পারে। এরপর প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেওয়া তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হয়নি। অবশ্য কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেওয়া তাঁর পক্ষে আর সম্ভবও ছিল না। কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেওয়ায় অগস্ট আন্দোলনের বিপুল বিস্ফোরণ তাঁকে স্পর্শ করল না। বিহার অগস্টের ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্র ছিল বললে অত্যুক্তি হবে না। পাটনায় অগস্ট আন্দোলনের সময় ছাত্র-বিক্ষোভের চেহারা রাহুল স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ভারতবাসীর চৈতন্যের গভীরে স্বাধীনতার যে গভীর আকাঙ্ক্ষা ছিল, অগস্ট আন্দোলন সেই আকাঙ্ক্ষাকে এক প্রচণ্ড আবেগে রূপান্তরিত করে সমগ্র ভারতকে অগ্নিময় করে তুলেছিল, সেই আবেগ রাহুলকে স্পর্শ করল না, বড় বিস্ময় লাগে। অগস্ট আন্দোলন যখন পাটনাকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল, তখন রাহুল পাটনাতেই ছিলেন। তাঁর চোখের সামনেই ঘটনা ঘটছিল। কিন্তু তিনি সেই সব প্রচণ্ড ঘটনা প্রত্যক্ষ করছিলেন দর্শকের মতো। কারণ তিনি সব ঘটনাই দেখছিলেন জনযুদ্ধের চশমা পরে। পাটনায় যা ঘটছিল সে বিষয়ে রাহুলের প্রতিক্রিয়া তাঁর *মেরী জীবনযাত্রা* থেকে তুলে দেওয়া যেতে পারে।

অগস্ট বিপ্লবকে তিনি অগস্টের আঁধি বলে অভিহিত করেছেন। তিনি লিখেছেন, '১০ অগস্ট দুপুরে ছাপরা পৌঁছোলাম। শুনতে পেলাম গতকাল দমননীতির বিরুদ্ধে ছাত্ররা মিছিল বার করেছিল; আজও তাদের একটা বড় মিছিল বার হয়। জানতে পারলাম, পাঁচজন লোক এরই মধ্যে এই জেলায় গ্রেপ্তার হয়েছে। কিছু দেশভক্ত আমাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছিল। তার উত্তরে আমি বলেছিলাম, যাতে জাপানের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ লাভ হয়, সেইরকম কাজ আমি করতে পারব না।'

'১১ অগস্ট পাটনা পৌঁছোলাম। এখানেও প্রচণ্ড উত্তেজনা। ছাত্ররা মিছিল বার করেছিল। আহমেদাবাদ, পুনা, বোম্বাই প্রভৃতি জায়গায় গুলি চলেছে, এই খবর আগুনে ঘৃতাহুতির কাজ করল। দুপুরে মিছিল বেরোল। কমিউনিস্ট ছাত্ররা ছাত্রদের বোঝানোর চেষ্টা করেছিল এবং এতকাল তারা সফল হয়েছিল। কিন্তু গুলি চলার খবরে তরুণরা উত্তেজিত হয়ে কিছু একটা করে ফেলতে চাইছিল। একটা বড় ছাত্র মিছিল সেক্রেটারিয়েটের দিকে গেল। অন্তত দশ হাজার লোক সেখানে জমা হয়েছিল। গুলি চলেছিল। তিনজন লোক সেখানেই মারা যায়। অনেকে আহত হয়। মধ্য রাতে শবদেহ নিয়ে মিছিল বার হয়। এই সব তরুণের শবদেহ দেখে চোখে জল আসেনি এমন কেউ ছিল না। শবদেহ ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছিল.... পেছনে যাচ্ছিল অপার জনসমুদ্র। প্রত্যেকের দৃষ্টিতে ক্রোধ ছিল, হৃদয়ে ছিল ক্ষোভ। এই দৃশ্য মানুষের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দেয়। ১২ অগস্ট সারা শহরে হরতাল পালিত হয়। কিন্তু একথা বললেই পাটনার হরতালের যথেষ্ট বর্ণনা দেওয়া হল না। রিকশা ও এক্কা চলছিল না। ছাত্রদের হাতেও আর নেতৃত্ব ছিল না। রিকশা ও এক্কা চালকদের হাতে অথবা এই ধরনের লোকদের হাতে নেতৃত্ব চলে গিয়েছিল। রাজনীতি সম্পর্কে তাদের শুধু এই ধারণা ছিল যে ইংরেজ তাদের শত্রু। চন্দ্রশেখর ও অন্যান্য কমিউনিস্টরা তাদের বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু এরা তাদের ইংরেজদের দালাল বলছিল। আমিও দুয়েকটা ছাত্র হোস্টেলে গিয়েছিলাম। কিন্তু তাতে কিছু ফল হয়নি। দুপুরের পর মিছিল বেরোল। কিন্তু মিছিলের কোনো নেতৃত্ব ছিল না। বিশাল সভা হল। কংগ্রেসের কিছু নেতা বিপ্লবে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য জমায়েত হওয়া লোকদের উৎসাহিত করলেন। যারা শুনছিল তারা বলল, লেকচারের কোনো দরকার নেই, চলো, কাজ করা যাক। তারপর তারা শহরের তার কাটতে চলে গেল....আমি আর যদুনন্দন শর্মা কিষান সভার কার্যালয়ের ছাদে বসে এই সব দৃশ্য দেখছিলাম। ডাকঘরে ও ডাকবাক্সে আগুন দেওয়া হল।..... বস্তুত আমি দেখছিলাম যে, মানুষের মধ্যে বিপ্লব এমন একটা চেতনার জন্ম দিয়েছে যাতে স্বার্থের নামগন্ধও ছিল না।'

১৩ অগস্ট থেকে ১৬ অগস্টের মধ্যে পাটনায় উত্তেজনা শান্ত হয়ে এল। কিন্তু পাটনা ও অন্যান্য শহরে আন্দোলন থেমে যাওয়ার পরও বিহারের গ্রামে বেশ কিছু দিন পর্যন্ত বিপ্লবের আগুন জ্বলতে থাকল। কিন্তু বেশ আত্মসন্তুষ্টির সঙ্গে রাহুল লিখছেন, 'আমওয়ারী জয়জোরীর কিষানরা বিপ্লবের বন্যায় ভেসে যায়নি। লোকজন তাদের অনেক বুঝিয়েছিল। কিন্তু তারা জবাব দিয়েছিল, রাহুল বাবার হুকুম নিয়ে আসুন, স্বামীজির (রাহুলের) চিঠি নিয়ে আসুন। তারপর আমরা এই লড়াইয়ে যোগ দেব। আশেপাশের কমরেডদের কাছ থেকে তারা জানতে পেরেছিল যে এবার তাদের এমন কোনো আন্দোলনে যোগ দেওয়া উচিত হবে না, যাতে কোনোভাবে জাপান সাহায্য পায়।'

'সিওয়ান শহরের সভায় গুলি চলেছিল। কিন্তু সেখানে বিশেষ কিছু হয়নি। বসন্তপুর, গুঠনী, দরৌলী, রঘুনাথপুর ও আরো কয়েকটি থানা বিদ্রোহীরা অধিকার করে নেয়।

সেখানকার দারোগা ও সেপাইরা সিওয়ান চলে যায়। থানার পরিবর্তে অন্য কোনো ব্যবস্থা হয়নি, তাই লুঠপাট হচ্ছিল।'

২৪ অগস্ট ইনারার (আজমগড়) পাশে তাঁর গ্রাম থেকে এক ব্যক্তি ফিরে এসেছিল। সে জানাল, সৈন্যবাহিনী তো লোকজনকে ভয় দেখিয়েই তাদের কাজ শেষ করে। কিন্তু পুলিশ চোখ বুজে লুঠপাট করছে।

'পুলিশের এই সময় খুব সুবিধা হয়েছিল। যেখানেই কমিউনিস্টরা ছিল, সেখানেই তারা মানুষকে এই আন্দোলন থেকে আলাদা থাকার কথা বলছিল। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে তারা এও বলছিল যে, ইংরেজ শাসকেরা জেনেশুনে এই আন্দোলনকে ডেকে এনেছে....ইংরেজ শাসকেরা দেখাতে চায় যে, হিন্দুস্থানিরা জাপানের মিত্র। জাপানের সঙ্গে মিত্রতার এর চেয়ে বড় প্রমাণ কি হতে পারে যে হিন্দুস্থানিদের হাত সেই রেলের লাইন ও তার কাটছে যার সাহায্যে জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য সৈন্য পাঠানো হয়।'

২৯ অগস্ট রাহুল বিহার সরকারের চিফ সেক্রেটারি গাডবালের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে গোটা পরিস্থিতি সম্পর্কে জানান। চিফ সেক্রেটারি জানান, এ ব্যাপারে তিনি নিরুপায়। ২২ সেপ্টেম্বর তিনি ছাপরার কালেক্টরের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি বলে দেন, কাল আসবেন। ২২ সেপ্টেম্বর থেকে ২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে তিনি ছাপরা থেকে প্রয়াগ পর্যন্ত যাওয়ার সময় দেখেন যে অনেক রেল স্টেশন পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

মেরী জীবনযাত্রা-য় অগস্ট বিপ্লবের এই বীতস্পৃহ, নিরুত্তাপ ও প্রায় অবজ্ঞা-ভরা বিবরণ এবং আমওয়ারী ও জয়জোরীর কিষানদের রাহুলবাবার নির্দেশ ছাড়া বিপ্লবে যোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্তে আত্মসন্তুষ্টি রাহুলের চরিত্রানুগ নয়। একটি মার্কসবাদী পার্টির জনযুদ্ধ তত্ত্ব কি করে তাঁর মধ্যে এমন অন্ধতা এনে দিল যা তাঁর সারা জীবনের প্রখর বুদ্ধিবাদকে ও মানবিকতাকে মুছে দিল; যা তাঁকে অগস্ট বিপ্লবের তাৎপর্য একেবারেই বুঝতে দিল না। কালামোকে বুদ্ধ যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা পড়ে তাঁর মনে হয়েছিল যে, এতকাল তিনি যা খুঁজেছেন তা তিনি পেয়ে গেছেন। এই উপদেশই তাঁকে বৌদ্ধ ভিক্ষু করেছিল। এই উপদেশই তাঁকে মার্কসবাদী হওয়ার প্রেরণা দিয়েছিল। বুদ্ধ এই প্রখর সন্দেহবাদী ও বুদ্ধিবাদী উপদেশ দিয়েছিলেন কালামোকে—'হে কালামো! সন্দেহই জ্ঞানের জনক। তুমি কোনো কথাকেই এই জন্য সত্য মনে কোরো না যে তা তুমি শুনেছ, এই জন্যে সত্য মনে কোরো না যে, পরম্পরাক্রমে তা সত্য বলে মানা হয়েছে; এই জন্যে সত্য বলে মনে কোরো না যে এই কথা যিনি বলেছেন তাঁর ব্যক্তিত্ব তোমাকে আকৃষ্ট করেছে; এই জন্যে সত্য মনে কোরো না যে তা তোমার ধর্মশাস্ত্রের দ্বারা অনুমোদিত; এই জন্যে সত্য বলে মনে কোরো না যে যিনি এই কথা বলেছেন, তিনি তোমার শ্রদ্ধাভাজন আচার্য। কালোমো! যখন তোমার বিবেক বলবে যে এই কথা দোষমুক্ত, তখন তাকে দোষমুক্ত বলেই মনে কোরো। আর যা তোমার বিবেক সত্য ও নির্দোষ মনে করবে, তাকে স্বীকার করো এবং তদনুযায়ী আচরণ করো।'

রাহুল মনে করতেন তিনি বুদ্ধের এই উপদেশ আজীবন মেনে চলেছেন। মেনে

চললে গ্রামীণ বিহারের এই প্রচণ্ড অভ্যুত্থান তাঁর চোখে পড়ত। অগস্ট বিপ্লবের তীব্রতা ও বিস্তার সবচেয়ে বেশি হয়েছিল বিহারে। বিহারের কিষানসভার অধিকাংশ কর্মী কমিউনিস্ট পার্টি ও সহজানন্দের জনযুদ্ধের নীতি মেনে নিতে পারেনি। তারা সোস্যালিস্টদের নেতৃত্বে বিপ্লবে যোগ দিয়েছিল। একমাত্র বিমানপথ ছাড়া পাটনার সঙ্গে সব সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। উত্তর ও মধ্য বিহারের দশটি জেলার ৮০ (আশি) শতাংশ থানা জনতার দ্বারা অধিকৃত হয়েছিল। এমনকি বিহারের উপজাতিরাও এই বিদ্রোহে যথেষ্ট সংখ্যায় যোগ দিয়েছিল, কেননা নিহতদের মধ্যে সব চেয়ে বেশি ছিল হাজারিবাগ জেলার (৫৩৩ জন), তারপরেই সবচেয়ে বেশি নিহত হয়েছিল সারন জেলায় এবং ভাগলপুরে (৪৭৭ জন)। বিদ্রোহ ভোজপুরি বুলির পশ্চিম বিহার থেকে উত্তরপ্রদেশের বেনারস বিভাগে বিস্তৃত হয়; বালিয়ার সব কয়টি পুলিশ স্টেশন অধিকৃত হয় এবং বালিয়া ও গাজিপুরে স্বল্পকালের জন্য জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৫ থেকে ১৭ অগস্ট আজমগড়ের মধুবন থানা অবরোধের মনোরম বর্ণনা দিয়েছেন নিবলাট। পাঁচ হাজার মানুষের একটি জনতা লাঠি, বর্শা, লাঙ্গল, হাতুড়ি নিয়ে থানার দিকে অগ্রসর হয়েছিল......দূর থেকে তাদের লাঠি ও বর্শা দেখে মনে হচ্ছিল যেন একটি শরবন এগিয়ে আসছে। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র গ্রামীণ জনতার অভ্যুত্থান ঘটেছিল। পূর্ব ইউ. পি. এবং বিহারের ১৬টি জেলায় আইনশৃঙ্খলা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে একটি বিশাল সৈন্য ও পুলিশ বাহিনীর কয়েক সপ্তাহ লেগেছিল। ইতস্তত গেরিলা যুদ্ধ চলেছিল ১৯৪৪ পর্যন্ত। তাছাড়াও ছিল জয়প্রকাশ নারায়ণ ও রাম মনোহর লোহিয়ার নেপাল সীমান্তে প্রতিষ্ঠিত অস্থায়ী জাতীয় সরকার। যখন এইসব ঘটনা ঘটেছিল, তখন রাহুল ছাপরা জেলায় ছিলেন। গ্রামীণ বিহারের এই অভুত্থানের মধ্যে শুধু লুঠতরাজের ব্যাপারটাই তাঁর চোখে পড়েছে। কৃষকেরা লুঠপাট করেছে, পুলিশেরা লুঠপাট করেছে; কাগজপত্রে আগুন দিয়েছে। কমিউনিস্ট কর্মীরা জনতাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে যে, কাগজপত্রে আগুন দিয়ে কী হবে। কাগজপত্র তো তাদেরই। কিন্তু ভিড়ের মধ্যে থাকার জন্য তাদেরই পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তাদের যাতে ছেড়ে দেওয়া হয় সেজন্য তিনি চিফ সেক্রেটারি ও কালেক্টরের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। চিফ সেক্রেটারি বলেছিলেন, তিনি নিরুপায় এবং কালেক্টর তার সঙ্গে কথা বলেননি। জনযুদ্ধের অন্ধ ভক্ত মার্কসবাদী রাহুল কি প্রকৃতই বুদ্ধের সন্তান?

চতুর্দশ অধ্যায়

আবার ঘুমক্কড়ী

দীর্ঘকাল ঘুমক্কড়ী বন্ধ ছিল। ২৯ মাস কেটে গেল জেলে। তারপর অগস্ট আন্দোলন এবং ইতস্তত ঘুরে বেড়ানো, মুখ্যত নানা জায়গায় হিন্দি সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য। হঠাৎ একদিন বেরিয়ে পড়লেন রাহুল। এই হঠাৎ বেরিয়ে পড়াটা রাহুলের চরিত্রানুগ। তাছাড়া গ্রীষ্মকালে পাহাড়ে বিশেষত হিমালয়ে চলে যাওয়াটা রাহুলের জীবনযাত্রায় নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রাহুল লিখছেন, 'গ্রীষ্মকাল এসে গিয়েছিল। আমি কিছু লেখাপড়া করার কথা ভাবছিলাম। হঠাৎ মনে হল হরিদ্বারে চলে যাই। সেখানে হয়তো লেখাপড়ার কাজ করা যাবে।'

উত্তরাখণ্ড

অতএব বন্ধু নাগার্জ্জুনকে নিয়ে হরিদ্বারে চলে গেলেন রাহুল। কিন্তু হরিদ্বারে থাকার জায়গা পাওয়া গেল না। ৩৪ বছর আগে রাহুল যখন এই রাস্তা দিয়ে গিয়েছিলেন তখন হরিদ্বারে জঙ্গলই বেশি ছিল। এখন হরিদ্বার অট্টালিকার শহর। হৃষিকেশেরও একই অবস্থা। সুতরাং হৃষিকেশ থেকে উত্তর কাশীর পথ ধরলেন তাঁরা। বাসে টেহরী অবধি গেলেন। সেখানে থাকার জায়গা পেয়ে গেলেন। টেহরী থেকে উত্তরকাশী দুদিনের রাস্তা। মুটের জন্য তিন দিন সেখানে থাকতে হল।

৪ মে বেলা তিনটায় উত্তরকাশী রওনা হলেন রাহুল। অনেকদূর পর্যন্ত সিধা রাস্তা ছিল। চড়াই-উতরাই ছিল না। সেই রাস্তায়ই ওপর থেকে গুর্জরেরা আসছিল তাদের গরু, মোষ নিয়ে। হয়তো দু হাজার বছর আগে তারা হিন্দুস্থানে এসেছিল। তখনো তারা পশুপালন করেছে। আজও তাই করছে। মধ্য-এশিয়া থেকে আসার পর এরা হিন্দু অথবা বৌদ্ধ ধর্ম স্বীকার করে নিয়েছিল। আজ তারা মুসলমান। হূনদের আক্রমণে তারা তাদের প্রাচীন জন্মভূমি ছেড়ে এসেছিল। গুর্জরদের প্রাচীন মাতৃভূমি আজ সোভিয়েত দেশের অন্তর্গত। রাহুলের ইচ্ছা হয়েছিল কয়েক সপ্তাহ গুর্জরদের সঙ্গে কাটিয়ে যাওয়ার।

ধরাসু হয়ে রাহুল উত্তরকাশী পৌঁছোলেন ৬ মে। কালীকমলিঅলার ধর্মশালায় জায়গা পেয়ে গেলেন এবং সেখানে খাওয়া-দাওয়ারও ব্যবস্থা হয়ে গেল। রাহুল উত্তরকাশীতে কিছুদিন থেকে *দর্শন-দিগদর্শন*-এর প্রুফ দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রুফ এল না। তাই ২৬ মে তাঁরা গঙ্গোত্রী যাত্রা করলেন। উত্তরকাশী থেকে তাঁরা মনেরি যান এবং মনেরি থেকে যান হৃষিকুণ্ডে। হৃষিকুণ্ড থেকে হরশীলের পথ বড় সুন্দর। প্রথম এক মাইল চড়াই। তারপর উতরাই। নীচে তাকালে গঙ্গার বিস্তৃত উপত্যকা চোখে

পড়ে, যার আশেপাশের পাহাড় দেবদারুতে ঢাকা। উতরাইয়ের পথে বাগোরী গ্রাম এল। এই গ্রামের লোকেরা হিন্দু তিব্বতি। এদের মাতৃভাষাও তিব্বতি। বাগোরী থেকে ধরালী গেলেন তাঁরা ৩০ মে। দুটো নাগাদ ধরালী থেকে গঙ্গোত্রী রওনা হলেন। রাহুল দেবদারুর ছায়ায় হাঁটছিলেন। পথে ভৈরব চটি। ভৈরব চটি থেকে বেরিয়ে হিমালয়কে বড় সুন্দর লাগছিল। তাঁরা ধীরে ধীরে পথ চলে গঙ্গোত্রী থেকে আধ ঘণ্টা দূরে গৌরীকুণ্ডের পুলের কাছে এলেন। এই পুল পেরিয়ে যাত্রীরা দিগম্বর তপস্বীদের দেখতে যায়। রাত্রি সাড়ে আটটায় যখন কেবল অন্ধকার হচ্ছিল, তখন তাঁরা গঙ্গোত্রী পৌঁছোলেন। এই গঙ্গোত্রীকে ৩৪ বছরের আগের গঙ্গোত্রী বলে মনে হল না রাহুলের। সবই কেমন পালটে গেছে। অনেক পাকা বাড়ি তৈরি হয়েছে। বরফ গলে যাচ্ছিল; জোরে হাওয়া বইছিল।

গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখ চৌদ্দ মাইল। তাঁরা গোমুখে গিয়ে সেখান থেকে হরশীল-এ ফিরে এলেন। সেখানে ১ জুন থেকে ৭ জুন পর্যন্ত তাঁরা ছিলেন।

নাগার্জুনজি এবার তিব্বত যাচ্ছিলেন তিব্বতি ভাষা অধ্যয়ন করবেন বলে। রাহুল তিব্বত যাওয়ার পথে অবস্থিত থোলিঙ পর্যন্ত যেতে চেয়েছিলেন। রাহুল ভাড়া করা ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিলেন। ৮ জুন ছাতু খেয়ে তাঁরা যাত্রা করলেন। সামনে গঙ্গোত্রীর রাস্তা ছেড়ে তাঁরা বাঁয়ের রাস্তা ধরলেন। কিছুটা রাস্তা পেরিয়ে তাঁরা কোপঙ্-এ কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলেন। চা ও ছাতু খেয়ে আবার যাত্রা করলেন। একটা ঝুলন্ত সেতুর কিছুটা আগে থেকে দেবদারুর রমণীয় বনস্থলী এল। হিমালয়ের বনস্থলীর মধ্যে এটিকে সবচেয়ে রমণীয় বনস্থলী বলা যেতে পারে। এই বনস্থলীকে রাহুলের বড় ভালো লেগেছিল। তাঁর ইচ্ছে হচ্ছিল, এখানে মাসখানেক থেকে যান। দেবদারুর ঘন সবুজ পাতার ছায়ার ভিতরে সূর্যের আলো ঢুকতে পারে না। নীচে দেবদারুর পাতার গদি বিছানো। চারদিকে ভিজে মাটির সুগন্ধ। আরো কিছুটা এগোবার পর পর্বত-পৃষ্ঠের সমতলভূমি। তারপর আবার কঠিন চড়াই-উতরাই। দুপুরের পর এমন রাস্তা এসে গেল যে, ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া সম্ভব হল না। গরদঙ-এর কাঠের পুলের আগেই রাত্রিতে থাকার একটা রাস্তা বার করতে হল। চারদিকে ভাঙা পাথরের চাঙড়। তার মধ্য দিয়ে গঙ্গা প্রচণ্ড গর্জন করতে করতে আসছিল। জোর হাওয়া ও ভীষণ ঠাণ্ডায় শরীর জমে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়েছিল। আশেপাশে জংলি বথুয়া ছিল। চর্বি, আলু, চাল ও লাদূ দিয়ে বথুয়ার থুক্পা রাঁধা হল। চা হল।

৯ জুন সকাল ছটায় আবার যাত্রা শুরু হল। কাঠের পুল পেরিয়ে তাঁরা যত এগোতে লাগলেন, ততই দেবদারু ছোটো ও বিরল হতে হতে অবশেষে হারিয়ে গেল। নেলঙ পৌঁছোবার এক মাইল আগে জঙ্গল শেষ হয়ে গেল। এখন তিব্বতের মতো নগ্ন পর্বত। নেলঙ ষাট-সত্তর ঘরের একটা গ্রাম। কিন্তু এখন গ্রাম জনশূন্য।

১০ জুন ঘোড়ায় চড়ে রাহুল, নাগার্জুন ও ঘোড়া-অলা নেলঙ রওনা হলেন। মাইল-খানেক হাঁটার পরেই গঙ্গা। দুটো পাথরের চাঙড়ের মধ্য দিয়ে গঙ্গা বয়ে যাচ্ছিল। সবাই বলছিল এখানে একটা বিকট দৈত্য থাকে। গঙ্গার উপরের পুল দেখেই বোঝা গেল

দৈত্য সত্যিই থাকে। এই দৈত্যের কাছে প্রতি বছর বেশ কিছু লোককে প্রাণ বলি দিতে হয়। গঙ্গার এপার থেকে ওপার পর্যন্ত দুটো গোল বাঁশ আটকে রাখা হয়েছে যা একদিকে এক হাত চওড়া, অন্যদিকে এক বিঘত। এই দুটো বাঁশের ওপর কিছু কঞ্চি বিছানো। সেই কঞ্চির উপরে মাঝে মাঝে কয়েকটা পাথর রেখে দেওয়া হয়েছে। এই হল পুল। পুল পেরোবার সময় বাঁশ দুটো দোলে, তার চেয়েও বেশি দোলে কঞ্চিগুলো, তার চেয়েও বেশি লাফায় কঞ্চির উপরে রাখা পাথর। নীচে প্রলয় কোলাহল করে গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে। গঙ্গার বুকে চার-পাঁচ হাত পর পর বড় বড় পাথরের চাঙড়। পুল থেকে পড়ে গেলে যে মৃত্যু হয় তা ঠিক যোগীর মৃত্যুর মতো। এক মিনিটও ভাবনাচিন্তার সময় পাওয়া যায় না এবং শরীর টুকরো টুকরো হয়ে যায়। এই দৃশ্য রাহুল দেখলেন, যখন তিনি পুল পার হচ্ছিলেন। এই পুল পার হওয়ার সময় যে ঘটনাটি ঘটেছিল তা *মেরী জীবনযাত্রা*-য় আঁকা একটি অসামান্য ক্যামিও। এই ক্যামিও রাহুলের চরিত্রের ওপরও আলোকপাত করে। *মেরী জীবনযাত্রা* থেকে ঘটনাটি তুলে দেওয়া হল :

'শিবদত্ত (ঘোড়া-অলা) তার মালপত্র পিঠে নিয়ে ছাগলের মতো খট্-খট্ করতে করতে পুল পার হয়ে গেল। আমি ভেতরের চিন্তাকে আমার মুখে ছাপ ফেলতে দিইনি। এবং আমিও ওপারে পৌঁছে গেলাম। হাত-পা ভেঙে পঙ্গু হয়ে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নেই। এই রকম মৃত্যুকে ভয় পাবার দরকার কী? তার উপরে আমি এও জানতাম এই দৈত্য হাজার মানুষের মধ্যে এক জনের প্রাণ বলি নেয়। অতএব আমি বেঁচে নয়শো নিরানব্বুই জনের সূচি থেকে আমার নাম কাটাতে যাব কেন? কিন্তু নাগার্জুনজিকে নিয়ে বেশ সমস্যা হল। সাহস হারানো খারাপ। কেননা দুনিয়ার লোক কী বলবে। কিন্তু দোলায়মান বাঁশ, কঞ্চি ও কম্পমান পাথর এবং নীচে মৃত্যুর অট্টহাস দেখে শরীরের রক্ত জমে যায়। আমি তাকে এই মন্ত্র দিয়েছিলাম যে, নীচে মৃত্যুর মুখ-বিবরের দিকে তাকাবেন না। কিন্ত অট্টহাস তাঁর দিকে নাগার্জুনজির দৃষ্টি ক্রমাগতই আকর্ষণ করছিল। যা হোক অনেক ভেবেচিন্তে তিনি পা বাড়ালেন। তাঁর হাঁটা দেখে মনে হল তাঁর এক একটা পা আশি মন ভারী। এ জায়গাতে এরকম ভাবে হাঁটাটাই সবচেয়ে বিপজ্জনক। এরকম জায়গা দিয়ে তো খুব ঝটপট চলে আসতে হয়। তিনি এপারে আসার পরে আমি বললাম, 'জয় অপরাজিতা মাঈ কী।' অপরাজিতা তার নিজের সিঁদুর নিজেই রক্ষা করলেন।'

'এভাবে আমরা তিনজন তো চলে এলাম। মালপত্রও চলে এল। কিন্তু ঘোড়াকে কীভাবে এপারে নিয়ে আসা যায়। শিবদত্ত ঘোড়াকে নিয়ে আসার চেষ্টা করছিল। কিন্ত ঘোড়া পুল শুঁকেই চার পা পিছে হেঁটে যাচ্ছিল। রাহুল বললেন, ঘোড়াটাকে এভাবে মেরে ফেলা ঠিক হবে না। শিবদত্ত গ্রামে গিয়ে দুজন পাহাড়িকে নিয়ে এল। কয়েকটা দড়ি জুড়ে একটা বড় দড়ি তৈরি করা হল। আর এই দড়ির একদিক একটা লোক নদীর এপারে নিয়ে এল। পুল থেকে শ' দেড়েক গজ নীচে নদীর প্রবাহ চওড়া হয়ে গিয়েছিল। সেখানে ঘোড়ার গলায় দড়ি বেঁধে তাকে জলে ফেলে দিয়ে অন্য পাড় থেকে টানা হতে লাগল। ঘোড়াকে এইভাবে নদী পার করার ব্যবস্থা ভালো লাগল না। মধ্য তিব্বতে

কতবার ঘোড়াকে নদী পার করাতে হয়েছে। সেখানে দড়ি-টড়ি বাঁধা হত না। এমনিতেই হৈ-চৈ করে পাথর ছুঁড়ে ঘোড়া বা খচ্চর পার করে দেওয়া হত। কিন্তু প্রতি দেশেরই নিজস্ব ব্যবস্থা থাকে। এখানকার লোকেরা এই ব্যবস্থা বার করেছে। সম্ভবত এই আনাড়ি পাহাড়িরা না থেকে যদি নেলঙ্-এর লোকেরা থাকত তাহলে তারা অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে এই কাজটি করত। জলে পড়ে ঘোড়া সাঁতরাতে লাগল। ঐ দড়ির সাহায্যে তাকে নদী পার হতে দিলে হত। কিন্তু পাহাড়িরা সোজা দড়ি টানতে লাগল এবং দড়ি ছিঁড়ে গেল। ঘোড়া ভেসে যেতে লাগল। সে পা নাড়ানোতে তাঁর গলার লম্বা দড়ি পায়ে পেঁচিয়ে গেল। ঘটনাক্রমে কিছুটা দূরে গঙ্গা দুটো প্রবাহ হয়ে গেছে। মাঝখানে পাথরের খুব ছোট একটা দ্বীপ তৈরি হয়েছে। ঘোড়াটা ঐ পাথরের দ্বীপের ওপর দাঁড়িয়ে পড়ল। তার পিছনের দুটো পা এবং সামনের একটা পা দড়িতে জড়িয়ে গিয়েছিল। দশটা থেকে দুটো পর্যন্ত লোকজন সেই দ্বীপে যাওয়ার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু জলের প্রচণ্ড প্রবাহে কেউ পা ফেলে দাঁড়াতে পারল না। হতাশ হয়ে সবাই ফিরে এল। ঘোড়া ডুবে মরল না, কিন্তু তার খিদেয় মরার সম্ভাবনা রইল। ঐ দ্বীপে পাথর ছিল, জলও ছিল ; কিন্তু কোনোভাবেই ঐ দ্বীপে এক মুঠো ঘাস পাঠানো যাচ্ছিল না।' রাহুল ডায়েরিতে লিখেছেন, 'হাত-পা বাঁধা ঘোড়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করে আছে। সন্ধ্যায় বরফ গলা জল অনেক বেড়ে যাবে। ভুটিয়ারা বলল, ঘোড়াটা এখন মরবে না।' পরদিন জল নেমে যাওয়ার প্রতীক্ষায় গ্রামে বসে থাকলেন রাহুল। বুকের মধ্যে মাঝে মাঝে শীতল দমকা হাওয়া লাগছিল তাঁর। এই পুল ও গঙ্গা অনেক প্রাণ বলি নিয়েছে। তিনি ধরেই নিয়েছিলেন যে, ঘোড়ার বাঁচার কোনো সম্ভাবনাই নেই। ১১ জুন অনেক ভুটিয়া এসে গেল। তাদের মধ্যে অনেকে ঘোড়াকে নিয়ে আসার চেষ্টা করল। পরদিন ১২ জুন রাহুল শিবদত্তকে বললেন যে, তিনি প্রত্যেকটি লোককে দুটাকা করে দেবেন। যেভাবে হোক লোকজন এনে এই ঘোড়াকে বাঁচাতে হবে। শিবদত্ত পাঁচ জন ভুটিয়াকে নিয়ে এল। রাহুলও কিছুটা নীচে নেমে দেখলেন, ঘোড়াটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। রাহুল একেবারে নিরাশ হয়ে গিয়েছিলেন। ঠিক এ সময়ে এগারোটা নাগাদ খবর পাওয়া গেল ঘোড়াকে নিয়ে আসা হয়েছে। এখন এই ঘোড়াকে নিয়ে নেলঙ্ যাবে কে, তা নিয়ে সমস্যা হল। কিন্তু ঘোড়া ছেড়ে দিলেও অসুবিধা ছিল। সঙ্গে এত মালপত্র ছিল যে একা শিবদত্তের পক্ষে তা বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। অন্য উপায় ছিল সপ্তাহ দুয়েক নেলঙে থেকে যাওয়া। লোকজন আসবে। নয়া পুল হবে এবং তারপর থোলিঙ্-এ যাওয়া হবে। কিন্তু রাহুলের হাতে এত সময় ছিল না। জুলাইতে রাহুলের ফিরতে হবে। শেষপর্যন্ত নাগার্জুনকে ওখানে রেখে শিবদত্ত ও ঘোড়াকে নিয়ে রাহুল ফিরে গেলেন। তাঁর নেলঙ্ যাওয়া হল না। তিনি মুসৌরির দিকে যাত্রা করলেন। মুসৌরির পথের সঙ্গী হলেন স্বামী গণেশানন্দ। *মেরী জীবনযাত্রা*-য় গণেশানন্দের যে ক্যামিওটি আছে তাও অবিস্মরণীয়। তাও এখানে তুলে দেওয়া হল ঃ

'১৬ জুন আড়াইটা নাগাদ আমরা উত্তরকাশী থেকে রওনা হলাম। বর্ষার জন্য

চারদিকে সবুজ ঘাস দেখা যাচ্ছিল। রাত্রিটা আমরা ডুংরাতে কাটালাম। শিবদত্ত রুটি-তরকারি বানাল। আমরা তিনজন পেট ভরে খেলাম।

'তিনি আনন্দস্বামীর কাছে আমার প্রশংসা নিশ্চয়ই অনেক শুনেছিলেন। কিন্তু এখন তাঁর আর লুকিয়ে থাকা চলল না। তাঁর সব গুণ প্রকাশ পেতে লাগল। তিনি এমন সব জায়গাও চক্কর মেরে এসেছেন যেখানে যাওয়ার স্বপ্ন আমি কখনও কখনও দেখেছি। কিন্তু এখনও তা পূর্ণ হয়নি। তিনি ইয়ারখণ্ড ও চীনা তুর্কিস্তান ঘুরে এসেছেন। মানসসরোবরও তার দেখা হয়ে গেছে। জাভাতেও থেকে এসেছেন এবং ফরাসি, ইন্দোচীন-এর সেগোঙ দেখে এসেছেন। গাড়োয়াল ও হিমালয়ের পাহাড় তো সব সময় তাঁর পায়ের নীচে। আমার কাছে গণেশানন্দ এমন এক ব্যক্তি যাঁকে আমি ঈর্ষা করতে পারতাম। অবশ্য একথা সত্য যে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ছিল না, কলমের জোরও ছিল না। তাই হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের দেশের ঘুমক্কড় সাধু যেভাবে ককেশাস, চীন ইত্যাদি দুর্গম দেশে ঘুরে এসেও সেখানে নিজেদের কোনো চিহ্ন রেখে আসেননি, সেই সব লোকেদেরই অন্যতম ছিলেন স্বামী গণেশানন্দ।

'১৭ জুন আমরা সকালবেলা ছয়টায় রওনা হলাম। ধরাসুতে গুড় ও চা খেলাম। দুপুরের খাওয়ার জন্য এক মাইল দূরে একটা দোকানে বিশ্রাম নিলাম। খাওয়া-দাওয়া করে বেলা চারটা নাগাদ রওনা দিলাম। টেহরীর রাস্তা ছেড়ে দিলাম, যে রাস্তায় পাহাড়িরা যাতায়াত করে সেই রাস্তা ধরলাম। ডানদিকে খেতের মধ্য দিয়ে আমরা যাচ্ছিলাম। গরম পড়েছিল। তাই স্বামী গণেশানন্দ তাঁর সব কিছু মালপত্র মাথায় নিয়ে হাঁটছিলেন। তার শরীরে একটা ল্যাঙট্ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তাতে তাঁর ভুঁড়িটা বড় হয়ে বেরিয়ে এসেছিল। খেতে মেয়েরা কাজ করছিল। স্বামীজিকে দেখে তারা খুব হাসছিল। কিন্তু স্বামীজি 'কুত্তে ভুঁকতে রহতে হৈঁ, হাথী চলা যাতা হৈঁ'—এই প্রবচন মনে করিয়ে দিচ্ছিলেন। আরও এগিয়ে আমরা পাহাড়ের উপর উঠতে লাগলাম। চারদিকে পাইন গাছ। সন্ধ্যা আটটায় লালুরী পৌঁছোলাম। ১৮ জুন আবার রওনা হলাম। প্রথমে খাড়া চড়াই। আজ আবার পাইনের জঙ্গল দিয়ে উপরের দিকে যাচ্ছিলাম। উতরাইয়ের সময় জলের ঝরনা পেলাম। এক চটিতে খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার যাত্রা শুরু হল। কিন্তু রাত হয়ে গিয়েছিল। তাই পাইনের জঙ্গলেই আমরা শুয়ে রইলাম। ১৯ জুন আমরা আবার রওনা হলাম। সেখান থেকে ভনমারীতে লালাজির দোকান। লালাজি স্বামীজির পরিচিত। সেখানে স্বামীজি থেকে গেলেন। আমি ও শিবদত্ত চলে এলাম। বেলা দশটা নাগাদ আমরা মুসৌরি পৌঁছে গেলাম।'

মুসৌরি থেকে দেহরাদুনে চলে এলেন রাহুল। দেহরাদুন-এ আনন্দ কৌশল্যায়ন, বদ্রিবাবু ও সুশীলের সঙ্গে আবার কিছুদিনের ঘুমক্কড়ী। প্রথমে তাঁরা কালসী গেলেন অশোকের শিলালেখ দেখার জন্য। তারপর ইতস্তত কয়েকদিন ঘোরাঘুরি করে আবার দেহরাদুনে ফিরে এলেন। দেহরাদুন থেকে হরিদ্বার হয়ে কনখলে গুরুকুল কাংড়ী ঘুরে গেলেন।

কনখলে গুরুকুল কাংড়ীতে না থেকে তিনি ছিলেন অধ্যাপক ভগবানজির বাড়িতে। ভগবানজি একেবারে নিয়ম করে শংকরজির বুটি অর্থাৎ ভাঙ্ খেতেন। তাঁর ইচ্ছা হয়েছিল রাহুলও একদিন ভাঙ্ খান। রাহুলও আপত্তি করেননি। তিনি পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছিলেন যে ভাঙ্ খেয়ে মস্তিষ্কের ক্রিয়া দ্রুততর হয় কিনা। ভাঙ্ খাওয়ার পর মস্তিষ্কের ধূসর কোষ কীভাবে কাজ করে, তা যাতে তিনি ভুলে না যান সেজন্য তা লিখে রাখার জন্য আনন্দ কৌশল্যায়নকে কাগজ কলম নিয়ে বসিয়ে রেখেছিলেন। রাহুল লিখছেন, '১৯১৪-র পরে আমি আর ভাঙ্ খাইনি। কিন্তু এতদিনে আমি এই স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, বেদে যা সোম, পোগ্তোতে যা ওম, পারসিতে যা হোম, তিব্বতিতে যা সোমরাজা বলে কীর্তিত তাই ভাঙ্। তিব্বতি ও পোগ্তো এই দুই ভাষাতেই ভাঙের নাম সোম। আমার মনে হল, আবার একবার ভাঙ্ খেয়ে দেখলে হয়। কেননা ২৯ বছরের পুরোনো স্মৃতিতে কাজ চলে না। চার আনার মতো সোম আমি সন্ধ্যাবেলা গ্রহণ করলাম। ঋষি হয়ে, ঋষিদের মতোই 'মধু-ক্ষীরের' সঙ্গে। সন্ধ্যাবেলায় যখন আমি বেড়াতে বেরোলাম, তখন তার প্রভাব অনুভব করতে লাগলাম। আমি একটা আমের বাগানে পৌঁছে গিয়েছিলাম। ভগবানজি বেছে বেছে আম নিচ্ছিলেন। আমার মনে হল যে, তিনি আম কিনতে কয়েক যুগ কাটিয়ে দিয়েছেন। মাত্র পনেরো-বিশটা আম তিনি বেছেছিলেন, অথচ আমি বলে উঠলাম, 'পর্যাপ্তমস্তি'। মাথার ধূসর কোষের পরমাণু খুব দ্রুত গতিতে চলছে বলে মনে হল। ঠিক সেই কারণেই আমার সময়ও চলছিল দ্রুতবেগে। তাই সময়টা লাগছে বলে মনে হচ্ছিল। ক্ষীণ আওয়াজও বড় হয়ে আমার কাছে আসছিল। বাইরে মুখের প্রসন্নতা বজায় রাখার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু কোনটার কী স্বাদ তা বোঝা বড় মুশকিল হচ্ছিল। আর ভোজনের পরিমাণের হিসেব রাখার তো কোনো প্রশ্নই ছিল না। ঐ অবস্থায় আমার মস্তিষ্কের কী অবস্থা হয়েছিল সে বিষয়ে আনন্দজিকে দিয়ে কিছুটা লিখিয়েছিলাম। সম্ভবত সেই কাগজ আজও তাঁর কাছে আছে। অতএব সোমের অভিজ্ঞতা হল, তা থেকে আমি বুঝতে পারলাম যে, ভাঙ্ মননের সহায়ক নয়। ভাঙ্ থেকে এক ধরনের মৌজ আসে মাত্র। কিন্তু আমার এই ধারণা ভগবানজি মেনে নিতে পারেননি। কিন্তু আমার মানসিক অবস্থা যে রকম দেখেছিলাম, তাই বলেছিলাম।'

লোলার ডাক

২২ জুলাই লোলার চিঠি এল, 'Necessary to be together. Come to Leningrad or arrange our departure for India. Many Kisses. (এক সঙ্গে থাকা অত্যন্ত জরুরি। লেনিনগ্রাদ চলে এসো, নয়তো আমাদের ভারতে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করো। অনেক অনেক চুমু।)' কিন্তু পাসপোর্ট নেওয়া হয়নি। লোলার ঠিকানাও জানা ছিল না। কিন্তু রাহুলের এখন যাওয়ার জন্য মন উতলা হল। এখন পাসপোর্টের জন্য দরখাস্ত দিতে হবে। কতদিন লাগবে তার কোনো ধারণাই ছিল না রাহুলের।

পাসপোর্টের জন্য এবার ঘোরাঘুরি শুরু করলেন রাহুল। ঘোরাঘুরি শুরু হল ১৯৪৩-

এর অগস্ট থেকে। রাহুল চেয়েছিলেন আফগানিস্তান হয়ে রাশিয়া যেতে। ভারত সরকার তাতে রাজি হল না। ১৯৪৪-এর জানুয়ারিতে সরকার ইরানের পাসপোর্ট দিল। কিন্তু তার সঙ্গে এই শর্ত ছিল যে ইরান ও সোভিয়েতের ভিসা না পাওয়া পর্যন্ত এই পাসপোর্ট ব্যবহার করা যাবে না। রাহুল সরকারকে লিখলেন, সরকার পাসপোর্ট দেওয়ার জন্য যে শর্ত দিয়েছেন তার ফলে তাঁর পক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নে যাওয়া সম্ভব হবে না। অতএব ইরানি ভিসা দেওয়ার আগে সোভিয়েত ভিসা নেওয়ার শর্ত তুলে নেওয়া হোক। এই পাসপোর্ট পেতে আরো চার মাস লাগল।

ফেব্রুয়ারিতে পাসপোর্ট পেয়ে রাহুল লোলাকে তার পাঠালেন. 'পাসপোর্ট পেয়ে গেছি। কিন্তু সোভিয়েত ভিসা দরকার। সোভিয়েত কনসালকে বলে তেহরানের কনসাল যাতে ভিসা দেয় তার চেষ্টা করো। নয়তো ঈগরকে সঙ্গে নিয়ে চলে এসো। তার করেই জবাব দিও।'

২২ ফেব্রুয়ারি লোলার তার এল ঃ 'ভোকস যে চিঠি পাঠিয়েছো তা পেয়েছি। কবে লেনিনগ্রাদ আসছো জানাও।' সেই দিন রাহুল তার করলেন, 'সোভিয়েত ভিসা পাঠাও। ভিসা পেলেই রওনা হব।'

রাহুল একাধিক চিঠি ইরান সবকারের কাছে পাঠিয়েছিলেন। ৯মে তিনি ইরান সরকারের কাছে দরখাস্ত পাঠিয়েছিলেন। ইরানের ভিসা এল ১৯ সেপ্টেম্বর। ১০ সেপ্টেম্বর লোলার তার আসে ঃ 'লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকটর ভোজনেসেন্‌স্‌কিকে তুমি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করতে ইচ্ছুক তা জানিয়ে সোভিয়েত ভিসা পাঠাবাব জন্য টেলিগ্রাম করো।' রাহুল টেলিগ্রাম করে দিলেন। কিন্তু সোভিয়েত ভিসা এল না।

সভায় সম্মেলনে

ইরানের পাসপোর্ট ও ভিসা পেতে রাহুলের প্রায় এক বছর সময় লেগে গেল। এই সময়টা রাহুল বসে ছিলেন না। প্রায় সারা ভারতই ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। হিন্দি সাহিত্য সম্মেলন, ওরিয়েন্টাল কনফারেন্স, কিষান সম্মেলন প্রভৃতিতে যোগদানের জন্য এবং বই লেখার প্রয়োজনে ইতস্তত ভ্রমণ করছিলেন। রাহুল সাংকৃত্যায়ন এখন একটি বিখ্যাত নাম। প্রগতিশীল হিন্দি লেখক ও শিল্পীদের কাছ থেকে, প্রাচ্যবিদ্যাবিদ মনীষীদের কাছ থেকে এবং একদা যে কিষান সম্মেলনের তিনি সভাপতি ছিলেন, সেই সম্মেলনের কাছ থেকে ডাক আসছিল। তিনি পাসপোর্ট ও ভিসার চেষ্টা করছিলেন। আবার ক্রমাগত ঘুরেও বেড়াচ্ছিলেন। ২৬ সেপ্টেম্বর কানপুরে কবি সম্মেলনের সভাপতি হিসেবে তাঁর ভাষণে তিনি প্রগতিশীলতার যে অর্থ করছিলেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন যে. প্রগতিশীলতার মানে এই নয় যে, সুরদাস, তুলসীদাস, কালিদাস, বাণভট্টের মতো সাহিত্যিকদের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিচার করলে তাদের মর্মোদ্ধার করা সম্ভব হবে। তাঁদের কবিতায় সামন্ত সমাজের পুষ্টি হয়েছিল, সেজন্য তাঁদের কবিতা গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া যাবে না। যে সমাজে অথবা যে যুগে মহান কবির জন্ম হোক না কেন,

তাঁরা চিরকাল আমাদের কাছে মহানই থাকবেন। যতদিন তাঁদের কবিতায় এই শক্তি থাকবে, আমাদের হৃদয়ে এই কোমলতা থাকবে, যা থেকে আনন্দের সময় আমরা উৎফুল্ল হয়ে উঠব, বিষাদের সময় আমাদের চোখ দিয়ে জল ঝরবে, ততদিন এই মহান কবিদের কোনো বিপদ নেই। পুরোনো কবিরা পরিত্যাজ্য একথা যাঁরা বলবেন, তাঁরা প্রগতিশীল নন, উন্মাদ। রাহুল একথাও বলেছিলেন যে তাঁর কথা যেন তাঁরা ব্যক্তিগত মত বলে মনে না করেন। এই ধরনের মত খণ্ডন করে এঙ্গেলস্ প্রোফেসর ডুহ্‌রিঙকে লিখেছিলেন। ডুহ্‌রিঙ গ্যয়টের মতো মহান কবিদের পাঠ্যক্রম থেকে বাদ দেওয়ার কথা বলেছিলেন। এঙ্গেলস তার প্রতিবাদ করেছিলেন। রাহুলের ভাষণের পর একজন সাহিত্যিক তাঁকে বলেছিলেন যে, যদি প্রগতিশীল লেখকদের আমাদের অতীতের সাহিত্য সম্পর্কে এই ধারণা হয়ে থাকে, তবে রাহুলের সঙ্গে তাঁদের কোনো বিরোধ নেই।

এই বছরই ওরিয়েন্টাল কনফারেন্সের অধিবেশন হয় বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে। রাহুল এই কনফারেন্সে যোগ দিয়েছিলেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন ও রাধাকৃষ্ণনের মতো পণ্ডিতেরাও এসেছিলেন।

১৯৪৪-এর জানুয়ারিতে গোয়ালিয়র কলেজের ছাত্র পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে তিনি গোয়ালিয়রে যান এবং গোয়ালিয়রের সব দর্শনীয় স্থান দেখেন। জানুয়ারির শেষ দিকে তিনি ইন্দোরে ফাসিবাদ বিরোধী লেখক সম্মেলনের সভাপতি হয়ে যান। সেখান থেকে উজ্জয়িনী হয়ে তিনি বোম্বাই চলে যান। ফেব্রুয়ারি মাসটা বোম্বাইয়ে কাটিয়ে বেজওয়াড়ায় অনুষ্ঠিত অখিল ভারতীয় কিষান সম্মেলনে যোগ দিতে চলে যান।

কিষান সম্মেলনে

বেজওয়াড়ায় এই কিষান সম্মেলন হয়েছিল ১৯৪৪-এর ১৪ মার্চ থেকে ১৫ মার্চ। অন্ধ্রের শাসকেরা কিষান সভা যাতে না হতে পারে তার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কিষানদের নিজস্ব সম্মেলনে আসা বন্ধ করতে পারে এতটা শক্তি ছিল না শাসকদের। অন্ধ্রে পাঁচ হাজার পার্টি মেম্বার, দশ হাজার স্বেচ্ছাসেবক এবং এক লাখ কিষান সভার মেম্বার। বেজওয়াড়ার এই কিষান সম্মেলনের বিশদ বিবরণ দিয়েছেন রাহুল। এই বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে, অন্ধ্রের কৃষকদের আন্দোলন কেন তেলেঙ্গানায় সংগ্রামী রূপ নিয়েছিল।

সম্মেলনে এক লাখের বেশি স্ত্রী-পুরুষ জমা হয়েছিল। চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজারের জনতা তো রাত চারটা পর্যন্ত বসে সঙ্গীত ও অভিনয় দেখছিল। রাহুল কংগ্রেসের অনেক অধিবেশন দেখেছিলেন, কিন্তু এমন বিপুল সংখ্যক স্ত্রীলোকের উপস্থিতি দেখেননি। পনেরো হাজারেরও বেশি স্ত্রীলোক বেলা চারটায় রোদের মধ্যে এসে বসে যেত। স্বেচ্ছাসেবিকারা জল খাওয়ানোর ভালো বন্দোবস্ত করেছিল। জল খাওয়ার ব্যাপারে ছোঁয়াছুঁয়ির প্রশ্নই ওঠেনি। সেখানে তো এক মাটির গ্লাসেই সবাই জল খাচ্ছিল। এমন প্রচণ্ড ভিড়ে অন্য কোনো ব্যবস্থা করা অসম্ভব ছিল।

রাত্রি দশটা থেকে সঙ্গীত, নৃত্য ও অভিনয়ের প্রোগ্রাম শুরু হত। বাংলার শিল্পীরা ললিতকলায় অনেকটা অগ্রসর ছিলেন। কিন্তু রাহুলের মনে হয়েছিল—সে ক্ষেত্রেও এঁরা বাজিমাত করে দিয়েছিলেন। দুদিন শিল্পকলা প্রদর্শিত হবার পর কমরেড মুজাফ্‌ফর ও কমরেড গোপাল হালদার তাঁদের অভিমত প্রকাশ করে বললেন যে, এখানে জনতার গভীরতম স্তর সব শিল্পকলার জননী। এখানকার কর্মীরা শিল্পকলাকে নিয়ে জনতার কাছে আসে না। বরং এরাই জনতার কাছে শিল্পকলা শিখতে আসে। অথচ বাংলায় মধ্যবিত্ত শ্রেণি তাদের নিজস্ব শিল্পকলার সংস্কার নিয়ে জনতার কাছে পৌঁছোয় এবং জনতার শিল্পকলা ঠিক মতো শিখতে পারে না।

অন্ধ্রের কমরেডরা মনে করেন, যে-রাজনৈতিক জ্ঞান জনতা নেতাদের কাছে পায়, তারা তার অনেক বেশি প্রতিদান দেয়। কংগ্রেসি নেতারা একবার এসে ভাষণ দিয়ে যান; জনতার সঙ্গে তাঁদের কোনো লেনা-দেনা নেই। জনতা তাঁদের চেনে না। গান্ধিজি আবেদন-নিবেদনের রাস্তা ছেড়ে জনশক্তির আবাহন করেছিলেন। এখন আর ইংরেজিতে কংগ্রেসি নেতাদের শহুরে ভাষণে কাজ হচ্ছে না। তাঁরা তাঁদের নিজেদের দাবিকে জনতার দাবি বানানোর জন্য জনতার কাছে যেতে শুরু করেছেন। ইন্দ্রের সিংহাসন টলছিল। কিন্তু গান্ধির আন্দোলনও জনতার বহিরঙ্গ স্পর্শ করেছিল। স্বরাজ ও আজাদির শ্লোগানে জনতা মুগ্ধ ও চকিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এই স্বরাজ ও আজাদিকে তারা নিরাকার ভগবানের মতো মনে করেছিল। কিন্তু অন্ধ্রের যুবক কমিউনিস্টরা নিরাকার স্বরাজ্যের জন্য জনতার আবাহন করছিল না। তারা তাদের রুটি-রুজির লড়াইয়ে সামিল হয়ে বলছিল যে, আমরা চাই সাকার স্বরাজ্য। যে জনতা লড়াই করছিল তারা এই কমিউনিস্টদের বুঝিয়েছিল যে, বক্তৃতার ভাষা ছাড়াও আর একটা ভাষা আছে যাকে ব্যবহার করলে অল্পতেই অনেকটা বোঝানো যায় এবং জনতার অন্তর ও মস্তরকে প্লাবিত করে দেওয়া যায়। জনতার সঙ্গীতের অনেক ভাষা, তাদের নৃত্য, অভিনয়, প্রহসনেরও ভাষা অনেক। কোনো কোনো গীত তো আগেকার কিষান মজদুর সংগ্রামের সময়েই হয়েছিল। সঙ্গীতের সঙ্গে অভিনয় যুক্ত হলে তা হাজারগুণ শক্তিশালী হয়ে যায়। তা ১৯৪২-এই জানা গিয়েছিল। কমিউনিস্টরা দেখলেন যে, জন-শিল্পকলার ভাষা তাদের বক্তব্যকে অনায়াসে জনতার হৃদয়ে পৌঁছে দিতে পারে। কিষান বীর এবং তাদের আত্মত্যাগের গাথা একটি সাধারণ ঢোলকের সঙ্গে বাজিয়ে গাইলে প্রতি রাতে জনতাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে শুনতে বাধ্য করা যায়। সুতরাং এখন তারা নিজেদের গাথা বানাল। কিষানদের যুদ্ধ, মজুরদের মেহনত, স্তালিনগ্রাদ এবং এমন সব বিষয় নিয়ে গাথা রচিত হল। কিষান ও মজুরদের মধ্য থেকে গায়কেরা উঠে এল এবং শিক্ষিতেরাও তাদের শিষ্যত্ব স্বীকার করে নিল। চারদিক থেকে এই নতুন গাথা শোনার জন্য শোরগোল শুরু হয়ে গেল। অন্ধ্রতে শুধু জেলায় জেলায় নয়, তালুকে তালুকে (তহশীল, তহশীল) তাদের নিজস্ব গাথার গায়কমণ্ডলী আছে।

এ সময়ে অন্ধ্রে পাঁচ হাজার পার্টি মেম্বার ছিল। সে সময় পার্টির সর্বক্ষণের কর্মীই

(whole timer) ছিল এক হাজার। তাদের মধ্যে চুয়াত্তর শতাংশ বিবাহিত ছিল। কমিউনিজমকে বাড়ি থেকে শুরু করা অত্যন্ত জরুরি। কমিউনিস্টদের স্ত্রী, বোন ও মা প্রথম তাদের পাগল বলে মনে করত। এখন তারা বুঝতে পেরেছে যে, সব রকমের স্বার্থত্যাগ ও আত্মোৎসর্গ পাগলামি নয়। এক বছর আগে স্ত্রীলোকদের জন্য বিশেষ শিক্ষা-ব্যবস্থা হয়েছিল, যেখানে কয়েক সপ্তাহ থেকে তিনমাস শিক্ষা দেওয়া হত।

বিজয়ওয়াড়ার কিষান সম্মেলনের পর রাহুল অন্ধ্রের ধান্যকন্টক (অমরাবতী) নাগার্জুনীকোণ্ডা, জগৈয়াপেট্ট, গোলী ইত্যাদি জায়গায় প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলার ধ্বংসাবশেষ দেখে কেরলে চলে যান। ধান্যকন্টক (অমরাবতী) যে বৌদ্ধদের এক মহান তীর্থস্থান হিসেবে গণ্য হত তাতে সন্দেহ নেই। ধান্যকন্টকের মহাচৈত্য মূর্তিকলার সুন্দর নিদর্শন। অমরাবতীর শিল্পকলা এক স্বতন্ত্র শিল্পধারা প্রবর্তন করেছে। শুধু শিল্পকলাই নয়, এই চৈত্য বৌদ্ধদের এক ধার্মিক সম্প্রদায়কে চৈত্যবাদী নামে চিহ্নিত করেছে। তিব্বতি পরম্পরা অনুসারে ধান্যকন্টকের পূর্ব ও পশ্চিমের দুই পর্বতের কাছে বাস করায় দুটি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নাম ছিল পূর্বটশলীয় ও অপরটশলীয়।

ধান্যকন্টক থেকে তিনি শ্রীপর্বত অথবা নাগার্জুনীকোণ্ডা যান। শ্রীপর্বতের তন্ত্রমন্ত্র-বেত্তাদের শব্দ ঝংকারের প্রতিধ্বনির গুঞ্জরণ সংস্কৃতের অনেক কাব্যে শোনা যায়। দ্বিতীয় শতকের মহান দার্শনিক নাগার্জুনেব কাছে এই স্থানটি অত্যন্ত প্রিয় ছিল। পরে তান্ত্রিক বৌদ্ধদের সর্বোত্তম পীঠ ছিল শ্রীপর্বত। নাগার্জুন তাঁর অনেক দার্শনিক গ্রন্থ এখানে লিখেছেন। নাগার্জুন তাঁর 'বিগ্রহব্যবর্তিনী' ও অন্যান্য নিবন্ধ দ্বারা যে তর্ক ও ন্যায়শাস্ত্রের আরম্ভ করেছিলেন, তাই পরে সারা ভারতীয় ন্যায় ও তর্কশাস্ত্রের প্রবল প্রবাহের উৎস বলে স্বীকৃত হয়।

শ্রীপর্বত মহাযান ও তান্ত্রিক বৌদ্ধদের পরম পুণ্যস্থান। কিন্তু এখানকার কোনো মূর্তিতে বা দৃশ্যে মহাযান অথবা তন্ত্রযানের ছায়াও দেখতে পাননি রাহুল।

ইতিপূর্বে ভারতের সব প্রদেশ রাহুল একাধিকবার দেখেছিলেন। কিন্তু কেরল দেখার সুযোগ হয়নি তাঁর। ২৭ মার্চ তিনি বাসে মহীশূর থেকে কালিকট যান। সেখান থেকে মালাবারের করিবেল্লুর গ্রামে তিন দিন থাকেন। গ্রামে উঁচু-নিচু পাহাড়ি জমি। সব থেকে নীচু জমিতে ধানের খেত। কিছুটা উঁচু জমিতে নারকেলের বাগান। সেখানে কোথাও কোথাও কলা, কাজু ও কাঁঠাল গাছ। গ্রামের লোকের বাড়ি ও বাগান দূরে দূরে। যার জমি নেই, সে অন্যের বাগানে থাকে। করিবেল্লুরের ৫২০০ পরিবারের মধ্যে শুধু ৪০০ পরিবারের নিজস্ব খেত আছে। করিবেল্লুর থেকে তিনি চেরুত্তুবত্তী গ্রামে কেরলের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি নারায়ণমেনন ভেল্লাতোল্ল-এর সঙ্গে দেখা করতে যান। ষাট বছরের এই তরুণ কবির বিচারধারা ক্রমাগতই পরিবর্তিত হচ্ছে। তিনি শুধু কবি ছিলেন না। কেরলের প্রাচীন নাট্যকলাকে তিনি অনেকাংশে জীবিত করে তুলেছিলেন। কথাকলির স্বীকৃত আচার্য ছিলেন তিনি। সঙ্গীত ও নৃত্যকলার পুনরুজ্জীবনের জন্য তিনি এক কলামণ্ডল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে থাকলে এই কলামণ্ডলের ক্ষতি হতে পারে, একথা

ভেবে তিনি কলামণ্ডল ও পঞ্চাশ হাজার টাকার সম্পত্তি রাজ্যকে অর্পণ করেছিলেন। কিন্তু রাজ্যের যান্ত্রিক পরিচালনায় কলামণ্ডলের কোনো উন্নতি হয়নি। ১৯০৭-এ ভেল্লতোল্ল বাল্মিকী রামায়ণের পদ্যানুবাদ করেন। তাঁর একটি মহাকাব্য হল 'চিত্রযোগম'। কালিদাসের *অভিজ্ঞান শকুন্তলম*-এর ভিত্তির ওপর তিনি 'অচ্ছন মকালম' নামে কাব্য রচনা করেন। এই কাব্য শকুন্তলাকে নিয়ে রচিত। এতে শকুন্তলা তাঁর পিতা বিশ্বামিত্রকে খুব ভর্ৎসনা করেন। বিশ্বামিত্র মেনকার সঙ্গে যে সম্পর্ক রেখেছিলেন, তা শুধু শারীরিক সুখের সম্বন্ধ, তিনি কন্যার দায়িত্ব গ্রহণ করেননি। কবিকে এই বিষয়টি অত্যন্ত যন্ত্রণা দিয়েছিল। রাহুল যখন তাঁর বাড়িতে গেলেন, তখন তিনি বাড়ি ছিলেন না। কবির বৃদ্ধা স্ত্রী, দুই পুত্র ও এক কন্যার সঙ্গে দেখা হল। দুই কন্যা পার্টি মেম্বার; ভেল্লতোল্ল স্বয়ং পার্টিকে খুব ভালোবাসেন। সন্ধ্যায় এলেন ভেল্লতোল্ল। তাঁর সঙ্গে কিছু কথাবার্তা হল। তিনি কানে এত কম শুনতেন যে, তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলা খুব কঠিন ছিল। পরদিন দুপুরের পর স্টেশনের পথ ধরলেন। ৩ এপ্রিল সকালবেলা আটটায় ব্যাঙ্গালোর পৌঁছোলেন রাহুল।

৪ এপ্রিল ব্যাঙ্গালোরে *বার্তা*-র (দৈনিক পত্রিকা) কার্যালয়ে কন্নড় সাহিত্যিকদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা হয়। আজকের জীবন্ত ভাষার মধ্যে কন্নড়ের সাহিত্য হিন্দি (অপভ্রংশ) ও তামিল সাহিত্যের পর সবচেয়ে পুরোনো। কর্ণাটকের কমিউনিস্ট পার্টি এখনো অনেকটা পিছিয়ে, এখানে পার্টি মেম্বার ছিল মাত্র একশো জন।

৬ এপ্রিল বোম্বাইয়ে ফিরে এলেন রাহুল। বোম্বাইয়ে সর্দার পৃথ্বি সিংহের হিন্দি কাব্যধারার কাজ শেষ করে তিনি ১২ জুলাই প্রয়াগে পৌঁছোলেন। এবার রাহুল *জয় যৌধেয়* উপন্যাসের দিকে মন দিলেন। ভারতে কোনো এক সময় জনগণের রাজ্য ছিল। রাজা ছাড়াই রাজ্য শাসন হত, একথা মানুষ এমনভাবে ভুলে গিয়েছিল যে এই শতাব্দীর প্রথম দিকে যখন কিছু ইউরোপীয় ও ভারতীয় পণ্ডিত লিচ্ছবি (বৈশালী), মল্ল আদি গণ রাজ্যের (প্রজাতন্ত্রী রাজ্যের) উল্লেখ করলেন, তখন অনেক শিক্ষিত মানুষও তা বিশ্বাস করতে পারেননি। তাঁরা ভাবতে পারেননি যে, রাজা ছাড়া রাজ্য চলতে পারে। ক্রমে তাঁরা এ নিয়ে কিছুটা গর্ববোধও করতে লাগলেন। কেননা তাঁরা দেখলেন যে, যে-গণতন্ত্র নিয়ে ইউরোপীয়রা গর্ববোধ করে, তা ভারতেও এক সময় ছিল। ব্রাহ্মণদের বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যে এ বিষয়ে একেবারে কোনো উল্লেখই নেই। শ্রীলঙ্কা যাওয়ার আগে রীজ ডেভিডস্-এর গ্রন্থে বৈশালী গণরাজ্য সম্পর্কে রাহুল কিছুটা পড়েছিলেন। অন্য কোনো গ্রন্থে গণরাজ্যের কোনো উল্লেখ তাঁর চোখে পড়েনি। রুশ বিপ্লব সোভিয়েত ব্যবস্থাকে যখন একটি জনপ্রিয় আদর্শে পরিণত করে তখনো সোভিয়েত ব্যবস্থা সম্পর্কে রাহুলের বিশেষ কিছু জানা ছিল না। রাহুল শুধু জানতেন যে, 'সেখানে ধনীর কোনো স্থান নেই। সব মানুষ সমান। কাজ করা প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য এবং অন্নবস্ত্রের অধিকার প্রত্যেকের।'

শ্রীলঙ্কা থেকে ফিরে এসে রাহুল ছয় বছর কংগ্রেসের সংগ্রামী রাজনীতিতে

অংশগ্রহণ করেছিলেন। জেল থেকে ছাড়া পেয়েও তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন। ফলে তাঁর এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে, বর্তমান ব্যবস্থাকে পালটে এক সম্পূর্ণ নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

শ্রীলঙ্কায় যখন তিনি *ত্রিপিটক*-এর পুঁথি পড়তে লাগলেন, তখন বুদ্ধের সময়ের গণরাজ্য তাঁর চোখের সামনে মূর্ত হয়ে উঠছিল। রাহুল চেয়েছিলেন যে, এই গণরাজ্য ভারতীয়দের চোখের সামনেও মূর্ত হয়ে উঠুক। তাই ইতিহাসের এক অত্যন্ত প্রভাবশালী লিচ্ছবি গণরাজ্যেকে নিয়ে তিনি *সিংহ সেনাপতি* উপন্যাস লিখেছিলেন। *ভোলগা সে গঙ্গার* 'সুপর্ণ যৌধেয়' লেখার সময় তাঁর খেয়াল হল যে, ভারতের এই বৈভবশালী গণরাজ্যকে নিয়ে একটি উপন্যাস লেখা যেতে পারে। সমুদ্রগুপ্ত ও চন্দ্রগুপ্ত এই দুই গুপ্ত সম্রাটের যুগকে তিনি বেছে নিয়েছিলেন। যৌধেয় গণরাজ্যকে উচ্ছেদ করেছিলেন চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য। বারোদিনের মধ্যে *জয় যৌধেয়* লিখে ফেললেন রাহুল (২৬ জুলাই থেকে ১৬ অগস্ট)।

১৭ অগস্ট থেকে রাহুল *ভাগো নেহি দুনিয়াকো বদলো* লিখতে শুরু করলেন। ইতিমধ্যে রাহুল মার্কসবাদ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যা নিয়ে অনেক বই লিখেছিলেন। কিন্তু এই সব বইই ছিল শিক্ষিত লোকদের জন্য। কিন্তু সমাজকে পালটে ন্যায় ও ভ্রাতৃত্ববোধের ওপর সমাজ প্রতিষ্ঠার কাজ শুধু শিক্ষিত মানুষের নয়। এই কাজ কিষান, মজদুর ও শিক্ষিত নিম্নবিত্তদের। সুতরাং সমাজ পালটানোর জন্য যে বই লেখা হবে তা কেতাবি ভাষা হলে চলবে না। সুতরাং *ভাগো নেহি দুনিয়াকো বদলো* লেখার সময় রাহুল ভাষা ব্যবহারে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। এই বইয়ের ভাষার কাঠামো ছিল হিন্দিতে, ক্রিয়া ও বিভক্তি ছিল হিন্দিতে। কিন্তু অশিক্ষিত গ্রামীণ মানুষ যে শব্দ ব্যবহার করে তিনি সেই শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। শব্দপ্রয়োগেও তাদের উচ্চারণ মেনে নিয়েছিলেন। প্রথম দিকে কাজটা কঠিন লাগছিল। পরে তিনি ভাষা ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে যান। তিনি লক্ষ করেছিলেন যে, গ্রামীণ জনতা এমন চার-পাঁচশো শব্দ ব্যবহার করে যা আরবি-ফার্সি থেকে নেওয়া। কিন্তু সেই সব শব্দ তারা উচ্চারণ করে নিজেদের মতো করে। এই চার-পাঁচশো শব্দের হিন্দি প্রতিশব্দ গ্রামের লোকেরা বোঝে না। বারো দিনে রাহুল এই বই শেষ করেন (১৭ অগস্ট থেকে ২৮ অগস্ট)।

১৯৪৭-এর ২৭ অগস্ট রাহুল সোভিয়েত দেশ থেকে লন্ডন হয়ে স্বাধীন ভারতে ফিরলেন। ১৯৪৭-এর ২৮ ডিসেম্বরে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত হিন্দি সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন রাহুলের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। স্বাধীনতার পর হিন্দি-সাহিত্য সম্মেলনের এই ছিল প্রথম অধিবেশন। তাই প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল আগের চেয়ে অনেক বেশি। রাহুল এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতে রাজি হয়েছিলেন। তিনি এ সময়ে বিশেষভাবে লিপি সংশোধন ও পারিভাষিক শব্দ সৃষ্টির কথা ভাবছিলেন

পঞ্চদশ অধ্যায়

ভাষা সমস্যা ও রাহুল

২৬ ডিসেম্বর রাহুল প্রয়াগ থেকে বোম্বাই এসে পৌঁছোন। ঐ দিনেই তিনি পার্টির কেন্দ্রীয় অফিসে যান। সভাপতি হিসেবে রাহুলের ভাষণের কপি ইতিমধ্যেই পার্টি কমরেডরা পড়েছিলেন। এই ভাষণে হিন্দি-উর্দু সম্পর্কে রাহুলের অভিমতের সঙ্গে পার্টি কমরেডদের ঐকমত্য ছিল না। তাছাড়া মুসলমানদের সাংস্কৃতিক বয়কট ছেড়ে ভারতীয় সংস্কৃতির মূল প্রবাহের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য রাহুলের আহ্বানও কমরেডদের পছন্দ হয়নি। তাঁরা রাহুলকে ভাষণ থেকে এই অংশ বাদ দিতে বলছিলেন। যদি ভাষণ ছাপার আগে এই প্রস্তাব তাঁর কাছে আসত, তাহলে তিনি তা বাদ দিয়েও দিতেন। রাহুল লিখছেন, 'আমি ব্যক্তিগত অভিমত থেকে সঙ্ঘের (পার্টির) অভিমতকে বড় বলে মনে করতাম এবং অনুশাসনকে মেনে নেওয়াও এক আবশ্যিক গুণ বলে স্বীকার করতাম।' কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে রাহুলের সম্পর্ক মাত্র আট বছর আগে হয়েছিল। কিন্তু যখন থেকে তাঁর রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ হয়েছে, তখন থেকেই তিনি পার্টিকে নিজের বলে মনে করেছেন। ১৯১৭-তে রাশিয়ার নভেম্বর বিপ্লবের মাস- দুয়েকের মধ্যেই রাহুল ভারতের কাগজে এই বিপ্লবের কথা পড়েন। তখন থেকেই তাঁর এই বিপ্লবের প্রতি শ্রদ্ধা জেগেছিল, তখন থেকেই সাম্যবাদ তাঁর নিজস্ব বাদ হয়ে যায়। যোগাযোগ হয়নি, তাই পার্টির ভেতরে আসতে তাঁর বিশ বছর সময় লেগেছিল। পার্টিতে যোগ না দেওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজেকে সর্বদা পার্টির লোক বলেই মনে করতেন। তাই ব্যক্তিগত অভিমতের জন্য পার্টিকে ত্যাগ করার কথা তিনি ভাবতে পারেননি। যখন তিনি কমিউনিজমের অর্থ ভালোভাবে বুঝতে শেখেননি, তখন থেকেই তাঁর মনে সাম্যবাদী চিন্তার উথালপাথাল শুরু হয়েছিল। তবু ভাষণ থেকে একটি বিশেষ অংশ বাদ দেওয়া সেই মুহূর্তে আর সম্ভব ছিল না। তাঁর সেই অংশের বিরুদ্ধে কথা বলা আরো বিশ্রী হত।

এতে সন্দেহ নেই যে, রাহুল চেয়েছিলেন যে, তৎসম-প্রধান সংস্কৃতনিষ্ঠ হিন্দি ভারতের রাষ্ট্রভাষা হোক। হিন্দির বিরোধীরা চেয়েছিল হিন্দুস্থানি হোক রাষ্ট্রভাষা। রাহুলের মতে হিন্দুস্থানি একটা জোড়াতালি-দেওয়া ভাষা। এই ধরনের একটা অপরিপক্ক ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা হলে তা ভারতীয়দের জাতীয় ভাষা হয়ে উঠতে পারবে না। ১৯৩৯-এ রাহুল বেনারসে হিন্দি সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। তখনও তিনি হিন্দিকেই ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার কথা বলেছিলেন। হিন্দুস্থানির মাধ্যমে হিন্দি ও উর্দুকে যুক্ত করার প্রয়াসকে তিনি ছেলেমানুষি বলে মনে করতেন। কেননা তাঁর মতে হিন্দুস্থানি একটি নকল ভাষার বেশি কিছু নয়। তিনি লিখছেন, 'হিন্দুস্থানির পক্ষপাতীরা যদি একবার পন্থ এবং ইমানালের কবিতা পাশাপাশি রেখে একটু বোঝার চেষ্টা করেন,

তাহলে দেখা যাবে যে, এ দুজনকে বোঝার জন্য অপরিপক্ক হিন্দুস্থানি দিয়ে কোনো কাজ হবে না। দাড়ি আর টিকিকে মেলালে ভাষা সমস্যার সমাধান করা যাবে না। তাদের শিকড়ের সঙ্গে মেলাতে পারলেই এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। এই শিকড় হল মাতৃভাষা। যাকে গ্রাম্য অ-সাহিত্যিক ভাষা বলে অবহেলা করা হয়।' হিন্দি আর উর্দু-অলারা যাতে পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারে, পারস্পরিক মনোভাব বোঝাতে পারে, তার জন্য রাহুল অবশ্যই চাইতেন যে, হিন্দির ছাত্রদের তাদেরই বর্ণমালায় উর্দুর দু-চারটি পাঠ দেওয়া হোক এবং উর্দুর ছাত্রদের বেলায়ও ঠিক তাই করা হোক।

২৮ ডিসেম্বর বেলা তিনটায় হিন্দি সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন শুরু হয়। সম্মেলনে আট-দশ হাজার লোকের সমাবেশ হয়েছিল। সভাপতির ভাষণ দীর্ঘ ছিল। এই ভাষণের কিছু অংশ ত্রিশ মিনিটের মতো পড়েন রাহুল। গোটা ভাষণটি তিনি পড়েননি। ভাষণ পড়ার আগেই কমরেড অধিকারী পার্টির তরফ থেকে আবার জোর দিয়ে লিখেছিলেন যে, রাহুল যেন বলেন যে, উর্দু সম্পর্কে তাঁর অভিমত পার্টির অভিমত নয়। তিনি সেই দিনই কমরেড অধিকারীকে লেখেন যে, এ বিষয়ে পার্টির নীতি তিনি মেনে নিতে পারছেন না, তাই তিনি আর পার্টিতে থাকার যোগ্য নন। তবু তিনি সর্বদাই পার্টির সহযাত্রী থাকবেন। রাহুল লিখছেন—ভাষা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত তিনি অনেক চিন্তাভাবনা করেই নিয়েছেন। সেই সিদ্ধান্ত পালটাতে তাঁর অনেক বছর লেগে যাবে। সেই সময় রাহুলের মনে হয়েছিল যে, পার্টির লোকরা জাতীয় বিষয়ে বিশেষ চিন্তাভাবনা না করেই সিদ্ধান্ত নিতেন। তাঁরা সংকীর্ণ মতবাদের প্রশ্রয় দিতেন। দূর ভবিষ্যতে (ভাষা সম্পর্কে) এই সিদ্ধান্তের কী প্রভাব হতে পারে, সে বিষয়ে তাঁদের কোনো ধারণাই ছিল না। রাহুল লিখেছিলেন যে, তিনি নিজেই পার্টি থেকে সরে যাচ্ছেন। কিন্তু রমেশ সিন্‌হার লেখা থেকে জানা যায় যে এই ভাষণের জন্য তাঁকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল।

২৮ ডিসেম্বরের অধিবেশনে ভাষা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য তিনি স্পষ্টভাবে তাঁর ভাষণে ব্যক্ত করেন ঃ

১। আমাদের দেশ বহুভাষাভাষী ও বহুজাতিক।

২। কোনো বিশেষ অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মাতৃভাষা সেই অঞ্চলের শিক্ষার ও প্রশাসনের মাধ্যম হবে। অর্থাৎ বাঙলায় মাধ্যম হবে বাঙলা ভাষা, ওড়িশায় ওড়িয়া, অন্ধ্রতে তেলেগু ইত্যাদি।

৩। যেহেতু আমাদের দেশ বহু ভাষাভাষী তাই আমাদের পারস্পরিক যোগাযোগের জন্য এবং আন্তঃ রাজ্যিক এবং কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্যের যোগসূত্র হিসেবে একটি দেশীয় ভাষা যদি না থাকে তবে ইংরেজি চিরকাল থেকে যাবে এবং ভারতীয়রা চিরকাল বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে।

৪। একমাত্র সেই ভাষাই যুক্তরাষ্ট্রের অথবা কেন্দ্রের ভাষা হতে পারে যে ভাষার সঙ্গে দেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ পরিচিত এবং যে ভাষার শব্দ ভাণ্ডারে বিভিন্ন রাজ্যের ভাষার বহু শব্দ আহৃত হয়েছে।

৫। এই জাতীয় একটি ভাষাই আছে। তা হল হিন্দি। অর্ধেক ভারতবর্ষে এই ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গৃহীত হয়েছে এবং অন্যান্য ভাষাভাষী মানুষের কাছে এই ভাষা অনায়াসবোধ্য, কারণ প্রথম থেকেই এই ভাষা সংস্কৃত থেকে শব্দ আহরণ করতে থাকে। এই অর্থে উর্দু সংস্কৃত এবং অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষার সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ উর্দু তার শব্দভাণ্ডার সংগ্রহ করেছে আরবি-ফার্সি ভাষা থেকে। তাই উর্দু যুক্তরাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে গৃহীত হলে আঞ্চলিক ভাষাসমূহের পক্ষে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হবে।

৬। প্রত্যেক বালক-বালিকার মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভের অধিকার আছে।

৭। এই নীতি অনুযায়ী উর্দুভাষীদের উর্দুর মাধ্যমে শিক্ষালাভের অধিকার আছে। কিন্তু হিন্দি ভাষাভাষী অঞ্চলে এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে উর্দু ভাষাভাষী মানুষ সংখ্যাগরিষ্ঠ। সুতরাং হিন্দি ভাষাভাষী রাজ্যের ভাষা হিসেবে উর্দুকে স্বীকার করে নিলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধতা করা হবে। তার পরিণামও উর্দু ভাষার সমর্থকদের অনুকূল হবে না; অনাবশ্যক তিক্ততার সৃষ্টি হবে। উর্দুর সমর্থকদের পক্ষে সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত কাজ হবে আরবি লিপির প্রতি তাদের মোহ দূর করে নাগরী লিপি গ্রহণ করা; যাতে দেশের বেশির ভাগ লোক এই ভাষা পড়তে পারে। মধ্যযুগের শাসকদের সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতার নীতি উর্দুর (আরবি ও ফার্সির সঙ্গে হিন্দির মিশ্রণে জাত) জন্ম দিয়েছিল। আজ আমাদের লক্ষ্য বিচ্ছিন্নতা নয়, সাংস্কৃতিক সমন্বয়। নাগরী লিপি গ্রহণের অর্থ সেই পথে পদক্ষেপ।

কমিউনিস্ট পার্টি ভাষা সম্পর্কে একটি খসড়া প্রস্তাব রচনার জন্য একটি কমিশন গঠন করেছিলেন। এই খসড়া প্রস্তাব আলোচনার সময় অনেকেই এই প্রস্তাবের সমালোচনা করেন। অমৃত রাই লেখেন ঃ 'খসড়া প্রস্তাবটি অত্যন্ত অন্যায়ভাবে রাহুলজিকে বিশ্রী অপবাদ দিয়েছে। তাঁকে ট্যান্ডনের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। তাঁকে বৃহৎ বুর্জোয়া ও সামন্তদের অনুগত ভৃত্য বলা হয়েছে। আমি এই মন্তব্যকে যুক্তিহীন বলে মনে করি। ভাষা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি গণতান্ত্রিক হিন্দি লেখকদের থেকে আমাদের ইতিমধ্যেই বিচ্ছিন্ন করেছে। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি যদি আমাদের মধ্যে থাকতে দিই, তবে আমরা গণতান্ত্রিক হিন্দি সাহিত্য আন্দোলনের পুরোধা হয়েও প্রগতিশীল লেখক সম্মেলনের কবর খুঁড়ছি বলা যেতে পারে। রাহুলজির দৃষ্টিভঙ্গি মূলত সাধারণ গণতান্ত্রিক হিন্দি লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গি। ....রাহুলজিকে প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক মানুষের সঙ্গে যুক্ত করে আমাদের কোনো লাভ হবে না। তাতে প্রতিপক্ষেরই সুবিধা হবে। ....ভাষার প্রশ্নে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ নেতিবাচক। ভাষা সম্পর্কিত বিতর্কে আমরা যোগ দিইনি, তোতাপাখির মতো কিছু মার্কসীয় বুলি আউড়েছি মাত্র। আমি মনে করি যে, খসড়া প্রস্তাবে রাহুলজি সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা অত্যন্ত মানহানিকর। যদিও একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, উর্দু সম্পর্কে রাহুলজির দৃষ্টিভঙ্গিতে সাম্প্রদায়িকতার বীজ আছে। কিন্তু তারও ঐতিহাসিক কারণ আছে।

'উর্দুকে একটি আঞ্চলিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া সম্পর্কে কিছু বলা সহজ

নয়, কারণ 'আঞ্চলিক ভাষা' কথাটির সঠিক অর্থ স্পষ্ট নয়। হিন্দি ও উর্দুর ভিত্তি এক, ব্যাকরণ ও মূল শব্দ ভাণ্ডার এক। এই দুই ভাষার বিস্তারের ক্ষেত্রও এক। এ পর্যন্ত 'আঞ্চলিক ভাষা' শব্দটির সঠিক অর্থ নির্ণয় করার চেষ্টাও করা হয়নি। সুতরাং উর্দুকে— আঞ্চলিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতির দাবির মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ আছে। তাই কমিউনিস্ট পার্টি এই দাবির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে পারে না।

'বস্তুত হিন্দি-উর্দু বিবাদের মূল ছিল অনেক গভীরে। উত্তরপ্রদেশ ও বিহার এই বিবাদের কেন্দ্র ও শিকার দুইই। হিন্দি ও উর্দুকে এই দুই রাজ্যের রাজ্যভাষা করার সংগ্রাম এখনও চলছে। রাহুলের সময়েও এই সংগ্রাম চলছিল। প্রশাসন ও অন্যান্য অনেক কাজে উর্দুর স্থান অধিকার করার জন্য হিন্দিকে অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছিল, একথা ইংরেজ শাসনের সঙ্গে পরিচিত সব মানুষ জানেন। গান্ধিজির সময়ে কিছুকালের জন্য এই সংঘাত ছিল হিন্দি, উর্দু ও হিন্দুস্থানির মধ্যে। স্বভাবতই রাহুল হিন্দির পক্ষে ছিলেন। তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল, 'নাগরী লিপি সহ সংস্কৃতনিষ্ঠ হিন্দিই ভারতের রাষ্ট্রভাষা হতে পারে।' তিনি জানতেন যে হিন্দিকে ইংরেজির সঙ্গে যুঝতে হবে। উর্দু ও হিন্দুস্থানির সঙ্গে তো লড়াই চলছিলই। অতএব তিনি যখন সংস্কৃতনিষ্ঠ হিন্দি ও নাগরী লিপির কথা বলছিলেন, তখন তিনি ইংরেজির শোষণের বিরুদ্ধেও বিশেষভাবে সাবধান করে দিয়েছিলেন। 'ইংরেজি পড়ে চাকরির পেছনে যারা ছুটছে তারা হিন্দির ব্যাপারে নাক সিঁটকাতে পারে, নয়তো হায় হায় করতে পারে। ভারতের এই মাথামোটা হঠকারীদের দ্বারা নয়, পূর্ণ সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার দ্বারাই এই শোষণের অন্ত হবে।'

রাহুল দেখতে পেয়েছিলেন যে, উর্দুকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনের পেছনে সাম্প্রদায়িকতা কাজ করছিল। আজও সেই অবস্থা পালটায়নি। তাই তাঁর পার্টি-কমরেডদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন 'সমাজতন্ত্র কায়েম করার জন্য জোটবদ্ধ কমরেডদের বলব যে, দুটি ভাষা ও দুটি লিপি ভারতের দুই প্রদেশের (উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাব) বাইরে নিয়ে গিয়ে সারা ভারতে ছড়িয়ে দেওয়ার অর্থ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার মূল মজবুত করা। সাম্প্রদায়িকতাকে আমাদের ভুলে যেতে হবে। হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, পারসিক ধর্ম মানা না মানা ব্যক্তিগত ব্যাপার। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ধর্মের জাঁকিয়ে বসার কোনো অধিকার থাকা উচিত নয়।'

এই সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা যাতে না বাড়ে এবং রাষ্ট্রীয় ঐক্য যাতে ঘনীভূত ও সংগঠিত হয়, সেইজন্য রাহুলের মনে হয়েছিল যে 'উত্তরপ্রদেশে ও পাঞ্জাবে উর্দু সরকারি ভাষা হয়ে থাকতে পারে যদি উর্দু আরবি লিপিতে না লিখে নাগরী লিপিতে লেখা হয়। সেজন্য নাগরী লিপিতে উর্দু শিক্ষার ব্যবস্থাও করতে হবে।' একথা স্পষ্ট যে যদি উর্দুর পেছনে সাম্প্রদায়িকতা না থাকে এবং যদি একথা মেনে নেওয়া হয় যে উর্দু রচনার ক্ষেত্রে হিন্দুদেরও সেই অধিকার আছে যা মুসলমানদের আছে, তবে ফার্সি-আরবির অত্যধিক ব্যবহার এবং আরবি লিপিতে লেখার আগ্রহ ছেড়ে উর্দুকে নাগরী লিপিতে লেখা উচিত।' এই কথা মেনে নিলে উর্দুর প্রতি সন্দেহের কোনো কারণ থাকে

না। উর্দু ও হিন্দির মধ্যে বিবাদেরও কোনো কারণ থাকে না। হিন্দি উর্দুর একতা রাষ্ট্রীয় একতার জন্যও প্রয়োজন।

রাহুল সংখ্যালঘুদের ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় একমত ছিলেন। উর্দুকে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা দিল্লির জামিয়া মিলিয়ার মতো সংস্থায় শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে আরবি লিপিকে ব্যবহারের স্বীকৃতি দিতে তিনি রাজি ছিলেন। কিন্তু যদি কেউ চায় যে, সে উর্দু শিখবে, রাজ্যের ভাষা শিখবে না, তবে তার জন্য সোভিয়েত রাশিয়ায় যে ব্যবস্থা আছে, তাকে সেই ব্যবস্থাই মেনে নিতে হবে। সোভিয়েত দেশে কোনো তাজিক যদি উজবেকিস্তানের ভাষা না শেখে, তবে তাকে চাকরির জন্য তাজিকিস্তানে যেতে হবে। ঠিক ঐভাবে উর্দু-অলাকেও নিজের জন্য কোনো জায়গা খুঁজে বার করতে হবে। এর তাৎপর্য হল এই যে, ভারতের ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার দায়িত্ব তাকে মেনে নিতে হবে। প্রশাসনিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে এই ভাষা চিরকালের জন্য ভারতকে বাঁটোয়ারা করে বসে থাকবে, এই পরিস্থিতি মেনে নেওয়া যায় না।

হিন্দুস্থানির মাধ্যমে দুইয়েরই স্বীকৃতি দেওয়া যেতে পারে, একথাও মানা চলে না। অবশ্য হিন্দুস্থানি যদি নাগরী লিপিতে লেখা হয়, তাহলে আর কোনো আপত্তি থাকে না। নাগরীর সঙ্গে আরবি লিপিকে রাষ্ট্রভাষার লিপি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে তা যদি হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী এবং কলকাতা থেকে অমৃতসর পর্যন্ত সব মানুষের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, তবে বাংলা, তেলেগু, কন্নড়, মালয়ালম, মারাঠি প্রভৃতির ওপর আরো দুটি ভাষা ও দুটি লিপি কোটি কোটি মানুষকে বাধ্যতামূলকভাবে শেখাতে হবে। তা দুঃসাধ্য। তাতে শ্রম ও সময়ের অপব্যয়ই হবে।

ভারতের প্রাদেশিক ভাষার একশোটি শব্দের মধ্যে ষাট-সত্তরটির সঙ্গে সংস্কৃত শব্দের সাদৃশ্য ও পূর্ব পরিচয়ের জন্য রাষ্ট্রভাষা হিসেবে হিন্দি স্বাভাবিক ভাষা। তার তুলনায় প্রতি একশোটি শব্দের মধ্যে ষাট-সত্তরটি অপরিচিত আরবি-ফার্সি শব্দে ভারাক্রান্ত উর্দু ভারতীয় ভাষা থেকে অনেক দূরে। এই সব ভেবেই রাহুল এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে 'উর্দু মেনে নিলে তা বড় বেশি দামি সওদা হবে।'

বর্তমান ভারতে যা ঘটেছে, সেদিকে দৃষ্টিপাত করলে রাহুলের কথার তাৎপর্য বোঝা যাবে। সাম্প্রদায়িকতার যত বেড়া আছে, তার মধ্যে ধর্মের পরেই সব চেয়ে শক্ত বেড়া হল ভাষার বেড়া। যেখানে ধর্ম ও ভাষার দুই বেড়াই থেকে যায়, সেখানে সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্ত হওয়া প্রায় অসম্ভব। রাহুল ভাষার এই শক্ত বেড়াই ভাঙতে চেয়েছিলেন। উর্দু ভাষাই যদি নাগরী লিপিতে লেখা হয় তাহলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান সহজ হবে; কেননা হিন্দি-উর্দুর শব্দ ভাণ্ডারের মিলের জন্য তাদের পার্থক্য অনেক কমে যাবে। হিন্দি-উর্দুর লিপিগত বেড়াটাই সবচেয়ে বড় বেড়া। যদি এই আপত্তি করা হয় যে, হিন্দী-উর্দু দুইই নাগরীর বদলে আরবিতে লিখলেও তো সমস্যার সমাধান হতে পারে তার উত্তর হল : (১) আরবি ব্যবহার করত এমন অনেক দেশও এই লিপির দুরূহতার জন্য এই লিপিকে বর্জন করেছে। (২) প্রাচীন ভারতের কথা মনে রেখেই

রাহুল নাগরী লিপির কথা বলেছিলেন। ভারতের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামীণ মানুষ নাগরী লিপি ব্যবহার করে থাকে। ভারতের জাতীয় ঐক্যই ছিল তাঁর চিন্তার মূলমন্ত্র। নাগরী লিপিতে লেখা হলে উর্দুকেও তিনি সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পক্ষে ছিলেন।

রোমান লিপি প্রবর্তন করারও বিরুদ্ধে ছিলেন তিনি। রাহুল মনে করতেন নাগরী লিপি রোমান লিপির চেয়েও অধিকতর বৈজ্ঞানিক। কিছুটা সংস্কার করে নিলে টাইপ ও প্রেসের জন্যও নাগরী লিপি রোমান লিপির চেয়ে বেশি উপযোগী হতে পারে। নাগরী লিপির মনোটাইপ ও লাইনোটাইপের বহুল ব্যবহার থেকে তা বোঝা যায়।

রাহুল বিশ্বনাগরিক ছিলেন। বিদেশি ভাষার প্রতি তাঁর কোনো বিরাগ ছিল না। তিনি নিজে কম করেও ছত্রিশটি ভাষা জানতেন। তিনি জানতেন যে, বিশ্ব রাজনীতিতে ভারতের প্রতিষ্ঠার জন্য এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখার জন্য বিদেশি ভাষা শেখা দরকার। কারণ 'আমাদের দেশের রাষ্ট্রদূত যে দেশে যাবেন, সেখানে শুধু রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করলে তিনি সফল হতে পারবেন না। তাঁকে ভারতের সংস্কৃতিরও প্রতিনিধি হতে হবে। একমাত্র তাহলেই তিনি সফল রাষ্ট্রদূত হতে পারবেন।'

রাহুলের সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা মাতৃভাষা সম্পর্কে তাঁর অভিমত প্রভাবিত হয়েছিল। তাঁর দৃষ্টি ছিল জনতার ভাষার দিকে। রাহুলের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, 'চোখ বুজে সংস্কৃত অথবা আরবি-ফার্সি থেকে হাজার শব্দ ঋণ নেওয়ার পরও আজ আমাদের হিন্দি ও উর্দুতে ভাবপ্রকাশের ও কমনীয়তার যে দারিদ্র্য রয়েছে তার বড় কারণ হল সাধারণ মানুষের লৌকিক ও চলতি ভাষা থেকে শব্দ আহরণ না করা।'

রাহুল বলতেন, 'মাতৃভাষার সংজ্ঞা হল : যে ভাষা একেবারে নিরক্ষর ও শিশু বললেও ব্যাকরণের ভুল হয় না, তাই মাতৃভাষা।' মাতৃদুগ্ধের সঙ্গেই মাতৃভাষা সন্তানের কাছে আসে। মাতৃভাষাকে রাহুল জনপদীয় ভাষা বলে অভিহিত করেছেন। জনপদীয় ভাষা বলেছেন এইজন্য যে, হিন্দিতে 'ন্যাশনালিটি' (Nationality) শব্দটির কোনো প্রতিশব্দ নেই। বহু ভাষাভাষী এই দেশে রাষ্ট্র শব্দে গোটা দেশকে বোঝায়। 'ন্যাশনালিটির' প্রতিশব্দ হিসেবে হিন্দিতে 'জাতি' ও 'জনজাতি' শব্দ প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু এতে ভুল হতে পারে। কারণ 'জাতি' ও 'জনজাতি' এই দুটি শব্দেরই নানারকম ব্যবহার হতে পারে। উর্দুর কৌম শব্দটিরও একই অসুবিধা। সুতরাং রাহুল 'জনপদ' শব্দটি চালু করেন। রাহুলের অর্থে 'জনপদীয় ভাষা' কথাটি ব্যবহার করলে তার অর্থ দাঁড়ায় বিভিন্ন জনপদের (Nationality) মাতৃভাষা, যেমন ব্রজ, মল্লিকা, অবধী ইত্যাদি। রাহুল চেয়েছিলেন যে, শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা (জনপদীয় ভাষা)। মাতৃভাষা শিক্ষার মাধ্যম না হয়ে অন্য কোনো ভাষা যদি শিক্ষার মাধ্যম হয়, তাহলে বেশ কয়েকটি বছর সেই ভাষা শিখতেই কেটে যাবে। এতদিন তাই হয়ে আসছে। মাতৃভাষা শিক্ষার মাধ্যম হলে নতুন শিক্ষার্থীকে শুধু লিপিটি আয়ত্ত করতে হয়। তাতে বিশেষ সময় লাগে না। তারপরই তাকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষিত করে তোলা চলে। মাতৃভাষার

মাধ্যমে দশ-বারো বছরের শিক্ষার্থী যতটা শিক্ষালাভ করতে পারে, অন্য ভাষাশিক্ষার মাধ্যম হলে ততটা শিক্ষালাভ করতে হায়ার সেকেণ্ডারি পর্যন্ত যেতে হয়। সোভিয়েত রাশিয়ায় মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের নীতিকে রাহুল মডেল হিসেবে নিয়েছিলেন।

রাহুলের সাহিত্য নিবন্ধাবলি পড়লে একটি সত্য স্পষ্টভাবে ধরা দেয়—তিনি হিন্দির প্রতি সমর্পিত-প্রাণ ছিলেন। একটি সংকল্প নিয়ে তিনি হিন্দি সাহিত্যের সেবা করেছিলেন। বিশ শতকের প্রারম্ভিক পর্বে হিন্দি সাহিত্যসেবীরা যা অনেক দূরের স্বপ্ন বলে মনে করতেন, আজকাল হিন্দির বিকাশের মধ্য দিয়ে সেই সংকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। হিন্দি স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রভাষা হয়েছে। রাহুলের এই আশা ছিল যে, হিন্দির বিকাশ যদি আশানুরূপ হয়, তবে বিশ্বের কোনো ভাষা থেকে হিন্দি পিছিয়ে থাকবে না। রাহুলের কাছে হিন্দি শুধু সাধ্যই নয়, সাধনও ছিল। তিনি চেয়েছিলেন দেশের ঐক্য; চেয়েছিলেন দেশের সব ভাষা ও উপভাষার স্রোত থেকে শব্দ, ধ্বনি ও অর্থের শক্তিকে আত্মসাৎ করে এক সমৃদ্ধ হিন্দি ভাষা সৃষ্টি করতে হবে, যাতে এই প্রাচীন দেশের ইন্দ্রধনু -সংস্কৃতির সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য আহৃত হবে, ভারতের সব প্রদেশ থেকে প্রবাহিত নদী ও শাখানদী হিন্দি ভাষার সমুদ্রে মিশে যাবে। সংস্কৃত এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ভাষা, উপভাষা ও বিদেশি ভাষাশিক্ষার জন্য অলৌকিক তপস্যা করেছিলেন রাহুল। সুতরাং ভারতের রাষ্ট্রভাষা কী হবে, শিক্ষার মাধ্যম কী হবে, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ভাষা সম্পর্কে যে অন্তর্দৃষ্টি ও মানসিক উদারতা থাকা দরকার, তা একমাত্র রাহুলেরই ছিল। ট্যান্ডন, আজাদ, নেহরু ও কমিউনিস্ট পার্টির তা ছিল না। তিনি জানতেন, যে-ভাষার সংস্কৃতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নেই, সেই ভাষার পক্ষে দেশের জাতীয় ভাষা হয়ে গড়ে ওঠার কোনো সম্ভাবনাই নেই। তাই তিনি তৎসম সংস্কৃতনিষ্ঠ হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে মত দিয়েছিলেন এবং মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার প্রস্তাব করেছিলেন। এ বিষয়ে রাহুলের যে সত্যদৃষ্টি ছিল তার প্রমাণ বর্তমানকালের সংস্কৃতনিষ্ঠ হিন্দি—যা রেডিও ও টিভিতে প্রচারিত হয় এবং সর্বত্রই অনায়াসবোধ্য। হিন্দি ভাষা যে সমগ্র ভারতের ভাষা ও উপভাষাকে নিয়ে সমুদ্র হতে যাচ্ছে তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই।

হিন্দি সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনের প্রথম দিন সকালবেলা বিষয় নির্বাচনী সমিতির অধিবেশন হয়। সেখানে রাহুল তাঁর পরিভাষা নির্মাণ সম্পর্কিত প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। রাহুল স্বয়ং পরিভাষা নির্মাণের কাজ গ্রহণ করলে পুরুষোত্তম দাস ট্যান্ডন এই প্রস্তাব গ্রহণে রাজি ছিলেন। রাহুল এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পরিভাষা নির্মাণের কাজে তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু ট্যান্ডন ঢিলেঢালা লোক। যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে তাঁর অনেক সময় লাগত। মনস্থির করতে পারতেন না। সেই কারণে অনেকে তাঁর নাম দিয়েছিলেন Confusion দাস। ট্যান্ডনের ইচ্ছা ছিল—প্রথমে প্রশাসনিক পরিভাষা তৈরির কাজ হাতে নেওয়া হোক। কেননা উত্তরপ্রদেশের স্পিকার হিসেবে তাঁর প্রশাসনিক পরিভাষার প্রয়োজন হচ্ছিল। রাহুলও এ বিষয়ে ট্যান্ডনের সঙ্গে একমত হয়েছিলেন। *শাসন শব্দকোষ* তৈরির জন্য তিন হাজার টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল।

রাহুল প্রথম ভেবেছিলেন, কয়েক হাজার পারিভাষিক শব্দ তৈরি করতে পারলেই *শাসন শব্দকোষ* সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। কিন্তু শেষপর্যন্ত *শাসন শব্দকোষ*-এর জন্য তাঁকে পনেরো হাজার শব্দ তৈরি করতে হয়েছিল। কিন্তু এককভাবে এই কাজ করা কঠিন ছিল। পরিভাষা তৈরির কাজে তিনি বিদ্যানিবাস মিশ্র ও প্রভাকর ম্যাচওয়ের সহায়তা পেয়েছিলেন। প্রশাসনিক পরিভাষা শব্দ তৈরির কাজও দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল। ১৯৪৮-এর মে মাস *শাসন শব্দকোষ* সম্পূর্ণ হয়ে গেল। *শাসন শব্দকোষ* দেখে পরিভাষা উপসমিতির বিশ্বাস হল যে, অন্যান্য বিষয়ে পরিভাষা তৈরির কাজেও অগ্রসর হওয়া যেতে পারে। অতএব বিজ্ঞানের পরিভাষা তৈরির জন্য পাঁচ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হল।

কিন্নর দেশে

শাসন শব্দকোষ তৈরি হওয়ার আগে থেকেই মন পালাই-পালাই করছিল। *শাসন শব্দকোষ* মুদ্রণের জন্য প্রস্তুত হওয়ার পর মনকে আর বেঁধে রাখতে পারলেন না রাহুল। কনৌর অথবা কিন্নর দেশে চলে গেল মন। স্বাধীন ভারতে ২২টি দেশীয় রাজ্যকে একত্রিত করে হিমাচল প্রদেশ সংগঠন করা হয়েছিল। এই হিমাচল প্রদেশেই কনৌর বা কিন্নর দেশ।

১৯৪৮-এর ৩ মে রাহুল কিন্নর দেশে যাত্রা করলেন। প্রয়াগ থেকে কালকা হয়ে সিমলা। কয়েকদিন সেখানে থেকে তিনি কিন্নরদেশের পথ ধরলেন। হেঁটে ২১ মাইল গিয়ে সরাহন পৌঁছোলেন। সরাহন থেকে আরো ২৩ মাইল চলার পর নচার। নচারে সঘন দেবদারু বন। সেখান থেকে কিছুটা উতবাইয়ের পর শতদ্রুর পুল পেরিয়ে মেঘে ঢাকা রাস্তা দিয়ে বেশ কিছুটা চড়াইয়ে যাওয়ার পর এক ডাকবাংলোতে বিশ্রাম নিতে হল। তারপর আবার যাত্রা শুরু করে ১২৫ মাইল পেরিয়ে উড়নীতে পৌঁছোলেন। উড়নীতে আসার অর্থ হল প্রকৃত কিন্নর দেশে পৌঁছোনো।

২০ মে কিন্নর দেশের চিনী পৌঁছে জঙ্গলাতের ডাকবাংলোয় উঠলেন। রাহুল স্থির করেছিলেন, তিনি ৭ আগস্ট পর্যন্ত চিনীতে থাকবেন। চিনীতে পুণ্যসাগর জুটে গেল রাহুলের সঙ্গে। রান্নাবান্নার ভার সে নিজের হাতে নেওয়ায় রাহুলের খাওযা-দাওয়ার চিন্তা দূর হল। লোকটি কিন্নর। কিন্নররা অধিকাংশই বৌদ্ধ। *মধুর স্বপ্ন* নামে একটি বই অনেকদিন রাহুলের মাথায় ঘোরাফেরা করছিল। তাঁর আশা ছিল চিনীতে এসে তিনি *মধুর স্বপ্ন* শেষ করে ফেলতে পারবেন।

কনৌরের লোকগীতির দিকেও রাহুলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল। তিনি এখানকার লোকগীতি সংগ্রহ করছিলেন। চিনীতে নানা ধরনের লোকের সঙ্গে পরিচয় হয় রাহুলের। প্রথমত চম্বা নিবাসী পরমানন্দ চেতন। রামানন্দের শিষ্য পরমানন্দ জাতিতে নেপালি। পাহাড়িদের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে তিনি শেষ পর্যন্ত কিন্নরিদের ফেরে পড়ে যান। কিন্নর দেশ থেকে তাঁর এখন অন্যত্র যাওয়ার উপায় নেই। এখানকার সুলভ মদ্য তিনি প্রায় বিনা দামেই পেতেন। ঘুমক্কড় পরমানন্দ চেতন এখন সুরাসুন্দরীর মোহে আসক্ত।

আমদো নামে আর একজন ঘুমক্কড়ের সঙ্গে রাহুলের দেখা হয়েছিল। সে এক যুগ তিব্বতে কাটিয়েছিল। এখন তিব্বত ও ভারত তার পায়ের নীচে। একজন মোঙ্গল ভিক্ষুর সঙ্গেও তাঁর দেখা হয়েছিল। ত্রিশ বছর আগে সে কমিউনিস্ট বিপ্লবের ভয়ে লাসার উপুংগ মঠে এসেছিল। সেখানে কিছুদিন পড়াশোনা করে সে তিব্বতে ও ভারতে চক্কর দিতে থাকে। চক্কর দিয়ে তার ঘুমক্কড়ীর বাসনাই শুধু পূর্ণ হয়নি, তার জীবিকাও এতে চলত। চতুর্থ ঘুমক্কড় ছিলেন নেপালি রঙ্গাচার্য্যজি, তিনি রামানুজি জগৎগুরুর শিষ্য ছিলেন। তাঁর জন্ম হয়েছিল পূর্ব নেপালের ধনকুটাতে। তারপর জীবিকার অন্বেষণে তিনি ব্রহ্মদেশে যান। শেষপর্যন্ত তাঁকে ঘুমক্কড়ীতে পেয়ে বসে এবং ঘুরতে ঘুরতে মাদ্রাজের দিকে গিয়ে রামানুজি সাধু হয়ে যান। তিনি রাহুলকে ওখানকার অনেক পরিচিত স্থানের কথা বলতেন। কিন্তু আজকাল তিনি অধিকতর সময় মৌনী হয়ে ছিলেন এবং সাধারণ মানুষ তাঁকে 'মোনেরোলা' বলত, যার অর্থ ছিল মৌন ফকির। তিনি চক্কর না কেটে থাকতে পারতেন না। নানা কঠিন পথ দিয়ে একবার নয় পাঁচবার তিনি কৈলাস ও মানসসরোবর গিয়েছিলেন। ১৯৫৩-তে রাহুল কাঠমান্ডু গিয়েছিলেন। সেখানেও কিন্নর দেশ থেকে পাহাড়িরা আসত।

এখানকার পাহাড়ের সব প্রাচীন স্থানকেই পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের স্থান বলে ধরে নেওয়া হয়। কিন্নর দেশের দেবতা মাটির, পাথরেরও নয় আর নিষ্ক্রিয়ও নয়। তারা বিমানেই ঘুমোয় এবং বিমানেই বেড়াতে বেরোয়। বিমান হল ছোটো খোলা পালকির মতো। যার ভেতরে চার-পাঁচ হাত লম্বা ভূর্জবৃক্ষের সোজা শাখা ফেলে দেওয়া হত, যা স্প্রিং-এর মতো ইশারা দিলে নড়াচড়া করত। এই বিমানের মাঝখানে সরু কঞ্চি দিয়ে কিছুটা উঁচু জায়গা তৈরি করা হত। তার ওপর রেশমি কাপড়ে ঢাকা রূপো অথবা রূপো ও সোনার মুখ লাগিয়ে দেওয়া হত। এই হল কিন্নর দেশের দেবতা। গ্রামের সুখ-দুঃখ ও অন্যান্য সব কাজের জন্য দেবতার প্রত্যাদেশ নিতে হত। দেবতা কখনো কারো মাথার ওপরে এসে কথা বলত, কখনো চিঠি দিলে তার সিদ্ধান্ত জানা যেত, কিন্তু বেশির ভাগ সময়ই দেবতা তার বাহনের কাঁধের ওপরে চড়ে বিমানে হেলিয়ে সংকেতে কথা বলত। কেউ প্রশ্ন জিগ্যেস করলে বিমান যদি তার দিকে হেলত তবে তার অর্থ ছিল—হ্যাঁ, যদি অন্যদিকে ঝুঁকত, তবে তার অর্থ—না। আর যদি ওপরে-নীচে ওঠানামা করত তবে তার অর্থ—খুব ভাল। আর যদি অত্যধিক ওঠানামা করত তবে তার অর্থ—দেবতা নারাজ। চিনীর দেবতার নাম নরেনস (নারায়ণ)। দেবতা অত্যন্ত বিত্তশালী। গ্রামের সব চেয়ে ভাল খেত তার। তাছাড়া সে যখন চাইত নতুন কর উত্তল করতে পারত আর দান-দক্ষিণা যা মিলত, তা তো আলাদা। মাঝে মাঝে দেবতাকে উৎসব করতে হত, তাতে দেবতার যা আমদানি হত তা প্রসাদ বিতরণ করতেই খরচ হয়ে যেত। কখনো কখনো দেবতাকে বনভোজন করতে যেতে হত। সে সময় তার সঙ্গে যারা বাজনা বাজাত, তারা ছাড়াও তরবারি নিয়ে পুরো পল্টন তার সঙ্গে যেত। চিনীতে লিয়োদের (হরিজন) নিজেদের আলাদা বিষ্ণু মন্দির ছিল, যাতে তিব্বতি দেবতা নামশু ছিল বলে রাহুলের মনে হয়েছিল।

চিনীতে ডিম সুলভ ছিল না, কিন্তু পাওয়া যেত। এ সময়ে ডায়বেটিজের জন্য রাহুলকে ইনসুলিন নিতে হত। ৯ জুন তিনি লিখেছিলেন—প্রতি বছরে দুই হাজার পৃষ্ঠা লেখার পরিকল্পনা ঠিক রাখতে হবে। কাজ না হলে বেঁচে থেকে লাভ কী?

চিনী থাকাকালীন পরিভাষার কাজের দিকে দৃষ্টি রাখতে হয়েছিল। অনেকদিন পরে বিদ্যানিবাস ও মাচওয়েজির চিঠি কলকাতা থেকে এল। সুনীতিবাবু তাঁদের কাজের প্রশংসা করেছিলেন এবং তাঁদের কাজে সহযোগিতা করার ইচ্ছা প্রকাশ করে চিঠি দিয়েছিলেন। *শাসন শব্দকোষ* টাইপ করা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু প্রেসে পাঠানোর আগে তা একবার দেখে নেবার দরকার ছিল। তাদের দুজনকে চিনীতে ডেকে পাঠানো সম্ভব ছিল না। তবে রাহুল একমাসের মধ্যে প্রেস কপি সংশোধন করে দিয়েছিলেন।

তিব্বতের সীমান্তে

কিন্নর দেশে বর্ষা খুব কম হত। তাই সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ার কোনো অসুবিধা ছিল না। রাহুল স্থির করেছিলেন, তিনি কিন্নর দেশের প্রান্তে ভারতে অবস্থিত অন্তিম গ্রাম নমগ্যা পর্যন্ত ঘুরে আসবেন। তিব্বত-হিন্দুস্থান সড়ক ছিল প্রায় সমতল—যা সিমলা থেকে তিব্বত সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। নমগ্যা থেকে পংগী, রারংগ, লিপ্পা হয়ে কনমের দিকে যাত্রা করেন রাহুল। এ পথটা কেবল উতরাই আর উতরাই। কনমে পৌঁছে তিনি ডাকবাংলোতে বিশ্রাম নিলেন। কনম বিশ হাজার থেকে উনিশ হাজার সত্তর ফুট পর্যন্ত উঁচু। সিমলা থেকে কনম এর দূরত্ব ১৭০ মাইল। কনমের কঞ্জুর দেবালয়ে ভারতীয় গ্রন্থের দুটি বিরাট সংগ্রহ—কনজুর ও তনজুর তিব্বতি ভাষায় আছে। এবার কনমকে বেশ ভালো করে দেখলেন রাহুল। কনম-এর দেবতা ডবলা খুব ধনী ও শক্তিশালী, কথাবার্তা বেশ মজার। চিনীর নীচে কোটীর দেবী সারা কনৌরের মহামহিম দেবী। সেখানে শত শত পাঁঠা বলি হয়। লোকেরা বৌদ্ধধর্ম মানে না। যেহেতু মহাদেবী চিরকুমারী তাই তাঁর ক্রোধ খুব বেশি।

কনম তিব্বতের এক প্রসিদ্ধ লামা লোচওয়া হুন-ছেন্-জড়পোর (রত্নভদ্র—অনুবাদকের) গদি ছিল। রত্নভদ্র একাদশ শতাব্দীর লোক ছিলেন। তিনি তিব্বতের সবচেয়ে বিখ্যাত পণ্ডিতদের অন্যতম। সংস্কৃতের অনেক গুরুগম্ভীর গ্রন্থকে তিনি তিব্বতিতে অনুবাদ করেছিলেন। এই লোচওয়ার মঠে কিছু ভিক্ষু ছিলেন, যাঁদের অনেকেই তিব্বত থেকে পড়াশোনা করে এসেছিলেন। কনম হয়ে স্পু। স্পু বারশো ফুট উঁচু। স্পু বড় গ্রাম। এখানকার প্রত্যেকেরই মাতৃভাষা তিব্বতি। এখানে জার্মান মিশনারিরা এক ছোটো গির্জা বানিয়েছিলেন। এখানে কয়েকটা বৌদ্ধ মন্দিরও আছে। এখানে এইসব মন্দিরে সারিপুত্ত মোদ্গল্যায়ন-এর মূর্তি ছিল। তাছাড়া ছিল মৃন্ময় অবলোকিতেশ্বর ও দারুময় বোধিসত্ত্ব প্রতিমা। মন্দির বেশ কিছু শতাব্দী আগে তৈরি হয়েছিল। অষ্ট সহস্রিকা প্রজ্ঞাপালিকার হাতে লেখা পুঁথির চিত্র ভারতীয় শিল্পীই করেছিলেন বলে মনে হয়। গ্রামের অন্য মন্দিরটির নাম ডোংগঞ্জর। এখানে কোটি কোটি

'ওঁ মনি পদ্মে হুম্' মন্ত্র লিখে বেলুনাকার কাগজে ভরে রাখা হত। শ্রদ্ধাশীল মানুষেরা এসে বেলুনাকার কাগজ ঘুরিয়ে পুণ্যলাভ করত। স্পু-র লোকদের এ সময়েও বিশ্বাস ছিল যে, দেশ ইংরেজরাই শাসন করছে।

নম্গ্যা (১৮০০ ফুট): স্পু থেকে আট মাইল দূরে শতদ্রুর বাঁয়ে ভারতের শেষ গ্রাম নম্গ্যা। এখান থেকে দু মাইল এগিয়ে গেলে একটা শুকনো মতো নালা আছে, যা তিব্বত ও ভারতের সীমা। এখন তা চীন ও ভারতের সীমা। বাইশ তারিখে স্পু থেকে রওনা হয়ে দুপুর নাগাদ নম্গ্যা পৌঁছে গেলেন রাহুল। ভালো রাস্তা, ঘোড়াও ছিল। শুকনো পর্বতমালার মধ্যে নম্গ্যাকে এক টুকরো ইন্দ্রপুরীর মতো মনে হল। গাঁয়ের আশেপাশের জমি সবুজে ঢাকা। খেতের সাদা যব, খুবানি, আখরোটের গাছ সবুজ পাতায় ঢাকা। বর্ষা কম হলেও এখানকার আঙুর খুব মিঠে। এখানে প্রায় প্রত্যেক পরিবারে হস্ত লিখিত বৌদ্ধ গ্রন্থ পাওয়া যায়। নম্গ্যায় ত্রিশ ঘর মানুষের বাস। পাণ্ডব-বিবাহ জনসংখ্যা বাড়তে দেয়নি। নয়তো পরিবারের সংখ্যা আরও বেশি হত।

নম্গ্যাবাসীদের মন থেকে কাজাগদের ভয় এখনো চলে যায়নি। মধ্যবিত্ত ও ধনী কাজাগ বলশেভিক বিপ্লবকে মেনে নিতে পারেনি। তারা তাদের জন্মভূমি ত্যাগ করে সিঙকিঙায়-এ (চীনী তুর্কিস্তান) চলে আসে এবং লুটপাট করতে করতে সেখানে ঢুকে পড়ে। পশ্চিম তিব্বতের কিছু গুম্ফা লুঠে নেয়। তারা নম্গ্যার দিকে আসছে এই খবর পৌঁছে গিয়েছিল। নম্গ্যার মানুষের পক্ষে তাদের প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল না। শেষ পর্যন্ত কাজাগরা আসেনি।

রাহুল নম্গ্যা থেকে স্পু হয়ে কনমে ফিরে এলেন এবং ২৮ জুন চিনীতে ফিরলেন। চিনী থেকে ফিরে এসেই আবার পরিভাষাব কাজে হাত দিলেন। চিনীতে থাকার সময়ই *কিন্নর দেশ* প্রায় শেষ কবে এনেছিলেন। কিন্তু *আজকের রাজনীতি* ও *ঘুমক্কড় শাস্ত্র* কিছুতেই মাথা থেকে কাগজে নিয়ে আসতে পারছিলেন না। উর্দুর কথাটাও তাঁর মাথায় ঘোরাফেরা করছিল। উর্দু ভাষাকে তিনি অমূল্য নিধি বলে মনে করতেন। অতএব উর্দু নাগরী অক্ষরে লেখা হবে। হিন্দি ভাষী জগৎ উর্দু পড়তে পারবে এবং তা থেকে লাভবান হতে পারবে—একথা তিনি ভুলতে পারছিলেন না। ১৯৪৭-এর সাহিত্য সম্মেলনে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, ষোলোটি উর্দু বইকে নাগরী অক্ষরে ছাপা হবে। কিন্তু এই কাজ এগোয়নি। গোয়েলজি উর্দু কবিতার ওপর একটা সুন্দর বই *শের ও শায়রী* লিখেছিলেন, যার ভূমিকা লিখেছিলেন রাহুল। এই বৃহৎ গ্রন্থটি লা জার্নাল প্রেস থেকে ছাপা হয়েছিল। হিন্দিভাষীরা উর্দু কবিতা যে কতটা ভালোবাসে তা বোঝা গেল এই থেকে যে এই বইয়ের প্রথম সংস্করণ এক বছরের মধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই ধরনের কিছু বই নাগরী অক্ষরে ছাপাটাই যথেষ্ট বলে মনে করেননি রাহুল। তাঁর ইচ্ছা ছিল উর্দু সাহিত্যের মূল্যবান গদ্য ও পদ্য নাগরী অক্ষরে ছাপা হোক। নাগরী লিপি উর্দু ভাষার নিজস্ব লিপি হওয়া প্রয়োজন বলে তিনি মনে করতেন। কিন্তু তার জন্য আরবি লিপিকে নির্বাসিত করতে হবে—তাও তিনি বলেননি। উর্দু ভাষা নাগরী লিপিতে

লেখা হলে হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক ভাব বিনিময় অনায়াস হত এবং মুসলমানদের ভারতীয়করণ সহজসাধ্য হত—রাহুল তাই চেয়েছিলেন।

ডায়াবেটিজ ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছিল। রাহুলের পক্ষেও আর এই ঘাতক ব্যাধিকে উপেক্ষা করা সম্ভব হচ্ছিল না। ইনসুলিন নিচ্ছিলেন, যদিও নিয়মিতভাবে নয়। আয়ুর্বেদিক ওষুধ খাচ্ছিলেন। এক সপ্তাহ নিরন্ন আহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু ডিম, মাংস, মাছ ও ফল খেতেন। এই আহারকে রাহুল ফলাহার বলতেন।

আর্থিক অবস্থার দিকেও রাহুলকে লক্ষ রাখতে হচ্ছিল। কেননা সম্মেলনের কাছ থেকে টাকা নিয়ে রাহুল দিন গুজরান করতে চাননি। ১৯৪৮-এ তিনি চার হাজার দুশো টাকার মতো রয়ালটি পেয়েছিলেন কিতাব মহলের কাছ থেকে। এই টাকা রাহুলের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। যদিও তখনো তাঁর জীবনে কমলা আসেনি। একটা সময় ছিল যখন এই টাকাটা একটা মানুষের পক্ষে যথেষ্ট বলে মনে করতেন রাহুল। এখন এই টাকায় আর চলত না।

পরিভাষা নির্মাণের কাজে তাঁকে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হচ্ছিল। বিভিন্ন বিষয়ের পরিভাষার জন্য বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া আবশ্যিক হয়ে পড়েছিল। তাই তিনি প্রয়াগ, শৃঙ্গবেরপুর (সিংগরৌর), সারনাথ, গোরখপুর হয়ে বেনারসে আসেন।

আবার সেই বেনারস। এখানে রাহুলকে পুরনো স্মৃতি-আতুরতা অধিকার করেছিল। বেনারসে তিনি ছয় দিন ছিলেন। বেনারসের অধ্যাপকদের কাছ থেকে পরিভাষা নির্মাণের কাজে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতিও নিয়ে এসেছিলেন। নবাবপুরার পণ্ডিত জয়চন্দ্র বিদ্যালংকারের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। বৃদ্ধ পণ্ডিত শিব বিনায়ক মিশ্রের সঙ্গে দেখা হল। অস্মী নদীর তীরে জগন্নাথ মন্দিরে গেলেন। সেখানে বাল্যবন্ধু দশরথ পাণ্ডের সঙ্গে দেখা হল। সেখান থেকে ছাত্রজীবনের স্মরণীয় জায়গা সীতারামের বাগিচা দেখতে গেলেন। এই বাগিচার অবস্থা দেখে কত দুঃখ হল রাহুলের। এই বাগিচা এমন পালটে গিয়েছিল যে তাকে আর চেনা যাচ্ছিল না। শেঠ গৌরীশঙ্কর গোয়েংকা এই বাগিচা কিনে তাঁর নিজের নামে এখানে এক পাঠশালা তৈরি করেছিলেন। রাহুল সবচেয়ে দুঃখ পেলেন এই দেখে যে কাশীর মহান পণ্ডিত গুরুতুল্য ব্রহ্মচারী মংগনীরামের নিবাসের সব চিহ্ন মুছে দেওয়া হয়েছিল। ব্রহ্মচারী মংগনীরাম মহাবিদ্বান, বেদান্তের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি। তাঁর ত্যাগেরও কোনো সীমা ছিল না। দুটো ছোটো ছোটো গেরুয়া কাপড়ের টুকরো দিয়ে শরীর ঢেকে এই বাগিচায় হাঁটতেন মংগনীরাম। তাঁর এই মূর্তি রাহুল ভুলতে পারেননি। তাঁকে খুব কম লোকই চিনতেন। অথচ ভাস্করানন্দকে লোকে আকাশে তুলে দিয়েছিল। ত্যাগ, পাণ্ডিত্য ইত্যাদির কথা বিবেচনা করলে মংগনীরামের সঙ্গে তাঁর কোনো তুলনাই চলে না। অথচ বাগিচার থেকে কিছু দূরেই ভাস্করানন্দের মার্বেল পাথরের সমাধি নির্মিত হয়েছিল। যদি কোনো ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষের স্মারক কাশীতে স্থাপনা করা উচিত বলে মনে হয়ে থাকে তবে সেই ব্যক্তি মংগনীরাম। কিন্তু তাঁর স্মারক স্থাপন করা তো দূরের কথা, তিনি যে কুটিরে থাকতেন তাও ভেঙে ফেলা হয়েছিল। মানুষের হাত যদি তাঁর কুটির

ভেঙে না ফেলত তবে তা আরো একশো বছর টিকে থাকত। শেঠ গৌরীশঙ্কর গোয়েংকা মংগনীরামের মধুর স্মৃতি বিলুপ্ত করে স্বয়ং অমর হতে চেয়েছিলেন। এই অপরাধের কোনো ক্ষমা নেই। মংগনীরামের নিজের নাম নিয়ে কোনো মাথাব্যথা ছিল না। মৃত্যুর পর কেউ তাঁকে মনে রাখুক এই আকাঙ্ক্ষাও তাঁর ছিল না। রাহুল যখন বাগিচায় ছিলেন, তখন ছাত্র ও সন্ন্যাসীদের জন্য তিন চারটি সত্র চলত। সেইসব বাড়ি আর নেই। কয়েক শো লেবু গাছ ও কিছু বড় গাছ ছিল, তাও আর নেই। তবে যেখানে চক্রপাণি ব্রহ্মচারী ও কিছু ছাত্র বাস করতেন সেই ঘরগুলি দাঁড়িয়ে ছিল।

পরিভাষার কাজে

৩০ অক্টোবর *শাসন শব্দকোষ* দিনের আলো দেখল। সেই দিনই হিন্দি সাহিত্য সম্মেলনের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপনা করলেন রাহুল। ট্যান্ডন সম্মেলনের প্রেসের উদ্ঘাটন করলেন। রাহুল সম্মেলনের নিজস্ব প্রেসের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন। কেননা একমাত্র প্রেসের সহযোগিতা পেলেই পরিভাষা মুদ্রণের কাজ সঠিকভাবে ও দ্রুত হতে পারে। নাগরী লিপি সংশোধন করার ইচ্ছা ছিল তাঁর। সেইজন্য অনেক খোঁজাখুঁজি করে সম্মেলনের প্রেসে একটি মনোটাইপ মেশিন এনে বসিয়েছিলেন। *শাসন শব্দকোষ* ছাপা হওয়ার পর তিনি অন্যান্য বিষয়ে পরিভাষা তৈরির কাজে অগ্রসর হলেন। বিদ্যানিবাস ও ম্যাচওয়ে কলকাতা, কটক, নাগপুর প্রভৃতি স্থানের ভাষাবিদ্‌দের সঙ্গে পরিভাষা তৈরির ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়েছিলেন। বিজ্ঞানের পরিভাষা তৈরির জন্য বিজ্ঞান ও ভাষা দুইই জানেন, এমন লোকের প্রয়োজন ছিল। ডঃ মহাদেব সাহা বলেছিলেন যে, সুরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এই কাজের উপযুক্ত লোক। প্রয়াগ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক ডঃ বিশ্বনাথ রবনে দর্শনের পরিভাষা তৈরির দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন।

রাহুল স্থির হয়ে বসে ছিলেন না। তিনি পরিভাষার অনুসন্ধানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। প্রথম রুরকি এনজিনিয়ারিঙ বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলেন। পরিভাষার ব্যাপারে অধ্যক্ষ নৃপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী রাহুলের সঙ্গে একমত ছিলেন। কিন্তু অধ্যাপকদের মধ্যে এ বিষয়ে কোনো আগ্রহ তাঁর চোখে পড়েনি।

কলকাতা গিয়ে তিনি সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেন। সুনীতিবাবু রাহুলের কাজ দেখে দিয়েছিলেন। তিনি ইংরেজি বজায় রাখার পক্ষপাতী ছিলেন, যদিও নিজের ভাষার প্রতিও তাঁর অনুরাগ ছিল। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী সত্যেন বসুর সঙ্গেও তিনি দেখা করেন। মাতৃভাষার প্রতি তাঁরও অনুরাগ ছিল। তিনি মাতৃভাষাকে বিজ্ঞান-শিক্ষার মাধ্যম করতে চেয়েছিলেন। কেননা, তিনি জানতেন যে একমাত্র তা হলেই সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রচার হবে। বাংলায় *জ্ঞান বিজ্ঞান* পত্রিকাও বার করা হয়েছিল সেইজনাই।

সেইযুগের কলকাতা ও কলকাতার বাঙালিদের সম্পর্কে রাহুলের এক ধরনের মুগ্ধতা ছিল। তিনি লিখছেন, 'কলকাতা শুধু বাংলার রাজনৈতিক রাজধানীই নয়,

সাংস্কৃতিক রাজধানীও। বাঙালিরা সবচেয়ে প্রথম য়োরোপ ও আধুনিক যুগের সংস্পর্শে এসেছিল। বাঙালিরাই প্রথম বুঝেছিল যে, স্বাধীনতার পথে অগ্রগতির একটাই পথ। অর্থাৎ য়োরোপীয়রা যে পথে গিয়েছে, আমাদেরও সেই পথে যেতে হবে। য়োরোপীয় সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধ্যয়ন উনিশ শতকের শেষ দিকে এখানকার মনীষীরাই শুরু করেছিলেন। য়োরোপীয় সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক কিছুর আত্তীকরণও করেছিলেন তাঁরা। সেই সময় হিন্দি-অলারা পঞ্চাশ বছর পেছনে পড়ে ছিল। সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি বাঙালিদের অনুরাগ দেখে ঈর্ষা হয়। আমাদের এদিকে আজও হিন্দি রঙ্গমঞ্চের দেখা নেই। বাংলায় রঙ্গমঞ্চের একশো বছরের ঐতিহ্য। একশো বছরে বাংলা রঙ্গমঞ্চ এমনভাবে প্রোথিত হয়েছে যে, সিনেমাও এই শেকড় উপড়াতে পারেনি।'

কালিম্পঙে

কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতন হয়ে রাহুল কালিম্পঙ চলে যান। কালিম্পঙ-এ তাঁর জীবনের যে নতুন অধ্যায় শুরু হতে যাচ্ছে সে বিষয়েও রাহুলের কোনো ধারণা ছিল না। পরিভাষা তৈরির কাজ সুষ্ঠুভাবে করার জন্য তিনি কালিম্পঙ যান। অবশ্য হিমালয়ের আহ্বান অস্বীকার করার ক্ষমতা তাঁর কখনোই ছিল না।

ইতিমধ্যে সেনগুপ্ত এ্যানাটমির (*প্রত্যক্ষ শরীর*) হাজারখানেক পারিভাষিক শব্দ জমা করে ফেলেছিলেন। অন্যান্য বিষয়েরও অনেক পারিভাষিক শব্দ সংগৃহীত হয়েছিল। একটি কোষই প্রস্তুত হয়েছিল বলা চলে। কিন্তু এই শব্দকে অ-কারাদি ক্রমে কার্ডে লেখা প্রয়োজন ছিল। রাহুল স্থির করেছিলেন কালিম্পঙ-এর গ্র্যাহামস্ হোমের কিছু ম্যাট্রিক পাশ বেকার নেপালি ছাত্র-ছাত্রীদের এই কাজে লাগাবেন।

এর মধ্যে খবর এল ভারতীয় সংবিধানের খসড়া অনুবাদের জন্য রাষ্ট্রপতি একটি সমিতি গঠন করেছেন। এই সমিতির অধ্যক্ষ ছিলেন ঘনশ্যাম সিংহগুপ্ত। সদস্য ছিলেন জয়চন্দ্র বিদ্যালংকার, প্রোফেসর মুজিব, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ সত্যনারায়ণ ও রাহুল। সমিতির সচিব ছিলেন বালকৃষ্ণ। সুতরাং রাহুলকে কিছুদিন কালিম্পঙ থেকে দিল্লি; এবং দিল্লি থেকে কালিম্পঙ ছোটাছুটি করতে হল। ২৪ এপ্রিল সমিতির বৈঠকে সদস্যদের মধ্যে পরিভাষা সম্পর্কে মতের বিনিময় হল। বৈঠকে স্থির হল, অনুবাদ সহজ ভাষায় হবে এবং পারিভাষিক শব্দ আহরণ করতে হবে সংস্কৃত থেকে। এ ব্যাপারে সদস্যদের মধ্যে ঐকমত্য হয়েছিল।

পরদিন রাহুল ও সচিব বালকৃষ্ণ একটি অনুচ্ছেদ অনুবাদ করে নিয়ে এসেছিলেন যা সমিতির বৈঠকে অনুমোদিত হয়েছিল। এরপর স্থির হয় যে, রাহুল ও প্রোফেসর বালকৃষ্ণ অনুবাদ করে তা সমিতির বৈঠকে পেশ করবেন। ১ জুন আবার অনুবাদ সমিতির বৈঠক হয়। স্থির হয় সংবিধান সভা সংবিধানের যে অনুচ্ছেদ পাশ করবে, সেই অনুচ্ছেদ সমিতি অনুবাদ করবে।

সংবিধান অনুবাদের জন্য দিল্লি যেতে হচ্ছিল রাহুলকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কালিম্পঙ-এথেকেই পরিভাষা তৈরির কাজ ও সাহিত্যসেবা করবেন স্থির করেছিলেন। সেজন্য তিনি কালিম্পঙ-এ একটি বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন। কালিম্পঙ-এ থাকার সিদ্ধান্তের একটি কারণ অবশ্যই ছিল হিমালয়, যাকে আজীবন তিনি ভালোবেসেছেন। তাছাড়া গরমের ভীতিও রাহুলের বরাবরই ছিল। মে মাস নাগাদ *প্রত্যক্ষ শরীর* অর্থাৎ এ্যানাটমির পরিভাষা তৈরির কাজ শেষ হয়ে যায়।

কালিম্পঙ-এ আসার দেড় মাসের মধ্যেই ছেলেমেয়েদের দিয়ে যত শব্দ লেখানোর কথা ছিল, তা শেষ হয়ে যায়। রাহুলের এখন দরকার ছিল একটি ছেলে অথবা মেয়ে যে বুঝে-সুঝে রাহুলের কাজ করতে পারবে। রাহুল তাঁর বন্ধু পরমহংস মিশ্রকে এই ধরনের একটি ছেলে অথবা মেয়েকে পাঠাতে বলেছিলেন। রাহুলের কাছে যে সব ছেলে-মেয়েরা কাজ করছিল তাদের মধ্যে কমলা পরিয়ার নামে একটি মেয়েও ছিল। পরমহংস মিশ্র তাকেই রাহুলের কাছে পাঠালেন। সে ২৪ জুন এসে কাজ করতে শুরু করল। ম্যাট্রিক পাস কমলা ইংরেজি ও হিন্দি দুইই জানত। তার হাতের লেখাও ভালো ছিল। ২৪ জুন কমলা রাহুলের ঘরে এল, রাহুলের জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু হল।

ষোড়শ অধ্যায়

জীবনের নতুন অধ্যায়

সহকারিণী কমলা

কমলা রাহুলের ঘরে আসার পর তাঁর দুটি সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। প্রথমত তাঁর লিপিকারের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। কারণ তাঁর লিপিকার মহেশকে চলে যেতে হচ্ছিল। দ্বিতীয়ত ডায়াবেটিজ। রাহুল জানতেন তাঁর ডায়াবেটিজ সারবে না। কিন্তু তাঁকে বাঁচিয়ে রাখছিল ইনসুলিন ইন্‌জেকশান। বেশিদিন বাঁচবেন, এমন ভরসা ছিল না তাঁর। এ সময়ে কমলা তাঁর ঘরে এল। লিপিকারের কাজটা সে ভালোভাবেই করছিল। সে টাইপ করাও শিখে নেবে, তাতেও রাহুলের সন্দেহ ছিল না। কমলা আসায় রাহুল কিছুটা নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিলেন।

অবশ্য মহেশ চলে যাওয়ায় রাহুলের কিছুটা অসুবিধা হয়েছিল। কমলার উৎসাহ ছিল, কিন্তু স্বাস্থ্য ভালো ছিল না। কৃশ, দুর্বল কমলা এতটা কাজের ভার নিতে পারবে কিনা সন্দেহ ছিল। তাছাড়া কেনা-কাটা, হিসাব ও খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা সবই করত মহেশ। এইসব একা কমলার পক্ষে করা সম্ভব ছিল না। এ সময় রামেশ্বর সিংহ পরিভাষা নির্মাণের কাছে সহায়তা করার জন্য চলে আসেন। রামেশ্বর যোগ্য ও আদর্শবাদী মানুষ ছিলেন। কিন্তু মুশকিল হয়েছিল এই যে, তিনিও পুরোনো রাহুলের মতো বাতাসি পাখি। এক জায়গায় বেশিদিন তিনি থাকতে পারতেন না। অতএব রাহুল কাজের সহায়ক খুঁজছিলেন, একটি বাড়িও খুঁজছিলেন। ধর্মোদয় নামে যে বাড়িটিতে ছিলেন, তাতে অসুবিধা হচ্ছিল। টাকাও আসছিল। কিতাব মহল থেকে বইয়ের রয়ালটি পেয়েছিলেন পাঁচ হাজার টাকা।

'ভোর হয়, রাত আসে' দুইয়ে মিলে বয়স বাড়ে। সপ্তাহে সাত দিনই কাজে এমন ব্যস্ত হয়ে থাকেন রাহুল যে ভুলে যান কখন সকাল হয়, কখন সন্ধ্যা আসে, কখন সপ্তাহ কেটে যায়, জীবনের শেষ দিন খরচের খাতায় জমা হয়ে যায়। ২৩ জুন রাহুল লেখেন, 'মানুষকে তার নিজের শক্তির কতটা সীমা তা বুঝে নিতে হয়। মানুষ তাকে টানতে চাইবে। কিন্তু এই টানাপোড়েনের মধ্যে যেতে নেই।' নিয়ত উড্ডীন পাখির কী ক্লান্তি আসছিল? হয়তো শুধু ক্লান্তি নয়, বিষণ্ণতাও। ডায়াবেটিজ তাঁর সঙ্গী হয়েছে ১৯৪৭ থেকে। ইনসুলিন নিয়ে টিকে থাকতে হচ্ছিল। হয়তো মৃত্যুর আহ্বান শুনতে পাচ্ছিলেন। ১৯২৯-এর এপ্রিলে রাহুল লিখছেন, 'অনেক দিন বাঁচব এমন আশা করি না।'

ধর্মোদয় নামে যে বাড়িতে ছিলেন, সেই বাড়ি থাকার পক্ষে বেশ আরামপ্রদই ছিল। কিন্তু বাড়িটি শহরের বড় কাছে ছিল, মানুষের আনাগোনাও বড় বেশি ছিল। এতে সময়

নষ্ট হত। তাই রাহুল শহর থেকে কিছুটা দূরে বাড়ি খুঁজছিলেন।

ডঃ রোয়েরিক এ সময়ে কালিম্পঙে ছিলেন। জুন মাসের একটা রবিবার তাঁর সঙ্গে দেখা হল। 'আমরা দুজনেই একই ব্যাধিতে ভুগছিলাম। তিব্বত সম্পর্কে আমাদের অতৃপ্ত জিজ্ঞাসা ছিল। আমরা দুজনেই তিব্বত সম্পর্কে কাজ করতে চাইছিলাম। রোয়েরিকের সঙ্গে আমার এই কথা হল যে, ধর্মকীর্তির মহান গ্রন্থ 'প্রমাণবার্তিকের' ইংরেজি অনুবাদ করতে হবে। তখনই এই কাজ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু আমরা স্থির করেছিলাম যে, প্রমাণবার্তিকের তিব্বতি অনুবাদকে ইংরেজিতে ভাষান্তরিত করবেন ডঃ রোয়েরিক। পরে ধর্মকীর্তির মূল সংস্কৃত গ্রন্থের সঙ্গে সেই অনুবাদ আমি মেলাব।' এই গ্রন্থের এক পরিচ্ছেদের মতো অনুবাদ হয়েছিল। আরো তিন পরিচ্ছেদ থেকে গিয়েছিল। এই মহান গ্রন্থের সম্পূর্ণ অনুবাদ একদিন কাউকে করতেই হবে।

নতুন বাড়ি 'পার্বতী'-র খোঁজ পাওয়া গেল ২ জুলাই। ঐ দিনই কমলা রাহুলের 'সাহিত্য সহায়িকা' হিসেবে বহাল হলেন। ৩ জুলাই রাহুল মালপত্র নিয়ে 'পার্বতী'-তে পৌঁছে গেলেন। বাড়ি হিসেবে 'পার্বতী' তেমন ভালো ছিল না। কিন্তু এখানে লোকজনের যাতায়াত বিশেষ ছিল না। তাই তিনি *মেরী জীবনযাত্রা*-র তৃতীয় খণ্ড লেখার অবসর পেলেন। 'ধর্মোদয়ে' থাকতেই তিনি *ঘুমক্কড় শাস্ত্র* ও *আজকের রাজনীতি* লিখে ফেলেছিলেন। এই দুটি বই টাইপ করার ব্যাপারে কমলা তাঁকে সাহায্য করেছিল।

'পার্বতী'তে এসেও কমলা লিপিকারের কাজ করছিল। টাইপ ও মোটামুটি শিখে নিয়েছিল। কিন্তু পরে একেবারে নিয়মমাফিক টাইপ শেখার চমৎকার সুযোগ এসে যায় কমলার। আইরিন রায় নামে এক ইংরেজ মহিলা এ সময়ে কালিম্পঙ-এ ছিলেন। টাইপিঙ-এ তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। রাহুলের অনুরোধে তিনি কমলাকে শুধু ইংরেজি টাইপিঙ-ই নয়, হিন্দি টাইপিঙ-ও শিখিয়ে দেন। টাইপিঙ-এ গতি বেড়ে যায় কমলার। এতে টাইপিস্ট-এর অভাবে রাহুলের যে অসুবিধা হচ্ছিল তা দূর হল।

কিন্তু একটা অসুবিধা দূর হয় তো, আর একটা অসুবিধা এসে সামনে দাঁড়ায়। 'পার্বতী' শহর থেকে দেড় মাইল দূরে। সারাদিন কাজ করে এখান থেকে শহরে ফিরে যাওয়া কমলার পক্ষে কষ্টকর ছিল। তাই কমলার 'পার্বতী'তে থাকার একটা ব্যবস্থা করার প্রয়োজন ছিল। মহেশ চলে যাওয়ার পর মহেশের ঘরেই কমলা থাকবেন, একথা রাহুলের মনে হয়েছিল।

এরই মধ্যে কমলা চমৎকার টাইপ করতে শিখে গিয়েছিল। হিন্দি বইও পড়ার অভ্যাস করে ফেলেছিল। রাহুলের ইচ্ছা ছিল কমলা হিন্দি বিশারদ পরীক্ষা দিক। কিন্তু কালিম্পঙ-এ এই পরীক্ষার কোনো কেন্দ্র ছিল না, তাই এই বছরই পরীক্ষা দেওয়া হল না। একদিন কমলা বৃষ্টিতে ভিজে জবজবে হয়ে 'পার্বতী'তে এসে উপস্থিত হল ; তাই ১৮ অগস্ট (১৯৪৯) থেকে 'পার্বতী'তে তার থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া হল। সে 'পার্বতী'তে থেকেই পরীক্ষার জন্য তৈরি হতে লাগল। কমলার বাবা জীবিত ছিলেন না। ওরা পাঁচ ভাই-বোন। বড় ভাই অনেক কষ্ট করে নিজের খরচ চালায়। মা দর্জির

কাজ করেন ভাড়া করা সেলাই মেশিনে। রাহুল কমলাকে বললেন, 'একটা মেশিন কিনে মাকে দিয়ে এসো। সে মেশিন কিনে দিয়ে এল। ছেলে যা করতে পারেনি, মেয়ে তাই করল। এতে মার খুশি হওয়ারই কথা।'

রাহুল লিখছেন, 'কমলা এখন আমার অনেক কাছে এসে গিয়েছিল। আমি আগেই বলেছি যে, ডায়াবেটিজের ইনসুলিন ইন্‌জেকশান দেওয়া ও লেখার কাজে সে সহায়তা করছিল। একটা স্থায়ী ব্যবস্থা করা দরকার, এই ভেবে আমার বড় চিন্তা হচ্ছিল। তাছাড়া কমলার লেখাপড়ায় মনোযোগ ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল। তাই ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্বাভাবিক ছিল। আইরিন রায় ওকে টাইপে পণ্ডিত করে দিয়েছিলেন। সে এখন দুঘণ্টায় একটা রচনা টাইপ করে ফেলতে পারে।'

টাইপ করার কাজটা কমলা এত ভালো শিখে গিয়েছিল যে, একটা সম্পূর্ণ প্রবন্ধ সে একাই টাইপ করে নিত। কিন্তু কমলার স্বাস্থ্য নিয়ে রাহুলের বড় ভাবনা হচ্ছিল। ওর স্বাস্থ্য ফিরছিল না। সর্বদাই মাথা ধরে থাকত। কমলা বেশ বুদ্ধিমতী, শুধু সাধারণ ব্যাপারেই নয়, লেখাপড়ায়ও। এমন বুদ্ধিমতী মেয়ে শুধু গরিব বলে লেখাপড়া করতে পারবে না, তার অন্তরের গুণরাশি বিকশিত হবে না, এতে রাহুলের দুঃখ হত। রাহুল তাকে ভালোভাবে জানতে পেরেছেন বলে এই দুঃখ আরো বেশি। তাই মনে মনে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, ওকে আরো এগিয়ে নিয়েযেতে হবে। টাইপ করাটা এখন আর তার কাছে কোনো ব্যাপারই নয়। রাহুলের ভাষায় বলা চলে যে, টাইপ করা এখন তার বাঁ হাতের খেলা। দিনে সে এখন ১৮ পৃষ্ঠারও বেশি টাইপ করতে পারে। এক নাগাড়ে টাইপ করায় তার চোখে ব্যথা হতে লাগল। রাহুল মানা করা সত্ত্বেও সে টাইপ করা বন্ধ করত না। কোনো কাজ না করে বসে থাকতে তার ভালো লাগত না।

পূর্ববঙ্গের শরণার্থী সমস্যায় রাহুল

অক্টোবরে অনুবাদ সমিতির কাজে আবার দিল্লি যেতে হল। সেখান থেকে প্রয়াগ কানপুর হয়ে কলকাতা এলেন। কলকাতার অবস্থা দেখে তিনি হতবাক হয়ে গেলেন। এ যুগে কোনো অবাঙালির চোখে যা পড়েনি, রাহুলের করুণ সহানুভূতিশীল দৃষ্টিতে তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ধরা দিয়েছিল। পূর্ববঙ্গের শরণার্থীদের দিকে তিনি তাঁর করুণ নয়নপাত করেছিলেন।

রাহুল লিখছেন, 'পশ্চিম পাকিস্তান থেকে হিন্দুদের বিতাড়ন অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সঙ্গে হয়েছিল। তাদের পুনর্বাসনের কাজ ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ না হলেও তাদের জন্য এমন অনেক কিছু করা হয়েছে যাতে তাদের সমস্যা অতিরিক্ত কঠিন না হয়ে উঠতে পারে, যাতে তারা নিজেদের পায়ের ওপর দাঁড়াতে পারে। তাদের একটা বিশেষ সুবিধা ছিল এই যে, পূর্ব পাঞ্জাবের মুসলমানরা ভারত ছেড়ে চলে গিয়েছিল। তাদের বাড়িঘর ও খেত-খামার শরণার্থীদের দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পূর্ব-পাকিস্তানে ঘটনাটা এভাবে ঘটেনি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ থেকে যে মুসলমানরা পূর্ব-পাকিস্তানে গিয়েছিল, তাদের সংখ্যা অতিশয়

নগণ্য। অতএব পূর্ব পাকিস্তান থেকে যে হিন্দু শরণার্থীরা পশ্চিমবঙ্গে এসেছিল, তারা মুসলমানদের খালি বাড়িঘর ও খেত-খামার পায়নি। দ্বিতীয়ত পূর্ব-পাকিস্তান থেকে হিন্দুদের বিতাড়ন দ্রুতগতিতে হয়নি, এই বিতাড়ন আজও চলছে।' রাহুলের এই ধারণা হয়েছিল যে, খুব কম হিন্দুই পূর্ব পাকিস্তানে থাকতে পারবে। ১৯৪৯-এ কলকাতায় আর একটি দৃশ্যও দেখা যাচ্ছিল। সরকার শরণার্থীদের ইচ্ছেমতো বসাতে চাইছিল। কিন্তু সরকারের একথা মনে আসেনি যে, জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে তাদের বসালে তারা কী খাবে। এমন জায়গায় তাদের পুনর্বাসন দিতে হবে যেখানে গায়ে খেটে পেটের ভাত যোগাড় করতে পারে। শহরের কাছাকাছি থাকলেই রুজি-রোজগারের সম্ভাবনা থাকে। তাই কলকাতার আশেপাশে তারা থাকতে চায়; তা-ই স্বাভাবিক। কলকাতা দ্রুত মহানগরীতে পরিণত হচ্ছিল। মাড়োয়ারি শেঠদের হাতেই সব টাকা এবং তারা কলকাতার শহরতলির সব জমি কিনে নিয়েছিল। টালিগঞ্জের রিজেন্ট পার্কের কাছে একটা ফাঁকা জমি দেখতে গিয়েছিলেন রাহুল। সেখানে পূর্ববঙ্গের শরণার্থীরা এসে বসে গিয়েছিল। কিন্তু জমিটা কিনে রেখেছিলেন কোনো এক মাড়োয়ারি শেঠ। ব্যক্তিগত সম্পত্তি সরকারের কাছে পরম পবিত্র। অতএব শরণার্থীদের উপযুক্ত স্থানে পুনর্বাসনের চেয়েও ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও তার উপর মালিকদের স্বার্থরক্ষা সরকারের কাছে অধিকতর জরুরি ছিল। ফাঁকা জমি পড়ে ছিল। তাই শরণার্থীরা সেখানে তাদের ঝুপড়ি তৈরি করেছিল। শরৎ বোসের মতো জননেতাও তাদের সমর্থন করেছিল। শেঠদের এমন শক্তি ছিল না যে, লক্ষ লক্ষ শরণার্থী ও তাদের পেছনে সারা জনতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শরণার্থীদের কাছ থেকে জমি ছিনিয়ে নেয়। শরণার্থীর ঘরের চাটাইয়ের দেয়াল ও খড়ের ছাদ। শরণার্থীরা জমির ভাড়া দিতে অক্ষম। কিস্তিতে কিস্তিতে তারা দাম চুকিয়ে দিতে রাজি ছিল। তারা এর চেয়ে বেশি আর কী করতে পারত। কিন্তু কায়েমী স্বার্থের সামান্য ক্ষতিও সরকার মেনে নিতে রাজি ছিল না। সরকার শরৎ বোসের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করছিল যে, তিনি নিজের নেতৃত্ব বজায় রাখার জন্য প্রাদেশিকতার উস্কানি দিচ্ছেন। কলকাতার দুর্ভাগ্য এই যে, এখানকার সব ধনকুবের অবাঙালি। কিন্তু প্রাদেশিকতার অপবাদের ভয়ে বাঙালি কি তাদের যুক্তিসঙ্গত দাবি ছেড়ে দেবে?

পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থীদের সমস্যার মর্মবস্তুটি এই চলমান মানুষটির চোখে স্পষ্টভাবে ধরা দিয়েছিল। অথচ লক্ষ লক্ষ যন্ত্রণায় কাতর মানুষের হাহাকার তথাকথিত বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিকদের হৃদয় স্পর্শ করেনি। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের শোষিত মানুষের দুঃখে এরা চোখের জল ফেলেছে, রাস্তায় মিছিল করেছে, গল্প, কবিতা, উপন্যাস লিখেছে। শুধু তাদের চোখের সামনে দুমুঠো ভাতের জন্য, একটুকরো মাটির জন্য, মাথার উপরে একটা খড়ের ছাউনির জন্য যে সব কঙ্কালসার নরনারী ও শিশু মিছিল করে রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে, বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিকদের তাদের জন্য বিশেষ কিছু বলার ও লেখার ছিল না। মাঝে মাঝে মনে হয় এই আত্মশ্লাঘাপরায়ণ মানুষগুলি কি বাংলায় কখনো থেকেছে, এই দেশকে, এই দেশের মানুষকে ভালবেসেছে? অথবা

সারা জীবন পকেট হাতড়াতে হাতড়াতে কাটিয়ে দিয়েছে। অথচ রাহুল, এক লহমায় শরণার্থী সমস্যার মর্মবস্তুটি উদ্ধার করলেন। মাড়োয়ারি শেঠদের তল্‌পিবাহক হিসেবে সরকারের প্রতি তাঁর ঘৃণা ব্যক্ত করলেন। ভালোবাসায় বিগলিত হলেন হতাশা ও দারিদ্র্যে পীড়িত প্রায় পশুতে পরিণত এই মানুষগুলিকে দেখে। বৃন্দাবনের শরণার্থী বাঙালি ভিখিরিদের ও দিল্লিতে তাদের যন্ত্রণায় জর্জরিত জীবন দেখেও তিনি দুঃখে অভিভূত হয়েছিলেন। স্বাধীনতা-উত্তর যুগে যে প্রাদেশিকতার বিষ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ছিল, রাহুল সেই প্রাদেশিকতার ঊর্ধ্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এই যুগে একমাত্র সভ্য ভারতীয় ছিলেন রাহুল। তাঁর আজীবন তপস্যার মূল কথাই ছিল হাজার হাজার বছরের পুরোনো ভারতের সাধনা ও সংস্কৃতি থেকে শুরু করে আধুনিক ভারতীয় মানসের আত্তীকরণ। স্বাধীন ভারতের একীভূত সামগ্রিক রূপ তিনি প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিলেন। একীভূত সামগ্রিকতাই যে ভারতের আসল রূপ একথা তাঁর চেয়ে বেশি আর কারো জানা সম্ভব ছিল না। একমাত্র তিনিই বারবার ভারত পরিব্রাজন করে এই সামগ্রিকতার জীবন্ত স্বরূপকে জেনেছিলেন। সমগ্র ভারতের তৃণমূলের মানুষের জীবনের শরিক হয়ে আসমুদ্র হিমাচলের মানুষের ভাষায়, চিন্তায়, সংস্কৃতিতে ভারতীয়ত্বের মূল কোথায় নিহিত তা তাঁর কাছে ধরা দিয়েছিল। প্রায় সব ভারতীয় ভাষাব সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের ফলে তিনি দেখেছিলেন যে অধিকাংশ ভাষারই প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ শব্দ সংস্কৃত ভাষা থেকে আহৃত। এই ভাষাই ভারতীয় মানসে একটি অখণ্ড চৈতন্যের উপলব্ধি এনে দিয়েছিল। কয়েকশো বছরের বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ততার মধ্যেও ভারতীয় চৈতন্যের এই অখণ্ডতার বিলুপ্তি ঘটেনি, চাপা পড়েছিল মাত্র। রাহুল যখন নাগরী লিপি সহ সংস্কৃতনিষ্ঠ হিন্দিকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নেওয়ার কথা বলছিলেন, তখন তাঁর মধ্যে ভারতের অখণ্ড সামগ্রিকতার বোধই কাজ করছিল। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে যখন ভারতের রাষ্ট্রভাষা কী হবে তা নিয়ে বিতর্ক চলছিল, তখন ভারতীয় সমাজের উপরতলার তথাকথিত ইংরেজি শিক্ষিত অন্ধদের দেশে একমাত্র ভারতীয় ছিলেন রাহুল। কেননা একমাত্র তাঁরই বোধের মধ্যে ভারতের চার হাজার বছরের সংস্কৃতির ও ভাষার ইতিহাস অতিশয় জীবন্ত হয়ে কাজ করছিল। ভারতীয়ত্বের সত্য ব্যবহারিক অর্থ একমাত্র রাহুলের কাছেই প্রতিভাত হয়েছিল। এই একই সত্যের পরমার্থিক অর্থ ভারতের ক্রান্তদর্শী ঋষিদের কাছে ধরা দিয়েছিল। বিজ্ঞাননিষ্ঠ রাহুল ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ভারতীয়ত্বের প্রকৃত স্বরূপকে উদ্‌ঘাটন করে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। সংবিধান সভায় যে ভারতীয় নেতারা ভারতীয়দের স্বাধীন জীবনের বিকাশের কাঠামোটি নির্মাণ করছিলেন, তাঁদের কারুরই প্রায় ভারতীয়ত্বের অর্থ জানা ছিল না। আজ যে বিচ্ছিন্নতাবাদী, সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও অভ্যন্তরীণ কলহে দীর্ণ ভারত চোখে পড়ছে, তার প্রধান কারণ হয়তো এই যে দুর্ভাগ্যবশত প্রায় অভারতীয় কিছু মানুষের হাতে স্বাধীন ভারতের নির্মাণের কাজ ন্যস্ত হয়েছিল।

হয়তো একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, দাঙ্গাপীড়িত সেই যুগে রাহুলই একমাত্র

মানুষ যিনি ভারতীয়ত্বের নিহিতার্থ কী তা বুঝতেন এবং তিনিই ছিলেন ভারতীয়ত্বের সাকার বিগ্রহ। ধর্মীয়, প্রাদেশিক, ভাষাগত ও অন্যান্য কোনো প্রকার সংকীর্ণতার লেশ-মাত্র ছিল না তাঁর মধ্যে। ভারতবিদ্যাবিদ্‌দের মধ্যে সব চেয়ে অগ্রণী পুরুষও ছিলেন তিনি। অতএব তাঁর মন থেকে সমসাময়িক সংকীর্ণতার নির্মোক খসে পড়েছিল। অতএব ভারতীয়তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবেই তিনি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠেন।

এই অবিকৃত ভারতীয়ত্বের জন্যই বাঙালি শরণার্থীদের জন্য তাঁর হৃদয় করুণায় বিগলিত হয়, ঘৃণা হয় সেই সরকারের প্রতি, যে-সরকার তাদের এই পতিত জীবনের মধ্যে অন্তরীণ করেছে।

কালিম্পঙ-এ পরিভাষা নির্মাণের কাজ চলছিল অতি দ্রুত। সংবিধান অনুবাদের কাজের জন্য দিল্লি যাতায়াতও করছিলেন রাহুল। ১৯৪৯-এর ১৮ সেপ্টেম্বর তিনি চিঠি পেলেন যে, সংবিধান সভায় দেবনাগরি লিপি সহ হিন্দি রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। অবশ্য সংখ্যা লিখিত হবে ইংরেজিতে। হিন্দি যাতে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি না পায় সেজন্য আজাদ ও নেহরু খোলাখুলিভাবে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন।

কালিম্পঙ-এ ১১ ডিসেম্বর ডঃ রোয়েরিক-এর স্ত্রী বিখ্যাত অভিনেত্রী দেবিকারানির সঙ্গে রাহুলের পরিচয় হয়। দেবিকারানির সৌন্দর্যই শুধু নয়, তার প্রসাধন দেখেও তিনি বিস্মিত হন। দেবিকারানি প্রসাধনকে প্রায় চারুশিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। চল্লিশেরও বেশি বয়সি দেবিকারানিকে প্রায় ষোড়শী বলে মনে হচ্ছিল রাহুলের। ওষ্ঠে অধররাগ, মুখে সূক্ষ্ম ক্রীম, চুল কিছুটা কুঞ্চিত। চোখে চমক, মুখে স্বাভাবিক প্রসন্নতা, সুসংস্কৃত, সুশিক্ষিতা, বিদুষী—এই হলেন দেবিকারানি। যাঁকে দেখার জন্য দার্জিলিঙে ভিড় লেগে গিয়েছিল। রাহুলের চোখেও মোহাঞ্জন লেগেছিল তাতে সন্দেহ নেই। নারীর সৌন্দর্যে মুগ্ধতা তাঁর চিরকাল ছিল।

ছমাসের জন্য কালিম্পঙ-এ বাড়ি (পার্বতী) ভাড়া নিয়েছিলেন রাহুল। সেই সময় ফুরিয়ে আসছিল। নভেম্বরে কমলাকে নিয়ে মণিহর্ষজির বেবি অস্টিনে দার্জিলিঙ বেড়িয়ে এলেন তিনি।

২৩ নভেম্বরের অনুবাদের কাজের জন্য আবার দিল্লি যেতে হল। ২৫ নভেম্বর ভারতের ভাষা বিশেষজ্ঞদের পরিষদের বৈঠক হল। এই পরিষদে সারা ভারতের ভাষা বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত হয়েছিলেন। এই বৈঠকে স্থির হয় যে ভারতের সব ভাষায় একই পরিভাষা ব্যবহার করা হবে। অধিকতর উপযুক্ত শব্দ যদি অন্য ভাষায় পাওয়া যায় তবে তা যে পরিভাষা তৈরি করা হয়েছে তার অন্তর্গত হবে।

ডিসেম্বর মাসে 'পার্বতী' থেকে তল্পিতল্পা গোটানোর সময় হল। তিনি এবার কোথায় গিয়ে থাকবেন, তা তখনো ঠিক করতে পারেননি। কোনো একটা ঠাণ্ডা জায়গার খোঁজ করার জন্য তিনি কয়েকজন বন্ধুকে লিখেছিলেন। ২৭ ডিসেম্বর পণ্ডিত গয়া-প্রসাদ শুক্ল দেহরাদুন থেকে জানালেন যে চকরৌ তাকে একটা ভালো বাংলো আছে যা ভাড়া নেওয়া যেতে পারে। কমলা এ সময় দিল্লিতে ছিলেন। তার চিঠি পেয়ে রাহুলের মনে

হল যে কমলাকে তার ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। সে যাতে তার নিজের শক্তির উপযুক্ত ব্যবহার করতে পারে, তা করতে হবে।

এই বছর সাহিত্য সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন হচ্ছিল হায়দরাবাদে। রাহুলের এবারের সম্মেলনে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু এ বছরই তাঁকে সম্মেলন 'সাহিত্যবাচস্পতি' উপাধি দিয়েছে। তাই তাঁকে হায়দরাবাদ সম্মেলনে যেতে হল। কিন্তু যে কাজের জন্য রাহুল যেতে বাধ্য হয়েছিলেন, তা হল পরিভাষার কাজ।

হায়দরাবাদ সম্মেলন

কমলাকে হায়দরাবাদ সম্মেলন দেখাতে নিয়ে গেলেন রাহুল। হায়দরাবাদ যেতে কমলার প্রায় অর্ধেক ভারত দেখা হয়ে যাবে। কালিম্পঙ থেকে মোটরে শিলিগুড়ি গেলেন রাহুল। মোটরে কয়েকবার বমি হল কমলার, যদিও যাতে বমি না হয় সেজন্য কমলা খালিপেটে ছিল। বাগডোগরা থেকে বিমানে কলকাতা। কমলার এ পর্যন্ত কলকাতা দেখার সুযোগ হয়নি। এবার তার কলকাতা থেকে ওড়িশা ও মধ্যপ্রদেশ হয়ে হায়দরাবাদ ও তেলেঙ্গানা দেখার সুযোগ হল। তারপর বিন্ধ্রপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি, পাঞ্জাব, বিহারই শুধু নয়, নেপাল দেখারও সুযোগ হয়েছিল। হায়দরাবাদ হিন্দি সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দিয়ে এবং অজন্তা ও ইলোরা দেখে রাহুল ও কমলা রাত্রি সাড়ে আটটায় ঔরঙ্গাবাদ থেকে মানমাড়-এর গাড়ি ধরেন। ১৯৪৯ সাল কেটে যাওয়ার আধঘণ্টা পর অর্থাৎ ৩১ ডিসেম্বর রাত্রি সাড়ে বারোটায় তাঁরা মানমাড় পৌছোন। রাত দুটোতে নাগপুর একসপ্রেস ধরে পরদিন বোম্বাই পৌঁছোলেন।

রাহুলের শরীর ভালো যাচ্ছিল না। ক্রমশ খারাপের দিকেই যাচ্ছিল। বেশ কিছুদিন আগে অমৃতসরে তাঁর শরীরে কিছুটা ক্ষত হয়েছিল, ইনসুলিন নেওয়া সত্ত্বেও তা কমছিল না। তাই পয়লা জানুয়ারি থেকে তিন ঘণ্টা পরপর চার বার পেনিসিলিন নিতে শুরু করলেন। কিন্তু সেজন্য তাঁর কাজ থেমে থাকেনি। তিনি দক্‌খিনী কবিদের ওপর লিখছিলেন। কবিদের ওপর লিখতে লিখতে তিনি *দক্‌খিনী কাব্যধারা* লিখে ফেললেন। ১৯৫১-তে এই বই সম্পূর্ণ হয়। দক্‌খিনী ভাষায় কবিতা পড়ার সময় তিনি বুঝতে পারেন দক্‌খিনী ভাষার সাহিত্যকে আরবি ভাষার ছাঁচে ঢালা হয়েছিল তার ইসলামিকরণের জন্য। গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরে প্রথম দিকে ফার্সি সাহিত্যিকদেরই রমরমা ছিল। সেই কবিরাই আসর জাঁকিয়ে বসেছিলেন, যাঁদের মাতৃভাষা ফার্সি। কিন্তু স্থানীয় লোক বারো বছর ফার্সি পড়েও তা ভালো করে শিখতে পারত না। শেষপর্যন্ত তারা অপরের ভাষা ছেড়ে নিজেদের ভাষা শিখতে আরম্ভ করে। এতকাল সাহিত্য ছিল ফার্সি-জানা লোকদের জন্য। কথ্য ভাষাতেও অনেক আরবি-ফার্সি শব্দ এসে গিয়েছিল, যেমন ইংরেজ আমলে আমাদের ভাষায় ইংরেজি শব্দ এসেছে। এই ভাষাকে প্রথমে হিন্দি অথবা হিন্দিওরি বলা হত। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তা দক্ষিণের বহু মানুষের ভাষা ছিল। গোলকুণ্ডায় এ সময়ে বহু মানুষের ভাষা ছিল তেলেগু আর বিজাপুরে মারাঠি। দিল্লির সুলতানি ভেঙে

যাওয়ার পর দক্ষিণে প্রথম বাহ্মনি এবং তারপর উত্তরাধিকারী কয়েকটি রাজ্য গোলকুণ্ডা, বিজাপুর, আহমদনগর ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হয়। দিল্লির অধীন থাকাকালীন এইসব স্থানে দিল্লি থেকে শাসনকর্তা আসত। ছোটো-বড় অফিসার এবং সৈনিকও আসত উত্তর ভারত থেকে। এরা এবং তাদের সন্তানেরা হিন্দি বলত। এদের সংখ্যা স্থানীয় মানুষের এক শতাংশের বেশি ছিল না। দরবারি ভাষা ছিল ফার্সি। হিন্দি ভাষাই বেশি ব্যবহার হত। এই ভাষাকেই পরে দক্খিনী নাম দেওয়া হয়েছে।

দরবারের লোকেরা দক্খিনী কবিতা লিখতে শুরু করেননি। শুরু করেছিলেন ধর্মপ্রচারক ফকিরেরা। কিছু গণকবিও হয়তো ছিলেন। ভারতের মুসলমান শাসন দিল্লি পৌঁছোনর আগে প্রায় দেড়শো বছর পাঞ্জাবে রাজত্ব করেছিল। সেখানে ফার্সির সঙ্গে পাঞ্জাবিও প্রশাসনের অলিখিত ভাষা ছিল। কিন্তু দিল্লীতে রাজধানী স্থাপিত হওয়ার পর দিল্লির ভাষা কৌরবির সঙ্গে পাঞ্জাবির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়। এই ভাষাই পরে দক্ষিণে গিয়ে দক্খিনী হয়েছিল। রাহুল *দক্খিনী কাব্যধারা*-র কাজে লেগে রইলেন।

২১ ফেব্রুয়ারি কালিম্পঙ ছেড়ে এলেন রাহুল। তারপর স্বল্পকালের জন্য নৈনিতালে ছিলেন। কমলার স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছিল না। সেজন্য রাহুল চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। কমলার ওজন মাত্র ৯২ পাউন্ড; তাছাড়া মাথা ব্যথা, পেট ব্যথা এবং অতিরিক্ত শারীরিক দুর্বলতা। এক্সরে ও আরো নানারকম পরীক্ষা করা হল কমলার। কমলার রক্তচাপ কম, ভিটামিনের অভাব। সেজন্য ভালো খাওয়া-দাওয়া দরকার। কিন্তু কমলা খেতে চাইত না। কমলার ওজন ঠিক হতে সময় লাগল। কিন্তু ওজন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি হল।

নানা জায়গায় খোঁজ করে শেষ পর্যন্ত ডঃ সত্যকেতু রাহুলের নীড় খুঁজে পেলেন মুসৌরিতে। ১৬ হাজার টাকায় মুসৌরিতে একটি বাংলো কিনে নিলেন। বাংলোর নাম 'হর্নক্লিফ'। পুরোনো বাংলো। কিন্তু দশ-বিশ বছর টিকে থাকবে তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। বাড়ির কিছু মেরামত করার দরকার ছিল। মেরামত করার পর মালপত্রসহ কমলাকে নিয়ে 'হর্নক্লিফে' এসে উঠলেন। ক্লান্ত পাখি আপাতত বিশ্রাম নিল হিমালয়ের কোলে 'হর্নক্লিফে'।

এতকাল পরে কি উড্ডীন পাখির ডানা কাটল? নুন-তেল-লাকড়ি কি জীবনের প্রাথমিক স্তরে উঠে এল? প্রবহমান নদী কি মরুপথে তার ধারাকে হারাল?

১৯৪৬-এ একবার রাহুল তিব্বতের নেলঙ্ গ্রাম থেকে ঘুরতে ঘুরতে মুসৌরি এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল নেলঙ্ গ্রামের এক যুবক। মুসৌরির লন্ডৌর বাজারে যুবকটির পরিচিত কিষান সিংহ থাকতেন। তার একটা ছোটো মতো দোকান ছিল এবং থাকার জন্য একটা কুঠিয়া ছিল। সেইবার কিষান সিংহের ছোটো কুঠিয়াতেই রাহুল একটা দিন কাটিয়ে গিয়েছিলেন। এবার মুসৌরি এসে কমলাকে নিয়ে কিষান সিংহের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন। এক সময় কিষান সিংহও ঘুমক্কড় ছিলেন। কনৌরের কনমগ্রামের বাসিন্দা কিষান সিংহ অনেকবার তিব্বতে গেছেন। তিব্বতি বলতেন

মাতৃভাষার মতো। ঘুমক্কড় হয়ে তিনি এখানে এসেছিলেন; কিন্তু এখানে এসে ঘুমক্কড়ী বন্ধ হল। তিনি দ্বিপদ থেকে চতুষ্পদ, ষটপদ ও অষ্টপদ হয়ে গেলেন। ১৯৫০-এ যখন রাহুল কমলাকে নিয়ে কিষান সিংহের বাড়িতে বেড়াতে এলেন তখন কি তাঁর কোনো পূর্ববোধ ছিল যে, যে-নীড় তিনি খুঁজে পেলেন, তা তাঁকে কোন ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাবে? যে ঘুমক্কড় পাখি ডানা কেটে স্থবির জীবনকে মেনে নিয়েছে, কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে কলুর বলদ হয়েছে, নুন-তেল-লকড়ি ছাড়া যে আর কিছু ভাবতে পারছে না, তাকে দেখে কি আর তিনি অবজ্ঞার হাসি হাসতে পারবেন? মুসৌরিতে অষ্টপদ কিষান সিংহকে দেখে কি তাঁর এই আশংকা হয়নি যে, তাঁর নীল আকাশের স্বপ্নাবিষ্ট নিরন্তনর চলমান মনকে মুসৌরি কিংবা পরবর্তীকালের দার্জিলিঙের নীড় কি এক অনভ্যস্ত অপরিবর্তনীয়তার মধ্যে আবদ্ধ করবে না? কমলা তাঁকে কী দেবে? যা লোলা দিয়েছিল, তার চেয়ে বেশি কিছু কমলার পক্ষেও তাঁকে দেওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু লোলাকেও তো তিনি ছেড়ে এসেছিলেন। কারণ লোলার জন্যে তাঁর ঘুমক্কড়ী ও সাহিত্যযাত্রা দুইই তাঁকে ছেড়ে দিতে হত। কিন্তু কমলাকে তিনি যেভাবে আগলে রাখছিলেন, যেভাবে আগে বাড়াতে চাইছিলেন (রাহুলের ভাষা) অর্থাৎ নিজের কাজের জন্য যে প্রয়োজনীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলছিলেন, কমলার স্বাস্থ্যের দিকে যে রকম সতর্ক দৃষ্টি রাখছিলেন তা থেকে এ সত্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, কমলা তাঁকে ছেড়ে তার নিজস্ব আলাদা জীবনযাপন করবে, এ কথা তিনি ভাবতে পারছিলেন না; তাঁর ও কমলার বয়সের অনতিক্রম্য ব্যবধান সত্ত্বেও না। এতকালের ঘনিষ্ঠতার ফলে তিনি কমলার সঙ্গে যৌন সংসর্গে লিপ্ত হননি, তাও তাঁব *মেরী জীবনযাত্রা* পড়লে মনে হয় না। বরং মনে হয় তাঁদের যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। কেন তিনি বয়সের ব্যবধান সত্ত্বেও কমলাকে বিয়ে করলেন *মেরী জীবনযাত্রা*-য় তিনি তার যে বিবরণ দিয়েছেন, তা পড়লে তাই মনে হয়। তিনি লিখছেন ঃ 'দেড় বছরেরও বেশি হল আমি কমলার সঙ্গে আছি। সে যাতে লেখাপড়ায় এগিয়ে যেতে পারে, তাই এ বছরই তার বিশারদ পরীক্ষায় বসার কথা ছিল। আমাদের দুজনের এক সঙ্গে থাকতে হত। এতদিনে আমরা পরস্পরের স্বভাব বেশ ভালোভাবেই জানতে পেরেছিলাম। এতদিনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অনিশ্চয়ত'র মধ্যে রাখা ঠিক নয়। পুরুষের যেখানে আধিপত্য সেখানে নারীদের এই পরিস্থিতি একেবারেই সহনীয় নয়। অতএব ১৮ ডিসেম্বর আমরা এই সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আমরা স্বামী-স্ত্রীর বৈধ সম্পর্ক স্বীকার করে নেব। আমার দ্বিধা ছিল আমার বয়স নিয়ে। আমি একটি তরুণ জীবনকে বেঁধে ফেলতে চাইনি।' ২৩ ডিসেম্বর কমলার সঙ্গে রাহুলের বিবাহ সম্পন্ন হল।

সপ্তদশ অধ্যায়

সন্তোষী-লোলা-কমলা

রাহুল তাঁর *ঘুমক্কড় শাস্ত্র*-এ ঘুমক্কড়দের এই বলে সাবধান করে দিয়েছেন যে, ঘুমক্কড়কে সারা দুনিয়ায় ঘুরে বেড়াতে হবে। তাই তাঁকে তার জীবনকে সতত প্রবাহমান নদীর মতো রাখতে হবে। এই প্রবাহের পথে বাধা আসতে পারে। সে বিষয়ে তাকে সতর্ক থাকতে হবে। যুবক ঘুমক্কড়ের পথে যত বাধা আসতে পারে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় বাধা হল প্রেম। প্রেম যদি শুধু প্লেটোনিক ব্যাপার হত তাহলে কথা ছিল না। কিন্তু প্রেমে যৌনসংসর্গ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রেমের শক্তিও এত প্রবল যে, নদীর প্রচণ্ড প্রবাহ রুদ্ধ করে দেওয়াও তার পক্ষে সম্ভব।

দুনিয়া-জোড়া প্রেমের ফাঁদে পড়লেই ঘুমক্কড়ী শেষ। সেজন্য ঘুমক্কড়দের জন্য কিছু নিয়ম কানুন তৈরি করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, ঘুমক্কড় এক রাতের বেশি কোনো মনুষ্য বসতিতে থাকবে না। এই নিয়ম রমতারামদের পক্ষে চলতে পারে। কিন্তু রাহুল যাদের প্রথম শ্রেণির ঘুমক্কড় বলেছেন তাদের পক্ষে এই নিয়ম প্রযোজ্য হতে পারে না। তাদের একস্থানে বেশ কিছুদিন থেকে যেতে হতে পারে। কারণ সেখানে অনেক জ্ঞাতব্য ও দ্রষ্টব্য জিনিস থাকতে পারে। এমন জায়গায় কোনো নারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হওয়া সম্ভব; কারণ প্রথম শ্রেণির ঘুমক্কড়দের এক ধরনের আকর্ষণী শক্তি থাকে, যা মেয়েদের কাছে টানে এবং যার কাছে তারা অনায়াসে আত্মসমর্পণ করে। বুদ্ধের উপদেশ মেনে চললে ঘুমক্কড়রা হয়তো প্রেমকে এড়িয়ে যেতে পারে। বুদ্ধ লজ্জা ও সংকোচকে শুক্ল, বিশুদ্ধ ও মহান ধর্ম বলেছেন এবং তাদের মাহাত্ম্যের কথাও বারবার বলেছেন। প্রথমশ্রেণির ঘুমক্কড় কখনোই এমন কাজ করতে পারে না যাতে তার দেশের মর্যাদা হানি হয়। ঘুমক্কড়ের লজ্জা ও সংকোচ বেশি থাকা দরকার। কিন্তু লজ্জা ও সংকোচের-ও একটা সীমা আছে। কেননা যত ঘনিষ্ঠতা বাড়ে, ততই লজ্জা ও সংকোচ কমে যেতে থাকে।

লজ্জা ও সংকোচ প্রেমের বিরুদ্ধে কঠিন বর্ম সন্দেহ নেই। কিন্তু স্ত্রী-পুরুষের আকর্ষণ এত প্রবল যে এই বর্মও অনেক সময় যথেষ্ট নয়। রাহুলের মতে, ঘুমক্কড় ধর্মে পতিত না হয়েও একটি বিশেষ শর্তসাপেক্ষে প্রেমকে মেনে নেওয়া যেতে পারে। প্রেম কখনোই ঘুমক্কড়ের পাশ হবে না, প্রেম হবে নদী ও নৌকোর সংযোগের মতো। এই প্রেম নিতান্তই পথের প্রেম। প্রেমিকদের চতুষ্পদের বেশি হওয়া চলবে না। কঠিন শর্ত সন্দেহ নেই। কিন্তু যে ঘুমক্কড়ের ব্রত গ্রহণ করেছে, তাকে এই কঠিন শর্তের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

রাহুল লিখছেন, 'সামান্য অসতর্কতা ঘুমক্কড়কে তার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করতে পারে। সে খুঁটিতে বাঁধা বলদে পরিণত হবে। কোথায় তার ঘুমক্কড়ের সতত চলমান

মুক্ত-জীবন যা তার কাছে জ্ঞানের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দেয় এবং যা থেকে অপরে লাভবান হয় আর কোথায় তার চরম অধঃপতন। আজও এক বন্ধুর করুণ কাহিনি আমার মনে পড়ে। সে ভারতের বাইরে ঘুরতে যায়নি। কিন্তু সারা ভারতে সে ক্রমাগত ঘুরেছে। সে যদি ভুল না করে ফেলত তাহলে সে অনেক ঘুরে বেড়াতে পারত। সে প্রতিভাশালী বিদ্বান পুরুষ ছিল। আমি তাকে শুধু প্রশংসাই নয়, ঈর্ষাও করতাম। কিন্তু ঘুরতে ঘুরতে সে গুড়ের মাছি হয়ে গেল, তার পাখা অকেজো হয়ে গেল। এরপর আর কী বলার থাকতে পারে। সে দ্বিপদ থেকে চতুষ্পদ হয়ে গেল। কিন্তু সেখানে সে থামল না। ষটপদ, অষ্টপদ ও একেবারে দ্বাদশপদ পর্যন্ত পৌঁছে গেল। ঘর সংসারের সব চিন্তা এখন তার মাথায়। তার নির্ভীক ও স্বাধীন চরিত্র মিলিয়ে গেল। 'নুন-তেল-লকড়ি' যোগাড় করার চিন্তায় তার সব সময় কেটে যেতে লাগল। আকাশের মুক্ত-পক্ষ ঈগল এখন মাটিতে পড়ে ছটফট করছিল। ..ভাগ্য ভালো ছিল যে, দুয়েক বছরের মধ্যেই সংসার ও তার চিন্তা থেকে তার মুক্তি মিলে গেল। সে যদি অসাধারণ মেধাবী পুরুষ না হত, যদি সে বড় বড় স্বপ্ন না দেখত, তবে হয়তো সে সাধারণ মানুষের মতোই জীবন কাটিয়ে দিত। তার ভয়ানক শাস্তি হয়েছিল এই জন্য যে, তার জীবনের লক্ষ্য ছিল অতি উচ্চ এবং নিজের ভুলের জন্য সে সেই লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়েছিল। শেষপর্যন্ত তার জীবন শেষ হয়েছিল চরম নিরাশা ও আত্মগ্লানিতে।'

রাহুল অবশ্য একথা বলেননি যে, প্রেম স্বভাবতই দোষদুষ্ট। তিনি *ঘুমক্কড় শাস্ত্র* -এ একথাও বলেছেন যে, প্রেম মানব জীবনকে সরস করে, আত্মত্যাগের শিক্ষাও দেয়। রাহুল বলছেন, 'আমার প্রেমের বিরুদ্ধে কোনো ঝগড়া নেই, প্রেম থাক, কিন্তু পাখাও থাক।'

রাহুলের জীবনীকারের সবচেয়ে বড় অসুবিধা হল এই যে, তিনি বড় বেশি লিখেছেন। ফরাসিতে যাকে বলে embarras de riches। *মেরী জীবনযাত্রা* নামে তাঁর দেশ-দেশান্তরে যাত্রার বৃত্তান্ত তিনি লিখেছেন পাঁচ খণ্ডে, যার পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৭৭০। সারা জীবনে তিনি যত বই লিখেছেন, তার পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫০,০০০। অথচ তাঁর আন্তর জীবনের কথা তিনি কিছুই লেখেননি, একথা বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না। স্বভাবতই এই প্রশ্ন জাগে যে, নিজেকে এভাবে গোপন করলেন কেন? তাঁর লেখা পঞ্চাশ হাজার পৃষ্ঠার মধ্যে তাঁর আন্তর জীবনের প্রায় কোনো কথা নেই কেন? একটি নিরন্তর চলমান মানুষ, যে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে যাঁর চোখের সামনে নিত্য নতুন দৃশ্য উন্মোচিত হচ্ছে, ঘটনা ঘটছে, নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয় ঘটছে, তারা চলে যাচ্ছে, অন্য মানুষ আসছে। এইসব কিছু অকল্পনীয় দ্রুতিতে তাঁর কলমকে চালাচ্ছে। এই ভ্রাম্যমান জীবনের রস আকণ্ঠ পান করে এই জীবনের অভিজ্ঞতাকে তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। শুধু ভ্রাম্যমান জীবনের অভিজ্ঞতাই নয়, গল্প, উপন্যাস, জীবনী ও ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, চিত্রকলা, হিন্দি ও জনপদীয় ভাষা, ধর্মশাস্ত্র, সাম্যবাদ এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ে তিনি লিখেছেন। ভ্রমণতৃষ্ণা, জ্ঞানলিপ্সা ও লেখার নেশায় পাওয়া মানুষের পক্ষে একটি সাধারণ মানুষের আয়ুষ্কাল যথেষ্ট নয়। এক জীবনে তিনি অনেক জীবনের কাজ করে যেতে চেয়েছিলেন।

তাই দিনে ষোলো ঘণ্টা অথবা আঠারো ঘণ্টা কাজ করাকেও তিনি যথেষ্ট বলে মনে করেননি। তিনি যদি জন্মান্তর মানতেন, তাহলে এই জীবনে যা হল না, তা পরের জন্মে করবেন, এই সান্ত্বনা থাকত। সেই সান্ত্বনাও তাঁর ছিল না।

যখন রাহুল শ্রীলঙ্কায় ছিলেন, তখন কখনো কখনো রাত বারোটায় কৌশল্যায়ন রাহুলের ঘরে যেতেন। কেননা তখনো রাহুলের ঘরে তাঁর টাইপরাইটার চলত। কৌশল্যায়ন বলতেন, 'এখন ঘুমোন।' রাহুল বলতেন, 'তুমি তো জান আমি পুনর্জন্মে বিশ্বাস করি না। আমার যা কিছু করার আছে, তা এই জন্মেই করে যেতে হবে।' ত্রিপিটকাচার্য মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নকে কে বোঝাবে যে, এই জন্মে বেশি কাজ করার জন্যও কিছুটা আরামের প্রয়োজন আছে।

বোঝা গেল, যেহেতু এক জন্মেই সব কিছু করে যেতে হবে, তাই তাঁর নষ্ট করার মতো কোনো সময় ছিল না। অবশ্য ছেলেবেলার বন্ধু-বান্ধব, মাস্টার মশাইদের জন্য তিনি কিছুটা সময় নষ্ট করেছেন। কিন্তু ২৭৭০ পৃষ্ঠার *মেরী জীবনযাত্রা*-র মধ্যে—তাঁকে যাঁরা ভালোবেসে লালন-পালন করেছেন, তাদের জন্য কয়েকটি লাইন, মার জন্যও কয়েকটা লাইন তিনি লেখেননি। বাবার জন্য কয়েক লাইনের বেশি খরচ করেছিলেন তার কারণ এই নয় যে, বাবাকে তিনি ভালোবাসতেন। ঘর পালানো ছেলের পেছনে বাবা বেশ কিছুকাল ছুটে বেড়িয়েছিলেন বলেই রাহুল বাবার এই পাগলামির কথা কিছুটা বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু বাবার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তাঁর চোখ দিয়ে একফোঁটা চোখের জল পড়েনি এবং গান্ধিজির সত্যাগ্রহে যোগ দেওয়ার অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন পিতার মৃত্যুসংবাদকে।

রাহুলের *মেরী জীবনযাত্রা* এবং তাঁর অন্যান্য অসংখ্য বই পড়লে মনে হয় তাঁর সব বইয়ে ঈশ্বরের মতো রাহুল নামে মানুষটিও অনুপস্থিত। রাহুলকে কি নিজের সঙ্গে কখনো যুদ্ধ করতে হয়নি? ভালো-মন্দ, লাভ-ক্ষতি, লোভ-লালসার কখনো কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না রাহুলের মধ্যে? এমন কোনো ক্ষত ছিল না, যা তিনি কোনোদিন ভুলতে পারেননি? এমন কোনো পীড়া ছিল না, যা তাঁকে চিরকাল যন্ত্রণা দিয়েছে?

তাঁর সব লেখায়, তাঁর আচরণে, কথাবার্তায় দলিত মানুষের ওপর যে উৎপীড়ন, পাশবিক শোষণ তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন তা ক্রুদ্ধ বিদ্রূপ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তা তো যন্ত্রণা নয়।

আর প্রেম, তাও তাঁর কাছে যন্ত্রণা হয়ে আসেনি। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে *ঘুমক্কড় শাস্ত্র* প্রণেতার কাছে প্রেমের সংজ্ঞা কী! মুক্ত প্রেমে *ঘুমক্কড় শাস্ত্র* প্রণেতার আপত্তি নেই। বরং প্রেম জীবনকে সরস করে; তিনি তাই মনে করতেন। কিন্তু অসতর্ক মুক্ত প্রেম যদি সন্তান নিয়ে আসে, তবে তা নিন্দনীয়। *ঘুমক্কড় শাস্ত্র* প্রণেতা তাঁর জীবনে এই বিধান কতটা মেনে চলেছিলেন এখন তা দেখা যাক।

যে *ঘুমক্কড় শাস্ত্র* প্রণেতা তরুণ ঘুমক্কড়দের বিবাহ ও সন্তান জন্ম না দেওয়ার বিধান দিয়েছিলেন, তিনি একাধিক বিয়ে করেছিলেন এবং তিনটি সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন।

আগেই বলা হয়েছে—১৯০৪-এ কেদারনাথের বিয়ে হয় নিজামাবাদ জেলার আহিরৌলী গ্রামের এক ধনী ব্রাহ্মণের সুন্দরী কন্যা সন্তোষীর সঙ্গে। রাহুলের বয়স তখন এগারো। কিন্তু রাহুল এই বিয়েকে মেনে নিতে পারেননি। রাহুল বিয়ের এই নাগপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করেছিলেন এবং সন্তোষীরও এ ব্যাপারে অনুরূপ স্বাধীনতা আছে বলে তিনি মনে করতেন। কিন্তু তবু একটা কথা থেকে যায়।

রাহুল জানতেন যে, পুরুষ শাসিত সমাজে সন্তোষীর নিজস্ব স্বাধীন পথ বেছে নেওয়ার কোনো প্রশ্নই ছিল না। এগারো বছরের অবোধ বালকের যদি এই বিয়ের জন্য কোনো দায়িত্ব না থাকে, তবে ষোলো বছরের গ্রাম্য কিশোরীরও নিশ্চয় এই বিয়ের জন্য কোনো দায়িত্ব ছিল না। অথচ রাহুল এই বিয়ের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেলেন ; কারণ সমাজ পুরুষ-শাসিত। অথচ এই বিয়ের যূপকাষ্ঠে একটি নিরাপরাধ কিশোরী কন্যাকে বলি দেওয়া হল। রাহুল যখন তাকে সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার উপদেশ দিয়েছিলেন, নিজের জন্য স্বাধীন পথ বেছে নিতে বলেছিলেন, তখন তিনি জানতেন যে, একটি অশিক্ষিতা গ্রাম্য মহিলার পক্ষে নিজস্ব স্বাধীন পথ বেছে নেওয়া সম্ভব নয়। রাহুল জানতেন যে, যেহেতু তিনি পুরুষ, তাই তার পক্ষে সবই করা সম্ভব। তাঁর পক্ষে আরো দুবার বিয়ে করা অথবা স্বামী-স্ত্রীর মতো বাস করা সম্ভব হয়েছিল। ১৯৩৭-এ লোলার সঙ্গে ঘর বেঁধেছিলেন এবং ১৯৫০-এ কমলাকে বিয়ে করেছিলেন। তিনটি সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন। অথচ তাঁর প্রথমা স্ত্রী সন্তোষী যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, তখন তিনি তাঁকে স্বীকৃতি দেননি।

এই ধরনের আচরণকেই সার্ত্র বলেছেন bad faith। রাহুলের নিজের এ বিষয়ে কিছুটা অপরাধবোধ ছিল। ১৯৫৮-র একটি ঘটনা থেকে তা বোঝা যায়। রাহুল শুনেছিলেন যে, সন্তোষী অসুস্থ হয়ে চিকিৎসার জন্য বেনারস এসেছেন। তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। সেখানে পৌঁছোনোর আগেই তাঁর স্ত্রী দেশে ফিরে গিয়েছিলেন। বেনারসে ভাইপো উদয়নারায়ণ পাণ্ডের সঙ্গে রাহুলের দেখা হয়। রাহুল ভাইপোকে বলেছিলেন, 'আমি তোমার কাকিমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম, কিন্তু দেখা হল না। তুমি ওকে বলো যে, ওর সঙ্গে আমি যা কিছু করেছি, বা করতে হয়েছে সেজন্য আমার দুঃখ হয়। গৃহত্যাগ না করলে আমার জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হত না।'

কমলাকে বিয়ে করার দীর্ঘকাল পরে আর একবার রাহুলের সঙ্গে তাঁর প্রথমা স্ত্রী সন্তোষীর দেখা হয়েছিল। রাহুল সেকথা স্বয়ং সন্তরামকে বলেছিলেন। তিনি যখন দীর্ঘকাল পরে কনৈলায় গিয়েছিলেন তখন হাত-মুখ ঢাকা কাপড়ের একটা গাঁটরি এসে তাঁর পায়ে মাথা রেখেছিল। প্রথমে তিনি চিনতে পারেননি। জিগ্যেস করে জানতে পেরেছিলেন, যে গাঁটরিটি তাঁর ছেলেবেলার দুলহিন। কিন্তু এই হাত-মুখ ঢাকা কাপড়ের গাঁটরি রাহুলকে একটা কথা বলেছিলেন। তার কোনো উত্তর রাহুলের জানা ছিল না : 'আমি তো বিয়ে করিনি, আপনি যদি বিয়ে না করে থাকতে পারতেন তবে বুঝতাম।'

রাহুল যদি বিয়ে না করতেন, তাহলে তাঁর প্রথম পরিণীতার কর্তব্য সম্পর্কে তিনি

যে কথা বলেছিলেন, তা বলার নৈতিক অধিকার হয়তো তাঁর থাকত। স্ত্রীর সঙ্গে এই ধরনের ব্যবহার হয়তো হৃদয়হীনতা বলেও মনে হত না। স্বীয় কর্তব্যনিষ্ঠ আচরণ বলেই মনে করা যেতে পারত। পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ হলে, রাহুল মুক্ত বিহঙ্গের মতো পণ্ডিত যাযাবরের জীবনযাপন করতে পারতেন না। বালক বয়সে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলে তিনি ভারততৈলপূর্ণ জ্ঞানময় প্রদীপ জ্বালাতে পারতেন না। বিবাহিতা স্ত্রীকে ফেলে বিবাগি হয়ে চলে যাওয়ার দৃষ্টান্তের অভাব নেই আমাদের দেশে। ঈশ্বর-লাভের জন্য এভাবে প্রব্রজ্যা নিয়ে চলে যাওয়া আমাদের দেশে অত্যন্ত প্রশংসনীয় কাজ বলে স্বীকৃত। কোনো বংশে কেউ ঈশ্বর-লাভের জন্য গৃহত্যাগ করলে 'কুলং পবিত্রং, জননী কৃতার্থা' ও 'পুণ্যবতী চ বসুন্ধরা' হয়। রাহুল সংসার ত্যাগ করে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। ঈশ্বর - লাভের জন্য নয়, দুনিয়া ভ্রমণের জন্য, জ্ঞানার্জনের জন্য। তিনি যে জ্ঞান তপস্বী ছিলেন, তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি দুনিয়া ভ্রমণ ও জ্ঞানের তপস্যাই করেননি। দুটি নারীর সঙ্গে ঘর বেঁধেছিলেন এবং পুরোদস্তুর সংসারী হয়েছিলেন।

গৃহস্থালি ঃ লোলা

আগেই বলা হয়েছে যে যখন অধ্যাপক শ্চের্বাৎসকির আমন্ত্রণে রাহুল লেনিনগ্রাদ ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউটে গবেষণার কাজে যান, তখন তাঁর প্রথম পরিচয় হয় লোলার সঙ্গে। এই পরিচয় থেকে পূর্বরাগ এবং তারপর তাঁদের বিয়ে হয় অথবা তাঁরা স্বামী-স্ত্রীর মতো থাকেন। প্রথমবার ১৯৩৭-এর ২২ ডিসেম্বর থেকে ১৯৩৮-এর ১৩ জানুয়ারি পর্যন্ত অর্থাৎ ২৩ দিনের মতো তাঁরা লেনিনগ্রাদে একসঙ্গে ছিলেন। ২৭ এপ্রিল (১৯৩৯) ডঃ শ্চের্বাৎসকি ভারতে টেলিগ্রাম করে রাহুলকে পুত্র ঈগরের জন্মের সংবাদ দেন। তিনি একটি চিঠিও লিখেছিলেন। চিঠির সঙ্গে শিশু ঈগর ও লোলার ছবি ছিল। রাহুল লোলার একটি চিঠি পেয়েছিলেন ১৮ অক্টোবর (১৯৩৯)। রাহুল ছেলের নাম রেখেছিলেন ওগোন অথবা অগ্নি। কিন্তু ইতিমধ্যেই তার নামকরণ হয়ে গিয়েছিল; নাম রাখা হয়েছিল ঈগর। তবে লোলা লিখেছেন, ওগোন নামটি তোলা রইল ভবিষ্যতের জন্য। ঈগরের জন্ম হয়েছিল ৫ সেপ্টেম্বর (১৯৩৮)। লোলা লিখেছিল—ঈগর খুব সুন্দর, স্বাস্থ্যবান ও গম্ভীর। একেবারে কাঁদে না। এ নিয়ে রাহুল ঠাট্টা করে লোলাকে চিঠি দিয়েছিলেন। লোলা লিখেছিলেন, নিজের চোখে যদি দেখতে তবে বুঝতে পারতে।

৫ এপ্রিল আবার লোলার চিঠি এল। আচার্য শ্চের্বাৎসকি ও লোলা দুজনেই চাইছিলেন রাহুল আবার রাশিয়া ফিরে যান। শ্চের্বাৎসকি চেয়েছিলেন, রাহুলের সাহায্যে একটি তিব্বতি ব্যাকরণ ও তিব্বতি-রুশ শব্দকোষ লিখতে। লোলাও রাহুলকে চাইছিলেন। ঈগরকে দেখাতে চাইছিলেন। সে বড় হয়েছে, পাপা বলছে।

১৯৪০-এর ১ জুলাই আবার লোলার চিঠি আসে। রাহুল হাজারিবাগ জেলে আছে শুনে ওঁর বড় চিন্তা হচ্ছিল, ভয় হচ্ছিল জেলে রাহুলের স্বাস্থ্যের জন্য। লোলা অন্য কোনো শব্দ খুঁজে না পেয়ে 'অতি প্রাণ প্রিয়' বলে রাহুলকে সংস্কৃতে সম্বোধন

করেছিলেন। রাহুল লোলাকে সম্বোধনেব জন্য কোন ভাষার কোন শব্দ বেছে নিয়েছিলেন আমরা জানি না। ডঃ শ্চের্বাৎসকি রাহুলের *সোভিয়েত ভূমি*-র প্রশংসা করে চিঠি লিখেছিলেন।

২৮ জুন রাহুল কাগজে দেখেছিলেন লেনিনগ্রাদ জ্বলছে। রাহুলের ভয়ানক চিন্তা হচ্ছিল। ৭ জুলাই তিনি ডায়েরিতে লিখলেন, 'আমার চিন্তা হচ্ছে, রাত্তিরে ঘুম ভাঙলে আর ঘুম আসতে চায় না।'

১৯৪১-এর ৫ জানুয়ারির চিঠিতেও লোলা ঈগরের কথাই লিখেছিল। লোলার ২৪মে-র চিঠিতেও ঈগরের কথা; 'আমার প্রিয় রাহুল, কাল সকালে তোমার তার পেলাম। আমার সোনামণির ফোটো কি তুমি পেয়েছ? তোমার ওকে কেমন লেগেছে? তোমার সঙ্গে ওর কি কোনো মিল আছে? ও কি দেখতে হিন্দুর মতো? ঈগর খুবই চালাক, খুবই বুদ্ধিমান ছেলে। ওর স্মরণশক্তিও খুব প্রখর, স্বভাব কোমল ও মধুর।'

যখন জার্মান সেনা মস্কো ও লেনিনগ্রাদের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল, তখন ভীষণ আতঙ্কিত হয়ে দিন কাটিয়েছেন রাহুল। ৭ অগস্ট লোলাকে রাহুল চিঠি লিখেছিলেন, 'ভীষণ পরীক্ষার সময়। হয় লাল সেনা পৃথিবীতে সাম্যবাদ সফল করবে, নয়তো মানুষ আবার অন্ধকার গহ্বরে নিজেকে হারাবে।' রাহুল লোলা ও ঈগরের জন্য ভীষণ দুশ্চিন্তা করছিলেন। লালসেনা রস্তোফ ছিনিয়ে নেওয়ার পর রাহুল কিছুটা নিশ্চিন্ত বোধ করেন।

১৯৪৫-এ রাহুল লেনিনগ্রাদে সংস্কৃতের প্রোফেসর হয়ে যান এবং লেনিনগ্রাদে লোলা ও ঈগরকে নিয়ে ২৫ মাসের জন্য ঘর বাঁধেন। এই পঁচিশ মাসেব ঘরকন্নার সময় নুন-তেল-লকড়ি নিয়ে রাহুলকে যে যুদ্ধ করতে হয়েছিল, তা ঘুমক্কড় রাহুলের বিশেষ গায়ে লাগেনি, তার কারণ সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি তাঁর অসামান্য মুগ্ধতা। তবু পিঠে করে রেশনের চাল-ডাল-নুন-তেল বয়ে নিয়ে আসতে হত। লকড়ি চিরত লোলা, কিন্তু রাহুলকে বাসন মাজতে হত। বাকি সময়টা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় ডুবে থাকতেন তিনি। এরই মধ্যে অল্প-স্বল্প ঘুমক্কড়ী এবং লোলা ও ঈগরকে নিয়ে প্রমোদ ভ্রমণ। তাছাড়া নতুন নতুন বইয়ের ছক মাথায় নিয়ে ঘোরাফেরা। অবশেষে সোভিয়েত মধ্য-এশিয়ার আকর্ষণ ও নিরন্তর হাতছানিতে তিনি নেশায়-পাওয়া মানুষের মতো ছিলেন লেনিনগ্রাদে। অতএব নুন-তেল-লকড়ি ছিল, জ্ঞানার্জনের নেশা এবং ঘুমক্কড়ীও ছিল। পুরোপুরি খুঁটিতে বাঁধা বলদ হয়ে যেতে পারেননি তিনি। তাছাড়া তাঁর অবচেতনে হয়তো একথা ছিল যে তিনি লোলার অতিথি। এখানে ক্ষণিক বিশ্রাম নিচ্ছেন। আবার তাঁকে ডানা মেলতে হবে।

চলে আসার সময় ঈগর কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, 'তুমি আর আসবে না।' লোলা কিছু বলেনি। কিন্তু রাহুলের মনে হয়তো এই ধারণা ছিল যে, লেনিনগ্রাদে তাঁর অবস্থান কোনো স্থায়ী ব্যাপার নয়। লোলা ও ঈগরকে তিনি ভালবাসেন। তবু তাঁকে একদিন চলে যেতে হবে। লেনিনগ্রাদে থাকার সময়েই রাশিয়ায় গোটা জীবন আরামে কাটানোর সুযোগ তাঁর মুঠোর মধ্যে এসে গিয়েছিল। কিন্তু তাঁর ঘুমক্কড়ীর নেশা তখনো কেটে যায়নি। প্রথম শ্রেণির ঘুমক্কড়কে যে লেখক, শিল্পী ইত্যাদি হয়ে দেশে ফিরে যেতে হয়,

তাও তিনি ভুলে যাননি। অতএব বিদায় নেওয়ার সময় কাঁদতে কাঁদতে ঈগর যখন বলছিল, 'আমি জানি তুমি আর ফিরে আসবে না', তখন রাহুলের মনে হয়েছিল ঈগরের কথা হয়তো ফলে যেতে পারে। লোলা কিছু বলেনি। হয়তো সেও বুঝতে পেরেছিল, রাহুলের পথের প্রেমের নেশা কেটে গেছে। সে আর ফিরবে না। ১৯৬৩-তে আর একবার রাহুলকে সোভিয়েত দেশে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। লোলা ও ঈগর তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল হাসপাতালে। রাহুল কথা বলতে পারেননি। কথা বলেছিল তাঁর চোখের জল।

১৯৪৭-এর অগস্টে রাহুল ভারতে চলে আসার পরও লোলা ও ঈগরের আশা ছিল—তিনি আবার রাশিয়ায় ফিরে যাবেন। ১৯৪৮-এর মার্চেও লোলা ও ঈগরের চিঠি আসছিল। কিন্তু হিন্দিতে সাহিত্য সৃষ্টি ও পারিভাষিক শব্দ নির্মাণের সর্বগ্রাসী কাজে রাহুল যেভাবে ডুবে ছিলেন, তাতে তাঁর পক্ষে আর রাশিয়ায় ফিরে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। রাহুল লিখছেন, 'আসল কথাটা যখন তারা জানতে পারবে, তখন তারা ভীষণ নিরাশ হবে।'

কিন্তু ১৯৪৮-এর মার্চেই লোলা ও ঈগর রাহুলকে শেষ চিঠি লেখেনি। বেশ কয়েক বছর পরে ১৯৫৩-র ১৫ অগস্ট লোলা রাহুলকে একটা চিঠি লিখেছিল। সেই চিঠি রাহুলের হাতে এসে পৌঁছেছিল ৩ সেপ্টেম্বর। চিঠি পাওয়ার পর রাহুল *মেরী জীবনযাত্রা*-য় লিখছেন ঃ 'ইতিমধ্যে আমার জীবন প্রবাহ অন্যদিকে মোড় নিয়েছে। ঈগর বেশ ভালোভাবে পড়াশোনা করছে জেনে আমি খুব খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু আমার জীবন তো এখন কমলা ও তার যে সন্তানেরা আসছে তাদের সঙ্গেই বাঁধা। ৫ সেপ্টেম্বর ঈগরের জন্মদিন, তাই ৪ সেপ্টেম্বর আমি তাকে জন্মদিনের অভিনন্দন জানিয়ে তার পাঠিয়ে দিই। লোলার চিঠি এলে কমলা বিরক্ত হয়। লোলাকে নিয়ে সর্বদাই ওর শঙ্কা। কিন্তু কেন ও বুঝতে পারে না যে, আমার প্রয়োজন এখানে। এমন দেশে ঈগরের জন্ম হয়েছে, যেখানে তার লেখাপড়ার কোনো অসুবিধা হবে না। তার দিন কেটে যাবে স্বচ্ছন্দে। লেখাপড়া শেষ হলে সে তার যোগ্য কাজ পাবে। এখন ওর পনেরো বছর বয়স। জয়ার জন্ম হয় ১৯৫৩-র ২০ সেপ্টেম্বর আর জেতার ১৯৫৫-র ৩১ জানুয়ারি। এই দুই শিশুকে ছেড়ে আমার পক্ষে রাশিয়ায় চলে যাওয়া অসম্ভব।.... কিন্তু লোলা ও ঈগরকে কমলা সহ্য করতে পরত না।'

ঈগরকে যে কমলা একেবারেই সহ্য করতে পারত না তার প্রমাণ ১৯৫৪-তে ঈগর রাহুলকে যে চিঠি লিখেছিল, তা নিয়ে রাহুলের প্রতি কমলার আচরণ। রাহুল *মেরী জীবনযাত্রা*-য় লিখছেন, 'ঈগরের চিঠি এসেছিল। সেই চিঠি আমাকে দেখাতে এসেছিল কমলা। সে আগেই সেই চিঠি পড়েছিল। সে চাইছিল যে, আমি যেন ঈগরকে কখনো চিঠি না লিখি। আমি কমলাকে বোঝাতে চেষ্টা করতাম যে, ওর সুযোগ-সুবিধার দিকেই আমি সব চেয়ে বেশি দৃষ্টি দিচ্ছি এবং তা করছি শুধু ওর জন্যই নয়, শিশুদের জন্যও। আমি জানি যে, জয়া ও তার যে অনুজ আসছে, তাদের জন্যই আমার বাকি জীবনটা

দিতে হবে। কেননা, তাদের জন্ম এমন দেশে হয়েছে যেখানে রাষ্ট্র কিছু দেয় না, মা-বাবাই তাদের সর্বস্ব। কিন্তু ঈগর আমার ছেলে। আমি তাকে ভালবাসি। সেও আমার কাছে উপদেশ পরামর্শের আশা রাখে। ও সাম্যবাদী দেশে জন্মেছে, সেখানে সে নিজেই তার ক্ষমতা অনুযায়ী বিনা বাধায় লেখাপড়া শিখে তার কাজের যোগাড় করে নেবে। কিন্তু আমি যদি তার চিঠিরও জবাব না দিতে পারি, তবে আমি তাতে অত্যন্ত নির্যাতিত বোধ করব। কিন্তু কী করব। ন্যায়ই হোক, অন্যায়ই হোক কমলা তাই চাইছিল। বুঝতে পারছিলাম কমলার কথাই মেনে নিতে হবে।'

কমলা ঃ নুন-তেল-লকড়ি

রাহুল তাঁর *ঘুমক্কড় শাস্ত্রে* লিখেছেন যে, পৌরুষ ও দেহে বল থাকতে থাকতে যদি কোনো ঘুমক্কড় ভুল করে ফেলে অর্থাৎ বিয়ে করে ফেলে, তবে অন্তত তার দাঁড়াবার একটা জায়গা থেকে যায়। কিন্তু সময় চলে যাওয়ার পর শক্তি শিথিল হয়ে যাওয়ার পর যদি কাঁধে ভার বহন করতে হয়, তবে তা অধিকতর দুঃখের কারণ হয়। এটা মনে রাখতে হবে যে, ঘুমক্কড়ের অন্তিম জীবন পেনশনভোগীর জীবন নয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জ্ঞান ও উপলব্ধি বেড়ে যেতে থাকে। এই জ্ঞান ও উপলব্ধি থেকে মানুষ যদি লাভবান হয়, তবেই ঘুমক্কড়ের দায়িত্ব পালিত হয় ও তার হৃদয়ের ভার হালকা হয়। তাকে আরও একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, যত বয়স বাড়তে থাকে তত দিন ও রাত ছোটো হতে থাকে। অথচ তখন কাজও বেড়ে যেতে থাকে। এ সময় তাকে নিজের কাজ গোছাতে হবে। এই সময়ের মূল্য খুব বেশি। কেননা এ সময়ে তার যা কিছু দেওয়ার আছে দেশকে, তা দিয়ে তাঁকে মহাপ্রয়াণের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। এ সময়ে প্রেম করার প্রশ্নই ওঠে না এবং ঘুমক্কড়ী থেকে পেনশন নিয়ে প্রেম করা উচিতও নয়। রাহুল এই কথাগুলি লিখেছিলেন ১৯৪৯-এ।

তিনি এ সময়ে পরিভাষা নির্মাণের কাজে ডুবে ছিলেন। একস্থানে স্থির হয়ে বসে সংগৃহীত পারিভাষিক শব্দকে সাজানো প্রয়োজন ছিল। তার জন্য তিনি কালিম্পঙকে বেছে নিয়েছিলেন। কারণ 'আমি কি শহরের থেকে গ্রামকে, সমতল থেকে পাহাড়কে বেশি ভালবাসি?' কালিম্পঙ গ্রাম নয়, 'কিন্তু কালিম্পঙকে আমার খুব ভালো লাগে। কিন্তু তার থেকেও বেশি ভালো লাগত ভারতের সীমান্তের শেষ গ্রাম লাছেনকে।' এই গ্রাম পেরোলেই তিব্বত। লাছেনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের তুলনা নেই। এখানে রাহুলের ভালোবাসার দেবদারুরও অতুলনীয় সৌন্দর্য। এই গ্রামের আরো বড় আকর্ষণ, এই গ্রাম তিব্বতের সীমার কাছে। সারা জীবন রাহুল হিমালয়, দেবদারু ও তিব্বতকে ভালোবেসেছেন। তিব্বতি ভাষা বলতে পারে এমন লোকও এখানে ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারিভাষিক শব্দ নির্মাণের প্রয়োজনে আপাতস্থায়ী নিবাস হিসেবে তাঁকে কালিম্পঙকেই বেছে নিতে হল।

১৯৪৯-এর ১৪ জুন কালিম্পঙ-এ কমলার সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল রাহুলের।

পারিভাষিক শব্দ সাজানোর জন্য কিছু কুশলী ছেলে-মেয়ের দরকার ছিল তাঁর। বন্ধু পরমহংস মিশ্রের সুপারিশে কমলা রাহুলের ভাড়াটে বাড়ি 'ধর্মোদয়'-এ এসে কাজ করতে শুরু করে। কমলার হস্তাক্ষর স্পষ্ট। সে ম্যাট্রিক পাস। ম্যাট্রিক পাস করা ছেলে-মেয়েদের এ সময়ে কাজ মেলা সহজ ছিল না। কমলার শরীর দুর্বল। আর্থিক অবস্থাও ভালো ছিল না। কিন্তু তার পড়াশোনা করার ইচ্ছা খুব ছিল। তাই রাহুলের ওখানে যখন সে কাজ করতে আসত তখন সে পড়াশোনা করার জন্য বইও নিয়ে আসত।

পারিভাষিক শব্দ সাজানো ছাড়াও বই লেখার জন্য শ্রুতিলেখকের সমস্যাও ছিল রাহুলের। সব সময় ভালো শ্রুতিলেখক পাওয়া যেত না। মহেশজি ভালো শ্রুতিলেখক ছিলেন। কিন্তু মহেশজি চলে যাওয়ার পর শ্রুতিলেখক মেলা কঠিন হল। ১৯৪৫-এ ভারতে এসে শ্রুতিলেখকের সাহায্যেই রাহুল আধ ডজনেরও বেশি ছোটো-বড় বই লিখেছেন। তাছাড়াও আর একটি সমস্যা ছিল। ডায়াবেটিজ। রাহুল বুঝতে পেরেছিলেন যে ডায়াবেটিজ কমবে না (ডায়াবেটিজও তাঁকে ১৯৪৫-এই ধরেছিল) এবং এই ব্যাধির যন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য ইনসুলিন নেওয়া দরকার ছিল। এতদিন তা না নিয়েই চলে গেছে। কিন্তু বেশিদিন ইনসুলিন না নিয়ে থাকতে পারবেন, এমন আশা ছিল না। ঠিক এই সময়েই কমলা রাহুলের কাজ করতে এল। শ্রুতিলিখনের কাজ সে ভালোভাবেই করতে পারত, টাইপ করাও সে শিখে নিয়েছিল। তাতে প্রত্যেক বইয়ের দুটো কপি তৈরি হয়ে যেত। এভাবে এক ধরনের নিশ্চিন্ততা এসেছিল রাহুলের।

১৯৪৯-এর ১৪ জুন কমলা রাহুলের ওখানে কাজ করতে এসেছিল। ১৪ জুনই রাহুল *ঘুমক্কড় শাস্ত্র* লিখতে শুরু করেছিলেন। *ঘুমক্কড় শাস্ত্র* ১৯৪৯-এই মুদ্রিত হয়েছিল। কিন্তু বইটির তিন হাজার কপি ছাপা শেষ হয়েছিল ১৯৫৬-তে।

ঘুমক্কড় শাস্ত্র-র প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় রাহুল মহেশজি ও কমলা পরিয়ারকে (পরে সাংকৃত্যায়ন) সহায়তার জন্য ধন্যবাদ জানান। *ঘুমক্কড় শাস্ত্র* যখন রাহুল লিখছিলেন, (যে বই লিখতে কমলা তাঁকে সহায়তা করেছিল) তখন তাঁর জীবনে কী ঘটতে যাচ্ছে, সে বিষয়ে তাঁর কি কোনো পূর্ববোধ ছিল? বিশেষত বেশি বয়সে প্রেমের মারাত্মক ভবিতব্যতা নিয়ে তাঁর মনে কি কোনো শঙ্কা জাগেনি? তিনি যখন লিখছেন, 'সময় চলে যাওয়ার পর, শক্তি শিথিল হয়ে যাওয়ার পর কাঁধে ভার এলে অধিকতর দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ...এ সময় প্রেম করার প্রশ্নই ওঠে না এবং ঘুমক্কড়ী থেকে পেনশন নেওয়া উচিতও নয়,' তখন কি তাঁর মনে এই শঙ্কা জাগেনি যে প্রেম এই মারাত্মক ভবিতব্যতা নিয়েই তাঁর জীবনে আসছে অথবা এসে গেছে? হয়তো জাগেনি, না জাগার কারণ হয়তো অস্বাভাবিক দ্রুতিতে লিখিত অথবা শ্রুতি-লিখিত একাধিক বই এবং এই সব বই লেখার পরই অন্য বই লেখার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া। লিখিত কোনো বই সম্পর্কেই হয়তো রাহুল পশ্চাৎ-চিন্তা করেননি অথবা তা করার সময় ছিল না তাঁর।

পশ্চাৎদৃষ্টির আলোকে বোঝা যায় যে ঘুমক্কড় রাহুলের অন্তিম জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবে উপরে উদ্ধৃত কয়েকটি ভয়ঙ্কর বাক্য।

কমলা রাহুলের ঘরে আসায় রাহুলের কালিম্পঙ-এর জীবনে নিশ্চিন্ততা এসেছিল, সন্দেহ নেই। কিন্তু ক্লান্ত এই পাখির ডানা কাটা গিয়েছিল, তাতেও সন্দেহ নেই। রাহুলের *মেরী জীবনযাত্রা*-র চতুর্থ খন্ডে নুন-তেল-লকড়ির, কমলার দীর্ঘায়িত ছায়ার প্রাধান্য। *মেরী জীবনযাত্রা*-য় ঘুরে ঘুরে কমলার কথাই আসছে। কমলা ভালোভাবে টাইপ করতে শিখছে, নিজে থেকেই হিন্দি বই পড়ছে, রাহুল তাকে হিন্দি বিশারদ পরীক্ষার জন্য তৈরি হতে সাহায্য করছেন। ক্রমশ কমলা রাহুলের কাছে আসছিল। ১৮ অগস্ট বৃষ্টিতে ভিজে কমলা রাহুলের ওখানে কাজ করতে এল। সেই দিন রাহুল তাকে তাঁর বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন এবং সেখানে থেকেই পরীক্ষার জন্য তৈরি হতে বলে দিলেন। কমলারা পাঁচ ভাই-বোন। বড় ভাই কষ্টে-সৃষ্টে তার নিজের খরচ চালাত। কমলার মা ভাড়া করা সেলাইয়ের মেশিনে দর্জির কাজ করে সংসার চালাতেন। কমলাকে তার মাকে একটি সেলাইয়ের মেশিন কিনে দিতে বললেন রাহুল।

এতদিনে কমলা রাহুলের খুব কাছাকাছি এসে গেছে। কমলা রাহুলকে ইনসুলিন ইন্‌জেকশন দিচ্ছে। তাঁর পড়াশোনা করার ইচ্ছা ছিল, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল। তার ওপর একই বাড়িতে নিরন্তর সান্নিধ্য। তাই দুজনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হওয়া স্বাভাবিক ছিল।

ডায়াবেটিজ তো রাহুলের চিরকালের সঙ্গী হয়ে গেছে। কখনো মুখ শুকিয়ে যেত, কখনো প্রস্রাব বেশি হত, কখনো কম; খাওয়া-দাওয়াও অনেক কমিয়ে দিয়েছিলেন রাহুল। ইতিমধ্যে কমলাও চমৎকার টাইপ করতে শিখে গিয়েছিল, সংসারের কাজকর্মও সেই সামলাচ্ছিল। কিন্তু তারও স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছিল না। সব সময় মাথা ধরে থাকত। কমলা বুদ্ধিমতী। পড়াশোনায়ও তার আগ্রহ ছিল। সুতরাং রাহুল স্থির করেছিলেন যে তাকে আরো পড়াবেন। ক্রমাগতই তিনি কমলার কথা ভাবছেন। ওর স্বাস্থ্য ভালো নয়। দুর্বল ও কৃশ হলেও কমলার উদ্যমের অভাব নেই। কিন্তু ওর পক্ষে রান্নাঘরের ভার নেওয়াও সম্ভব নয়। তাছাড়া ডায়াবেটিজ আক্রান্ত না হলেও রাহুলের পক্ষে হিসাব-নিকাশ ও ঘর-গৃহস্থালির দিকে নজর দেওয়া অসম্ভব ছিল। কারণ সপ্তাহের সাতদিনই তিনি কাজে লেগে থাকতেন। তাই তিনি বুঝতেই পারতেন না কখন সকাল হল, কখন সন্ধ্যা হল, কখন সপ্তাহ কেটে গেল। তাঁর ডায়েরিতে লিখছেন, 'এভাবেই জীবনের সব দিন খরচের খাতায় চলে যায়। মানুষকে শক্তির সীমা বুঝে সে যে কাজ করবে তা স্থির করতে হবে এবং সেই কাজ শেষ করার কথাই ভাবতে হয়।'

রাহুল যেখানে থাকছিলেন অর্থাৎ 'ধর্মোদয়'-এ, সেখানে লোকজনের যাওয়া ক্রমাগতই বেড়ে যাচ্ছিল। তাই তাঁকে বাড়ি পালটাতে হল। চলে গেলেন 'পার্বতী'তে, বেশ বড়, খোলামেলা বাড়ি। কিন্তু কালিম্পঙ-এ থাকার সময় ফুরিয়ে আসছিল। পরিভাষা নির্মাণের কাজ শেষ হবে না, তিনি বুঝতে পারছিলেন। সামগ্রিকভাবে পারিভাষিক শব্দ নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হয়নি, যদিও *শাসন শব্দকোষ* রাহুল স্বয়ং সম্পূর্ণ করেছিলেন এবং তা মুদ্রিত হয়েছিল। আলাদা আলাদা ভাবে আরো কয়েকটি শব্দকোষ

তৈরি হয়েছিল—যেমন, *প্রত্যক্ষ শরীর* (এ্যানাটমি) ইত্যাদি। ক্রমশ বুঝতে পারছিলেন যে পরিভাষা নির্মাণের কাজ হয়তো তিনি বেশি দিন করতে পারবেন না। সম্মেলনের প্রেস যদি উদ্যোগী হয়ে পরিভাষা মুদ্রণের কাজ শুরু করত, তাহলে পরিভাষা দ্রুত তৈরি হয়ে যেত। কিন্তু সাহিত্য সম্মেলনের ভেতরের রাজনীতি এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল যে, পারিভাষিক শব্দের মুদ্রণের সম্ভাবনা বিশেষ ছিল না। তবু হয়তো পারিভাষিক শব্দের কাজ বন্ধ হয়ে যেত না। বন্ধ হয়ে গেল হিন্দি পারিভাষিক শব্দ তৈরির কাজ কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক নিয়ে নেওয়ায়। তার কারণ মৌলানা আজাদের উদাসীনতা অথবা কাজ বন্ধ রাখার নীতি। শিক্ষামন্ত্রকের কাজ ছিল পারিভাষিক শব্দ তৈরির কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া; কিন্তু উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা না করায় মৌলানা আজাদের মনে বড় আঘাত লেগেছিল। তাই তিনি নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। কৃষিমন্ত্রক ও কৃষিবিভাগ পারিভাষিক শব্দ তৈরির সমিতি করেছিল। তাতে রাহুলকে সদস্য করা হয়েছিল। অন্যান্য বিভাগও এই ধরনের সমিতিতে রাহুলের নাম রেখেছিল। মুসৌরি আসার পর রাহুলের হাতে এত কাজ এসে জুটেছিল যে, এইসব সমিতির সদস্য থাকলে তিনি ভালোভাবে তাঁর কাজ করতে পারতেন না।

পরিভাষার কাজের জন্যই ঠাণ্ডা জায়গা খুঁজে খুঁজে রাহুল কালিম্পঙ-এ এসেছিলেন। এবার কালিম্পঙ থেকে যেতে হবে। অন্য কোনো জায়গা খুঁজে বার করতে হবে।

(১৯৪৯-এর ১৮ সেপ্টেম্বর জানতে পারলেন যে, সংবিধান সভা হিন্দিভাষা ও দেবনাগরিকে রাষ্ট্রভাষা ও রাষ্ট্রলিপি হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে।)

১৯৪৯-এর ডিসেম্বরে কালিম্পঙ-এর বাসস্থান ছেড়ে চলে গেলেন রাহুল, কমলা। এ বছর তাঁর প্রধান কাজ ছিল *ঘুমক্কড় শাস্ত্র* ও *আজ কী রাজনীতি*। দুটি বইই প্রকাশিত হয়েছিল। *মধুর স্বপ্ন* লেখা হয়েছিল ২৬ অধ্যায়। সংবিধানের হিন্দি অনুবাদেও অনেকটা সময় ব্যয় করেছিলেন তিনি।

১৯৪৯-এর ডিসেম্বর রাহুল কমলাকে নিয়ে হায়দরাবাদ সম্মেলনে চলে যান। ১৯৫০-এর ভোর হল বোম্বাইগামী ট্রেনে।

নীড়ের খোঁজে

১৯৫০-এর জানুয়ারিতে রাহুলের বয়স হয়েছিল প্রায় ৫৭। আজকের দিনের তুলনায় এই বয়সটা খুব বেশি নয়। কিন্তু জীবনভর নিরন্তর উড্ডীন পাখি এখন ক্লান্ত। সে এখন নীড়ের খোঁজ করছিল। এই ক্লান্ত পাখির এখন নুন-তেল-লকড়ির কথাও ভাবতে হচ্ছিল। তাঁর লেখা বই থেকে যে রয়ালটি আসত, তাই ছিল নুন-তেল-লকড়ি অথবা রোটি কাপড়া ঔর মকান জোটাবার একমাত্র উপায়। রাহুলের প্রকাশক কিতাব মহল ১৯৪৯-এর ১১ জানুয়ারি থেকে ১৯৫০-এর মার্চ পর্যন্ত তাঁর রয়ালটির যে হিসেব পাঠিয়েছিল তা থেকে জানা যায় যে, ঐ বছরে তাঁর প্রাপ্য রয়ালটির পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৫,২০৩ টাকা সাড়ে ৯ আনা। রাহুল জানতেন যে, মাসিক পাঁচশো টাকা অথবা বার্ষিক

৬০০০ টাকার কমে তাঁর কুলোবে না। যখন তিনি শুধুই ঘুমক্কড়ী করতেন, তখন একেবারে অকিঞ্চন হয়েও জীবনযাপনে কোনোই অসুবিধা ছিল না। কিন্তু এখন তো তাঁকে স্থায়ী নীড় খুঁজে বার করতে হবে এবং তা সম্ভব না হলে অস্থায়ী ঘর বাঁধতে হবে। তাই এখন খরচটা স্থায়ী, কিন্তু আয় অস্থায়ী।

নীড়ের খোঁজে আবার আর এক দফা ঘুমক্কড়ী ঃ আবার একবার কালিম্পঙ, গ্যাংটক, কলকাতা, নৈনিতাল, কুমায়ুন, আলমোড়া, রানিখেত। আজীবন যে মানুষ হিমালয়কে ভালোবেসেছেন, রমণীয় দেবদারু যাঁর অন্তরে বাসা বেঁধেছিল, তাঁর সাময়িক অথবা স্থায়ী আবাস মিলে যাবে হিমালয়ে, তাই স্বাভাবিক।

শেষ পর্যন্ত মুসৌরিতে 'হর্নক্লিফ' নামে বাংলো রাহুলের নামে রেজিস্ট্রি করা হল। বাড়ি রেজিস্ট্রি করতে রাহুল নিজে যাননি। ডঃ সত্যকেতু গোটা কাজটা করে দিয়েছিলেন। ডঃ সত্যকেতু তাঁকে মাতার সিংহ নামে পাচকও ঠিক করে দিলেন। অতএব রাহুল মুসৌরির 'হর্নক্লিফ'-এর বাসিন্দা হয়ে গেলেন। প্রথমদিকে নতুন নতুন মুসৌরিকে ভালোই লেগেছিল। কিন্তু যত দিন যেতে লাগল এর নতুনত্ব চলে যেতে লাগল। কমলার এই স্থানের প্রতি স্নেহ ধীরে ধীরে কমে যেতে লাগল। সে তপস্বিনী হয়ে জন্মায়নি। সে জন্মগত ঘুমক্কড়ও নয়।

নুন-তেল-লকড়ি ঃ মুসৌরি

১৯৪৩-এ রাহুল একবার মুসৌরি এসেছিলেন, তখন মুসৌরির লনঢৌ বাজারের কিষান সিংহের কুটিরে রাহুল থেকেছিলেন। কনম গ্রামের বাসিন্দা ছিল ঘুমক্কড় কিষান সিংহ। ঘুমক্কড়ীই তাঁকে মুসৌরি নিয়ে আসে। সে বেশ কয়েকবার তিব্বত গিয়েছিল। মাতৃভাষার মতো তিব্বতি বলত সে। লনঢৌর বাজারে সে ছোটো দোকান দিয়েছিল। শেষপর্যন্ত তাকে ঘুমক্কড়ের জীবন ছেড়ে গৃহী হয়ে প্রথম চতুষ্পদ, পরে ষটপদ ও অষ্টপদ হতে হয়।

মুসৌরিতে 'হর্নক্লিফ'-এ এসে রাহুল কমলাকে নিয়ে লনঢৌর বাজারে কিষান সিংহের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। রাহুলের ঘুমক্কড়ী শেষ হয়ে এসেছিল। কিন্তু ঘুমক্কড়ীর স্মৃতি-আতুরতা কোনোদিনই রাহুল মন থেকে মুছে ফেলতে পারেননি। মুসৌরির তিনটি বাজারের মধ্যে লনঢৌর বাজারই একমাত্র মরশুমি বাজার ছিল না। লনঢৌর বাজারে সারা বছরই পাহাড়িরা গ্রাম থেকে বেচাকেনা করতে আসত। পাহাড়িরা তাদের মালপত্র পিঠে বয়ে আনত। রাহুলেরও এ সময়ে ইচ্ছা হয়েছিল যে তিনি নিজে সব মালপত্র পিঠে বয়ে আবার ঘুমক্কড়ী করবেন। এই ইচ্ছা তাঁর অপূর্ণ থেকে গিয়েছিল। প্রথম তিব্বত যাত্রার সময় শুধু একবার কয়েক দিনের জন্য তিনি নিজের মালপত্র পিঠে বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাছাড়া আর কখনো তিনি পিঠে মাল বয়ে নিয়ে যাননি। কারণ সবসময় রাহুলের প্রয়োজনের অতিরিক্ত মালপত্র থাকত। মাল বয়ে নিয়ে যাওয়ার অভ্যাসও তাঁর ছিল না। রাহুলের মনে হয়েছিল — এখন অভ্যাস করে সেই অপূর্ণ ইচ্ছা

তিনি পূর্ণ করবেন। প্রথম যখন ঘুমক্কড়ী শুরু করেন তখন বড় আনন্দে তিনি একটি সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করতেন, 'একাকী নিস্পৃহঃ শান্তঃ পানি পাত্রো দিগম্বরঃ কদা ভবিষ্যামি।' পানি পাত্র ও দিগম্বর হওয়ার সাধ রাহুলের মিটে গিয়েছিল। কিন্তু নিজের মাল পিঠে বয়ে নিয়ে ঘুমক্কড়ীর সাধ তখনো মেটেনি। কিন্তু আর সে-কথা ভাবার সময় ছিল না। এখন তো রাহুল ঘর বেঁধেছেন। আর গৃহের সঙ্গে গৃহিনীও এসে গেছেন। অন্য পরিস্থিতিতে ও অন্য উদ্দেশ্যে রাহুল ও কমলার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে সেই ঘনিষ্ঠতার রূপ ও রঙ পালটে গেছে। তা এখন ভালোবাসা। কিন্তু দুজনের বয়সের ব্যবধানের কথা মনে এলে রাহুলের মনে দ্বিধা হত। মনে হত কমলাকে সুশিক্ষিত করে নিজের পায়ের উপর দাঁড় করিয়ে দেওয়াই উচিত হবে। কিন্তু দেশের সমাজের দিকে তাকালে মনে হত—এই ব্যবস্থা নীচ স্বার্থপরতারই নামান্তর হবে। শেষ পর্যন্ত কমলা ও রাহুলের এক সঙ্গে থাকাটার সমাজ যে অর্থ করেছিল, রাহুলের তা নিয়ে কোনো ভাবনা ছিল না। কিন্তু দুজনের একসঙ্গে থাকা সম্পর্কে অপরের টীকা-টিপ্পনী কমলাকে কী রকম বিহ্বল করত তা রাহুলের চোখ এড়াত না। যা স্বাভাবিক সেইদিকেই যে তাঁরা অগ্রসর হচ্ছিলেন সে বিষয়ে দুজনেরই কোনো সন্দেহ ছিল না। গৃহ, গৃহিণী ও ঘুমক্কড়ীর সহাবস্থান সম্ভব নয়। অতএব ১৯৫০-এ রাহুলের ঘুমক্কড়ীর অবসান হল। ঘুমক্কড় হওয়ার স্বপ্নও আর নয়।

শেষ পর্যন্ত দুজনের সম্পর্কের বৈধ পরিণতি ঘটেছিল। কালাসঙ্গতি সত্ত্বেও এখানে দুজনের বিয়ের কথাটা বলে নেওয়াই ভালো।

মেরি জীবনযাত্রা-র চতুর্থ খণ্ডে রাহুল তাঁর বিয়ের বিবরণ দিয়েছেন ঃ 'দেড় বছর হয়ে গেছে কমলার সঙ্গে এক সঙ্গে আছি। তাঁকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রথম পদক্ষেপ ছিল এই যে, এই বছর সে বিশারদ পরীক্ষা দেবে। এতদিনে আমরা পরস্পরকে ভালোভাবেই জেনে গিয়েছিলাম। স্ত্রী-পুরুষের এই ধরনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককে অনিশ্চিত অবস্থায় রাখা ঠিক নয়। পুরুষ-শাসিত দেশে এই ধরনের পরিস্থিতি নারীর পক্ষে একেবারেই সহনীয় নয়। অতএব ১৮ ডিসেম্বর আমরা এই সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আমরা বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীতে পরিণত হব। কিন্তু তবু দুজনের বয়সের ব্যবধানের দ্বিধা আমার ছিল। ২৩ ডিসেম্বর ঊষাবাবার সঙ্গে ডঃ সত্যকেতু ও শীলাজি বেলা এগারোটা নাগাদ এলেন। আশা করেছিলাম নাগার্জুনও আসবেন, কিন্তু তাঁর আসা হয়ে ওঠেনি। মহাদেব ভাই আমার সঙ্গেই ছিলেন। বেলা বারোটা নাগাদ ডঃ সত্যকেতু পুরোহিত হলেন এবং আমাদের দুজনের বিয়ে হয়ে গেল।' দেড় বছর ধরে কমলা রাহুলের সাহিত্য-কর্মের ও স্বাস্থ্যের যেভাবে দেখাশোনা করেছেন তা শ্লাঘনীয়। ডায়াবেটিজে আক্রান্ত দেহকে ঠিক মতো চালানোর জন্য কমলার সেবা-পরায়ণা হাতের প্রয়োজন ছিল রাহুলের। 'আমি যদি ওকে বিয়ে না করতাম তাহলে তা হত স্বার্থপরতা এবং কমলার প্রতিও অত্যন্ত অন্যায় করা হত। পরদিন ২৪ ডিসেম্বর পরীক্ষা দেওয়ার জন্য কমলার দেহরাদুন যাওয়ার কথা ছিল। তাই আগের দিন বিয়েটা হয়ে গেল।'

বড় করুণ বিয়োগান্ত এই মিলন। ২৩ ডিসেম্বর বিয়ে হল। ১৯ ডিসেম্বরও রাহুলের শরীরের ঘা শুকোয়নি। এই দিন থেকেই খাওয়ার আগে প্রতিদিন ইনসুলিন নিতে হচ্ছিল। প্রতিদিন সিবাজল ট্যাবলেট খেতে হচ্ছিল। এখন থেকে প্রতিদিন ইনসুলিন নিতে হবে তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল রাহুলের কাছে। ৩১ ডিসেম্বর রাহুল ডায়েরিতে লিখছেন, 'এখনো ঘা ভালো হচ্ছে না। আগামী কাল পেনিসিলিন নিতে হবে। আড়াই মাস হল ঘা হয়েছে। তা থেকে বোঝা যাচ্ছে রোজ ইনসুলিন নিতে হবে এবং যথাসম্ভব ঘা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে হবে। মুসৌরি থাকলে তার সম্ভাবনা কম। অথচ ট্রেনে, মোটরে অথবা পায়ে হেঁটে যেভাবেই হোক বাইরে বেরোলে ঘা হওয়ার ভয় থাকত।' তাই বাইরে বেরোবার ঝোঁক ছেড়ে দিতে হল। প্রথম দিকে সকাল ও সন্ধ্যায় দুবার ইনসুলিন নিতে হচ্ছিল। পরে রাহুলের মনে হল, রাত্তিরে কিছু না খেলে দুবার ইনসুলিন না নিলেও হয়তো চলতে পারে। 'কিন্তু ডাক্তার বললেন, একবার বেশি খেলে হৃদযন্ত্রের ওপর বেশি চাপ পড়ে। তাই বুকে ব্যথা হচ্ছে। পরে ২৪ ঘণ্টার ইনসুলিন নিয়ে দুবারই খেতে শুরু করলাম........টক্ উদ্‌গার উঠছিল। ঘা না থাকলেও ইনসুলিন নিতে হত। তা না হলে প্রস্রাব বেশি হলে মুখ শুকিয়ে যেত এবং মস্তিষ্ক এক ধরনের তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকত। অতএব ইনসুলিনব্রতী হওয়া ছাড়া আমার উপায় ছিল না।'

২৪ ডিসেম্বর কমলা দেহ্‌রাদুন চলে যায়। দেহ্‌রাদুন থেকে সে কালিম্পঙ হয়ে একমাস পরে ফিরবে। ২৪ ডিসেম্বর রাত্রিতে বৃষ্টি হয়েছিল। ২৫ ডিসেম্বর বড়দিনের সকালে বরফ পড়তে লাগল। রাহুল জানালা দিয়ে দেখছিলেন—তাঁর বাগান ও রাস্তা বরফের সাদা চাদরে ঢেকে গিয়েছিল। সব গাছের শাখা, পাতা, বরফে ঢাকা। তাঁর বাড়ির ছাদ ও আশেপাশের অন্যান্য সব বাড়ির ছাদে বরফ। কীট-পতঙ্গ, পশুপক্ষীর কোনো শব্দ নেই। চারদিকে অখণ্ড নীরবতা। এই অখণ্ড নীরবতার মধ্যে বরফে মোড়া প্রকৃতিকে দেখে রাহুলের কি পুরনো দিনের কথা, তিব্বত-লাদাখ যাত্রার কথা মনে পড়েছিল? স্মৃতি-আতুরতা কি তাঁকে আবিষ্ট করেছিল? লাদাখে বরফে-ঢাকা পথ অতিক্রম করার কথা কি তাঁর মনে উঁকি দিয়েছিল? রাহুল গঙ্গারামকে নিয়ে খর্দোঙ যাচ্ছিলেন। সরকারি অফিসারের বাড়িতে রাত্রিতে থাকার নিমন্ত্রণ ছিল। প্রচণ্ড শীতে তাঁরা দুজন ঘোড়ায় চড়ে বেগার-খাটা কিষানদের সঙ্গে রাত দুটোতে রওনা হয়েছিলেন। লাদাখে বরফে ঢাকা জোত পার হওয়ার এই ছিল উপযুক্ত সময়। রোদ ওঠার আগেই বরফের রাস্তা শেষ করতে হত। নয়তো রোদে বরফ নরম হয়ে গেলে মানুষ ও পশুর পা বরফের মধ্যে ঢুকে যেত। উঁচু জায়গা থেকে লাখ লাখ মন বরফের ধস নামার ভয় থাকত। 'ঘোড়াগুলো প্রত্যেক দশ পা গিয়ে নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য থামছিল। আমরা সাদা বরফের ফরাশের ওপর দিয়ে চলতে লাগলাম। চাঁদনি রাতে বরফ খুব ঝক্‌ঝক্ করছিল। পাতলা হাওয়ার জন্য নিঃশ্বাস নেওয়া আর পা ওঠানোর মধ্যে কারো কথা বলার ফুরসত ছিল না। সেই স্তব্ধতার মধ্যে শুধু জানোয়ারদের নিশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছিল....মনে হচ্ছিল ধীরে ধীরে পা মেপে মেপে যুগ যুগ ধরে রাস্তা পার হচ্ছিলাম। পনেরো হাজার, ষোলো হাজার,

সতেরো হাজার, আঠারো হাজার ফুট পর্যন্ত পৌঁছোনো—বলতে সোজা মনে হয়, কিন্তু এই প্রত্যেক হাজার ফুট মানুষ ও পশুর ফুসফুস, পা ও পিঠের ওপর কী অসহ্য ভার চাপিয়ে দেয়, কী রকম পীড়া এনে দেয়, ভাষায় তার আভাস দেওয়াও কঠিন।'

রাহুল খর্দোঙ হয়ে নুব্রা গিয়েছিলেন ১৯২৬-এর জুলাই অথবা অগস্টে। ১৯৫০-এর ২৫ ডিসেম্বর রাহুল 'হর্নক্লিফ'-এ তাঁর ঘরে খাটিয়ায় বসে বরফে ঢাকা মুসৌরিকে দেখছিলেন। আঠারো হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের পথ চলার অসহ্য বোঝা ও পীড়া কি এখন এক আনন্দময় বেদনা হয়ে তাঁর কাছে আসছিল? ২৪ বছর, সে তো অনেক দিন। কিন্তু নিয়ত ভ্রাম্যমান যাযাবর তো দিনের হিসেব রাখে না। সব আনন্দ দুঃখ যন্ত্রণা শুধুই আনন্দের স্মৃতি হয়ে তাঁর দেহের প্রত্যেকটি কোষকে ভরে রাখে।

১৯৫০-এর শেষ সপ্তাহে তিনি খাটিয়ায় বসে *গাঢ়েওয়াল* লিখছিলেন। ১৯৫০-এর ৩১ ডিসেম্বর ছিল রবিবার। ঐ দিন তিনি হিসেব করে দেখলেন যে তাঁর রুগ্ন শরীর ইনসুলিনকে সঙ্গী করে যে কাজ করেছে, তাতে তাঁর খুশি হওয়া উচিত। এই বছর তার *মধুর স্বপ্ন* ও *দার্জিলিঙ পরিচয়* প্রকাশিত হয়েছে। *কুমায়ুন* প্রেসে গেছে। *আদি হিন্দী*-ও মুদ্রিত হচ্ছে। কিন্তু সামনে এখনো অনেক কাজ। সবচেয়ে বড় কাজ *মধ্য-এশিয়া কা ইতিহাস*। তাতে কতটা সময় লাগবে তিনি বুঝতে পারছিলেন না। তিনি স্থির করেছিলেন, ১৯৫০-এ তিনি বাইরে বেরোবেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁকে বেরোতে হয়েছিল।

নুন-তেল-লকড়ি ঃ সাহিত্য রচনা

রাহুল 'হর্নক্লিফ'-এ স্থায়ীভাবে বাস করতে শুরু করার পর থকে সেখানে তাঁর সাহিত্যিক অতিথিদেব আনাগোনা চলতে থাকে। তাছাড়া তাঁর সঙ্গে স্থায়ীভাবে বাস করতেন এমন সহকারীরা তো ছিলেনই। শেষ পর্যন্ত সাহিত্যিক বন্ধু ও অতিথিদের জন্য 'হর্নক্লিফ'-এর উপরের পাহাড়ের একটা বাংলো ভাড়া নিতে হল। ফলে রাহুলকে কেন্দ্র করে সাহিত্যিকদের একটা গোষ্ঠী মুসৌরিতে গড়ে ওঠে। কিন্তু মুসৌরিতে এসে বিবাহিত জীবনের ঘরকন্না শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমক্কড়ী একেবারে ঘুচে গিয়েছিল, তা বলা চলে না। তার জন্যও কিছুটা সময়ের প্রয়োজন ছিল। তাই অনুপযোগী শরীর নিয়েও পুরোনো অভ্যাসবশে তিনি ২ মে (১৯৫১) মুসৌরি থেকে কেদার-বদরির পথে রওনা হন। তারপর ঋষিকেশ, রুদ্রপ্রয়াগ, গুপ্তকাশী, তিরযুগী নারায়ণ, গৌরীকুণ্ড, কেদারনাথ, কালীমঠ, ঊখীমঠ, তুঙ্গনাথ, গোপেশ্বর, বদরিনাথ, জোশীমঠ হয়ে ২৬মে মুসৌরি ফিরে আসেন। রাহুলের জীবনের প্রথম প্রেম হিমালয়ের উত্তরাখন্ড। উত্তরাখন্ডে বারবার ঘুরেও রাহুলের আশ মেটেনি; তাই জীবনের এই অন্তিম পর্বে যখন শরীর আর বইছিল না, যখন মৃত্যু তাঁর দেহে বাসা বেঁধেছিল, তখনো তাঁর ঘুমক্কড় মন দেহটাকে টেনে নিয়ে গেছে উত্তরাখণ্ডে। *মেরী জীবনযাত্রা*-র প্রথম খণ্ডে যে দুটি ভূত—ভ্রমণতৃষ্ণা ও জ্ঞানলিপ্সার ভূত, তাঁর ওপর সওয়ার হয়েছিল বলে লিখেছেন তাদের হাত থেকে তিনি কখনোই পুরোপুরি নিষ্কৃতি পাননি, যখন পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় দেহকে ফেলে এই দুই ভূত

পালাল, তখন তাঁর নিরন্তর চোখের জলের মধ্যে হয়তো মানুষের হৃদয়হীনতার, অনভ্যস্ত অধীনতার যন্ত্রণা ছাড়াও স্থবিরত্বের ও ভাষাহীনতার বেদনা ছিল।

মুসৌরিতে রাহুলের পরিচালনায় রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতির সাহিত্য-রচনা পরিকল্পনার কাজ চলছিল। ডঃ সত্যকেতু *ফরাসি স্বয়ং শিক্ষক* লিখছিলেন, শীলাজি জিদের উপন্যাস অনুবাদ করেছিলেন। মাধব বাজপেয়ী রমাঁ রলাঁর উপন্যাস *জাঁ ক্রিস্তফ* অনুবাদের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। কমলা সাহিত্যরত্ন প্রথম বর্ষ ও এফ. এ. পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন।

ঘুমক্কড় শাস্ত্র-এ স্থবির গৃহস্থরা কীভাবে নুন-তেল-লকড়ির সন্ধানে ঘুরে বেড়ায় এবং খুঁটিতে বাঁধা বলদে পরিণত হয় তা নিয়ে রাহুল বিদ্রূপ করেছেন। মুসৌরি বাসের সময়ই রাহুল প্রথম বুঝতে পারলেন, কী করে নুন-তেল-লকড়ি জীবনের প্রাথমিক স্তরে উঠে আসে। হিসেব করতে হয়, যা রাহুলের কোনো দিন শেখা হয়নি। অকিঞ্চন ছিলেন; টাকা-পয়সার ভাবনা কখনো ভাবেননি। ১৯৫১-র জুনে রাহুল টাকা-পয়সার চিন্তা না করে পারছিলেন না। 'ব্যাংক থেকে ছশো টাকা তোলা হয়েছে। এখন বাকি আছে ষোলোশো। বড় চিন্তা হচ্ছে। ধার করা আমার জীবনের নীতি বিরোধী।' নানা ধরনের লোকজন রাহুলের সঙ্গে দেখা করতে আসছেন। এঁরা সবাই সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন শাখার লোক। রাহুল তো কাউকে ফেরাতে পারেন না। পণ্ডিত হরিনারায়ণ মিশ্র, ব্যারিস্টার মুকুন্দীলাল, স্বামী সত্যস্বরূপ—এইসব পণ্ডিতেরা রাহুলের কাজেই আসছিলেন। সংস্কৃত-হিন্দিকোষ ও হিন্দি-হিন্দিকোষ রচনা রাহুলের পরিকল্পনার অন্তর্গত ছিল। এঁদের সহায়তার প্রয়োজন ছিল রাহুলের।

কিন্তু 'টাকা কড়ির জল শুকিয়ে যাচ্ছিল দেখে আমারও চিন্তা হচ্ছিল। কেননা আত্মসম্মানের চেয়ে বড় কোনো ধন আছে বলে আমি মনে করতাম না। বরং একথা বলাই উচিত যে, আত্মসম্মানকে আমি প্রাণের চেয়েও বেশি মূল্যবান বলে মনে করতাম। তবু আমি কোনো না কোনো ভাবে মনকে বোঝাতে পারতাম। কিন্তু এই ধরনের পরিস্থিতিতে কমলা ঘাবড়ে যেত।' তা স্বাভাবিক। কারণ কমলাকেই তো গৃহস্থালি সামলাতে হত, অতিথি সৎকার করতে হত। 'কোন জিনিসের কতটা প্রয়োজন থাকতে পারে, কত টাকা খরচ হচ্ছে, সেদিকে তাকাবার সময় ছিল না আমার। খরচ কমাবার চেষ্টা করেছি অনেকবার, কিন্তু কোনোভাবেই পাঁচশো টাকার কমে চালাতে পারিনি। ভাবতাম, যখন প্রথমবার তিব্বতে গিয়েছিলাম, তখন মাসে বিশ টাকা হলেই আমার কাজ চলে যেত। পরে একশো টাকাই যথেষ্ট মনে করতাম।' কিন্তু ১৯৫১-তে রাহুলের পাঁচশো টাকার কমে চলছিল না।

ইতিমধ্যে রাহুলের ঘরে নতুন অতিথি এসেছিল। ভূতনাথ। এ্যালসেসিয়ান কুকুরের এই বাচ্চাটিকে একদিন থলিতে পুরে রাহুল নিয়ে এসেছিলেন এক বন্ধুর কাছ থেকে। কুকুরের বাচ্চাটিকে দেখে কমলা ঝাঁঝিয়ে উঠে বলেছিলেন, 'কোথা থেকে এই ভূতটাকে জোটালে?' সেই থেকে ওর নাম হয়ে গেল ভূত। রাহুল আদর করে ডাকতেন ভূতনাথ। অল্পদিনের মধ্যেই ভূতনাথ সাংকৃত্যায়ন পরিবারের একজন হয়ে উঠল।

রাহুল কমলার পড়াশোনা যাতে দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়, সেজন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর বড় কারণ হয়তো এই ছিল যে, কমলা তাঁর সহধর্মিণী হবেন না একথা তিনি ভাবতেই পারতেন না। তিনি কমলার মধ্যে সেই সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিলেন। আর একটা কারণও হয়তো ছিল। কমলার সঙ্গে তাঁর বয়সের ব্যবধানের পীড়া হয়তো তাঁর মধ্যে ছিল। ডায়াবেটিজ যেভাবে তাঁর সমর্থ দেহকে ক্রমাগত ক্ষয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল তাতে তাঁর দেহাবসানের পরও কমলা যাতে রাহুলের মর্যাদা ও তার নিজস্ব আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে, সেজন্য তিনি কমলাকে শুধু উচ্চ শিক্ষিতা নয়, লেখিকা হিসেবে তৈরি করে রেখে যেতে চেয়েছিলেন।

লেখার হাত যাতে তৈরি হয়, সেজন্য রাহুল ক্রমাগত কমলাকে উৎসাহ দিচ্ছিলেন। কমলা দুটি গল্প লিখে একটি পত্রিকায় পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তা ছাপা হয়নি। তাতেই তাঁর গল্প রচনার সব উৎসাহ উবে যায়। রাহুল লিখছেন, 'আমি ওকে অনেক বোঝালাম যে, সব লেখককেই এই পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়। কিন্তু আমি বললে কী হবে? ওর একটি গল্প 'নয়া সমাজ' কাগজে ছাপা না হওয়া পর্যন্ত কমলা আমার কথা বিশ্বাস করেনি। এখন (১৯৫৬) পর্যন্ত ও আটটি গল্প লিখেছে এবং সব কয়টি গল্পই ভালো কাগজে ছাপা হয়েছিল।' কমলার গল্প লেখায় অল্প-স্বল্প হাত লাগিয়েছিলেন রাহুল। কমলার রুচি ছিল প্রবন্ধ লেখায়। কিন্তু ওর সবচেয়ে বড় দোষ ছিল আলস্য। কলম ধরার আলস্য।

অতিথিরা আসছিলেন। রাহুলের সাহিত্যিক বন্ধুরা—পণ্ডিত কনহাইয়ালাল মিশ্র প্রভাকর, বিষ্ণু প্রভাকরজি, বিদ্যাবতী কোমল প্রভৃতিরা ইতিমধ্যেই এসেছিলেন। কিন্তু টাকাও আসছিল। একবার এতটাই টাকা এসেছিল যে রাহুলকে আয়করের জালেও জড়িয়ে যেতে হয়েছিল। ১৯৫০-এ এক সঙ্গে ২৫ হাজার টাকা এসেছিল বইয়ের নতুন সংস্করণের অগ্রিম হিসেবে। টাকা আসছিল, খরচও হচ্ছিল। অভাব থেকেই যাচ্ছিল। তবু বই থেকে যে টাকা আসছিল, তা থেকেই কোনো রকমে চলে যাচ্ছিল। আত্মমর্যাদার বিনিময়ে ধার করে সংসার চালাতে হয়নি।

পাঁচ-ছয় বছর ধরে রাহুল *মধ্য-এশিয়া কা ইতিহাস* লেখার কথা ভাবছিলেন। বৃহদায়তন বই লেখার সংকল্প করেছিলেন। তাই বইটি অনায়াসে লেখা সম্ভব ছিল না। ১৯৫১-র পয়লা অগস্ট তিনি বইটি লিখতে শুরু করেন। ১৯৫২-র মধ্যে বই শেষ হয়ে যায়, প্রেসে যায় ১৯৫৩-তে। রাহুলের লেখনীর দ্রুতি সম্পর্কে হয়তো এই কথা বললেই যথেষ্ট হবে যে, দুই খণ্ডে প্রকাশিত *মধ্য-এশিয়া কা ইতিহাস*-এর পৃষ্ঠাসংখ্যা হল ১৪১৫।

ঘড়ির কাঁটা ধরে রাহুলের দিন কেটে যেত। আপনা থেকেই ঘণ্টাগুলি সরে সরে যেত। সপ্তাহে শুধু রবিবারটাকে ভুলতে পারতেন না রাহুল। সেদিন সব কাজ বন্ধ। বন্ধু-বান্ধবেরা সেদিন আসতেন। তাঁদের সঙ্গে আড্ডা দিতেন। দিন কেটে যেত, সপ্তাহ আসত, সপ্তাহ কেটে যেতে যেতে মাস, মাস কেটে গেলে বছর। ১৯৫১ এভাবে কেটে গিয়েছিল।

গোটা বছরটা শারীরিক পীড়াই শুধু নয়, আর্থিক পীড়াতেও কষ্ট পাচ্ছিলেন রাহুল। ব্যাংকে মাত্র ২০৫০ টাকা। তা থেকে ৫০০ টাকা পাঠিয়ে দিতে হয়েছিল উদয়নারায়ণ পাণ্ডেকে। ব্যাঙ্কে থেকে গেল ১৫৫০ টাকা। রাহুল লিখছেন, 'এতকাল আমি অপরের মন দিয়ে অর্থকৃচ্ছ্রতাকে দেখেছি। কেননা এতকাল আমি অজগর বৃত্তি নিয়ে ছিলাম। আমার না ছিল কোনো ঘর, না ছিল কোনো পরিবার। আমাকে অতিথি হিসেবে পাওয়ার জন্য দেশ-বিদেশের অসংখ্য গৃহস্বামী উদ্‌গ্রীব ছিলেন। তাই নুন-তেল-লকড়ি নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা ছিল না। ভ্রমণ ও গবেষণার জন্য অবশ্যই টাকাকড়ির প্রয়োজন ছিল। টাকা-পয়সার অভাব হলে তা কিছুদিন বন্ধ রাখতে হত। কিন্তু এখন সেই অবস্থা নেই। এখন আমি গৃহস্বামী। গৃহস্বামীর সব কর্তব্য পালন করা উচিত বলে আমি মনে করতাম। বিশেষ করে অতিথি সৎকার করতে আমার বিশেষ আনন্দ হত। আমার মনে হত যে সারা জীবন আমি যে আতিথ্য পেয়েছি, তার কিছুটা অন্তত অতিথি সৎকার করে ফিরিয়ে দিচ্ছি। অতিথি-ঋণ শোধ করার এই পথ। কিন্তু সবচেয়ে বেশি চিন্তা হচ্ছিল এই ভেবে যে, গরমের দিনে যখন অতিথিরা আসবেন তখন যেন 'তৃণানি ভূমিরুদক্ বাক্‌চতুর্থী' দিয়ে অতিথি সৎকার করতে না হয়।'

তা করতে হয়নি। ১৯৫১ কেটে গেল। রাহুল হিসেব করে দেখলেন যে ১৯৫১-তে তিনি ২৫০০ হাজার পৃষ্ঠা লেখার যে সংকল্প করেছিলেন তা সিদ্ধ হয়েছে। তিনি ১৯৫১-তে লিখেছেন (১) *গাঢ়োয়াল*, (২) *কুমায়ূন*, (৩) *অদীসা*, (৪) *রুশ মে পঞ্চীশ মাস*, (৫) *যাত্রা কে পন্নে*, (৬) *সুদখোর কে মৌত*, (৭) *তিব্বত মে তিসরী বার*। সব মিলিয়ে আড়াই হাজার পৃষ্ঠা। আগামী বছরেও তিনি আড়াই হাজার পৃষ্ঠা লেখার সংকল্প করলেন।

সাহিত্যিক বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, অর্থকৃচ্ছ্রতা নিয়ে ভাবনা, কমলাকে পড়াশোনায় এগিয়ে দেওয়া, নিজের পড়াশোনা করা এবং তার মধ্যেই এতটা সময় করে নেওয়া যাতে বছরে আড়াই হাজার পৃষ্ঠা লেখা যায়। এইসব কিছু করতে হলে কোনো ভাবেই সময়ের বিন্দুমাত্র অপচয় করা সম্ভব নয়। রাহুল যে তা করেননি তা জানা যায় তাঁর ১৯৫২-র দিনচর্যা থেকে। সওয়া সাতটায় ঘুম থেকে উঠে প্রাতঃকৃত্য সেরে কিছু কাজ করা এবং চা। তারপর বেলা এগারোটা পর্যন্ত কমলাকে লেখাপড়া করিয়ে নিজের পড়াশোনা অথবা লেখার সংশোধন। দ্বিপ্রাহরিক আহার—বেলা একটা থেকে দেড়টার মধ্যে। তারপর চিঠিপত্র ও খবরের কাগজ পড়া। সন্ধ্যার চা—চারটা থেকে পাঁচটার মধ্যে। তারপর যে সব বই লেখা হয়ে গেছে, তা আবার পড়ে দেখা। রাত্রির আহার—আটটায়। পরে পড়ানো এবং পড়া ও লেখা। রাত ৯টায় রেডিওতে সংবাদ শোনা। আবার ঘণ্টা দুয়েক পড়াশোনা। ১১টা নাগাদ শুতে যাওয়া।

কমিউনিস্ট পার্টি ও রাহুল

১৯৫২-র নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির ফল ভালো হয়নি। তার যে কারণ রাহুল নির্দেশ

করেছেন, তা থেকে তাঁর তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন যে, কমিউনিস্টরা চীনের বিপ্লব থেকে কোনো শিক্ষা নেয়নি। শহুরে রাজনীতির কানাগলিতেই কমিউনিস্টরা ঘুরে মরছিল। তাদের জনসাধারণের কাছে যেতে হবে, গ্রামে যেতে হবে। হাড় যেমন মাংসের ভেতর লুকিয়ে থেকে শেষ পর্যন্ত অভিন্ন হয়ে যায়, তেমনি কমিউনিস্টদেরও জনসাধারণের সঙ্গে অনুরূপভাবে মিশে যেতে হবে। ভারতের কমিউনিস্টরা রাশিয়া ও চীনের কমিউনিস্টদের মতো জনসাধারণের ভাষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্য সম্পর্কে গভীর ও সঠিকভাবে বিচার করতে শেখেনি। তাই বিরোধীরা কমিউনিস্টদের ভারতীয় ভাষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের শত্রু বলে তাদের প্রতি জনসাধারণের সন্দেহ জাগিয়ে তুলেছে। দক্ষিণ ভারতে কমিউনিস্টরা উত্তর ভারতের কমিউনিস্টদের চেয়ে অনেক বেশি জনসাধারণের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে। দক্ষিণের কমিউনিস্টরা জনতার সুখ-দুঃখ, ভাষা, শিল্পকলার সঙ্গে নিজেদের পুরোপুরি মিশিয়ে দিয়েছে। উত্তরের কমিউনিস্টরা এতকালেও জনতার ভাষা (মৈথিলি, ভোজপুরি, মগহি, ছত্তীশগড়ি, বুন্দেলখণ্ডি, মালওয়ি, রাজস্থানি, ব্রজ, কৌরবি, গাড়োয়ালি, কুমায়ুনি, আওধি) ব্যবহার করে জনতার হৃদয়ে স্থান করে নিতে পারেনি। এ বিষয়ে তাদের কোনো চেষ্টাও নেই। জনতার মুখের ভাষা নিয়ে তারা সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা করেনি। গণ-শিল্প ও গণ-সঙ্গীতকে পুরোপুরি নিজেদের করে নিতে পারেনি। যতদিন তারা জনতার জীবনস্রোতের সঙ্গে মিশে যেতে না পারবে, ততদিন কমিউনিস্টরা কখনোই জনতার ওপর তাদের প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। এই অর্থে সে যুগের কমিউনিস্টদের মধ্যে একমাত্র রাহুলকেই প্রকৃত ভারতীয় কমিউনিস্ট বললে হয়তো অন্যায় হবে না। কেননা ভারতের অন্যান্য কমিউনিস্ট নেতারা রুশ অথবা ইংরেজ আদলে নিজেদের তৈরি করেছিলেন। তাঁরা ভারতের জনতাকে চিনতেন না। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কোন পথ অনুসরণ করবে তা নির্দিষ্ট করে দিত আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন। নিজেদের দেশকে ও দেশের মানুষকে জানার প্রয়োজন ছিল বলে তাঁরা মনে করতেন না। এক ধরনের কমিউনিস্ট স্কলাস্টিসিজম্—যার মধ্যে তাঁরা আবদ্ধ হয়ে ছিলেন। এঁদের মধ্যে রাহুলই ছিলেন একমাত্র লোক যিনি নিজের দেশকে চিনতেন, যিনি জনতার ভাষায় কথা বলতে জানতেন, যিনি জনতার জীবনের সঙ্গে নিজের জীবনকে মিশিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু যে সাম্যবাদী রাজনীতি তিনি করতে চেয়েছিলেন, এককভাবে তাঁর পক্ষে তা করা সম্ভব ছিল না। কমিউনিস্ট পার্টি তার জন্মলগ্ন থেকেই পরনির্ভরতার কারাগারে নিজেকে অন্তরীণ করেছিল। আজও কমিউনিস্টরা স্বাবলম্বী হতে পারেনি। অথচ স্বাবলম্বী ও স্বাধীনভাবে বিচরণ করা ছাড়া রাহুলের কোনো উপায় ছিল না। তবু একটা প্রশ্ন থেকে যায় ঃ কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পর তিনি আবার অজয় ঘোষের কাছ থেকে পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করেছিলেন কেন? কেন ডায়েরিতে লিখেছিলেন, 'অব মেরা পার্টি মুঝসে না ছুটে।'

কমিউনিস্ট পার্টি থেকে সরে যাওয়ার পর তাঁর মনে হয়তো এক ধরনের বিচ্ছিন্নতার

বোধ জেগেছিল; নিপীড়িত, দলিত, সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্নতার বোধ—যা তাঁর কাছে একেবারে দুঃসহ ছিল। কারণ তাঁর কথাবার্তা, লিখিত-অলিখিত উক্তি, আচার-আচরণের মধ্যে অনেক স্ববিরোধিতা আছে, তা স্বীকার করে নিলেও একটা কথা প্রায় নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, তাঁর জীবন-বীণার গভীরতম সুরটি ছিল দরিদ্র, নির্যাতিত ও দলিত মানুষের সঙ্গে তাঁর একাত্মতার। জনতার সঙ্গে এই গভীর ঐক্যের বোধই হয়তো কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে বিচ্ছেদের ফলে খণ্ডিত হয়েছিল, যা রাহুলের পক্ষে সহনীয় ছিল না।

ষাট বছর বয়সে

১৯৫২-র ৯ এপ্রিল রাহুলের ৬০ বছর পূর্ণ হল। কমলা স্থির করলেন এবার রাহুলের জন্মদিন পালন করবেন। জন্মদিনের কোনো বিশেষ মাহাত্ম্য আছে বলে রাহুল মনে করতেন না। জন্মদিন পালন করা যেতে পারে, একথা কোনো বন্ধুও তাঁকে কোনোদিন বলেননি। রাহুল লিখছেন, 'আমাদের মতো পরিবারের (যার ওপর লক্ষ্মী অথবা সরস্বতীর বরদহস্ত ছিল না) জন্মদিন পালনের কোনো প্রয়োজনই নেই। জন্মদিন পালন করাটা বড়লোকের ব্যাপার, একথা আমি অবশ্যই স্বীকার করি। কমলা যখন জন্মদিনের কথাটা আমাকে বলল তখন আমি তাঁকে বললাম, যেভাবে আমার ৫৯-তম জন্মদিন কেটেছে, সেভাবেই ৬০-তম জন্মদিন কাটুক।' কিন্তু কমলা কোনো কথা শুনল না। ৯ এপ্রিল জন্মদিন পালনের সিদ্ধান্ত নিল। সাধারণত রবিবার রাহুলের ছুটির দিন ছিল। কিন্তু ৯ এপ্রিলও কাজ থেকে ছুটি নিতে হল। দুপুরের পরে ছোটো মতো পার্টি হল। পার্টিতে সদানন্দ মেহতা, শিবশর্মা, শীলাজি, ডঃ সত্যকেতু ও তাঁর দুটি ছোটো ছেলে এল।

রাহুলের শরীর ইদানীং আগের থেকে কিছুটা ভালো যাচ্ছিল। নিয়মমতো ইনসুলিন নিচ্ছিলেন। পিপাসা ও প্রস্রাব দুইই কম হচ্ছিল। তন্দ্রাচ্ছন্নতাও অনেকটা কমেছিল। এ সময়ে কমলা রাহুলের মনকে ভরে রেখেছিল; অন্তত *মেরী জীবনযাত্রা*-র পঞ্চম খণ্ড পড়লে তাই মনে হয়। ফিরে ফিরে তিনি কমলার কথায়ই আসছেন। কমলা মেধাবী, তার লেখার হাত ভালো। কিন্তু লেখাপড়া দুয়েতেই তার আলস্য। একথা বলা হয়তো ঠিক হবে না, বরং একথা বলাই ঠিক হবে যে লেখাপড়ার জন্য ভেতরের প্রবল প্রেরণা ছিল না। 'আমিও তো লেখাপড়ায় খুব ভালো ছিলাম......কিন্তু তাগিদ দিয়ে আমাকে কেউ লেখাপড়া করাতে পারত না।' কমলা চমৎকার সেলাই করতে পারত। সময় পেলেই ও সেলাই করত, ওর গানের গলাও খুব ভালো ছিল। কোনো ভালো গান শুনলে ও সঙ্গে সঙ্গে তা নিজের গলায় তুলে নিত। গান-বাজনা শেখার খুব ইচ্ছা হয়েছিল ওর। কিন্তু 'হর্নক্লিফ' ছিল শহর থেকে অনেকটা দূরে। শহরের কাছাকাছি হলে দশ-পনেরো টাকা দিলেই গান-বাজনা শেখানোর মাস্টার পাওয়া যেত। বেশ কিছুটা চেষ্টা করার পর মাস্টার পাওয়া গেল মাসিক ৪০ টাকা বেতনে। কমলা গান ও বেহালা শিখতে শুরু করল। গান বাজনায় রাহুলের বিশেষ উৎসাহ ছিল না। সঙ্গীতের রাগ-রাগিনী চেনার

ব্যাপারে রাহুলের কান ছিল মোষের কাছে বীণা বাজানোর মতো। কমলাও গান-বাজনা বেশিদিন শিখতে পারেনি। দশ বারোটা রাগ-রাগিনী শিখেছিল। বেহালায়ও হাত বসে গিয়েছিল। আসলে গুনগুন করাটা ছিল তার পুরোনো অভ্যাস। তাই মাঝে মাঝে দুয়েকটা গান গাইত। অধিকাংশই ফিল্‌মের গান।

কমলাকে গান-বাজনা শেখানোর ব্যাপারে রাহুলের উৎসাহ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। গানের রাগরাগিনীর ব্যাপারে রাহুলের কান ছিল মোষের কান, একথা রাহুল নিজেই বলছেন। আর কমলাও ফিল্‌মের গান গুনগুন করত, তার বেশি কিছু নয়। তবু কমলা গান-বাজনা শিখবে বলে রাহুল মুসৌরি শহর থেকে ওস্তাদ নিযুক্ত করলেন। কিন্তু গান শেখাটা বেশি দিন চলল না। রাহুলের ইচ্ছা ছিল না বলে নয়, কমলাই লেগে থাকতে পারল না।

এই ঘটনাটি রাহুল-কমলার সম্পর্কের ওপর আলোকপাত করে। কমলা রাহুলের দেখাশোনা করছেন, ইনসুলিন দিচ্ছেন, ঘর সামলাচ্ছেন, অতিথি সৎকার করছেন, সংসারের কোনো ঝঞ্ঝাটই রাহুলকে পোয়াতে হচ্ছে না। নিজের লেখাপড়ায় ডুবে আছেন রাহুল। কীভাবে দিন, সপ্তাহ, মাস, বছর কেটে যাচ্ছে বুঝতে পারছেন না। কিন্তু এই মগ্ন অভিনিবিষ্ট মানুষটি কমলাকে পড়াচ্ছেন, লিখতে শেখাচ্ছেন, একটার পর একটা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করে দিচ্ছেন। তার উপর কমলার বালিকাসুলভ আবদারও পালন করছেন। কমলার গান-বাজনা শেখার ইচ্ছাটা হয়তো রাহুলের কাছে আবদারের মতোই মনে হয়ে থাকবে। কিন্তু তিনি আপত্তি করেননি। হয়তো তিনি জানতেন, কমলার গান-বাজনা শেখার ইচ্ছাটা বেশিদিন স্থায়ী হবে না; কমলা আপনা থেকেই গান-বাজনা ছেড়ে দেবে।

দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে রাহুল আচার্য গোবর্ধন-এর (১১০০ খ্রিস্টাব্দ) কয়েকটি লাইনের উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাঁর *মেরী জীবনযাত্রা*-য়। লাইনগুলি তাঁর এ সময়ের দাম্পত্য জীবনের প্রতিচ্ছবি বলা যেতে পারে। আচার্য গোবর্ধনের দুটি লাইন তুলে দেওয়া হল ঃ

"নিষ্কারণাপরধং নিষ্কারণ কলহ-রোষ-পরিতোষম্।
সামান্য মরণ-জীবন সুখ-দুঃখং জয়তি দাম্পত্যম্।"
('যে দাম্পত্যে অকারণ অপরাধ, অকারণ কলহ-রোষ-পরিতোষ,
যে দাম্পত্যে একই সঙ্গে জীবন-মরণ সুখ-দুঃখ তার জয় হোক।')

দাম্পত্য জীবনের এই জয়ধ্বনির একটি কারণ হয়তো ছিল এই যে, এ বছর অর্থকৃচ্ছ্রতার কিছুটা সমাধান হওয়ার মতো অবস্থা হয়েছিল। কারণ সব মিলিয়ে প্রায় ন হাজার টাকার মতো এ বছর রাহুলের আয় হয়েছিল। লেখাপড়ার ব্যাপারে ১৯৫২-র ৩১ ডিসেম্বর রাহুল হিসেব করে দেখলেন যে, এক বছর *যাত্রা কা পন্নে* ও *রুশ মে পচ্চীশ মাস* দিনের আলো দেখেছে। *রাজস্থানী রণিবাস*-এর মুদ্রণ শেষ হয়েছে। এ বছর তিনি যে বই লিখেছেন, তা হল ঃ (১) *মধ্য-এশিয়া কা ইতিহাস*, (২) *গাঢ়োয়াল*, (৩) *নেপাল*। সব শুদ্ধ দেড় হাজার পৃষ্ঠা লিখেছেন তিনি। মন্দ নয়।

১৯৫৩-র জানুয়ারিতে কমলাকে নিয়ে এক দফা ঘুমক্কড়ী করে এলেন। প্রথম

৩ জানুয়ারি সকাল সাতটায় রাহুল কমলাকে নিয়ে পাটনায় পৌঁছোলেন। পাটনা থেকে নেপাল। নেপালে প্রায় মাস খানেক বেড়িয়ে ১ ফেব্রুয়ারি বিমানে পাটনা ফিরে এলেন। পাটনা থেকে মুসৌরি ফিরলেন ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে।

ডায়াবেটিজকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে এভাবে নেপাল ঘুরে আসায় রাহুলের দেহের ক্ষত বেড়ে গেল। কমলা গত বছর কালিম্পঙ গিয়েছিল। কিন্তু নেপাল থেকে ঘুরে এসেই কমলা আবার কালিম্পঙ যেতে চাইলেন। তাঁর আগ্রহ দেখে রাহুলও বাধা দিলেন না।

কিন্তু এতটা দূর একা কমলা কীভাবে যাবেন? ট্রেনে খুন, ডাকাতি প্রায়ই হচ্ছিল। তবু কমলা ১৫ ফেব্রুয়ারি কালিম্পঙ রওনা হয়ে গেলেন। দেহ্‌রাদুনে মেহেতাজি তাঁকে কলকাতা মেলে বসিয়ে দিলেন। কলকাতায় মহাদেবভাই কমলার যাতায়াতে সাহায্য করতেন। 'কিন্তু কালিম্পঙ পৌঁছে চিঠি না লেখা পর্যন্ত আমার দুশ্চিন্তা যায়নি।' হায়রে, ডানা-কাটা পাখি!

১৯৫৩-র ৫ মার্চ মস্কো রেডিও থেকে স্তালিনের মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করা হয়। স্তালিনের মৃত্যু সংবাদে রাহুল গভীরভাবে অভিভূত হয়ে লিখেছিলেনঃ 'তাঁর যশঃ শরীরেরই শুধু নয়, তিনি যে কাজ করে গিয়েছেন, তার মৃত্যু নেই। মার্কস যে সাম্যবাদী দর্শন সূত্রবদ্ধ করেছিলেন এবং তাকে প্রতিষ্ঠার পথের কথা বলেছিলেন লেনিন সেই সাম্যবাদী বিপ্লবকে বাস্তবায়িত করেছিলেন। কিন্তু সাম্যবাদী অর্থনীতিকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করা এবং সাম্যবাদকে ফাসিবাদী ঘাতক সংকট থেকে উত্তীর্ণ করার মহান দায়িত্ব বহন করেছিলেন স্তালিন। স্তালিনের শাসনকালে আমি দু-বছর রাশিয়ায় ছিলাম। সে সময়ে রাশিয়ার প্রগতি আমি স্বচক্ষে দেখেছি। পরে স্তালিনের ব্যক্তিপূজার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু ব্যক্তিপূজা বেশিদিন চলা সম্ভব ছিল না। কারণ ব্যক্তিপূজা সাম্যবাদ-বিরোধী। যত বড়ই হোক না কেন একটি দোষের জন্য স্তালিনের মহান কাজকে নগণ্য বলা চলে না।' এই হল স্তালিনবাদ সম্পর্কে রাহুলের রায়।

এ সময়েই রাহুলের স্তালিনের একটি জীবনী লেখার ইচ্ছা হয়েছিল। ইতিপূর্বে স্তালিনের কোনো জীবনীও লেখা হয়নি। স্তালিনের জীবনী লেখার পর রাহুলের মনে হল লেনিনের জীবনী ছাড়া বলশেভিকবাদকে বোঝা যায় না। অতএব লেনিনের জীবনী লিখতে হল। কিন্তু মার্কসকে বাদ দিয়ে লেনিন, স্তালিনকে বোঝার প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং মার্কসের জীবনীও লিখে ফেললেন রাহুল। কিন্তু এশিয়ার ৬০ কোটি মানুষকে সাম্যবাদের পথে যিনি নিয়ে গেছেন এবং সমগ্র এশিয়ায় যিনি সাম্যবাদের পথ দেখিয়েছেন, সেই মাও-সে-তুঙের জীবনী না লিখলে পৃথিবীব্যাপী মার্কসবাদের বিস্তারের কথা বলা হয় না। অতএব মাওয়ের জীবনী তিনি লিখলেন। এই চারটি বইই ১৯৫৪-র মধ্যে প্রকাশিত হয়।

পরে রাহুল *নয়ে ভারতকী নয়ে নেতা* নামে বেশ কয়েকজন কমিউনিস্ট নেতার জীবনীও লিখেছিলেন।

'হর্নক্লিফ'-এ নতুন অতিথি আসছিল। কমলা অন্তঃসত্তা। সেজন্য রাহুলকে প্রস্তুত হতে হচ্ছিল। রাহুল ও কমলা ষট্পদ হতে যাচ্ছেন। অতএব রাহুলের ওপর গুরু দায়িত্ব এসে পড়ল। কমলার ওপর ক্রমাগতই লক্ষ রাখতে হবে। রাহুলের ইচ্ছা নয় কমলা বাজার হাট করুক। কিন্তু কমলা কথা শুনতে চায় না। ষট্পদ হওয়ার সমস্যা নুন-তেল-লকড়ির চেয়েও বড় সমস্যা। কিন্তু অতিথি আসার বিরাম ছিল না। ১৭ মে সত্যগুপ্ত এলেন। তাঁকে রাহুল কৌরবি লোকগীতি ও লোককাহিনি জমা করতে বলেছিলেন। তিনি ১৩০০ লোকগীতি সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছেন। দুদিন পরে এলেন রাহুলের বন্ধু জামিয়ার ইংরেজির প্রোফেসর চৌহান। তিনি রাহুলকে বললেন যে, জামিয়ার ইতিহাসের অধ্যাপক রাহুলের *ভোলগসে গঙ্গা*-র উর্দু সংস্করণ ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। কারণ এই বইয়ে একটি মুসলমান মেয়ের সঙ্গে একটি হিন্দুর ছেলের বিয়ের কথা আছে। পর পর আরো অনেক অতিথি এলেন। গরমের দিনে বহু অতিথি সমাগম 'হর্নক্লিফ'-এ স্বাভাবিক ঘটনা।

জয়ার জন্ম

১৯৫৩-এর ২০ সেপ্টেম্বর হাসপাতাল থেকে রাহুলের কাছে ফোন এল। কমলা একটি কন্যা সন্তান প্রসব করেছেন। রাহুল আগেই বলেছিলেন—কমলার কন্যা সন্তান হবে এবং কন্যার নাম হবে জয়া। কমলা ছেলে চেয়েছিল। কিন্তু মেয়ে হওয়াতে তাঁর কম আনন্দ হয়নি। কমলার দুর্বলতা ও প্রসবোত্তর জটিলতা ছিল বলে তাঁকে কিছুদিন হাসপাতালে থাকতে হল। ২ অক্টোবর কমলা ও জয়াকে হাসপাতাল থেকে নিয়ে আসা হল। ১৪ অক্টোবর জয়ার জন্ম উপলক্ষে বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে একটা ছোটোখাটো ভোজ হল।

রাহুল এখন পুরোদস্তুর সংসারী। জয়া কীভাবে ধীরে ধীরে বাড়ছে, কী খাচ্ছে, কমলার স্বাস্থ্য—সব কিছুর প্রতি তিনি লক্ষ রাখছেন। কিন্তু লেখাও চলছে। কোনো কাজেই রাহুলের অনিচ্ছা নেই, উদ্যমের অভাব নেই। কর্তব্য কর্মেরও কোনো বিচ্যুতি নেই। তিনি আনন্দিত হয়ে লক্ষ করেছিলেন যে, জয়ার আবির্ভাবে তাঁদের সম্পর্ক অনেক মোলায়েম হয়েছে। দুজনের মধ্যে আগে যত সহজে খিটিমিটি হত এখন আর তা হয় না। দাম্পত্য জীবনের এই জয়ধ্বনি যখন উঠছিল, তার মধ্যে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো একটি চিঠি এল।

১৩ নভেম্বর চিঠি ও ফটো এল লেনিনগ্রাদ থেকে। 'তা দেখে কমলা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। অনেক কাঁদল। আমার কথা আমি খুলে বললাম। আমি তো বলেছি, জয়াকে ও তোমাকে আমার প্রয়োজন। রাশিয়া চলে যাওয়ার কোনো ইচ্ছা নেই আমার। কিন্তু কমলা চাইছিল, আমি তাদের কাছে চিঠি লেখাও বন্ধ করে দিই। তা করার চেয়ে আত্মহত্যা করাও অনেক সোজা। যে বাবা ঈগরকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে, তাকে কে বিশ্বাস করতে পারবে? যখন কমলার সঙ্গে আমার জানাশোনা হল, তখন আমার কোনো আশা ছিল না যে, রাশিয়ার সঙ্গে আবার আমার সম্বন্ধ স্থাপিত হবে। আবার যদি তা

হয়ে থাকে তবে ঈগরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা মানবতা বিরোধী হবে। যদি কমলা তাই চায়, তবে কোনো ভয়ংকর পদক্ষেপ করার আগে মা-মেয়ের একটা ব্যবস্থা করে ফেলতে হবে।

'এ বিষয়ে ১৪ নভেম্বর আমি ডায়েরিতে লিখলাম, কাল থেকে আমি আমার নিজের চোখে অনেক নেমে গেছি। কমলাই ঠিক বুঝেছে। আমি তার অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়েছি। হ্যাঁ পরোপকার, দয়া করা এবং আরো নানা রকমের অছিলা ছিল আমার। ও আমাকে বিশ্বাস করবে কেন।'

স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে, কমলা যে রাহুলকে চিঠি লিখতে বারণ করেছিলেন অর্থাৎ রাশিয়ার সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করতে বলছিলেন, তা ঠিক অনুরোধ ছিল না। তিনি রাহুলের কাছে এটা দাবি করেছিলেন। এই প্রশ্ন করার অধিকার তাঁর ছিল। কমলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ দৈহিক মিলনের আগে তার নিহিতার্থ সম্পর্কে রাহুল কি নিজেকে প্রশ্ন করেছিলেন? তিনি কি বুঝতে পারেন নি যে কমলার সঙ্গে যৌন সংসর্গ তার জীবনকে ভয়ানক জটিল করে তুলতে পারে? রাহুলের মতো মানুষ তা বুঝতে পারেননি, একথা বলা চলে না। তিনি জেনেশুনে এই বিষ পান করেছিলেন। রাহুলের তাঁকে প্রয়োজন ছিল। কমলা যখন রাহুলের ঘরে এলেন, তখন রাহুলের কোনো উপায় ছিল না। কমলাকে তাঁকে পেতেই হত। তাঁর এমন একটা অবলম্বন প্রয়োজন ছিল, যে টাইপ করবে, শ্রুতিলিখনের কাজ করবে, ঘর সামলাবে, ইন্‌জেকশান দেবে, ওষুধ খাওয়াবে, অতিথি সৎকাব করবে, শয্যাসঙ্গিনী হবে। কমলা একাধারে সব। রাহুল যখন তাঁকে লেখাপড়ায় এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছিলেন, তাও তাঁর নিজেরই প্রয়োজনে। এই অবলম্বন যখন তিনি আঁকড়ে ধরলেন তখন তিনি কী করে লোলাকে ঈগরকে ভুলে গেলেন? কী করে তিনি ভাবলেন, যে-সম্পর্ক রাশিয়ার মাটিতে গড়ে উঠেছিল, যে-পুত্র ঈগর রাশিয়ায় জন্ম নিয়েছিল, তার আর কোনো অস্তিত্ব নেই। কেন তিনি ভাবেননি রাশিয়ার সঙ্গে আবার সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে।

আজ যদি কমলা রাহুলকে ঈগরের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে দিতে বলেন, তবে রাহুলের আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। যদিও তিনি *মেরী জীবনযাত্রা*-য় লিখছেন যে, ভয়ংকর কাজটি করার আগে মা-মেয়ের একটা ব্যবস্থা করতে হবে। রাহুল যখন এই কথা লিখছেন, তখন তিনি নিশ্চয় জানতেন যে, কোনো ভয়ংকর কাজ করা অর্থাৎ কমলার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা তাঁর সাধ্যাতীত।

কমলার সঙ্গে বিয়ের আগে কি রাহুলের শের্বাৎসকির কথা মনে হয়েছিল? শ্রীমতী শের্বাৎসকির মতোই কমলা যাতে সাংকৃত্যায়ন পদবীটি এবং তার সম্পত্তি পায় রাহুল কি সেই ব্যবস্থা করে যেতে চেয়েছিলেন? কিন্তু শের্বাৎসকি তাঁর বৃদ্ধা রাঁধুনিকে বিয়ে করেছিলেন। রাহুলের ক্ষেত্রে বিয়েটা একেবারে বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা হয়ে গেল। তাঁর রুগ্ন, ক্লান্ত শরীরের জন্য তাঁকে ভালোবাসে এমন নারীর কল্যাণ হস্তের প্রয়োজন ছিল রাহুলের। তাঁর প্রতি কি কমলার ভালোবাসা ছিল? অথবা কৃতজ্ঞতা? কোথা থেকে রাহুল

কমলাকে টেনে তুলেছেন, সে কথা মনে রাখলে রাহুলের প্রতি কমলার সকৃতজ্ঞ ভালোবাসা থাকাই স্বাভাবিক। হয়তো তাই ছিল। কিন্তু যৌবন বড় অকৃতজ্ঞ। ব্যাধি ও বার্ধক্যকে দীর্ঘকাল সহ্য করতে হলে যৌবনের এক ধরনের পীড়ার সৃষ্টি হয়। রাহুল ও কমলার অন্তরঙ্গ জীবনের ইতিহাস আমার বিশেষ জানিনা। এর কিছুটা অনুমান করা যায়। সবাই জানতেন এবং কমলা বেশ ভাল করেই জানত যে মহাপণ্ডিত ত্রিপিটকাচার্য রাহুল সাংকৃত্যায়ন অসামান্য পুরুষ এবং তাঁর স্ত্রী হওয়াটা অত্যন্ত শ্লাঘনীয় ব্যাপার। রাহুল সাংকৃত্যায়নের স্ত্রী কমলা সাংকৃত্যায়নের নাম ইতিহাসে লেখা থাকবে। রাহুল সাংকৃত্যায়ন পরবর্তী প্রজন্মের জন্য নিজেকে রেখে গেছেন। কিন্তু ক্ষত ভরা দেহ, ডায়াবেটিজে পীড়িত রাহুল সাংকৃত্যায়ন শুধু কমলার।

অষ্টাদশ অধ্যায়

অন্তিম পর্ব

মেরী জীবনযাত্রা-র পাঁচটি খণ্ডে রাহুল শৈশব থেকে ৬৩ বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর জীবনায়নের অনুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন। ১৯৫৪ সালের ৯ এপ্রিলে পঞ্চম খণ্ডের সমাপ্তি। তার পর থেকে ১৯৫৭ সালে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর জীবনী রচনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য খুবই অপ্রতুল। যতটুকু উপাদান পাওয়া যায় তা হল ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বন্ধু আনন্দ কৌশল্যায়নকে লেখা তাঁর কিছু পত্র, যা প্রকাশিত হয়েছে। আর তাঁর কন্যা জয়া পড়হাকের লেখা—*পাপা মেরা বচপন কা স্মৃতিয়াঁ*। তাছাড়া তাঁর কতিপয় বন্ধুর বিক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণা।

চীন ভ্রমণ

চীন সরকারের আমন্ত্রণে রাহুল চীন যান ১৯৫৮ সালে। চীনের বিপ্লব এবং সেখানে নতুন সমাজ নির্মাণের কর্মকাণ্ড তাঁর হৃদয়কে স্পন্দিত করেছিল। মধ্য এশিয়ায় যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তো তাঁর বহুদিনের। চীন বিপ্লবের নেতা মাও-সে-তুঙের জীবনী তিনি ইতিপূর্বেই রচনা করেছেন। তাই আমন্ত্রণ পেয়ে তিনি সাড়ে চার মাস চীনে কাটিয়ে আসেন। এই সময়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী, কন্যা ও পুত্রও কিছুদিনের জন্য চীনে গিয়েছিলেন। চীন ভ্রমণ সম্পর্কে জয়া লিখেছেন—'হঠাৎ একদিন খবর এল চীন যেতে হবে। বাবা আমাদের ডেকেছেন। পিকিঙে বাবা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। শুনলাম বাবা কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। আপাতত মোটামুটি সুস্থ। বাবার সঙ্গে আমি চীন ঘুরে দেখলাম। উঁচু ছুঁচলো ছাদ-অলা বৌদ্ধ মন্দির, পিকিঙ অপেরার রঙিন দৃশ্য দেখলাম। কাপাস তুলোর খেত, তুলো উড়ছিল। সেখানে সব লোক পুরুষ, শিশু, মহিলা নীল কোট ও পায়জামা পরে কাজ করছিল। আমিও একই পোষাক পরেছিলাম। তুলোয় আমার কোট ভরে গিয়েছিল। একদিন একটা কমিউনও দেখে এসেছিলাম। বাবাকে কমিউনের লোকদের সঙ্গে চীনা ভাষায় কথা বলতেও দেখেছিলাম।'

শ্রীলঙ্কায় অধ্যাপনা

১৯৫৯-র প্রথমদিকে রাহুল কিছুটা সময় দেহ্‌রাদুনে কাটান। বছরের শেষ দিকে শ্রীলঙ্কার বিদ্যালংকার বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে আহ্বান করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ গ্রহণের জন্য। বিদ্যালংকার পরিবেন ঐ বছরই বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। আশৈশব ঘুমক্কড়ীর ঝড় তাঁর বলিষ্ঠ শরীরকে এতদিনে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে,

ডায়াবেটিজ তো তাঁর বহুদিনের সঙ্গী; দিনে একাধিকবার ইনসুলিন ইন্‌জেকশন নিতে হয়। খাওয়াদাওয়া ও ঔষধ সেবনে নিয়ম মেনে চলতে হয়। এই সময়ে শ্রীলঙ্কায় গিয়ে থাকায় ঝুঁকি ছিল। কমলা চাইছিলেন না যে রাহুল শ্রীলঙ্কায় যান। তিনি বলছিলেন—দেশে থাকাই ভালো। অসুখবিসুখ হলে চিকিৎসা করানোর মতো একটা ভালো হাসপাতালও সেখানে নেই।

কিন্তু জীবনে পদে পদে ঝুঁকি নিতে যিনি অভ্যস্ত তিনি এতেই বা কেন পরাঙ্মুখ হবেন? তিনি অধ্যাপনার চাকুরি নিয়ে একাকী শ্রীলঙ্কায় চলে গেলেন সেপ্টেম্বরে। যেতে হল, তার কারণ এই সময় তিনি আর্থিক অনিশ্চয়তার মধ্যে ছিলেন। এখন তো তিনি আর সংসার বন্ধনহীন উড্ডীন পাখি নন। স্ত্রী ও দুটি সন্তানকে নিয়ে তাঁর সংসার। অর্থের একমাত্র উৎস নিজের লেখা বই-এর রয়ালটি। প্রকাশকের অসহযোগিতায় তাও কখনো কখনো অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। কারও কোনো সাহায্য তো জীবনে তিনি গ্রহণ করেননি। এমনকি কোন বেতনভুক চাকরিও তিনি করতে চাইতেন না। মাত্র কিছুদিন বিদ্যালংকার পরিবেনে ও রাশিয়ায় অধ্যাপনার চাকরি করেছিলে; কিন্তু জ্ঞানান্বেষণের প্রবল তাড়নায় তা পরিত্যাগ করতেও তাঁর বিন্দুমাত্র সময় লাগেনি। লোলা ও ঈগরকে ছেড়ে আসতেও তাঁর বাধেনি। কারণ লোলা অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন ও সক্ষম ছিলেন; আর তিনি এটাও বুঝেছিলেন যে ঈগর এমন একটা দেশে জন্মেছে যেখানে তার জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে কোনো বাধা হবে না। কিন্তু এখানে যে সংসার তাঁর উপরেই নির্ভরশীল। তাই এবার ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে বিদেশে তাঁকে চাকরি গ্রহণ করতে পাড়ি দিতে হল।

কাজ যখন গ্রহণ করলেন তখন তাতে মন-প্রাণ ঢেলে দিলেন। এই বয়সে ব্যাধিগ্রস্ত শরীর নিয়ে রাহুলের পরিশ্রম করার ক্ষমতা দেখে তাঁর সহকর্মী বন্ধু শান্তি শাস্ত্রী হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তত্ত্বাবধায়ককে সঙ্গে নিয়ে রাহুল বিশ্ববিদ্যালয়টি ঘুরে ঘুরে দেখতেন। শ্রীপ্রজ্ঞাকীর্তিকে দোভাষী বানিয়ে দর্শন বিষয়ক ভাষণ দিতেন। সামাজিক উৎসবে অংশ গ্রহণ করতেন এবং সর্বোপরি বই লেখার কাজে ক্রমাগতই ব্যস্ত থাকতেন। রাত্রি দুটোর আগে তিনি ঘুমোতেন না। রাত্রিতে ঘরের ভিতর যাতে মশা ও পোকার উপদ্রব না হয় সেজন্য ঘরের সব জানালায় কাঁচ লাগিয়ে সন্ধ্যা হওয়ার আগেই তা বন্ধ করে দিতেন। এভাবে তিনি সর্বদাই অবিরাম কাজ করে যেতেন। জীবনের শেষ পাঁচ বছরে তিনি অন্তত দেড় ডজন বই লিখেছেন ও প্রকাশিত করেছেন।

কিন্তু রোগাক্রান্ত শরীরকে খাড়া রাখার জন্য যে নিয়মবাঁধা জীবনযাত্রা, ঔষধ ও পথ্য, পরিবার পরিজনের সেবা-শুশ্রূষার প্রয়োজন তা এখানে সম্ভব ছিল না। অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন। শীতকালে জয়ার স্কুল যখন ৩ মাস ছুটি থাকত রাহুল তাকে নিজের কাছে নিয়ে রাখতেন। কমলা ও জেতাও কখনও কখনও যেতেন এবং একবার অসুস্থতার সময় তাঁরা তাঁর কাছে ছিলেন। জয়া তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন—'একদিন বাবার শরীর সত্যিই খুব খারাপ হয়ে গেল। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। আমি হাসপাতালে গিয়ে দেখলাম, তিনি একটা খোলা বারান্দায় শুয়ে আছেন। সেখানে আরো অনেক

রোগীর খাট। ইলেকট্রিক পাখা পর্যন্ত নেই। বাবা নিজের হাতে বাতাস করছিলেন। আমরা যখন হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এলাম তখন মার মুখ বড়ো বিষণ্ণ। বারবার বলছিলেন—দেশে থাকলে কখনও এমন হত না। সন্ধ্যায় বাবা আর হাসপাতালে থাকতে পারলেন না। ফিরে এলেন। কয়েকদিন একটা রেস্ট হাউসে গিয়ে থাকলেন।'

তৎসত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি ছেড়ে দেশে চলে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ এখানকার বেতন না পেলে তাঁর সংসার যে অচল হয়ে যাবে। কমলা দার্জিলিঙের 'গ্রীন রিজেস' বাড়িটি কিনে নেওয়ায় বাসস্থানের সমস্যার একটা সমাধান হয়েছিল। কিন্তু মেয়ে ও ছেলের লেখাপড়া ও সংসারযাত্রা নির্বাহের জন্য বছরে অন্তত ন হাজার টাকা যে তাঁর প্রয়োজন। এখানকার বেতন থেকে মাসে ৭৫০ টাকা না পাঠালে তো চলবে না। বই-এর রয়ালটির কোনো ভরসা নেই। তাঁর প্রধান প্রকাশক কিতাব মহল তাঁর প্রাপ্য টাকা ঠিকমতো পাঠায় না। তার বিরুদ্ধে এমনকি আদালতে মামলা করার কথাও তাঁকে ভাবতে হয়েছে। ১৯৬০ সালের ২ নভেম্বর বন্ধু আনন্দ কৌশল্যায়নকে এক পত্রে তিনি লিখছেন—'কিতাব মহল একবছর ৬০০০ টাকা (রয়ালটি) দিয়ে দুবছর চুপ করে আছে। আর টাকা দেওয়ার কোনো নাম নিচ্ছে না...আমি শ্রীবাচস্পতি পাঠকজিকে লিখেছি। কিন্তু ধরাধরি করে কাজ না হলে আদালতে যেতে হবে।' তাই একেবারে অশক্ত হয়ে না পড়া পর্যন্ত তাঁকে শ্রীলঙ্কায় থেকে যেতে হয়েছে।

১৯৫৯-এর সেপ্টেম্বরে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেবার জন্য রাহুল চলে এসেছিলেন। ১৯৬০-এর অগস্ট থেকে অক্টোবর গ্রীষ্মাবকাশের সময় দার্জিলিঙে ছিলেন। আবার নভেম্বরে চলে আসেন। ১৯৬০ সালের মার্চে চিকিৎসার জন্য তাঁকে সবেতন ছুটি দেয় বিশ্ববিদ্যালয়। ১২ জুলাই বিমানে শ্রীলঙ্কায় ফিরে আসেন। দেড়মাস থেকে গ্রীষ্মাবকাশের শুরুতে শ্রীলঙ্কা শেষবারের মতো ত্যাগ করেন রাহুল অগস্টে। এই শেষবার সম্পর্কে আনন্দজি লিখেছেন—'কিছুটা চাঙ্গা হয়ে রাহুলজি একবার সিংহলে এসেছিলেন। তিনি পড়াতে পারতেন না। তাঁকে কেউ পড়াতেও বলেননি। তাঁর খাওয়া-দাওয়ার সুবিধার কথা মনে রেখে তাঁর পরমবন্ধু এস. কে. কাপাডিয়ার ওখানে তাঁকে রাখা হয়েছিল। এবারের সিংহল নিবাস তাঁর পক্ষে একেবারেই সুবিধাজনক হয়নি। আর ফিরে যাবেন না এই ভেবেই রাহুল শ্রীলঙ্কা থেকে বিদায় নিয়েছিলেন।' ভিক্ষু শান্তি শাস্ত্রী লিখেছেন—'তিনি ভারতে যাবার সময় সবাইকে বলে গিয়েছিলেন, এই শেষবারের মতো আপনাদের দেখে যাচ্ছি।'

কিন্তু দার্জিলিঙে ফিরে আসার পর একমাসও কাটেনি তিনি আবার শ্রীলঙ্কায় ফিরে যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছেন। ২১ সেপ্টেম্বর তিনি চিঠিতে আনন্দ কৌশল্যায়নকে লিখছেন—'মাত্র ২৩ দিন হল এখানে এসেছি। অথচ মনে হচ্ছে ছমাস হয়ে গেছে। দিনগুলি বড়ো দুশ্চিন্তায় কাটছে। উদয় নারায়ণ তেওয়ারিকে জিজ্ঞেস করবেন যদি তাঁর যাওয়া স্থির না হয়ে থাকে তবে শ্রীলঙ্কায় আপনার সঙ্গেই চলে যাই। যাতে অন্তত যতদিন বেঁচে থাকব ছেলেমেয়ের জন্য মাসে ৭৫০ টাকা তো পাঠাতে পারব। তাহলে আর

কোনো চিন্তা থাকবে না। 'মুদ গই জব অখড়িয়া তব সোজ সব আনন্দ হ্যায়' (চোখ বুঁজলে সব বেদনাও আনন্দ—মরমীয়া শের) কমলজি নাছোড়বান্দা। তিনি শ্রীলঙ্কায় যাবেন না। কিন্তু আমি তো সারা জীবনের জন্য যাচ্ছি।'

মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের জন্য তাঁর স্মৃতিভ্রংশ হয় ১৯৬০-র ডিসেম্বরে। স্মৃতিভ্রংশের ঠিক একমাস আগে ১১ নভেম্বর রাহুল আনন্দজিকে লিখছেন—'আমি ওখানে (বিদ্যালংকারে) ১৯৫৮-র ১১ এপ্রিল পর্যন্ত ছুটি পেয়েছি। এখানে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রতীক্ষা করব। তারপর প্রয়াগের আশা ছেড়ে চিরকালের জন্য শ্রীলঙ্কা চলে যাব। শ্রীলঙ্কায় কখনো কখনো ছেলেমেয়েরা আমাকে দেখতে চলে আসবে। আমার কোনো সুখ-দুঃখ নেই। আমি শুধু ছেলেমেয়েদের বছরে ৯ হাজার টাকা পাঠাতে চাই। এইসব চিঠিতে রাহুলের চরিত্রের একটি দিকও স্পষ্টভাবে ধরা দিচ্ছে। তা হল তাঁর পুত্রকন্যার ভবিষ্যতের জন্য দুশ্চিন্তা। দুশ্চিন্তা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তিনি রাহুল বলেই ব্যাপারটা অস্বাভাবিক মনে হয়।

পুত্রকন্যা ও রাহুল

শেষ বয়সে রাহুল যখন সংসারের বন্ধনে নিজেকে বন্দী করেছেন তখন পুত্রকন্যার প্রতি তাঁর স্নেহ ভালোবাসা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। তাদের জীবনকে গড়ে তুলবার জন্য সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। ১৯৫৮ সালে যখন চীনে গিয়েছিলেন তখন তিনি তাদের প্রায় প্রতিদিন চিঠি লিখতেন। দুটি চিঠি এখানে তুলে দেওয়া হল—

'জয়া মেরী প্যারী বেটী

তোমার চিঠি পেয়ে খুব খুশি হয়েছি। তোমার কথা বাবার বারবার মনে পড়ছে। তুমি কেঁদো না। ভাইকেও কাঁদিও না। মাকে বোঝাবে। দেখবে মা যেন না কাঁদে। বলবে, বাবা শীগগিরই আসছেন। ...জয়া প্যারী মাকে দুঃখ দিও না। ছোটোভাইকে মেরো না, কাঁদিও না। ...জয়া বিটিয়ার জন্য বাবার ভালোবাসা, প্রতিদিনের, সন্ধ্যার, সকালের।

তোমার বাবা'

জেতাকে লিখছেন—

'জেতা প্যারে,

তোমার কথা বাবার বারবার মনে হচ্ছে। তুমি তো পাইলট হবে। তবে তো তোমাকে অনেক পড়তে হবে। খেলতেও হবে। বাবা তোমার জন্য অনেক গল্প ভেবে রেখেছে। ময়ূরের গল্প, বাঘের গল্প, বাঘের মাসির গল্প। ফিরে এসে বলব। তোমরা দুজনে কিন্তু ঝগড়া কোরো না। এখানকার ছেলেমেয়েরা কিন্তু একেবারেই ঝগড়া করে না। জয়া তো বাবাকে চিঠি লিখেছে। তোমারও তো বাবাকে চিঠি লেখা উচিত। জেতাকে অনেক ভালোবাসা ও চুমু।

তোমার বাবা'

রাহুলের পরিবার যখন চীনে গিয়েছিল তখন জয়াকে নিয়ে রাহুল নানা জায়গায়

ঘুরতেন; সেকথা আগেই বলা হয়েছে। শ্রীলঙ্কাতেও জয়াকে নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে রাখতেন শুধু নয়, তাকে নিয়ে নানা জায়গা দেখাতেন। বাবার সঙ্গে জয়া কেলানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতেন, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়িতে চেপে বাবার সঙ্গে অনুরাধাপুর, পেলেনরুবা, কাণ্ডী ইত্যাদি জায়গা দেখতে গিয়েছেন। জয়া লিখেছেন—'শ্রীলঙ্কা থেকে চলে আসার পর রোজ বাবার চিঠি আসত। তাতে আমার জন্য ছোটো ছোটো গল্প লিখে পাঠাতেন। ...আমার স্কুল, পড়াশোনা ও বান্ধবীদের সম্পর্কে বাবা জানতে চাইতেন।' জয়া আরো লিখেছেন—'শ্রীলঙ্কা থেকে কিছু সময়ের জন্য যখন তিনি দার্জিলিঙে আসেন তখন তিনি প্রতিদিন আমাকে নামতা শেখাতেন। ইংরেজি বানানে আমি কাঁচা ছিলাম, তাই তিনি রোজ আমাকে ডিকটেশন দিতেন এবং গল্প বলতেন।' ভিক্ষু শান্তি শাস্ত্রী লিখেছেন—'তিনি (রাহুল) একা শ্রীলঙ্কায় থাকলেও তাঁর মনপ্রাণ সর্বক্ষণ পড়ে থাকত দার্জিলিঙে গ্রিন রিজেসে তাঁর ছেলেমেয়ের কাছে।' মহাপণ্ডিত ত্রিপিটকাচার্য রাহুল সাংকৃত্যায়ন, দুরূহ বিষয়ের মধ্যে যিনি ডুবে থাকেন, ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে যাঁর কলম চলে দিবারাত্র তাঁর চিত্তের এই ভালোবাসার অপার উৎসার আমাদের বিমোহিত করে।

অপরাজেয় রাহুল

১৯৫৮ সালের ৩১ মার্চ চিকিৎসার জন্য রাহুল দার্জিলিঙ চলে আসেন এবং চিকিৎসার উদ্দেশ্যে কলকাতায় যান। ডাবর হাউসে থাকেন। কলকাতার ডাক্তাররা বললেন—কিডনি গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত। চিকিৎসার জন্য অন্তত দু সপ্তাহ কলকাতায় থেকে যেতে হবে। কিন্তু থাকতে পারলেন না, কারণ আগেই দার্জিলিঙে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল। দার্জিলিঙে একজন খ্যাতনামা ইংরেজ মহিলা ডাক্তার ডাঃ মিসেস প্যাটারসন তাঁকে পরীক্ষা করে বললেন—উচ্চ রক্তচাপ, রক্ত ও প্রস্রাবে শর্করা, ক্ষতিগ্রস্ত কিডনি। চিকিৎসার জন্য ১৫ এপ্রিল ডাঃ প্যাটারসনের নার্সিংহোমে রাহুল ভর্তি হলেন। ডাঃ বললেন— সময় লাগবে, তবে চিকিৎসা সফল হবে।

এই সময়ে আনন্দজির কাছে যে সব চিঠি রাহুল লিখেছেন তা পড়লে মনে হয় তিনি যেসব গুরুতর অসুখে ভুগছিলেন তা যে কোনও সময়ে যে তাঁর মৃত্যু ডেকে আনতে পারে তা হয়ত তিনি জানতেন। কিন্তু মৃত্যুর চেয়েও বড়ো কিছু কাজ তাঁর হাতে ছিল, বেশ কিছু বই ছিল, যা তাঁকে লিখে যেতে হবে। তাই মৃত্যুচিন্তার বিষণ্ণতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। ১৯৫৮-র ১৪ এপ্রিলের চিঠিতে তিনি তাঁর অসুখের বিবরণ দিচ্ছেন। কিন্তু পরমুহূর্তে সব কিছু ভুলে গিয়ে লিখছেন—

'আমি ওখানে যে সব জিনিস ফেলে এসেছি তার মধ্যে তিব্বতি হিন্দি কোষের গ্যালি প্রুফ ও তার সবটার কার্বন পেন্সিল কপি ও তিব্বতি ব্যাকরণের ভূমিকা সমেত দুটি প্রতিলিপি অত্যন্ত মূল্যবান। রেজিস্টার্ড বুক পোস্টে ওগুলি পাঠিয়ে দেবেন। ...এই সব বইটই আনার জন্য ওখানে চলে যাই—এমন ইচ্ছাও মাঝে মাঝে হয়। ...কিন্তু এসব

কথা ভাবার কোনো মানে হয় না। ডাক্তার অনুমতি দেবে না।'

২১ এপ্রিলের চিঠিতে লিখছেন—ডাঃ প্যাটার্সন তাঁকে আরো বিশ বছর বেঁচে থাকার গ্যারান্টি দিয়েছেন। মনে হয় প্যাটার্সনের আশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গেই রোগের ব্যাপারটা তাঁর মাথা থেকে একেবারে উবে গিয়েছিল। তিনি লিখছেন যে শ্রীলঙ্কায় ফিরে যেতে হবে *ধর্মাচার বিশ্বকোষ*-এর কাজ শেষ করার জন্য।

১৯৫৫-র ৪, ৮, ১৩ ও ১৯ মে রাহুল আনন্দজিকে যে চিঠিগুলি লিখেছেন তাতে শুধু বই আর পাণ্ডুলিপির কথা। ২ জুনের চিঠিতে কেবল বই-এর এক দীর্ঘ তালিকা। বইগুলি দার্জিলিঙে পাঠাতে লিখছেন। মৃত্যু যখন বারবার দরজায় আঘাত করছে তখনও তাঁর মনে আর কিছু নেই, শুধু বই। নিদারুণ দৈহিক যন্ত্রণার কথা নেই, এমনকি কমলা ও ছেলেমেয়ের কথাও নেই, আর্থিক দুশ্চিন্তার কথাও নেই। নতুন কী লিখবেন, কী অসমাপ্ত লেখা সম্পূর্ণ করতে হবে তারই কথা।

সারাজীবন দুটি ভুত তাঁর উপর সওয়ার হয়েছিল। ভ্রমণলিপ্সার ভুত তাঁর দেহটিকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে ফেলেছিল। কিন্তু জ্ঞানলিপ্সা যে মানুষের দেহবুদ্ধিকে সম্পূর্ণ ভুলিয়ে দিতে পারে—এই সব চিঠি থেকে তা বোঝা যায়।

প্রবঞ্চিত রাহুল

স্মৃতিভ্রংশের ঠিক একমাস আগে রাহুল দার্জিলিঙ থেকে আনন্দজিকে লিখেছিলেন—'এখানে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রতীক্ষা করব। তারপর প্রয়াগের আশা ছেড়ে চিরকালের জন্য শ্রীলঙ্কা চলে যাব।' হিন্দি বিশ্বকোষের সম্পাদনার জন্য তিনি প্রয়াগে যাওয়ার কথা ভাবছিলেন। হিন্দি বিশ্বকোষ সম্পাদনার ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছিলেন। এই ব্যাপারে রাহুলের সঙ্গে যে ব্যবহার করা হয়েছিল তা অত্যন্ত নিন্দনীয়।

১৯৫৫-র ফেব্রুয়ারিতে রাহুল যখন দিল্লি গিয়েছিলেন তখন ডঃ হাজারিপ্রসাদ ত্রিবেদী ও ডঃ রাজবলী পান্ডে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। তাঁরা রাহুলকে বলেন যে কাশী নাগরী প্রচারিনী সভা একটি হিন্দি বিশ্বকোষ রচনার পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় শিক্ষাবিভাগের কাছে পাঠিয়েছে। এই বিশ্বকোষের একজন প্রধান সম্পাদক ও চারজন সহকারী সম্পাদক থাকবেন। এই পরিকল্পনা কার্যকর হওয়ার পথে কোনো বাধা থাকবে না যদি রাহুল এই বিশ্বকোষের প্রধান সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

এই কাজের প্রতি রাহুলের আকর্ষণ ছিল। কিন্তু প্রধান সম্পাদকের পদের জন্য নির্দিষ্ট বেতন ছিল। সারা জীবন রাহুল কোনো বেতনভূক কাজ করেননি। তাই এই দায়িত্বভার গ্রহণে ইতস্তত করছিলেন। শেষপর্যন্ত বন্ধুবান্ধবরা অনেক করে তাঁকে বোঝালেন যে সম্পাদকের পদ কোনো সরকারি পদ নয়। সরকার শুধু অনুদান দিচ্ছে। তখন তিনি প্রধান সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণে স্বীকৃত হন এবং বিশ্বকোষের রূপরেখা রচনার কাজও সম্পন্ন করেন। ডঃ ভগবতশরণ উপাধ্যায়কে তিনি স্নেহ করতেন। তিনি ভাবছিলেন যে এই কাজে তাঁর সহযোগিতা পেলে তিনি উপকৃত হবেন।

কিন্তু দুঃখের কথা হল এই যে, ১৯৫৬-র ডিসেম্বর পর্যন্ত তাঁকে প্রধান সম্পাদকের দায়িত্বভার দেওয়া সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। এদিকে রাহুল এই দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁকে কিছু জানানোও হল না, ঝুলিয়ে রাখা হল। শেষ পর্যন্ত রাহুলকে প্রধান সম্পাদকের দায়িত্বভার দেওয়াই হল না। দেওয়া হল ভগবতশরণ উপাধ্যায়কে। কমিউনিস্ট বলে রাহুলকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। তাঁর স্নেহভাজন হিন্দি সাহিত্যসেবীদের ষড়যন্ত্রও এর পিছনে ছিল। কমিউনিস্ট হওয়ার জন্য যে কোনো মূল্য দিতে রাহুল প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তিনি দুঃখিত হয়েছিলেন এই কারণে যে তিনি যাদের প্রতি স্নেহাসক্ত ছিলেন সেই হিন্দি বিদ্বানরা তাঁর সঙ্গে প্রবঞ্চনা করেছিলেন।

রাহুল হিন্দি ভাষার প্রতি সমর্পিত-প্রাণ ছিলেন। একটি সমৃদ্ধ হিন্দিভাষা সৃষ্টির জন্য তিনি তপস্যা করেছিলেন বলা যেতে পারে। হিন্দি লেখকদের তিনি সব সময় উৎসাহিত করতেন। হিন্দি পরিভাষা সৃষ্টির জন্য তিনি দিনরাত পরিশ্রম করেছেন। কিন্তু কোনো কাজের জন্য তিনি কোনোদিন বেতন গ্রহণ করেননি। তাই দেশে-বিদেশে যখন রাহুল সাংকৃত্যায়নের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল তখনও তিনি নিদারুণ অর্থ কৃচ্ছ্রতায় ভুগছিলেন। বই-এর রয়ালটি বাবদ যে টাকা পেতেন তা দিয়েই তাঁকে কষ্টে-সৃষ্টে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে হত। রাহুলের *মেরী জীবনযাত্রা* পড়লে বোঝা যায় যে মুশৌরিতে যখন ঘরকন্না শুরু করলেন তখন তিনি কী রকম আর্থিক দুশ্চিন্তায় ভুগছিলেন। অথচ অর্থের জন্য কারো কাছে হাত পাতা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। এ ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত আত্মাভিমানী ছিলেন। অল্প বয়সে যখন তিনি অকিঞ্চন হয়ে উত্তরাখণ্ডে ঘুমক্কড়ী করছিলেন তখন অন্যদের দেখাদেখি নেপালের এক রানির কাছে একবার তিনি হাত পেতেছিলেন। রানি তাঁকে কী দিয়েছিলেন বা আদৌ কিছু দিয়েছিলেন কিনা তা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। কিন্তু একটা কথা তিনি মনে রেখেছিলেন 'কোনো কিছুর জন্যে জীবনে এই আমার প্রথম ও শেষ হাত পাতা।' রাহুলের এই উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। শুধু হাত পাতা নয় তিনি কোনো বেতনভুক সরকারি পদও কোনোদিন গ্রহণ করেননি। তাঁর সক্রিয় জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁকে ক্রমাগত বই লিখতে হয়েছে। লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৫ মাস ও শ্রীলঙ্কার বিদ্যালংকার পরিবেন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার জন্য তিনি বেতন নিয়েছেন। এই চার বছরের মতো সময় বাদ দিলে, সেই ১৭ বছর বয়সে বৈরাগ্যের ভূত যখন তাঁর উপর সওয়ার হয়ে তাঁকে উত্তরাখন্ডে নিয়ে যায় সেই সময় থেকে ৬৮ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি কোনো সবেতন পদ গ্রহণ করেননি। পরন্তু অসীম কষ্টে সংগৃহীত লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যের অমূল্য পাণ্ডুলিপি, পট প্রভৃতি বিভিন্ন সংগ্রহশালায় দান করে দিয়েছেন সংরক্ষণের জন্য।

জীবনের অন্তিমপর্বে সেই মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন ক্রমাগত আর্থিক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে দিন কাটিয়েছেন। নিজের জন্য নয়, তাঁর অবর্তমানে জয়া-জেতা-কমলার যাতে কোনো অর্থকষ্ট না হয়, তাদের যাতে কারো কাছে হাত পাততে না হয় সেজন্য তিনি

ক্রমাগত ভাবছেন। পাটনায় কমলার চাকরির জন্য তাঁর বন্ধু রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদকে লিখছেন। দার্জিলিঙের সরকারি কলেজে যাতে কমলাকে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করা হয় তার জন্য ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে লিখছেন। ১৯৫৫-৬০ তে আনন্দজিকে লেখা চিঠিগুলি থেকে এই সত্য বেরিয়ে আসে যে এ সময়ে রোগ যন্ত্রণাকে অগ্রাহ্য করে তিনি চিরকালের মতো শ্রীলঙ্কায় চলে যেতে চাইছেন। অবিশ্বাস্য উদ্যমে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনায় নিজেকে ব্যাপৃত রাখছেন, যুগপৎ নানাভাবে অর্থ উপার্জনের কথা ভাবছেন। হয়ত ৬৮ বছরের এই ছেলেমানুষ লোকটি ভাবছেন আরো ত্রিশ বছর বেঁচে থেকে ছেলেমেয়েদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেই তিনি ছুটি নেবেন। ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ আর্থিক সুস্থিতির চিন্তা রাহুলকে এমন অস্থির করে তুলছিল যে ২৩ দিনের দার্জিলিঙ বাস তাঁর কাছে ছমাসের মতো মনে হচ্ছিল। দার্জিলিঙে স্ত্রী পুত্র কন্যাকে নিয়ে কিছুদিন বিশ্রামের সুখ উপভোগ করাব মতো মানসিক অবস্থাও তাঁর ছিল না। সারা জীবন ঘুমক্কড়ী আর জ্ঞানান্বেষণের নেশায় পাওয়া জীবন কাটিয়ে তিনি কাসানোভার মতো ঘাতক কালকে ভুলে গিয়েছিলেন। সেই প্রবৃদ্ধ ঘাতক কাল আজ তাঁকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। তিনি নিরুপায়। হয়ত ডায়াবেটিজ নয়, উচ্চ রক্তচাপ, ক্ষতিগ্রস্ত কিডনি নয়, তাঁর প্রাণের চেয়েও প্রিয় জয়া ও জেতার অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ তাঁকে নিরন্তর যে মানসিক যন্ত্রণা দিচ্ছিল তাই তাঁকে দেড় বছর বিস্মৃতির গভীর অন্ধকারে টেনে নিয়েছিল।

স্মৃতিভ্রষ্ট রাহুল

রাহুলের প্রয়াগে অথবা শ্রীলঙ্কায় আর যাওয়া হয়নি। তার আগেই তাঁকে অন্ধকার গ্রাস করেছিল। যে পরিস্থিতিতে রাহুলের মৃত্যু এসেছিল তার জন্য হিন্দি জগত তাদের দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে না। রাহুল যদি ভারতের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সুযোগ পেতেন, তাঁকে যদি অধ্যাপনার জন্য শ্রীলঙ্কায় না যেতে হত তবে হয়ত প্রবল পরাক্রান্ত রাহুলকে মৃত্যু এত সহজে গ্রাস করতে পারত না। শ্রীলঙ্কায় যাওয়ার ফলে প্রতিকূল পরিবেশে তাঁকে জীবনযাত্রা প্রণালী পালটাতে হয়েছিল।

দেশে বিদেশে তাঁর পাণ্ডিত্যের বিপুল খ্যাতি সত্ত্বেও তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে লেখাপড়া শেখেননি বলে ভারতের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় প্রোফেসর পদ অলংকৃত করার জন্য তাঁকে আহ্বান জানায়নি। যে মানুষটি জ্ঞানের সাধনায় সারা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর জীবনদীপের তেল ফুরিয়ে এসেছে তা তাঁর সাহিত্যিক বন্ধু-বান্ধবরা তো বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু গৌরবময় বিস্মৃত অতীতকে পুনরুদ্ধার করে যিনি ভারত তৈলপূর্ণ প্রদীপের আলো বিশ্বময় বিকীর্ণ করেছিলেন সেই রুগ্ন মুমূর্ষু মানুষটিকে তাঁর জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে ফেলে অসুস্থ শরীরকে শ্রীলঙ্কায় টেনে নিয়ে যেতে হল। ফলে তাঁর আয়ুষ্কাল হ্রস্বতর হয়ে আসে।

১৯৫৫-র ডিসেম্বরে কলকাতায় কিশোরীদাস বাজপেয়ীর আবাসে অনুষ্ঠিত সম্মান-সমারোহে যোগ দিতে আসেন অসুস্থ রাহুল। সিঁড়ি ভেঙে যখন উপরে উঠছিলেন তখনই

পক্ষাঘাতের আক্রমণ হয়। কারুরই একথা মনে হয়নি যে রাহুল হৃদরোগী, তাঁকে উপরে নিয়ে যাওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা করা উচিত। পক্ষাঘাত ও স্মৃতিলোপ হয়েছিল তাঁর মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের জন্য।

পক্ষাঘাত হওয়ার পর রাহুলের দেড় বছরের জীবনের বিবরণ বিশেষ মেলে না। তাঁর এই দেড় বছরের জীবনের কিছু বিচ্ছিন্ন তথ্য কোনো কোনো লেখকের লেখার মধ্যে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। তা থেকেই দেড় বছরের মতো তার জীবন ইতিহাসকে একটা সূত্রে গ্রথিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। —*পাপা ঃ মেরে বচপন কী স্মৃতিয়াঁ* গ্রন্থে জয়া লিখছেন—'ডিসেম্বর মাস এল। আমরা সবাই কলকাতা গেলাম। কোনো বড় সভা ছিল। ...সেই সভার দিনের কথাই বলছি। বাবার বন্ধুরা তাঁকে ঘিরে বসেছিল। গভীর রাতে তাঁরা সবাই চলে যান। পরদিন সকালে যখন আমার ঘুম ভাঙল তখন শুনতে পেলাম যে মা খুব চেঁচিয়ে বাবার সঙ্গে কথা বলছেন। তাঁকে হাতে ধরে বাথরুমে নিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু বাবা কিছুই বুঝতে পারছেন না।

'ডাক্তার ডাকা হল। বাবাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। কয়েক মাস বাবা হাসপাতালে কাটালেন। আমি প্রতিদিন বাবার সঙ্গে দেখা করতে যেতাম।

'বাবা তখন সবাইকে 'ভাইয়া' বলে ডাকতেন। কাউকে চিনতে পারতেন না। মাকেও প্রায় সময়ই ভাইয়া বলতেন। যখনই কেউ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন তিনি বলতেন—'ভাইয়াকে, চা খাওয়াও'। হয়ত এই কারণেই হাসপাতালের লোকেরা চায়ের আয়োজন করে রাখত।

'বাবার সঙ্গে দেখা করতে হাসপাতালে অনেক লোক আসতেন। বোম্বাই থেকেও বেশ কিছু ভদ্রলোক বাবার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। এঁরা বেশ কয়েকবার এসেছিলেন। ...বাবা লেখাপড়া ভুলে গিয়েছিলেন। একদিন এক ভদ্রলোক কাঠের তৈরি হিন্দি অক্ষর ও প্লাস্টিকের নানা রঙের ইংরেজি সংখ্যা নিয়ে এসেছিলেন। অনেকটা সময় তিনি বাবার পাশে বসে ছিলেন। তাঁর হাত ধরে তাঁকে দিয়ে অক্ষর ওঠাতেন। আমাদের সবাইকে নিয়ে তিনি ফোটো তুলেছিলেন। পরে মার কাছে জেনে ছিলাম তিনি শ্রীজৈন।

'আমার স্কুল খোলার সময় এসে গিয়েছিল। মা আমাকে দার্জিলিঙ রেখে আবার কলকাতায় চলে আসেন। ...কিছুদিন পরে জানতে পারলাম, চিকিৎসার জন্য বাবাকে সোভিয়েত দেশে পাঠানো হবে এবং মাও তাঁর সঙ্গে যাবেন।'

সোভিয়েত রাশিয়া যাওয়ার আগে পক্ষাঘাতগ্রস্ত রাহুলের একটি অন্তরঙ্গ চিত্র পাওয়া যায় তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু সোহনলাল শাস্ত্রীর লেখা—*মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন ঔর উনকা ব্যক্তিত্ব* থেকে। এই স্মৃতিচারণা থেকে রাশিয়া যাওয়ার আগে রাহুলের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। রাশিয়া যাওয়ার আগে রাহুল ও কমলা দিল্লিতে এক সাংসদের বাড়িতে কয়েকদিন কাটিয়েছিলেন। সোহনলাল লিখছেন—'আমি রাহুলজির সঙ্গে দেখা করার জন্য সকাল ৯টা নাগাদ রাহুলজির বাড়ি গিয়ে পৌঁছোলাম। কমলজি বললেন 'রাহুলজি স্পষ্টভাবে কথা বলতে পারেন না। কাউকে চিনতেও পারেন

না। সারারাত তিনি এক মিনিটও ঘুমোতে পারেননি। তাঁর অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর। এই অবস্থায় তাঁর সঙ্গে দেখা করা তোমার উচিত হবে না।'

'রাহুলজির এই করুণ অবস্থার কথা শুনে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য আমি আরো বেশি উৎসুক হয়ে উঠলাম। আমি কমলজিকে সবিনয়ে নিবেদন করলাম, কৃপা করে আমাকে অল্প কিছুক্ষণের জন্য রাহুলজির সঙ্গে দেখা করতে দিন। তিনি বললেন—ও তোমাকে চিনতে পারবে না। স্পষ্ট করে কথাও বলতে পারবে না। এই অবস্থায় তুমি ওর সঙ্গে দেখা করার জন্য জেদ কোরো না। কিন্তু আমার পুরোপুরি বিশ্বাস ছিল যে রাহুলজি যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন, তিনি আমাকে নিশ্চয়ই চিনতে পারবেন।'

শেষ পর্যন্ত সোহনলালের আগ্রহাতিশয্যে কমলা তাঁকে রাহুলের ঘরে নিয়ে যান। 'ঘরে ঢুকতেই রাহুলজি আমাকে চিনতে পারলেন এবং খাটিয়া থেকে উঠে আমার গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। ভাঙা ভাঙা কথায় আমাকে বললেন—'সোহনলাল, তোমার ছেলেমেয়েরা কেমন আছে? তোমার স্ত্রী ভালো আছে তো? আচার্যজি (বিশ্ববন্ধু) ভালো আছেন তো? তার সঙ্গে তোমার কবে দেখা হয়েছে?'

'ধরা গলায় আমি তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিলাম। আমি তাঁর কথা বুঝতে পারছিলাম। তিনিও আমার কথা বুঝতে পারছিলেন। অনেকদিন ধরে তিনি ডায়াবেটিজে ভুগছিলেন। এখন তিনি কঠিন মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁর ঘরের এক কোণে তাঁর বইয়ের স্তূপ পড়েছিল। তিনি বার বার আমাকে বলছিলেন—তোমার ইচ্ছে মতো আমার বই নিয়ে যাও। আমি তাঁকে বললাম সব বই-ই আমার কাছে আছে। অতএব তাঁর একটি বইও আমি সেখান থেকে নিয়ে আসিনি।

'আমার অফিসের সময় হয়ে আসছিল। আমি তাঁর কাছ থেকে ওঠার চেষ্টা করছিলাম; রাহুলজি আমাকে উঠতে দিচ্ছিলেন না। তিনি চাইছিলেন, আমি তাঁর পাশেই বসে থাকি। কমলজি সব কিছু দেখছিলেন। আমার প্রতি রাহুলজির কী পরিমাণ ভালোবাসা তা দেখে তিনি আশ্চর্য হচ্ছিলেন।

'শেষ পর্যন্ত রাহুলজি জলভরা চোখে থেমে থেমে কমলজিকে দেখিয়ে বললেন, 'আমি আমার সন্তানদের সঙ্গে দেখা করতে চাইছি; কিন্তু এ আমাকে তাদের সঙ্গে দেখা করতে দিচ্ছে না।'

'সাড়ে দশটা বা এগারোটা নাগাদ আমি রাহুলজির কাছ থেকে বাইরে এসে কমলজিকে বললাম, রাহুলজির সঙ্গে তাঁর ছেলেমেয়ের দেখা করানো সম্ভব নাও হতে পারে। কেননা ওরা দার্জিলিঙে থাকে। ...তবু ওদের ফোটো অন্তত রাহুলজিকে দেখাতে পারেন। তাতে হয়ত তিনি কিছুটা সান্ত্বনা পাবেন।

'কমলজি আমাকে এমন একটা ফোটো দেখালেন যাতে গোটা পরিবারের সঙ্গে ছেলেমেয়েরা ছিল। কিন্তু তাতে ছেলেমেয়েরা খুব ছোটো দেখাচ্ছিল। আমি কমলজিকে বিশ টাকা দিয়ে বললাম, ছেলেমেয়ের ফোটো এনলার্জ করিয়ে নিন। রাহুলজি যখন ছেলেমেয়েদের দেখতে চাইছেন, তখন তাঁকে এই এনলার্জ করা ফোটো দেখাবেন।

কমলজি আমার এই প্রস্তাবে রাজি হলেন। ...রুগ্ন রাহুলজির সঙ্গে দেখা করে গভীর বেদনা নিয়ে আমি অফিসে ফিরলাম।

'আমি বুঝতে পারছিলাম যে এই ভীষণ ব্যাধি থেকে রাহুলজি আর সেরে উঠবেন না এবং তাঁর সঙ্গে আমার এই শেষ দেখা। বস্তুত তাই হয়েছিল। চিকিৎসা হয়ে ভালোভাবে ফিরে আসার জন্য তিনি রাশিয়া গিয়েছিলেন। কিন্তু পুরোপুরি সুস্থ হয়ে তিনি ফিরে আসেননি।'

এবার আবার জয়ার স্মৃতিকথায় ফিরে যাওয়া যাক—

'মা রাশিয়া থেকে আমাকে চিঠি লিখতেন। সোভিয়েত রাশিয়াতে বাবার কী চিকিৎসা হচ্ছে তিনি আমাকে চিঠি লিখে জানাতেন। একদিন মায়ের চিঠিতে জানতে পারলাম ঈগর ও তাঁর মা দেখা করতে এসেছিলেন।

'ছেলেবেলায় ঈগর সম্পর্কে বাবা আমাকে অনেক কথা বলতেন। আমি জানতাম আমার এক ভাই রাশিয়াতে আছে। সে রুশি। বাবা এও বলতেন যে একদিন তাঁর সঙ্গে বাবার নিশ্চয় দেখা হবে। এখন রাশিয়া থেকে ঈগর এবং তাঁর মার চিঠি আসছিল। ঈগর লিখত রুশ ভাষায় ও তার মা লিখতেন ইংরেজিতে। জেতা ও আমার কাছে আলাদা আলাদা চিঠি লিখতেন। মার হাত দিয়ে আমাদের খেলনা পাঠাতেন।

'শীতের সময় আমার ও জেতার রাশিয়া যাওয়ার কথা হচ্ছিল। মা চিঠি লিখেছিলেন যে বাবা যখনই কিছুটা ভালো থাকতেন, তখনই তিনি জিগ্যেস করতেন 'দোনো বচ্চে?' (ছেলেমেয়ে?) কিন্তু আমাদের রাশিয়া যাওয়ার সুযোগ হয়নি। কেননা খবর পেলাম বাবা ফিরে আসছেন। মার্চ মাসে মা বাবাকে নিয়ে দিল্লি হয়ে দার্জিলিঙে পৌঁছোন।

'বাবা যখন সুস্থ ছিলেন, তখন তিনি কলকাতা থেকে নানা রঙের গার্ডেন আমব্রেলা এনেছিলেন। তিনি বেশ সৌখিন বেতের চেয়ার ও টেবিলও এনেছিলেন। আমি স্কুলে যাওয়ার আগেই একটি চেয়ার বাইরে গার্ডেন আমব্রেলার নীচে রেখে যেতাম। যখন দুপুরে খেতে আসতাম তখনও দেখতাম বাবা সেখানেই বসে আছেন। তাঁকে দূর থেকে দেখে মনে হত তিনি পুরোপুরি সুস্থ। কিন্তু কাছে গেলে বুঝতে পারতাম তাঁর মস্তিষ্কের কী অবস্থা।'

জগদীশপ্রসাদ দ্বিবেদী তাঁর *বিদ্বতা ঔর ব্যক্তিত্ব* স্মৃতিকথায় লিখেছেন যে রাহুলের ইচ্ছা ছিল, তাঁর ছেলেমেয়েকে তিনি তাঁর সঙ্গে মস্কো নিয়ে যাবেন। 'যখন তিনি শুনলেন যে আমি মস্কো হয়ে বুদাপেস্ত যাব তখন তিনি আমাকে বললেন যে আমি যেন তাঁর ছেলেমেয়েকে আমার সঙ্গে মস্কো নিয়ে যাই। কিন্তু এক মাস পরে যখন আমি ফিরে মস্কো গেলাম তখন জানতে পারলাম সেই রাত্রিতেই রাহুল মস্কো থেকে দিল্লি ফিরে যেতে পারেন।'

১৯৫৫ সালের ১৪ এপ্রিল রাহুল সাংকৃত্যায়নের জীবনদীপ নির্বাপিত হয়।

বিদ্যালংকার বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধার্ঘ্য

'১৯৫৫ সাল। রাহুল স্মৃতিভ্রষ্ট, গুরুতর রোগাক্রান্ত। নভেম্বর মাসে বিদ্যালংকার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন উৎসবে রাহুলকে ডি. লিট (সাহিত্য চক্রবর্তী) উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এই উপাধি প্রদান উপলক্ষে ভিক্ষু শান্তি শাস্ত্রী সংস্কৃতে যে ভাষণ দেন, তাতে রাহুলের অসামান্য কীর্তিকে বিস্ময়কর সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপিত করা হয়। তার বঙ্গানুবাদ এখানে প্রদত্ত হল।

শ্রদ্ধাস্পদ কুলপতি,

আমি এখন শ্রীমান রাহুল সাংকৃত্যায়নের কীর্তির তালিকা প্রস্তুত করছি। পূর্ব ও পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদ্যার বিদগ্ধমণ্ডলীর মধ্যে খ্যাতিমান এই মহানুভব ধর্মকীর্তির প্রমাণবার্তিক, স্ববৃত্তি, বাদন্যায় আদির মতো বিলুপ্ত গ্রন্থ ভোট দেশ থেকে এনে সম্পাদিত করেছেন। ভোটদেশে সুরক্ষিত তালপাতায় লিখিত অনেক লুপ্তগ্রন্থের ফোটোগ্রাফ এনে বৌদ্ধধর্মের তর্ক ও দর্শনের স্বাধ্যায়ে অভিনিবিষ্ট মানুষের মহা উপকার করেছেন। বিলুপ্ত গ্রন্থের আবিষ্কারের ক্ষেত্রে তিনি অদ্বিতীয়। তিনি প্রথমদিকে সিংহল দ্বীপের এই (বিদ্যালংকার নামক) বিদ্যায়তনেই ভগবান বুদ্ধের মূলীভূত আগম অধ্যয়ন করেছেন এবং তা হিন্দি ভাষায় অনুবাদের দ্বারা উত্তর ভারতে তার প্রবর্তক। স্বাধীন ভারতে বিজ্ঞানের পরিভাষাই শুধু নয়, প্রশাসনিক পরিভাষারও অভাব দেখে তিনি শাসন শব্দকোষ রচনা করেন এবং মৌলিক, অনূদিত ও সম্পাদিত গ্রন্থরচনা করেন যার পৃষ্ঠাসংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হাজার। প্রথমে তিনি লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোফেসর ছিলেন এবং এখন তিনি বিদ্যালংকার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-পদেব শোভাবর্ধন করছেন।

দর্শন ও পুরাতত্ত্বে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। বিদ্যায় ও বয়সে বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে শিশুর সরলতা। এই শ্রীমান রাহুল সাংকৃত্যায়নেব পাণ্ডিত্যের গৌরবের জন্য ভারতীয় পণ্ডিতেরা তাঁকে মহাপণ্ডিত উপাধিতে বিভূষিত কবেছেন। তিনি বিদ্যার ক্ষেত্রের এই মহান সম্মানের যোগ্য। বেশি কথা বলার প্রয়োজন কী?

কুলপতিজী, যে ধর্মকীর্তির কৃতি অন্যান্য বিদ্বানদের কাছে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তিনি তা পুনরুদ্ধার করেছিলেন। এই উন্নত পুঁথির শ্বেতকমলের মালায় সরস্বতী পূজিত হয়ে শোভা পাচ্ছেন। বর্তমানে অনুপস্থিত মহর্ষি সংকৃতি বংশজ শ্রীরাহুলকে বিদ্বানদের এই উৎসবে সাহিত্য চক্রবর্তী(ডি. লিট) পদের দ্বারা সম্মানিত করা হোক।

উনবিংশ অধ্যায়

রাহুল সাংকৃত্যায়নের কৃতির মূল্যায়ন

যতদূর মনে পড়ে H.G. Wells তাঁর *Outline of World History* শেষ করেছিলেন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য দিয়ে। তিনি লিখছেন যে, দৃশ্যমান জগৎকে জয় করার জন্য মানুষের যে জয়যাত্রা আমরা এই ইতিহাসে লক্ষ করেছি, তা মানুষকে সম্পূর্ণ জয় এনে দেবে—তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু মানুষের সামনে আরো একটি অনাবিষ্কৃত মহাদেশ পড়ে রয়েছে। মানুষকে সেই মহাদেশ আবিষ্কার করতে হবে, তার জ্ঞানের অন্তর্গত করতে হবে; এই মহাদেশ মানুষের আন্তর জগৎ। মানুষের এই আন্তর জগৎকে রাহুল পুরোপুরি অস্বীকার করেছিলেন। নিরন্তর ভ্রাম্যমানতাই জীবন; জ্ঞানার্জনের স্পৃহাই জীবন; প্রায় শ্বাসরোধী বেগে অর্জিত জ্ঞানকে লিপিবদ্ধ করাই জীবন। একটিমাত্র কামনা—নির্যাতিত, দলিত মানুষের উদ্ধারের কামনা—তাঁর জীবনের কর্মকে অনুপ্রাণিত করেছিল। বিশ্বব্যাপী একটি শোষণহীন সাম্যবাদী সমাজের প্রতিষ্ঠার দ্বারাই মানুষের উজ্জ্বল উদ্ধার সম্ভব বলে তিনি মনে করতেন।

রাহুল বাইরের জগতে ঘুরে বেড়িয়েছেন। ভ্রমণ ও জ্ঞানার্জনের প্রচণ্ড উন্মাদনা তাঁকে এমনভাবে অধিকার করেছিল যে, তাঁর আর কোনোদিকে তাকাবার অবসর ছিল না। হাজার হাজার বছরের সাধনায় মানুষ দৃশ্যমান জগৎ সম্পর্কে যা কিছু জেনেছে, রাহুল একটিমাত্র জীবনেই তা আত্মসাৎ করে হিন্দি জগতের জন্য তা লিপিবদ্ধ করে রেখে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মানুষের একমাত্রিক জীবনই তাঁর চোখে পড়েছে। রাহুল বাইরের জগৎকে দেখেছেন, মানুষের বাইরের জীবনটাই দেখেছেন। আন্তর জীবনকে তিনি অগ্রাহ্য করেছেন। শুধু অস্বীকার নয়, বিদ্রূপ করেছেন এবং তা করেছেন আন্তর জগৎকে জানার চেষ্টা না করে। তিনি ডারউইনের বিবর্তনবাদের কথা বলেছেন, বিবর্তনবাদী সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছেন। কিন্তু ফ্রয়েডের নামোচ্চারণ করেননি। বুদ্ধিবাদী, বিজ্ঞানবাদী, মার্কসবাদী রাহুলের ফ্রয়েড সম্পর্কে কোনো কৌতূহল নেই। বিজ্ঞান দৃশ্যমান জগতে যে পরিবর্তন নিয়ে এসেছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলার মধ্যে তিনি তা প্রত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু এই সত্য তাঁর চোখে পড়েনি যে, বিজ্ঞান নিত্য নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা মানুষের আন্তর জগতের অনালোকিত মহাদেশ মানুষের চোখের সামনে মেলে ধরেছে। নিরন্তর চেষ্টা করছে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ, সব চিত্তবৃত্তির, ইন্দ্রিয়জ চেতনার একটিমাত্র উৎসমুখের ঢাকা খুলে দেওয়ার। আন্তর ও বহির্জগতের বস্তুকণাময় জগতে বিজ্ঞানসাধনার মূল কথা হল একটি অন্বয়ী সূত্রের সন্ধান, যার মধ্যে পুঞ্জিত, উচ্ছ্রিত বস্তুকণাময় অন্তর্বহির্জগৎ গ্রথিত। জড় জগতের মতো

মানুষের মনোজগৎকেও উন্মোচিত করছে বিজ্ঞান। এতকাল যে জগৎ অজ্ঞাত ছিল তা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাছে ধরা দিচ্ছে। বিজ্ঞান সর্বত্র তার আলোকপাত করছে এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলস্বরূপ যে জ্ঞান অর্জিত হচ্ছে, পুরোনো প্রত্যয় বর্জন করতে হলেও মানুষ তা মেনে নিচ্ছে।

বিজ্ঞান যে মানুষের আন্তর জগৎকে আলোকিত করে মানবিক জ্ঞানের একটি নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে, সে বিষয়ে রাহুল প্রায় উদাসীন ছিলেন বললে অত্যুক্তি হবে না। ২৭৭০ পৃষ্ঠার আত্মজীবনীতে অসংখ্য রমতা সাধুর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে, তিনি তাঁদের সঙ্গে ধুনি জ্বালিয়ে একসঙ্গে বসে রাত কাটিয়েছেন, নানা দেশের ভ্রমণের গল্প শুনেছেন, কিন্তু প্রায় চল্লিশ বছরের নিরন্তর ভ্রাম্যমান জীবনে কোনো প্রকৃত যোগীপুরুষের সঙ্গে তাঁর দেখা তো হয়ইনি, অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো হঠযোগীর সঙ্গেও তাঁর দেখা হয়েছে, এমন কোনো উল্লেখ তাঁর *মেরী জীবনযাত্রা*-য় নেই। তিনি নিজে কিছুটা মেসমেরিজম শিখেছিলেন, তা তিনি লিখেছেন। কিন্তু মেসমেরিজম ব্যাপারটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ব্যাপার বলে তিনি মনে করতেন। ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করার যে কিছু আছে, তা তাঁর মনে হয়নি।

কিন্তু এই বিজ্ঞানবাদী, প্রখর বুদ্ধিবাদী জ্ঞান-তপস্বী মনোজগতের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে উপেক্ষা করে একদিকে যেমন দৃশ্যের মধ্যে নিজেকে অন্তরীণ করেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি আন্তর জগতের আলোড়নকে বিদ্রূপের দ্বারা পিষ্ট করে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সুখ-দুঃখ-বেদনা, মহৎ আদর্শের ও তুচ্ছ প্রাত্যহিকতার দ্বন্দ্বের, অসাফল্যের, অতৃপ্তির, যৌনক্ষুধার যন্ত্রণা যাকে grandeur it misere de la vie savante বলা হয়েছে, রাহুলের তা সবই ছিল। কারণ ব্রাউনিঙের grammarian-এর মতো রাহুল সম্পর্কে একথা বলা যাবে না যে this man decided not to live but to know। তিনি ভোগ ও জ্ঞান দুই-ই চেয়েছিলেন। তিল তিল করে ভোগের সামগ্রী জমিয়ে যে ভোগ তা নয়, পাখা কেটে ফেলে স্থবির বদ্ধ-পাখা জীবনের যে ভোগ তা নয়। মুক্তপক্ষ ঈগলের ক্ষণিক বিশ্রাম এবং এই পৃথিবীর মৃত্তিকার পাত্রে ভরা অজস্র, অপরিমেয় সুখের, তুষারাবৃত হিমালয়ের উত্তুঙ্গ প্রহরী সারি সারি দেওদার ও পুষ্প-পল্লবের তীক্ষ্ণ আনন্দ, আশ্লিষ্ট নারীদেহের বিগলিত সুধার আস্বাদন। আবার অনন্ত, উদার আকাশে পাখা মেলে দেওয়া।

কিন্তু মেঘবর্ত্মে সঞ্চরমান এই বিহঙ্গের পাখা অক্ষত থাকেনি। পাখা কাটা গিয়েছিল। স্থবির গৃহস্থের দিনযাপনের গ্লানি, অর্থকৃচ্ছ্রতা—যা মেটাবার আবশ্যিক শর্ত ক্রমাগত গ্রন্থ রচনা—বয়স্ক, ব্যাধিগ্রস্ত ভাঙা শরীর নিয়ে এই সব কিছু তাঁকে অবিরাম পরিশ্রম করতে বাধ্য করেছিল। জীবনের অন্তিম পর্বে স্থবির গৃহস্থের আন্তর জীবন রাহুলের জীবনের প্রাথমিক স্তরে উঠে এসে পুরোনো চলমান জীবনের নিঃসীম আকাশকে প্রায় মুছে দিয়েছিল। কমলা-জেতা-জয়ার আর্থিক সুস্থিতির জন্য তাঁর অস্থিরতা এক সময় তাঁকে প্রায় দিশেহারা করেছিল। রাহুলের মতো চলিষ্ণু পণ্ডিতের জীবনের এই পরিণাম

বড় শোকাবহ। তাঁর আন্তর জীবনের পীড়া তাঁর শেষ জীবনে যে কী কঠিন যন্ত্রণা দিত, তা বোঝা যেত পক্ষাঘাতগ্রস্ত অবস্থায়ও দুটি শব্দ উচ্চারণের মধ্য দিয়ে—দোনো বাচ্চো। জয়া ও জেতাকে তিনি ক্রমাগত দেখতে চাইতেন। কিন্তু তা সম্ভব ছিল না। তাই তাদের ফোটো দেখিয়ে তাঁকে শান্ত রাখতে হতো। প্রকৃতির কী নির্মম প্রতিশোধ!

বিজ্ঞান যে পদ্ধতিতে মানুষের বাইরের ও আন্তর জগৎকে নিত্যনতুন আবিষ্কারের দ্বারা আলোকিত করছিল, পাশ্চাত্য পাণ্ডিত্যের নিয়মাবদ্ধ বিচার-বিশ্লেষণ প্রণালী (methodology of western scholarship) এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে অনুসরণ করছিল। তথ্য ও যুক্তি নির্ভর এই ইউরোপীয় পাণ্ডিত্য-ধর্মের বিষয়গত নিরপেক্ষতা বিজ্ঞানের বস্তুতান্ত্রিক যথাযথতা পর্যন্ত পৌঁছোতে পারে না; কিন্তু কাছাকাছি যেতে পারে। ইংরেজরা এদেশে আসার পর ইংরেজি শিক্ষিত ভারতীয় পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মতো পাশ্চাত্য পাণ্ডিত্যের নিয়মাবদ্ধ প্রণালী স্বীকার করে নেয়। কিন্তু সমান্তরালভাবে এদেশে ভারতীয় পাণ্ডিত্যধর্মের নিয়মপরম্পরাও প্রচলিত ছিল দীর্ঘকাল। ভারতীয় পাণ্ডিত্যের জগতের রাজধানী ছিল কাশী। ভারতীয় পাণ্ডিত্যের প্রকাশের ভাষা ছিল সংস্কৃত। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের পণ্ডিতদের নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি সংস্কৃত ভাষায় যে গ্রন্থ রচনা করত, কাশীর সারস্বত সমাজে বাদ-প্রতিবাদ বিচারের দ্বারা তার সারবত্তা স্বীকৃত হলেই তা বিদ্বজ্জনগ্রাহ্য হত। মৌলিক কৃতি বারাণসীর সারস্বত সমাজের বিচারের মানদণ্ডে যাতে গৃহীত হয়, সেজন্য ভারতীয় পণ্ডিতদের ভ্রমণশীল হতে হত। ভারতের বৌদ্ধিক রাজধানী বারাণসী ভারতের সর্বত্র ছড়ানো বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র থেকে পণ্ডিতদের আকর্ষণ করত। তাছাড়া ভারতীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতেরা ভারতের বিদ্যাচর্চার বিভিন্ন কেন্দ্রে যেখানে বিশেষীকৃত বিদ্যার অনুশীলন হত (যেমন তক্ষশীলা, কাঞ্চী, নবদ্বীপ ইত্যাদি) সেখানে ছড়িয়ে থাকতেন। দেশের বিভিন্ন অংশের বিদ্যার্থীদের তাঁদের কাছে নিরন্তর যাতায়াত ছিল। ভারতের বিভিন্ন অংশের মধ্যে কখনোই বাণিজ্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতির যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়নি। সরযূপারী ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও রাহুল একদিকে যেমন ঐতিহ্যাগত সংস্কৃত জ্ঞানবিজ্ঞানের বিশিষ্ট পরিমণ্ডল ও বিদ্যাচর্চার মধ্যে বেড়ে ওঠেননি; অন্যদিকে ইংরেজি, ফরাসি, রুশ ও অন্যান্য কয়েকটি পশ্চিমি ভাষার জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও পাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয়ী নিয়মাবদ্ধ পাণ্ডিত্য-ধর্মের সঙ্গেও তাঁর বিশেষ পরিচয় ছিল না। এই অর্থে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সারস্বত সাধনার ক্ষেত্রে রাহুলকে novus homo বললে হয়তো অন্যায় হবে না। ঘুমক্কড় রাহুল ভারতীয় রমতারামদের একজনই হয়তো হয়ে যেতেন যদি তিনি জ্ঞানার্জনের প্রচণ্ড বাসনার দ্বারা আক্রান্ত না হতেন। তাঁর স্থির সিদ্ধান্ত ছিল যে, রমতা সাধু হওয়ার আগে সংস্কৃতের বিপুল ভাণ্ডার ও বেদান্ত তাঁর অধিগত হওয়া চাই। তাই প্রাচীন ভারতীয় বিদ্যার পরিমণ্ডলের মধ্যে তিনি পরিগৃহীত হয়েছিলেন এবং এক অখ্যাত চাষি পরিবারের ব্রাহ্মণ বালকের শেষপর্যন্ত আবির্ভাব ঘটেছিল মহাপণ্ডিত ও ত্রিপিটকাচার্য হিসেবে। বৌদ্ধধর্ম অধ্যয়নের ক্ষেত্রে রাহুল ভারতীয় পাণ্ডিত্যধর্ম অনুসরণ করেছিলেন। তা না

করে উপায় ছিল না। কারণ বৌদ্ধধর্মের অধ্যয়নে এই পাণ্ডিত্যধর্ম আবশ্যিক। বৌদ্ধধর্ম অধ্যয়নের ক্ষেত্রে রাহুলের মৌলিক অবদান চোখে পড়ে। বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে রাহুলের অবদান চোখে পড়ে না। মধ্য এশিয়ায় বৌদ্ধধর্মের প্রসার ও প্রভাবের বিস্তৃত ও অনুপুঙ্খ অধ্যয়নের ক্ষেত্রে এই অবদান লক্ষ করা যায়। ইতিপূর্বে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে সমগ্র এশিয়ায় সভ্যতা বিস্তারে বৌদ্ধ ভারতের অগ্রণী ভূমিকার কথা রাহুলই ভারতীয় চৈতন্যে সংক্রামিত করেছিলেন।

সংস্কৃত ও বেদান্ত শেখার আগ্রহ তাঁর গৃহত্যাগ করার অন্যতম কারণ—একথা রাহুল নিজেই বলেছেন। বারাণসী, অযোধ্যা, দক্ষিণভারত ঘুরে তিনি সংস্কৃতে অসামান্য অধিকার অর্জন করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ্যধর্মীয় সংস্কৃতের ভাণ্ডারে তাঁর নিজস্ব কোনো মৌলিক অবদান নেই। তা অস্বাভাবিক নয়। কারণ তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্মকে অবজ্ঞেয় বলে মনে করতেন এবং এই ধর্মকে তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছিলেন। তা নিন্দনীয় নয়, যদি তা পাণ্ডিত্যের নিয়ম পরম্পরাকে লঙ্ঘন করে না করা হয়। কিন্তু *ঘুমক্কড় শাস্ত্র* লেখার সময় তিনি যেভাবে আচার্য শংকর, গীতা ও অন্যান্য শাস্ত্রীয় উক্তিকে ব্যবহার করেছেন, তা থেকে শিক্ষিত, মার্জিত, পরিশীলিত রুচির পরিচয় মেলে না। পরিচয় মেলে বিক্ষুব্ধ গ্রাম্য মানসিকতার। তিনি সামগ্রিকভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্মের এবং গীতা ও অন্যান্য হিন্দুধর্মগ্রন্থের কঠিন সমালোচনা করতে পারেন। কিন্তু কঠিন সমালোচনারও পণ্ডিত সমাজের একটা রীতি আছে, কোনো পণ্ডিতের পক্ষেই সেই রীতিনীতি লঙ্ঘন করে গ্রাম্য কর্দম নিক্ষেপের রীতিনীতি সরস্বতীর দরবারে নিয়ে আসা উচিত নয়। তাহলে বিতর্কবিচার উত্তর ভারতের হোলিখেলায় পর্যবসিত হয়। ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ নৈয়ায়িকদের মধ্যে আটশো বছর ধরে যে বিতর্ক চলেছিল যা ন্যায়শাস্ত্রের অসামান্য বিকাশ ঘটিয়েছিল, তা রাহুল বেশ ভালো করেই জানতেন। সেই হারিয়ে যাওয়া বৌদ্ধ ন্যায়কে তিনি ফিরিয়ে এনেছিলেন এবং কিছু গ্রন্থের সম্পাদনাও করেছিলেন। অথচ অপরের যুক্তি খণ্ডনের জন্য তিনি বেছে নিয়েছিলেন যুক্তি নয়, বিদ্রূপ। *ঘুমক্কড় শাস্ত্র*-এ গীতা সম্পর্কে উক্তি থেকে এর সমর্থন মিলবে। যেমন 'যে লোক অনেক কথা বলে তার এক আধটি কথা সত্য হয়ে যায়।' —গীতা সম্পর্কেও এই কথা বলা যায়। মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততে সিদ্ধয়ে—গীতার এই উক্তিটি সত্য—যদিও অন্যান্য উক্তি সম্পর্কে একথা বলা চলে না। কেন? কারণ ঘুমক্কড়দের সম্পর্কে এই কথাটি সত্য। সহস্র মনুষ্যের মধ্যে একজন ঘুমক্কড় হয়। আর একটি দৃষ্টান্ত ঃ অরবিন্দকে আলোকের স্তম্ভ বলা হয়েছে। রাহুল বললেন 'অরবিন্দ আলোকের স্তম্ভ নয়, অন্ধকারের স্তম্ভ।' কিন্তু কেন তিনি আলোকের স্তম্ভ নন, অন্ধকারের স্তম্ভ, তা যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করবার প্রয়োজন বোধ করলেন না। এই ধরনের অসংখ্য উক্তি তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থের সর্বত্র ছড়ানো আছে। পাণ্ডিত্যধর্ম-বিরোধী এইসব উক্তি মেনে নিতে হবে। কারণ তা রাহুলের উক্তি।

রাহুল বুদ্ধিবাদী ও প্রয়োগবাদী। বিজ্ঞান ও গণতন্ত্রে তাঁর সুদৃঢ় আস্থা। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে সাধারণভাবে যাঁকে মুক্তপন্থী অথবা লিবারেল বলা হয়, রাহুলকে তাই

মনে হতে পারে। প্রাতিস্বিক মানুষ মুক্তপন্থার ভিত্তি। কিন্তু প্রাতিস্বিক মানুষের মতবাদের চেয়ে সাংঘিক মতবাদকে তিনি অধিকতর মূল্যবান বলে মনে করতেন। কারণ তিনি মার্কসবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। অথচ ভারতের বিভিন্ন গণরাজ্যের এবং বৌদ্ধসংঘের কার্যকলাপের যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তাতে তাঁকে মুক্তপন্থী গণতন্ত্রী বলে মনে হয়। রাহুলের মতবাদের এই স্ববিরোধিতা তাঁর রচনায় ক্রমাগতই চোখে পড়ে। আসল কথাটা সম্ভবত এই যে কোনো মতবাদের মধ্যেই রাহুল কখনোই পুরোপুরি ধরা দেননি। বৈরাগী হিন্দু, বৌদ্ধ, মুক্তপন্থী গণতন্ত্রী অথবা মার্কসবাদী কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ বলে রাহুলকে ভাবা কঠিন। যে সমাজের তিনি অন্তর্গত ছিলেন তা হল মনুষ্যসমাজ। যে মতবাদ তিনি পুরোপুরি মেনে নিয়েছিলেন তাকে অকৃত্রিম মনুষ্যত্ববাদ বলা যেতে পারে। মনুষ্যসমাজে দলিত মানুষের অমানবিক নির্যাতন ও দুঃসহ দারিদ্র্য দেখে একেবারে আক্ষরিক অর্থে তৃণমূল থেকে উঠে আসা এই মানুষটির কোমল ও সংবেদনশীল হৃদয়ে জীবনব্যাপী তীক্ষ্ণ পীড়ার অনুভব ছিল। এই পীড়িত হৃদয় চেয়েছিল একটি শোষণহীন মানবসমাজ। যেখানে বিপুলসংখ্যক পীড়িত জোব সমান, সুখী মানুষের আনন্দিত জীবনযাপন করবে। এই তীব্র বেদনা ও একটি শোষণহীন মানবসমাজ প্রতিষ্ঠার প্রচণ্ড কামনা তাঁর চেতনায় সংক্রামিত হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি ও কৃতিকে আচ্ছন্ন করেছিল।

বিংশ অধ্যায়

রাহুল সাংকৃত্যায়ন ঃ ধর্ম

রাহুলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভদন্ত আনন্দ কৌশল্যায়ন লিখেছেন, রাহুলজিকে বুঝতে হলে যা প্রয়োজন তা হলো ঃ তাঁর সারা জীবনের চিন্তার মিল খুঁজে বার করার কোনো চেষ্টা না করা। তিনি যা ভেবেছেন, বিশ্বাস করেছেন, তাই লিখেছেন এবং লিখেছেন সম্পূর্ণ নির্ভীকভাবে। কোনোপ্রকার লোভ-লালসা তাঁকে তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। প্রথমদিকে তিনি আত্মবাদী, ঈশ্বরবাদী ও অধ্যাত্মবাদী ছিলেন। পরে তিনি বিদ্যালংকার পরিবেনের প্রধান আচার্য ধর্মানন্দজির কাছে ভিক্ষুর দীক্ষা নেন। এ সময়ে তিনি অনাত্মবাদী, অনীশ্বরবাদী হয়েও কট্টর পুনর্জন্মবাদী ছিলেন। তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ *মাজঝিম নিকায়*-এর তিনি যে হিন্দি অনুবাদ করেন তার ভূমিকা।

ধর্মভাবনার তৃতীয় ধাপে পা রেখেই যিনি অনাত্মবাদী, অনীশ্বরবাদী ছিলেন, তিনি অপুনর্জন্মবাদী হয়ে গেলেন। শুধু তাই নয়, তিনি তাঁর আগেকার নিজস্ব সিদ্ধান্তের সমালোচনাও করতে লাগলেন। আত্মা ও ঈশ্বরবাদ থেকে তো তিনি অনেক আগেই ছুটি নিয়েছিলেন। রাহুলের মতে, আত্মার অস্তিত্বের বিরুদ্ধে যে যুক্তি দেওয়া যায় পরমাত্মা সম্পর্কেও সেই যুক্তিই প্রযোজ্য। সমষ্টিগতভাবে আত্মাকে মেনে নিলে ব্রহ্মের উৎপত্তি হয় এবং ব্রহ্মের কর্তৃত্ব আরোপ করলে সেই আত্মা অথবা ব্রহ্মই ঈশ্বর হয়ে যায়। আত্মাকে ঈশ্বরের অংশও বলা হয়েছে। তাই ঈশ্বরই যখন নেই, তখন আত্মা কোথা থেকে আসবে? আত্মা ও পরমাত্মা উভয়েরই 'শাস্ত্রয়োণিত্বাৎ' অর্থাৎ শব্দ প্রমাণই একমাত্র প্রমাণ। বৌদ্ধধর্ম তো শব্দ প্রমাণকে মানেনি।

আত্মা ও পরমাত্মা দুই-ই আধ্যাত্মিক বস্তু। নির্বাণও তাই। রাহুলের ধারণা হয়েছিল যে, আত্মা ও পরমাত্মাকে অস্বীকার করা এবং নির্বিবাদে নির্বাণকে অঙ্গীকার করা পুরোপুরি অসঙ্গত। শেষপর্যন্ত নির্বাণের অর্থ কী? অপুনর্ভবে দ্বিতীয় নামই নির্বাণ নয় কি? নির্বাণের সঙ্গে পুনর্ভবকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। নির্বাণ না হলে পুনর্ভব আছে। আর পুনর্ভব অথবা বার বার জন্ম নেওয়া দুঃখ। নির্বাণ হলে অপুনর্ভব আছে। অপুনর্ভব হল পুনর্ভবর ঐকান্তিক বিরোধ। পুনর্ভব দুঃখ, অপুনর্ভব দুঃখের ক্ষয়। কিন্তু আত্মত্ব নেই, 'পরমাত্মত্ব' নেই। তাহলে সব কিছু কি জড়ত্ব? চার মহাভূতের বেশি কিছু কি নেই? চিত্ত, মন, বিজ্ঞান আছে। কিন্তু এইসব কিছু চার মহাভূত থেকে উৎপন্ন হয়েছে।

'Budhist Dialectics' নামক ইংরেজি প্রবন্ধে রাহুল বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বৌদ্ধধর্ম অনাত্মবাদী, অনীশ্বরবাদী, গ্রন্থ-অপ্রামাণ্যবাদী। এই সব মানুষকে মানসিক বন্ধনমুক্ত করে। বৌদ্ধধর্মের কথা হল ঃ সবকিছুই অনিত্য, সবই ক্ষণিক। ক্ষণিক বস্তুর প্রবহমানতাই সত্য। নিত্য এবং স্থায়ী

কোনো বস্তু নেই এই পৃথিবীতে। ক্ষণিক বস্তুর স্রোত, এই হল বৌদ্ধধর্মের মূল প্রত্যয়। ঈশ্বর অথবা আত্মার অস্বীকৃতি এই মূল প্রত্যয়েরই অনুষঙ্গ মাত্র। উপনিষদের শাশ্বত অপরিবর্তনীয় আত্মার বিরুদ্ধে বৌদ্ধধর্মের ক্ষণের প্রবহমানতার ধারণা জগৎ সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এসেছিল। যেমন পেঁয়াজের খোসা ক্রমাগত ছাড়িয়ে গেলে শেষ পর্যন্ত আর কিছুই থাকে না, তেমনি এই বিশ্বজগতের কোন স্থায়ী সত্ত্ব বা আত্মা নেই। এই বিশ্বজগৎ কোনো স্থায়ী উপাদানশূন্য।

বিশ্বজগতের অনিত্যতা বা উপাদানশূন্যতা মেনে নিলে কার্যকারণ সম্বন্ধের ভিন্ন তত্ত্ব প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যাঁরা বস্তুকণাকে অপরিবর্তনীয় বলে মনে করেন, তাঁরা বলতে পারেন যে এইসব অপরিবর্তনীয় বস্তুকণা সংযোজিত হয়ে নতুন নতুন বস্তু উৎপন্ন হয়। তাঁদের মতে বস্তুর উৎপত্তি ও বিনাশের অর্থ বস্তুকণার সংযোজন ও ভাঙন। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম কোনো অপরিবর্তনীয় বস্তুকণার অস্তিত্ব স্বীকার করে না। কিছুরই নিত্য সত্ত্ব নেই। অর্থাৎ বস্তু নেই, ঘটনা আছে। একে সোনার সঙ্গে তুলনা করা যাবে না, যা প্রাথমিক উপাদান, যাকে বিভিন্ন আকার যেমন কঙ্কণ, হার ইত্যাদি দেওয়া যেতে পারে। তাই কার্যকারণ সম্বন্ধের ব্যাখ্যা করার জন্য ভিন্ন পরিভাষা প্রতীত্য সমুৎপাদ ব্যবহার করেছিলেন বুদ্ধ। বুদ্ধ প্রতীত্য সমুৎপাদের যে ব্যাখ্যা করেছেন তা হল ঃ অস্মিন সতি ইদং ভবতি অর্থাৎ এটা ছিল, এটা হয়েছে। অর্থাৎ এর বিলুপ্তির পর এর জন্ম হয়েছে। সদ্য যা শেষ হল তাই কারণ এবং এই কারণ শেষ হবার পর যার অভ্যুদয় হল তা কার্য। যখন কারণ ছিল, তখন কার্য ছিল না। যখন কার্যের অভ্যুদয় হল তখন কারণের বিলুপ্তি ঘটেছে। কারণের মধ্যে এমন কোনো নিত্যবস্তু ছিল না যার কার্যে স্থানান্তরণ ঘটেছে। বস্তুত একটি আর একটির আগে ঘটেছে। এছাড়া কার্যকারণের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। বিশ্বজগতে অন্তর্লীন কোনো নিত্যবস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করলে এবং ক্ষণকে ও প্রবহমানতাকে স্বীকার করে নিলে কার্যকারণ সম্বন্ধের পুরোনো ধারণাকে ত্যাগ করতে হয় এবং প্রতীত্য সমুৎপাদ তত্ত্বকে গ্রহণ করতে হয়। এ পর্যন্ত রাহুলের বৌদ্ধ দর্শনের ব্যাখ্যা পুরোপুরি গ্রাহ্য।

বৌদ্ধ শূন্যবাদের ব্যাখ্যাকার নাগার্জুন। তিনি শূন্যবাদী অর্থাৎ nihilist। তাঁর শূন্যবাদে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় কিছুই স্বীকৃত নয়। জগৎ সত্য নয়। সব কিছুই শূন্য। কিন্তু তা যদি হয় তাহলে নাগার্জুনের এই উক্তিটিও শূন্য। নাগার্জুনের উত্তর হল তাঁর উক্তিটিও শূন্য তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, জগৎ সত্য। জগৎও শূন্য।

বৌদ্ধ প্রতীত্য সমুৎপাদের ব্যাখ্যাকার দিঙ্‌নাগ ও ধর্মকীর্তি। তাঁরা পরোপুরি ভাববাদী বা idealist। ভারতের শ্রদ্ধেয় প্রাচীন নৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্ট ধর্মকীর্তিকে জগতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক বলতেও কুণ্ঠিত হননি। দিঙ্‌নাগ এবং ধর্মকীর্তি উভয়েই ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী। ক্ষণিক বিজ্ঞান সত্য। অনন্ত ক্ষণিক বিজ্ঞান ছাড়া আর কিছু বিজ্ঞেয় নেই। পারমার্থিক অস্তিত্ব আছে। আর আছে অনন্ত ক্ষণিক বিজ্ঞান, a stream of impressions।

এরা ক্ষণভঙ্গবাদী। ক্ষণভঙ্গবাদ বলে—Everything is momentary, there is universal flux। ক্ষণভঙ্গবাদ ক্ষণকে স্বীকার করে। ক্ষণের একটা স্রোত চলছে। আমি বলি কিছু নেই। একটা ক্ষণের ধ্বংসের অর্থ পরবর্তী ক্ষণের উৎপত্তি। তাদের মধ্যে কিন্তু মুখ দেখাদেখি নেই। এভাবে নিরন্তর উৎপত্তি ও বিনাশ চলছে। আগের ও পরের ক্ষণ পুরোপুরি নিরন্বয়।

রাহুল তাঁর 'Budhist Dialectics'-এ বৌদ্ধদর্শনের যে ব্যাখ্যা করেছেন তা শূন্যবাদী ও ক্ষণভঙ্গবাদী। এই বৌদ্ধদর্শনের সঙ্গে মার্কসবাদের কোনো মিল নেই। অথচ তিনি বৌদ্ধধর্মকে মার্কসবাদে পৌঁছোনোর সোপান হিসেবে বর্ণনা করেছেন। নাগার্জুনের শূন্যবাদী দর্শনে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় কিছুই স্বীকৃত নয়, মানবিক জগৎ স্বীকৃত নয়, সেই দর্শনের সঙ্গে মার্কসবাদের কোনো মিল থাকতে পারে না। তা কীভাবে মার্কসবাদে পৌঁছোনোর সোপান হতে পারে তা বোঝা কঠিন।

অন্যদিকে ক্ষণভঙ্গবাদীরা অর্থাৎ দিঙ্‌নাগ ও ধর্মকীর্তি ভাববাদী। যে দর্শনে এই জগতের স্বীকৃতি নেই, সেই দর্শন মার্কসবাদের সোপান হতে পারে, রাহুল তা ভাবলেন কী করে? সন্দেহ নেই, বৌদ্ধদর্শন পরিবর্তনের কথা বলে। কিন্তু বৌদ্ধদর্শনের ক্ষণের স্রোতের সঙ্গে মার্কসবাদের পরিবর্তনের কোনো মিল নেই। মার্কসবাদ যে পরিবর্তনের কথা বলে তা বৌদ্ধধর্ম স্বীকার করে না। পরিবর্তনে উপাদান কারণ (material cause) এবং উপাদেয় কার্যের (material effect) মধ্যে একটা মূল ঐক্য থাকে। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম এই কার্যকারণ সম্পর্ক স্বীকার করে না।

বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের সঙ্গে প্রকৃত মিল অদ্বৈত বেদান্তের। এই সব ভাববাদী দর্শন জগৎকে সত্য বলে স্বীকার করে না। যে দর্শন মনুষ্য জগৎকেই অস্বীকার করে তাকে রাহুল মার্কসবাদের সঙ্গে মেলালেন কী করে? বিশেষত যে-রাহুল *প্রমাণবার্তিক* খুঁজে বার করলেন ও তার সম্পাদনা করলেন!

অথচ মার্কসবাদী রাহুলের চোখে পড়ল না যে, মার্ক্সীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের সঙ্গে সাংখ্যদর্শনের কী অসামান্য মিল। অবশ্য একথা সত্য যে, আত্মার কথা বলে সাংখ্যদর্শন একটা প্রাচীর তুলে দিয়েছে। এই প্রাচীরটি উপেক্ষা করতে পারলে এবং everything is change and everything is changing every moment এই দিক থেকে বিচার করলে সাংখ্যদর্শনের সঙ্গে মার্কসবাদের মিল চোখে পড়ে। সাংখ্যাদর্শন ঈশ্বর মানে না, কিন্তু আত্মা মানে। যুগপৎ এই দর্শন স্বাধীন বস্তুও মানে। সাংখ্যদর্শন ও মার্কসবাদের সাদৃশ্য হল এখানে : মূল প্রকৃতি বা primordial matter হল তিন ধরনের অতি সূক্ষ্ম বস্তুকণার সাম্যাবস্থায় অবস্থান। কিন্তু ভেতরে আলোড়ন থাকে। এই ধরনের বস্তুকণার পরস্পরের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলতে থাকে। প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তন হচ্ছে। সত্ত্বগুণের স্বভাব প্রকাশ। প্রবৃত্তি, পরিণাম বা বিকাশ রজোগুণ। নিয়মশৃঙ্খলা তমোগুণ। এই তিনগুণের বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে প্রতিটি ক্ষণ পরিবর্তিত হচ্ছে। সাংখ্যদর্শনের পরস্পর অভিভব মিথুনবৃত্তত্বের অবিকল অনুবাদ struggle and unity। Dialectical

materialism-এর মূল সূত্র সাংখ্যদর্শন ছাড়া অন্য কোনো দর্শনে নেই। বৌদ্ধদর্শনে নেই। হেরাক্লিটাসেও নেই।

বৌদ্ধধর্ম মার্কসবাদের সোপান—বৌদ্ধ দার্শনিক ব্যাখ্যার মধ্যে রাহুলের এই উক্তির সমর্থন মেলে না। বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন অবিচ্ছেদ্য। তাই বৌদ্ধধর্ম মার্কসবাদের সোপান হতে পারে না। অতএব বৌদ্ধধর্ম মার্কসবাদের সোপান—রাহুলের এই উক্তিটির ধর্মীয় ব্যাখ্যা করলে ভুল হবে। তিনি তা করেননি। তিনি বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে হেগেলীয় ভাববাদের সাদৃশ্যের কথা বলেছেন। নতুন বৌদ্ধ নৈতিকতার কথা ভেবেই সম্ভবত তিনি এই উক্তিটি করে থাকবেন। বুদ্ধ গ্রন্থ-প্রামাণ্যবাদ মানেননি, সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর মানেননি। সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে মানলে নৈতিকতা মানুষের ইষ্টানিষ্ট ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল হয়ে যায়। কিন্তু বৌদ্ধমতে ইষ্টানিষ্টের মানদণ্ড হল বহুজনের হিত, বহুজনের সুখ (বহুজন সুখায় বহুজন হিতায়)। বৌদ্ধ নৈতিকতায় রাহুল বিচারস্বাতন্ত্র্যবাদ, মানুষের সেবাব্রত ও আর্থিক সাম্যবাদ খুঁজে পেয়েছিলেন। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন বুদ্ধ। তাঁদের যৌথ জীবনযাত্রার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের সঙ্ঘে তিনি আর্থিক সাম্যবাদ প্রবর্তন করেছিলেন। চীবর, ভিক্ষাপাত্র ও এই ধরনের আটটি ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিস ছাড়া অন্য সব জিনিসই সঙ্ঘের সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হত। বুদ্ধের জীবদ্দশায় যে সব সম্পত্তি দান হিসেবে আসত, তা সেই সময়ের ও ভবিষ্যতের চতুর্দিকের সংঘের সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হত (আগত অনাগত ও চতুর্দিশস সঙ্ঘস)। এই ব্যবস্থা চতুর্থ অথবা পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত চলেছিল। সমাজে আর্থিক অসাম্য তিনি দূর করতে পারেননি। কিন্তু সঙ্ঘের ভিতর আর্থিক অসাম্য থাকতে দেননি। সর্বত্র সামাজিক অসাম্য দূর করার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। বৌদ্ধ সঙ্ঘের চণ্ডাল ভিক্ষুদেরও অন্যান্য জাতের ভিক্ষুদের মতো অধিকার ছিল। বৌদ্ধধর্ম মানবিক সৌভ্রাত্রের কথা বলেছে। দেশ, জাতি ও কুলের ভেদ মানেনি বৌদ্ধধর্ম। বৌদ্ধধর্ম এক ধরনের র‍্যাডিক্যাল নৈতিকতার কথা বলেছে। এই র‍্যাডিক্যাল নৈতিকতা থেকে মার্কসীয় বৈপ্লবিক মতবাদে উত্তরণ অস্বাভাবিক নয়।

তাছাড়া অন্য একটি দৃষ্টিকোণ থেকেও রাহুলের উক্তিকে (বৌদ্ধধর্ম মার্কসবাদের সোপান) দেখা চলে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে রাহুলের উক্তিকে মেনে নেওয়া যায়। কেউ যদি ব্যক্তিগতভাবে মনে করেন যে বৌদ্ধধর্মেই তিনি মার্কসবাদের সমর্থন খুঁজে পেয়েছেন, তাহলে আপত্তি করার কিছু আছে বলে মনে হয় না। কেননা কোনো মতামতের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া বিষয়ীগত (subjective) এমনকি বিশিষ্ট মেজাজ ও ব্যাখ্যার ব্যাপার হতে পারে। এমনকি তা আরোপের (imposition) ব্যাপারও হতে পারে। একটি বিশেষ ধর্মকে (বৌদ্ধধর্মকে) ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে, একটি বিশেষ দিকের ওপর জোর দিয়ে কেউ একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারে।

আসলে প্রত্যক্ষ, মনন—এ জাতীয় মানসিক বা মানবিক ক্রিয়ামাত্রই পছন্দ-অপছন্দের (selective) ও ব্যাখ্যার ব্যাপার। মন নিষ্ক্রিয় গ্রাহক tabula rasa অথবা

wax tablet (প্লেটোর উপমা) নয়। মন সক্রিয় কর্তা। সে নির্বাচন করে, ব্যাখ্যা করে, প্রত্যক্ষ করে, স্মরণে রাখে। কোন জ্ঞেয় বস্তুর কোন দিক কেউ প্রত্যক্ষ করবে, কোনটার উপর গুরুত্ব আরোপ করবে, তা কিছুটা নির্ভর করে তার মনের তাৎক্ষণিক অবস্থার উপর, মানসিক অভিমুখের (direction) উপর, কিছুটা মতামতের পরিমণ্ডলের (climate of opinion) উপর (যেমন বৌদ্ধধর্মের প্রকৃতি, অর্থাৎ বস্তুগত বৈশিষ্ট্যের উপর নয়)।

'ক' 'খ'-এর সোপান, এ কথার দুই অর্থ : (১) 'ক' থেকে 'খ'-কে যৌক্তিকভাবে নিষ্কাশন করা যায় অথবা (২) আমি 'ক'-এর ভিত্তিতে 'খ'-এতে পৌঁছোতে পারি। অবশ্যই প্রথম অর্থে বৌদ্ধধর্মকে মার্কসবাদের সোপান বলা যায় না, বলা যায় কেবল দ্বিতীয় অর্থে। বৌদ্ধধর্মকে মার্কসবাদের সোপান বললে একথা বলা হয় না যে, বৌদ্ধধর্ম থেকে মার্কসবাদকে যৌক্তিকভাবে নিষ্কাশন করা যায়। মার্কসবাদ সম্পর্কে কোনো ধারণা (তা যত প্রাথমিক ও স্থূল হোক না কেন) বা পরিচয় না থাকলে রাহুল বৌদ্ধধর্ম থেকে মার্কসবাদে আসতে পারতেন না। বৌদ্ধধর্মের নানান দিক। কয়েকটি নির্বাচিত দিকের মধ্যে রাহুল তাঁর মতের সমর্থন খুঁজেছেন। আর এরকম ক্ষেত্রে সাদৃশ্যগুলি বেশি প্রকট হয়ে ওঠে, লোককে বেশি প্রভাবিত করে। বৈসাদৃশ্যের দিকে নজর পড়ে না। বস্তুত ক্ষেত্র বিশেষে কারো একটা কথাই কাউকে গভীরভাবে প্রভাবিত করতে পারে, জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে।

প্রসঙ্গত, ঈশ্বরসাধক যুক্তি সম্পর্কে জার্মান দার্শনিক বলেছেন, এগুলি আসলে pleas put forward in justification of our (already existing) faith in god। রাহুলের বৌদ্ধধর্ম একটা plea—তাঁর সাম্যবাদী, নিরীশ্বরবাদী ও জাতিভেদ-বিরোধী চিন্তাভাবনার সমর্থন তিনি পেয়েছেন বৌদ্ধধর্মে। অতএব তিনি বৌদ্ধধর্মের কেবল কয়েকটি নির্বাচিত দিকের ওপরই জোর দিয়েছেন, অন্যদিক (যেমন পুনর্জন্মবাদ, কর্মবাদ ইত্যাদি) অগ্রাহ্য করেছেন। ফলে এই একপেশে দৃষ্টিভঙ্গিতে বৌদ্ধধর্মে মার্কসবাদের সমর্থন পাওয়া তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছে।

আরো একটি দৃষ্টিকোণ থেকে রাহুলের ধর্মবিশ্বাসের ব্যাপারটা বিবেচনা করা যেতে পারে। রাহুলের *মেরী জীবনযাত্রা* পড়লে বোঝা যায় যে সরযূপারী ব্রাহ্মণ কেদারনাথ পাণ্ডের উপর অল্প বয়সে বৈরাগ্যের ভূত (রাহুলের ভাষা) সওয়ার হয়েছিল। রাহুলের বাড়ি কনৈলার কাছাকাছি উমরপুর গ্রামের পরমহংস বাবার দ্বারা রাহুল কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিলেন। পরমহংস বাবার শিষ্য হরিকিরণ দাস তাঁকে বেদান্তের শিক্ষা দিয়েছিলেন। ফলে তিনি অদ্বৈত বেদান্তী হয়ে গিয়েছিলেন। অদ্বৈত বেদান্তী হওয়ায় তাঁর ঈশ্বরে বিশ্বাস উবে গিয়েছিল। কিন্তু সংস্কৃতের বিশাল জ্ঞান-ভাণ্ডারের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সংস্কৃত ও বেদান্ত পড়ে সন্ন্যাসী হওয়ার সংকল্প ছিল তাঁর।

কাশীতে পড়াশোনা করার সময় বেদান্তে তাঁর বিশ্বাস কিছুটা শিথিল হয়েছিল; আত্মজীবনী থেকে এই ধারণাই জন্মে। এ সময় তিনি তন্ত্রসাধনায় মন দিয়েছিলেন।

জগদম্বার দর্শনের আশায় জীবনকে বাজী রেখে তন্ত্রসাধনা করেছিলেন। সাধনায় ব্যর্থ হওয়ায় তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন। তাও ব্যর্থ হয়। ১৯১১-তে তিনি পরসার বৈরাগী মঠে আনুষ্ঠানিকভাবে সাধু হয়ে যান। নতুন নাম হয় রামউদার দাস। কেদারনাথ সাধু হয়েছিলেন ঈশ্বরলাভের জন্য নয়; সংস্কৃত শিক্ষার সুযোগ মিলবে বলে।

রাহুল একথা বারবার তাঁর *মেরী জীবনযাত্রা*-য় বলেছিলেন যে তিনি ঘর ছেড়েছিলেন; কারণ ভ্রমণতৃষ্ণা ও জ্ঞানলিপ্সার দুই ভূত তাঁর ওপর সওয়ার হয়েছিল। বস্তুত তাঁর ২৭৭০ পৃষ্ঠার *মেরী জীবনযাত্রা*-য় ঈশ্বর প্রায় অনুপস্থিত।

কেদারনাথ রামউদার দাস হয়ে বেশিদিন বৈরাগী মঠে থাকতে পারেননি। ১৯১৫-তে তিনি আগ্রার আর্য মুসাফির বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এই বিদ্যালয়ে তাঁর এক নতুন উপলব্ধি হল। তিনি পুরোপুরি আর্যসমাজী হয়ে গেলেন। এ বিষয়ে রাহুল লিখছেন ঃ

'আর্য সমাজের ধর্মকেই আমি সার্বভৌম ধর্ম বলে মনে করতাম। আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে এই ধর্মই সত্য এবং সেই কারণে এই ধর্মও একদিন বিজ্ঞানের মতোই সারা জগতে সমঝদার ও সাধারণ মানুষের ধর্মে পরিণত হবে।'

আর্যসমাজী হয়েও তিনি বেশিদিন থাকতে পারেননি। বেশ কিছুকাল ধরেই তিনি বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠছিলেন। ১৯২৩-এ তিনি শ্রীলঙ্কা চলে যান। এ সময়ে তিনি আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, তখনো তাঁর ঈশ্বরে বিশ্বাস পুরোপুরি ভেঙে যায়নি। অবশেষে শ্রীলঙ্কায় বিদ্যালংকার পরিবেন-এ বৌদ্ধ ধর্ম তাঁকে টেনে নিল। *মাজঝিম নিকায়*-এ বুদ্ধের একটি বাক্য 'আমি তোমাকে যে ধর্মোপদেশ দিয়েছি, তা নৌকার মতো নদী পেরোবার জন্য, মাথায় নিয়ে বয়ে বেড়াবার জন্য নয়' রাহুলকে অনুপ্রাণিত করে। এই বাক্যটি পড়ে তিনি লিখছেন ঃ 'যে জিনিসের জন্য আমি এতকাল ঘুরে বেড়িয়েছি, আমি তা পেয়ে গেছি।' হয়তো এতদিন তিনি ঈশ্বরবাদ ও নিরীশ্বরবাদের মধ্যে দুলছিলেন। এরপর তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোন, 'ঈশ্বর ও বুদ্ধের একসঙ্গে থাকা সম্ভব নয় এবং ঈশ্বর কাল্পনিক বস্তু। বুদ্ধের বক্তব্যই যথার্থ।' এ সময় থেকেই তিনি ঈশ্বরকে পুরোপুরি বর্জন করলেন এবং বুদ্ধকে মেনে নিলেন। তারপর অনাত্মবাদী, নিরীশ্বরবাদী, অধ্যাত্মবাদী বৌদ্ধধর্ম থেকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে পৌঁছোনো একটি পদক্ষেপ মাত্র।

বলশেভিক বিপ্লবের পর সোভিয়েত দেশে একটি শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা তিনি শুনেছিলেন। পরে এই শোষণমুক্ত সমাজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও তাঁর হয়েছিল। এই বিপ্লবের দ্বারা অনুপ্রাণিত রাহুল দলিত মানুষের উজ্জ্বল উদ্ধারের পথ খুঁজছিলেন। সারা জীবন রাহুল শুধু খুঁজেছেন, পথে পথে কাটিয়েছেন, কোথাও বেশিদিন থেমে থাকেননি। তাঁর মননের জগতেও এই স্বভাবজ পরিবর্তনশীলতা চোখে পড়ে। কোনো ভাবাদর্শীয় মডেলের মধ্যেই তাঁর চিরকাল অন্তরীণ হয়ে থাকা সম্ভব ছিল না। কিন্তু তিনি যখন যে মডেল গ্রহণ করেছেন, তখন তাকে আত্মস্থ করে রূপায়িত করার জন্য নিজেকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করেছেন। কিন্তু যখনই সেই মডেলের সীমাবদ্ধতা তাঁর কাছে ধরা পড়েছে তখন সেখান থেকে সরে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সাহস ও বৌদ্ধিক

সততা তাঁর ছিল। তাঁর এই মানসিক প্রবণতাও বুদ্ধের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিল বলা চলে। কালামোকে বুদ্ধ যে উপদেশ দিয়েছিলেন, রাহুল তা মেনে নিয়েছিলেন বললে হয়তো অন্যায় হবে না। বুদ্ধ কালামোকে বলেছিলেন, 'হে কালামো! সন্দেহই জ্ঞানের জনক। তুমি কোনো কথাকেই এই জন্য সত্য বলে মনে কোরো না যে, এই কথা তুমি শুনেছ; এই জন্য সত্য মনে কোরো না যে, তোমার ধর্মশাস্ত্রের দ্বারা তা অনুমোদিত; এই জন্য সত্য মনে কোরো না যে, এই কথা যিনি বলেছেন তিনি তোমার শ্রদ্ধাভাজন আচার্য। কালামো! তোমার বিবেক যদি বলে এই কথা দোষমুক্ত তাহলে তা দোষমুক্ত বলেই মনে করবে। আর তোমার বিবেক যা সত্য ও নির্দোষ বলে মনে করবে, তাকে স্বীকার করবে এবং তদনুযায়ী আচরণ করবে।'

বৌদ্ধধর্ম মার্কসবাদের সোপান ছিল কী না অথবা বৌদ্ধধর্ম ও মার্কসবাদের ভাবাদর্শগত মিল রাহুলের মার্কসবাদ গ্রহণের জন্য কতটা দায়ী ছিল অথবা আদৌ দায়ী ছিল কি না, এ নিয়ে আলোচনা শেষ পর্যন্ত নিরর্থক বলে মনে হয়। কারণ, রাহুলের কি প্রকৃত ধর্মবিশ্বাস ছিল? *মেরী জীবনযাত্রা* পড়লে এই প্রশ্ন ওঠা খুব স্বাভাবিক। এই আত্মজীবনী থেকে এই ধারণা জন্মে যে, রাহুলের দীর্ঘস্থায়ী ধর্মপথপরিক্রমা অর্থাৎ ১৯১০-এ গৃহত্যাগের পর উত্তরাখণ্ডে যাওয়া থেকে ১৯৩০-এ বিদ্যালংকার পরিবেনে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা পর্যন্ত (যখন তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ঈশ্বরকে ত্যাগ করলেন) ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাসকে ঠিক বিশ্বাস বলা চলে না। নিউম্যান যে বিশ্বাসকে বলেছেন প্রকৃত সম্মতি (real assent) তা রাহুলের কখনোই ছিল না। যে বিশ্বাস তাঁর ছিল তাকে নিউম্যান বলেছেন ধারণাগত সম্মতি (notional assent)। প্রকৃতপক্ষে রাহুল যে-ধর্মে বিশ্বাস করতেন তাকে মানবিক ধর্ম (Humanism) বলাই সঙ্গত বলে মনে হয়।

এখানে রাহুলের সঙ্গে সার্ত্রের বেশ মিল চোখে পড়ে। রাহুলের নিজস্ব স্বাধীনতার উপলব্ধি, পরিস্থিতির প্রতি দায়বদ্ধতা এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী তাঁর অবস্থানের পরিবর্তন সার্ত্র-এর তিনটি ভিত্তিস্থানীয় প্রত্যয়ের Liberty (liberté), Engagement (commitment), situation (situation)-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। *Lis Mouches* নাটকে সার্ত্র Liberté-র সংজ্ঞা দিয়েছেন। নাটকের চূড়ান্ত পরিণতি হল, যখন Orestes তাঁর স্বাধীনতার অর্থ খুঁজে পেলেন। কিন্তু স্বাধীনতার অর্থ খুঁজে পেলেই তা প্রকৃত স্বাধীনতায় পরিণত হয় না। Les chemins de la Liberté -তে অধ্যাপক মাতিয় দা লা রূ্য তাঁর স্বাধীনতা সম্পর্কে সচেতন ; কিন্তু স্বাধীনতাব প্রকৃত মূল্য তিনি দিতে চাননি এবং তিনি স্বাধীনতার ভুল ব্যাখ্যা করেছিলেন। স্বাধীনতার দায়বদ্ধতাকে অস্বীকার করে তিনি স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু Orestes যখন তাঁর স্বাধীনতা সম্পর্কে সচেতন হলেন তখন তিনি অগ্রসর হলেন সেই কর্মে যা তাঁব স্বাধীনতার মধ্যে অন্তর্লীন ছিল। এই হলো দায়বদ্ধতা (Engagement)। মানুষের মহত্ত্ব এই দায়বদ্ধতার মধ্যে, তার কাজের সব দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেওয়ার মধ্যে।

বাহুল স্বাধীনতাকে কখনো বিসর্জন দেননি বলেই বারবার তিনি ধর্মমত অথবা পথ পালটেছেন। কিন্তু তাঁর স্বাধীনতার দায়বদ্ধতাকে তিনি স্বীকার করেছেন। সব দায়িত্ব তিনি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন।

একবিংশ অধ্যায়

সমাজ-চিন্তা

রাহুলের সমাজ-চিন্তা বৌদ্ধ দর্শনের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। বৌদ্ধ দর্শন নিরন্তর পরিবর্তন ও গতিময়তার কথা বলেছে। কোনো কিছুই নিত্য ও স্থির নয়। সব কিছুই আকাশের মেঘের মতো পরিবর্তনশীল। শুধু বৌদ্ধ দর্শনই নয়, বৌদ্ধ সঙ্ঘের যৌথ জীবনযাত্রার ছাপও পড়েছে তাঁর চিন্তায়। তাঁর মতে গৌতম বুদ্ধ সঙ্ঘে আর্থিক সাম্যবাদ প্রবর্তন করেছিলেন। চীবর, ভিক্ষাপাত্র—এই ধরনেব আটটি জিনিস ছাড়া সব কিছুই সঙ্ঘের সম্পত্তি। যে পরিবর্তন ও আর্থিক সাম্যবাদের ধারণা তিনি বুদ্ধের কাছ থেকে পেয়েছিলেন, তাই তাঁকে মার্কসবাদের দিকে নিয়ে গিয়েছিল।

তাঁর সক্রিয় জীবনের প্রথম পর্ব থেকেই তিনি ভারতের স্থির সমাজের পঙ্কোদ্ধারের জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। ত্রিশের দশকে তিনি মার্কসবাদী চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হন। বিহারের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রাহুল। তাঁর *সাম্যবাদ হী কিউঁ* প্রকাশিত হয় ১৯৩৪-এ। মার্কসবাদে উত্তীর্ণ হওয়ার পরে তাঁর চিন্তাভাবনা ও রচনা সব কিছুই মার্কসীয় তত্ত্বের দ্বারা আলোকিত।

১৯৩৯-এ আমওয়ারী কিষান সত্যাগ্রহের পর রাহুলকে গ্রেপ্তার করা হয়। জেলে বসে রাহুল একটি ক্ষুদ্রায়তন বই লেখেন—*তুমহারী ক্ষয়*। এই গ্রন্থে তিনি অত্যন্ত তীব্র ভাষায় সমাজের শত্রুদের কথা বলেছেন ঃ

'সমাজ প্রথম দিকে শত শত মানুষের ঐক্যের দ্বাবা দুর্বল মানুষের শক্তি অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিল। যাতে মানুষ প্রাকৃতিক ও পশুজগতের শক্তির কাছ থেকে পরিত্রাণ পেয়েছিল....... কিন্তু সেই সমাজ তার ভেতরেই এমন শত্রুর জন্ম দিয়েছে যে, প্রাকৃতিক ও পশুজগতের শক্তির চেয়েও যা মনুষ্য জীবনকে অনেক বেশি নারকীয় করে তুলেছে।

'সমাজের পঞ্চায়েত বলবে, বড়লোক-গরিব চিরকাল আছে। সবাইকে সমান করে দিলে কেউ কাজ করতে চাইবে না, এই দুনিয়াকে চালানোর জন্য বড়লোক-গরিবলোক থাকা জরুরি। সমাজের বেড়ি জেলখানার বেড়ির চেয়েও শক্ত...... এখন সমাজের জন্য আমাদেব মনে কোনো সম্ভ্রম, কোনো সহানুভূতি থাকা কি সম্ভব! বাইরে ধর্মের ঢঙ, সদাচারের অভিনয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের তামাশা করা হয় আর ভেতরে জঘন্য কুৎসিত কর্ম! এই সমাজকে ধিক্কার! এই সমাজের সর্বনাশ হোক।'

প্রচণ্ড ভাষায় তিনি সমাজকে ধিক্কার দিয়েছেন, শাণিত বিদ্রূপ করেছেন সমাজের বিরুদ্ধে। রাহুলের *মেরী জীবনযাত্রা* পড়লে সমাজের অভ্যন্তরের পঙ্কিলতা ও গ্লানি চোখে পড়ে, অত্যন্ত নিকট থেকে তিনি সমাজে পচন লক্ষ করেছেন, এই সমাজকে ধ্বংস করে

নতুন গতিশীল সমাজ গড়ে না তুললে ভারতের কোটি কোটি মানুষের আধুনিক সমাজজীবনে প্রবেশের কোনো সম্ভাবনা থাকবে না। তাই তাঁর প্রবল কামনা ঃ 'তোমাদের ধর্মের ক্ষয় হোক, তোমাদের ভগবানের ক্ষয় হোক, তোমাদের সদাচারের ক্ষয় হোক, তোমাদের জাতপাতের ক্ষয় হোক, সমাজের জোঁকদের ক্ষয় হোক।'

কিন্তু এ তো পুরনো সমাজ ধ্বংসের কথা হল। কিন্তু এই ধ্বংসের পর কোন নতুন সমাজ গড়ে তোলা হবে! সেই সমাজের কথা তিনি তাঁর বেশ কয়েকটি বইয়ে বলেছেন ঃ যেমন *মানব সমাজ, দর্শন দিগদর্শন, আজ কি সমস্যা, এঁ দিমাগী গুলামী, ভাগো নহী (দুনিয়া কো) বদলো, সাম্যবাদ হী কিঁউ,* আটটি ভোজপুরী নাটক, তাছাড়া তাঁর ঐতিহাসিক ও সামাজিক উপন্যাস ও গল্পে, ভ্রমণ বৃত্তান্তে তিনি সমাজব্যবস্থার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। *বাইসওবী সদী* নামক ইউটোপিয়াতে তিনি ভবিষ্যৎ আদর্শ সমাজের রূপরেখা বর্ণনা করেছেন। চলমান রাহুলের সমাজ-চিন্তা তাঁর দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা-প্রসূত।

রাহুলের এই দৃঢ় ধারণা ছিল যে বর্তমান সামাজিক কাঠামো বদলানোর জন্য আধুনিক কাল পর্যন্ত মানবসমাজের পরিবর্তনের প্রকৃতি সঠিকভাবে জানা দরকার। আদি মানব সমাজবদ্ধ জীবনে জন্ম নেয়নি। সে নিজের শ্রম দিয়ে প্রকৃতিকে পরাজিত করে ভোগ্যবস্তু উৎপাদন করেছে, আত্মরক্ষার জন্য সংগ্রাম করেছে এবং নিজের শক্তি বাড়িয়ে সমাজবদ্ধ জীবনে উত্তীর্ণ হয়েছে। কিন্তু ব্যক্তিরা যুক্তভাবে সমাজ গড়ে তুললেও সমাজ ব্যক্তিদের যোগফল মাত্র নয়। ব্যক্তির সংখ্যা সমাজে গুণাত্মক পরিবর্তন নিয়ে আসে।

অবশ্য একথা সত্য, গোঁড়া মার্কসবাদী ছক অনুসরণ করে মানব সমাজে বিভিন্ন পর্বের কথা *মানব সমাজ* বইয়ে বলা হয়েছে। এই বই এবং তাঁর ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও ইতিহাস নির্ভর গ্রন্থে তিনি এই ছকই অনুসরণ করেছেন। আদিম সমাজ হল প্রথম পর্ব, দ্বিতীয় পর্ব—ক্রীতদাস নির্ভর সমাজ, তৃতীয় পর্ব—সামন্ততন্ত্র, চতুর্থ পর্ব—পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। রাহুলের মতে সমাজতন্ত্র শেষ পর্ব, যার দৃষ্টান্ত সোভিয়েত রাশিয়া। বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে এই ছকের অনেক সূক্ষ্ম পরিবর্তন ঘটেছে এবং এও লক্ষ করা গেছে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এই ছকের প্রয়োগ সম্ভব নয়। কিন্তু চল্লিশের দশকে ভারতে মার্কসীয় চিন্তায় যে যান্ত্রিক অতিসরলীকরণের প্রবণতা ছিল রাহুল তা থেকে মুক্ত ছিলেন না। বরং রাহুলের মধ্যে এই প্রবণতার আধিক্য ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলা চলে যে, হিন্দি জগতে *মানব সমাজ* নতুন পথ খুলে দিয়েছে।

ভারতীয় সমাজের বিবর্তনের ব্যাখ্যায় ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রয়োগ অত্যন্ত তাৎপর্যময়। বর্তমান কালের গবেষণার আলোকে রাহুলের অনেক সিদ্ধান্ত এখন আর গ্রহণযোগ্য না হলেও তা বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখার যোগ্য। আদিম ভারতীয় সমাজে রাহুল ক্রীতদাসত্বের অস্তিত্বের কথা বলেছেন। অনেক রুশ ভারতবিদ্যাবিদ্‌ও এই কথা বলেছেন। প্রাচীন ভারতে ক্রীতদাস-শ্রম-নির্ভর উৎপাদন পদ্ধতি ছিল, সেই যুগের পুঁথিপত্র থেকে এই সিদ্ধান্তের সমর্থন পাওয়া যায় না।

রাহুল সিন্ধু সভ্যতাতেও সামন্ততান্ত্রিক প্রথা ছিল বলে মনে করতেন। রাহুলের মতে, বৈদিক যুগে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ থেকে সামন্ততান্ত্রিক সমাজে রূপান্তর ঘটেছিল এবং বুদ্ধ থেকে হর্ষবর্ধন পর্যন্ত অন্তর্বর্তী সময়ে তার বিকাশ ঘটেছিল। তাঁর মতে, হর্ষবর্ধনের পর সামন্ততন্ত্র নিশ্চল হয়ে যায়। আরো কিছু হিন্দি লেখকও বৈদিক যুগে সামন্তবাদ লক্ষ করেছেন। অবশ্য সামন্তবাদের সংগঠনে ভূমির ভিত্তিস্থানীয় ভূমিকা তাঁরা উপেক্ষা করেছেন। রাহুল রাজা এবং ক্ষত্রিয়কে অভিন্ন বলে মনে করতেন। এও কিছুটা অদ্ভুত। তাঁর সেনাপতিদের ক্ষমতা খর্ব করার জন্য আলাউদ্দিন খিলজী যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন রাহুল তা প্রশংসনীয় বলে মনে করতেন। রাহুল মনে করতেন যে, চতুর্দশ শতকের প্রথম দিকেই সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ভাঙন শুরু হয়।

রাহুলের মতে সামন্ততন্ত্র খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ থেকে খ্রিস্টিয় সপ্তম শতক পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। কিন্তু যদি সামন্ততন্ত্রের সংজ্ঞা এই হয় যে, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় একটি ভূস্বামী শ্রেণি এবং একটি ভূমিদাস কৃষক শ্রেণি থাকবে, তাহলে একথা প্রায় সুনিশ্চিতভাবে বলা চলে যে, এই সামাজিক ব্যবস্থা বুদ্ধের যুগে ছিল না। আমরা জানি যে, সে যুগে কিছু বিত্তশালী ভূস্বামী ছিলেন, যাঁরা কৃষির উৎপাদনের জন্য ক্রীতদাস ও বেতনভূক শ্রমিক ব্যবহার করতেন। সাধারণভাবে, আদিযুগের পালি পুঁথি ও প্রাচীনতম সংস্কৃত সংহিতা থেকে জানা যায় যে, কৃষকদের ভূমিস্বত্ব ছিল এবং কৃষি উৎপাদনে তাঁদের স্বাধীনতা ছিল। ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ভূমিদানের ব্যবস্থার ফলেই একটি ভূস্বামী শ্রেণি গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায় খ্রিস্টিয় চতুর্থ ও সপ্তম শতকের মধ্যে। ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ভূমিদান বেড়ে যায় এবং বিশেষভাবে অর্থবহ হয়ে ওঠে। অতএব হর্ষের যুগেই সামন্ততন্ত্র একটি পুরোপুরি সুগঠিত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পরিণত হয়। হর্ষের রাজত্বকালের পরও এই ব্যবস্থায় নিশ্চলতা আসেনি।

অতএব এ কথা বলা চলে—ক্রীতদাস প্রথা প্রাচীন ভারতে ছিল না এবং সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব ঘটে মধ্যযুগের প্রথম দিকে। প্রাচীন ভারতে ক্রীতদাস প্রথা ও সামন্ততন্ত্র ছিল—রাহুলের এই সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া যায় না। কিন্তু এতে তাঁর মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির যাথার্থ্য অপসারিত হচ্ছে, তা বলা চলে না। কারণ প্রাচীন ভারতে দাসপ্রথা ছিল না, তা আসল কথা নয়, আসল কথা হল এই, প্রাচীন ভারতে শাসক শ্রেণি ও এই শ্রেণির ভাবাদর্শ নির্ভরশীল ছিল কৃষক ও কারিগরদের শ্রমের উদ্বৃত্ত মূল্যের উপর। এই উদ্বৃত্ত মূল্য ধরা হত কর ও ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ধন সম্পত্তি দানের আকারে।

রাহুল : ইতিহাসকার ও পুরাতত্ত্ববিদ

আগেই বলা হয়েছে যে রাহুল মার্কসীয় বস্তুবাদকে ইতিহাসের চাবিকাঠি হিসেবে ব্যবহার করেছেন। মার্কসবাদী হিসেবে রাহুল মনে করতেন যে, মানব ইতিহাসের বিবর্তনকে চারটি পর্বে বিভাজন সম্ভব; যথা—আদিম সাম্যবাদ, ক্রীতদাসত্ব, সামন্ততন্ত্র, পুঁজিবাদ ও শেষপর্ব সমাজতন্ত্র—যার দৃষ্টান্ত সোভিয়েত রাশিয়া।

রাহুল তাঁর *মানব সমাজ* নামক বইয়ে আদিম মানব সমাজ থেকে সাম্যবাদী মানব সমাজের বিকাশের ক্রম দেখিয়েছেন বৈজ্ঞানিকের মতো। তিনি প্রথমেই এই বিকাশের সূত্র উল্লেখ করেছেন। মার্কসবাদের ভিত্তির ওপর রাহুল মানব সমাজের বিবর্তনের ইতিহাস রচনা করলেও, ভারতীয় সমাজে হাজার বছরের গতিশূন্যতা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব বক্তব্য আছে এতে। তিনি লিখছেন : ভারতীয় মানব সমাজে হাজার বছর ধরে যে নিশ্চলতা প্রবাহশূন্যতা চলে আসছে তার কারণ ভারতের মানুষ গ্রামের প্রতি অনুরক্তিকে অতিক্রম করে সমগ্র দেশের প্রতি ভক্তি পর্যন্ত পৌঁছোতে পারেনি। তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাইরের শত্রুর মোকাবিলা করতে পারেনি। হাজার বছর ধরে গ্রাম পঞ্চায়েত কিষানদের হাতে লাঙল, হাসুয়া দিয়ে রেখেছে। শাসকবর্গ জানত যে, গ্রাম সংগঠন ভারতীয় সমাজের মর্মস্থান। সেখানে আঘাত লাগলে, সে তা সহ্য করতে পারবে না। তাই সেখানে সে আঘাত করেনি, যেমন আছে তেমনি থাকতে দিয়েছে। সেও তাই থেকেছে। গ্রামের বাইরে সারা দেশে কী হচ্ছে, তা নিয়ে গ্রামের মানুষ মাথা ঘামায়নি। গ্রামীণ মানুষের এই মনোবৃত্তিকেই ভাষা দিয়েছেন তুলসীদাস : কোই নৃপ হোই হমে হানী (যে ইচ্ছে রাজা হোক, তাতে আমার কী ক্ষতি)। রাহুল মনে করেন যে, যদি ভারতীয় গ্রাম্য প্রজাতন্ত্র আগেই ভেঙে যেত, যদি এর বিস্তৃততর সংগঠন হত, তাহলে একথা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, সাধারণ মানুষ শাসকের নিরঙ্কুশ আধিপত্যের মোকাবিলা করত। তাহলে, যে স্বেচ্ছাচারিতা আমরা ভারতের দুহাজাব বছরের ইতিহাসে দেখতে পাই, তা কি থাকত?

ভারতের ইতিহাস অধ্যয়ন করে রাহুল এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, আর্য, যবন, শক, হুন, গুর্জর, জাঠ, আভির, আরব, তুর্কি ইত্যাদি জাতি যারা ভারতে এসেছে তারা প্রথমে তাদের শাসন ও ঔপনিবেশিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু যখন তাদের হাত থেকে শাসনভার চলে গেছে, তখন তারা একটা আলাদা জাতি হিসেবে ভারতীয় হয়ে থেকেছে। বাইরে ও ভিতরে লড়াই চলেছে, রাষ্ট্রবিপ্লব হয়েছে, আকাল এসেছে; কতবার যে কত বিপদ ভারতীয় সমাজে আছড়ে পড়েছে তার ঠিক নেই, কিন্তু উনিশ শতক পর্যন্ত কোনো কিছুই ভারতীয় সমাজের ভেতরের কাঠামো বদলাতে পারেনি। আপাতদৃষ্টিতে যে সব পরিবর্তন লক্ষ করা যায়, তা ভারতের মৌলিক কাঠামোকে স্পর্শ করতে পারেনি।

অনেক কাল আগেই কিন্তু উনিশ শতকে পরিবর্তন হতে শুরু করে। যে পরিবর্তন ইউরোপীয় জগৎকে আমূল রূপান্তরিত করেছিল, ইংরেজ সেই নতুন ব্যবস্থা ভারতে প্রবর্তন করে। কিন্তু ভারতের আগের বিজেতাদের মতো ইংরেজ ভারতীয় হয়ে যায়নি। ভারতের আগের বিজেতাদের থেকে ইংরেজের অনেক পার্থক্য ছিল। ইংরেজের আগে যারা এসেছিল, তারা ভারত জয় করেছিল ঠিকই। কিন্তু এই বিজেতারা ভারতীয় সভ্যতার মর্মস্থানে পৌঁছোতে পারেনি। তাই ইতিহাসের সনাতন নিয়ম অনুসারে তারা বিজিত জাতির সভ্যতার কাছে পরাজিত হয়েছিল। ইংরেজ হিন্দু সভ্যতার চেয়েও উচ্চতর সভ্যতার বাহক। তাই বিজিত জাতি তাকে হজম করতে পারেনি। কয়েক প্রজন্ম ধরে

ভারতীয়রা এই চেষ্টা করছিল যে, তারা বিজেতাদের সভ্যতা থেকে দূরে থাকবে; কিন্তু তা কতদিন সম্ভব? সংক্ষেপে বলা চলে যে, ইংরেজ তাদের পুঁজিপতিদের স্বার্থে ভারতের গ্রামীণ সমাজব্যবস্থাকে অটুট থাকতে দেয়নি। অবশ্য রাহুলের সিদ্ধান্তও ভারত সম্পর্কে মার্কসের চিন্তায় অনুগামী।

মধ্য-এশিয়ার ইতিহাসের অক্লান্ত গবেষক হিসেবে রাহুলের স্বাধীন ইতিহাস চিন্তা চোখে পড়ে। দুই খণ্ডে রচিত রাহুলের *মধ্য এশিয়ার ইতিহাস* ঐতিহাসিক হিসেবে তাঁর অসামান্য কীর্তি। এই ইতিহাস রচনায় তিনি ঐতিহাসিক উপাদান ছাড়াও মধ্য-এশিয়ায় বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর লৌকিক ও অনুরূপ অন্যান্য উপাদানের ওপর নির্ভর করেছেন। মধ্য-এশিয়ার যে ইতিহাস তিনি রচনা করেছেন, তা শুধু মধ্য-এশিয়ার রাজনৈতিক ইতিহাস নয়, এই ইতিহাসে মধ্য এশিয়ার জাতিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের কাহিনি গ্রথিত। ঐতিহাসিক হিসেবে এখানেই রাহুলের অনন্যতা। ইংরেজের কাছ থেকে ভারতীয় গবেষকরা পাশ্চাত্যের ইতিহাসবিদ্যার বিচার-বিশ্লেষণ পদ্ধতি আয়ত্ত করে যে ইতিহাস রচনা করেন তা প্রধানত রাজনৈতিক ইতিহাস। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনায় তাঁদের অনীহা ছিল। কারণ তাঁদের গবেষণা ছিল মূলত গ্রন্থাগার-নির্ভর। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনায় যে বিপুল শ্রম স্বীকার আবশ্যিক অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ী পণ্ডিতের পক্ষে ত' সম্ভব নয়। এই দুইটি বিশেষ ক্ষেত্রে রাহুলের দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ এবং অন্তত ছত্রিশটি ভাষার ওপরে অধিকার বিভিন্ন দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনায় তাঁকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল। কেন না এতে তিনি যে-দেশের ইতিহাস রচনা করেছেন সেই দেশের মানুষের ও তাদের ইতিহাসের লৌকিক ও অনুরূপ অন্যান্য উপাদানের সরাসরি অভিজ্ঞতা তাঁকে সেই দেশের সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রখর অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছিল। এই অন্তর্দৃষ্টিই তাঁর কিছু উপন্যাস ও ছোটোগল্পের মধ্যে প্রকাশিত। তিনি এই সব উপন্যাস ও ছোটোগল্প ইতিহাসের অভিমুখ (direction) ও গতিশীলতার দৃষ্টান্ত হিসেবে রচনা করেছিলেন। এখানে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *ভোলগা সে গঙ্গা* উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থের বিভিন্ন কাহিনিতে ভোলগা উপত্যকায় আর্যদের উৎপত্তি থেকে শুরু করে তাদের ভারতে অভিপ্রয়ান ও ভারতে তাদের জীবনের বিভিন্ন পর্বের কথা চিত্রিত। এতে তিনি মানবসমাজের মাতৃতান্ত্রিক সমাজ থেকে পুঁজিবাদী পর্যন্ত বিভিন্ন পর্বকে চিহ্নিত করেছেন। এই বইয়ে রাহুলের দূরবগাহী ঐতিহাসিক কল্পনায় মানুষের ছয় হাজার বছরের ইতিহাস জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে বিগত চল্লিশ বছরের পুরাতাত্ত্বিক উৎখননের ফলে এই ধারণার প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, আর্যরা অথবা ঐতিহাসিকদের ভাষায় ইন্দো-ইউরোপীয়রা দক্ষিণ রাশিয়ার শুষ্ক তৃণাবৃত নিষ্পাদপ প্রান্তরে (steppe) বাস করত। ঘোড়া, চাকা-অলা রথ, যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি প্রদত্ত ঘোড়া, গরু ও ভেড়ার অবশেষ, অগ্নিতে দাহ করার পর সমাহিত করার ব্যবস্থা ও অগ্নিপূজা ইত্যাদির চিহ্ন দক্ষিণ এশিয়া থেকে

মধ্য-এশিয়ায় উৎখননের ফলে পাওয়া গেছে। যা পাওয়া গেছে সব কিছুই খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ থেকে ২০০০ সময় কালের। এই সবই ইন্দো-ইউরোপীয় জাতিসমূহের সঙ্গে জড়িত। বিশেষত ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সংক্রান্ত পশুবলির ব্যবস্থাও ইন্দো-ইউরোপীয়দের মধ্যে ছিল। কোনো কোনো সমাধিস্থল থেকে পাওয়া প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে জানা যায় যে, খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ থেকে ২০০০ সময়কালের রাশিয়ায় পুরুষের আধিপত্য ছিল বলে মনে হয়।

নৃতাত্ত্বিক মহলে আজ একথা স্বীকৃত যে, সামাজিক বিবর্তনে উদ্যান-পালনের পর্বে মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পশুচালিত লাঙলদ্বারা কৃষিকার্যের পর্বে বলদ দ্বারা লাঙল চালনার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি ছিল না নারীর। তাই তাকে পিছনে হটে যেতে হয়। তা ছাড়া গো-পালক সমাজকে—গো-ধন কেড়ে নেওয়ার জন্য যে হানাদাররা আসত তাদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত যুদ্ধ করতে হত। ফলে ইন্দো-ইউরোপীয় সমাজ মাতৃতান্ত্রিকতা থেকে পিতৃতান্ত্রিকতায় উদ্বর্তিত হয়। রাহুলের বইয়ে এই সব সাম্প্রতিককালে প্রাপ্ত বিবরণের উল্লেখ না থাকলেও ভোলগা উপত্যকা থেকে ইন্দো-ইউরোপীয়দের ভারত আগমনের যে পথ রাহুল নির্দেশ করেছেন, তা সঠিক। রাহুল মনে করতেন, অতীত সম্পর্কে অন্ধ অনুরাগ ও ঐতিহাসিক গবেষণা পাশাপাশি চলতে পারে না। ইতিহাসকে তথ্য-নির্ভর হতে হবে। অতীতের ইতিহাসে প্রত্নতত্ত্ব, পুরালিপি, মুদ্রা ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সমর্থন প্রয়োজন। রাহুলের মতে ধর্মের প্রতি অতিরিক্ত অনুরাগ নৈষ্ঠিক-ঐতিহাসিক গবেষণার পথে সবচেয়ে বড় বাধা। রাহুল মনে করতেন, সেই ইতিহাসই গ্রাহ্য যা প্রত্নতত্ত্বের সমর্থনপুষ্ট।

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের প্রতি রাহুলের কী প্রবল অনুরাগ ছিল তা তাঁর গ্রন্থ *পুরাতত্ত্ব নিবন্ধাবলী* পড়লে বোঝা যায়। এতে তিনি যে সব পুরাতাত্ত্বিক সামগ্রী পেয়েছেন তার বিশ্লেষণ ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর গবেষণার ওপর নির্ভর করে তিনি প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কে কিছু নতুন কথাও বলেছেন। তা থেকে বোঝা যায় যে, প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিকোণ কিছুটা নতুন ছিল। তাঁর মতে প্রত্নতাত্ত্বিক সামগ্রী ইতিহাসের সবচেয়ে মূল্যবান সামগ্রী এবং ভারতে এমন কোনো স্থান নেই যেখানে প্রত্নতাত্ত্বিক সামগ্রী পাওয়া যাবে না। গ্রামে মাটির পুরোনো ঢিবিতে যে চিত্র-বিচিত্র পোড়া মাটির টুকরো পাওয়া যায় তা ইতিহাস সম্পর্কে অনেক কথা বলে। তবে সেই ইতিহাস বোঝার জন্য আমাদের উপযুক্ত জ্ঞান ও চোখ থাকা চাই। বস্তুত ভারতের ইতিহাস লেখার জন্য পুরাতাত্ত্বিক তথ্য যে কতটা মূল্যবান, পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকেরা ভারতের যে ইতিহাস রচনা করেছেন তা থেকেও তার প্রমাণ মেলে। পুরাতাত্ত্বিক সামগ্রীর রক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তার কাল নির্ণয় ও পুরালিপির উদ্ধারের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার কথা তাঁরা বলেছেন। ভারত ও দেশান্তরে ভ্রমণ ও প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টি থাকার ফলে এবিষয়ে রাহুলের যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তার তুলনা মেলা ভার। পুরালিপি সম্পর্কে তার পাণ্ডিত্য দেশে-বিদেশে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। পাঠোদ্ধারে সিলভাঁ লেভি-ও তাঁর সাহায্য নিয়েছিলেন।

প্রাচীন মুদ্রা ও পদক সংক্রান্ত (Numismatics) বিদ্যায়ও তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। প্রাচীন মুদ্রার ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথাও রাহুল বলেছেন। আমরা জানি যে, প্রাচীন মুদ্রা অনেক রাজবংশের কথা আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে মেলে ধরেছে, অনেক রাজবংশের লুপ্ত গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে। কাল নির্ণয়ে পুরাতাত্ত্বিক সামগ্রী ও মুদ্রার গুরুত্বের কথা বারবার বলেছেন রাহুল। তিনি স্বয়ং ঐতিহাসিক কাল নির্ণয়ে এই সামগ্রীর ওপর নির্ভর করেছেন। পুরাতাত্ত্বিক সামগ্রীর ভাষা তিনি পাঠ করতে পারতেন। এই ভাষা রাজনৈতিক ইতিহাস, সভ্যতা ও সংস্কৃতির কথা বলে। শুধু এই ভাষা বোঝার ক্ষমতা থাকা চাই। শ্রাবস্তীর ঐতিহাসিকতা, জেতবনের বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও মাহাত্ম্য, লিচ্ছবিদের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে পুরাতাত্ত্বিক সামগ্রীর ওপর নির্ভর করে রাহুল যে ঐতিহাসিক আলোকপাত করেছেন হিন্দি ঐতিহাসিক রচনায় তার কোনো তুলনা নাই। হিমালয়ের তরাই নিবাসী খার জাতির যে বর্ণনা তাঁর লেখায় পাওয়া যায়, তারও কোনো তুলনা নেই।

তিব্বতের চিত্রকলার উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে তিনি যে সারগর্ভ ও চিত্তাকর্ষক গ্রন্থ রচনা করেন তার জন্য তিনি নির্ভর করেছিলেন তিব্বতি সাহিত্য, উৎখনন থেকে প্রাপ্ত সামগ্রী ও নিজস্ব পর্যবেক্ষণের উপর। তিব্বতি চিত্রকলার উপর এমন নির্ভরযোগ্য উপাদান-নির্ভর কোনো গ্রন্থ ইতিপূর্বে কোনো দেশি ও বিদেশি কলা সমালোচক লেখেন-নি। প্রাচীনকাল থেকে আধুনিকযুগ পর্যন্ত তিব্বতি চিত্রকলার বিকাশ, বিষয়বস্তু, শিক্ষাক্রম, রেখাঙ্কন, চিত্রণ সামগ্রী, মিশ্রিত ও অমিশ্রিত রঙ এবং চিত্রণ ক্রিয়ার যে আনুপূর্বিক বর্ণনা করেছেন তা এমন জীবন্ত ও রচনাশৈলী এমন প্রাণময় যে এই গ্রন্থ পড়ার সময় মনে হয় যেন সব ছবি পাঠকের চোখের সামনে দাঁড়িয়ে তাদের কথা বলছে।

ইতিহাসের প্রতি রাহুলের প্রবল ভালোবাসা ছিল। ইতিহাস রাহুলের প্রায় যে কোনো রচনারই গভীরতম প্রেরণা ছিল বলা যেতে পারে। তাই তাঁর ইতিহাস দৃষ্টির সামনে তাঁর উপন্যাসে ও গল্পে অতীত এমন বিস্ময়কর সজীবতা ও প্রাণময়তা নিয়ে ধরা দেয় যে অতীতকে আর অতীত বলে মনেই হয় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও অতীত-ইতিহাস-মুগ্ধতা সম্পর্কে রাহুল আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন, যাতে এই অতীত আমাদের আধুনিক দৃষ্টির পথরোধ করে না দাঁড়ায়। তিনি লিখছেন 'ইতিহাস-ইতিহাস সংস্কৃতি-সংস্কৃতি করে অনেক চেঁচামেচি করা হয়। মনে হয় যেন ইতিহাস ও সংস্কৃতি শুধু মধুর ও সুখময় স্মৃতি। আমাদের সমাজের পঁচিশ বছরের অভিজ্ঞতা আমার আছে। এই তো আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ইতিহাস হয়ে যাবে। আজ যে অন্ধকার আমরা চোখের সামনে দেখছি, হাজার বছর আগে তার চেয়ে কি কম অন্ধকার ছিল? আমাদের ইতিহাস তো রাজা পুরোহিতের ইতিহাস। আজকের মতো এরা অতীতেও এইভাবেই আরামে থাকত।'

অতএব রাহুলের সিদ্ধান্ত ঃ ইতিহাস-মুগ্ধতা আমাদের সমাজের পুরোনো বেড়িকে মজবুত করে। ইতিহাস আমাদের মনের স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় শত্রু। সহস্র বছর ধরে মানুষের এই ঘোর শত্রু ধর্ম ও ইতিহাসের ভিত্তির ওপরেই প্রতিষ্ঠিত। সকল লুঠেরা ও খুনিদের আকাশে তুলে ধরার যে প্রবৃত্তি চোখে পড়ে তা থেকে বোঝা যায় যে

ইতিহাসে যে বীরপূজা আমরা লক্ষ করি, তার জন্য ইতিহাস অনেকাংশে দায়ী। যে জাতির সভ্যতা যত পুরোনো তার মানসিক বন্ধনও তত বেশি। ভারতের সভ্যতা পুরোনো, তাতে কোনো সন্দেহ নেই, সেইজন্য ভারতীয়দের অগ্রগতির পথে বাধা অনেক বেশি। মানসিক দাসত্ব প্রগতির পথে সবচেয়ে বড় বাধা। ধর্মীয় উন্মাদনার উৎস ভারতীয় মুগ্ধতা—একথাও রাহুল বলেছেন।

রাহুলের ইতিহাস-দৃষ্টির প্রধান কথা হল এই যে, ইতিহাস সমাজকে পিছনে নিয়ে যাবে না। ইতিহাস সমাজকে বিকাশ ও পুনর্নির্মাণের পথে নিয়ে যাবে। নতুন নতুন গবেষণা ইতিহাসের পথ প্রশস্ত করে দেয়। তাই ইতিহাসের কোনো কোনো সিদ্ধান্ত পুরোনো হয়ে যেতে পারে এবং তাতে কিছু ভুলও থাকতে পারে এবং আছে। কিন্তু আসল কথা হল এই যে, তিনি ইতিহাস কীভাবে এবং কীজন্য ব্যবহার করেছেন? রাহুলের মহত্তম কৃতিত্ব হল এই যে, তাঁর গবেষণা ইতিহাসের উপর নতুন আলোকপাত করেছে এবং তিনি ইতিহাসকে ব্যবহার করেছেন সামাজিক প্রগতির জন্য, সামাজিক প্রগতির পথ রোধ করার জন্য নয়। ১৯৫৭-তে একথা তিনি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তাঁর স্ত্রীর কাছে লিখেছেন, 'একথা তোমাকে মনে রাখতে হবে যে তিব্বত সম্পর্কে অনুসন্ধান ও সাম্যবাদের সেবা আমার জীবনে সবচেয়ে বড় আদর্শ।'

পক্ষান্তরে তাঁর ইতিহাস-দৃষ্টি সম্পর্কে আরো একটি কথা বলা চলে। একটি মহান সত্যের দিকে তিনি ভারতীয় গবেষক ও ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তিনি বারবার একথা বলেছিলেন যে, ভারতের প্রাচীন আচার্যরা সমগ্র এশিয়া মহাদেশে যে সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন তা পুনরুজ্জীবিত ও সংরক্ষিত করা ভারতীয় ঐতিহাসিকদের বড় কর্তব্য। শ্রীলঙ্কা, চীন, বর্মা, রাশিয়া, জাপান ইত্যাদি ভ্রমণ করে তাঁর এই ধারণা দৃঢ়তর হয়েছিল।

আমরা যাকে বিশুদ্ধ ইতিহাস বলি তা রাহুল বেশি রচনা করেননি। কিন্তু ইতিহাসের ভিত্তিমূলক সামগ্রীর অনুসন্ধান ও তার উদ্ধারের জন্য রাহুলের প্রয়াসের কোনো তুলনা নেই।

রাহুলের প্রধান কীর্তি বৌদ্ধ সাহিত্য ও তার ঐতিহাসিক উপলব্ধির দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ। আমরা জানি তিনি কী প্রচণ্ড অধ্যবসায় ও দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার দ্বারা বৌদ্ধ গ্রন্থরাজি তিব্বত থেকে নিয়ে এসেছিলেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা উনিশ শতকের শেষ দিকে তিব্বতে বৌদ্ধগ্রন্থ সংগ্রহের চেষ্টা করেছিলেন। এদের মধ্যে রুশ পণ্ডিত শেরবাৎসিক ও ইতালীয় পণ্ডিত তুচির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিব্বতিরা বাধা দেওয়ায় তাঁদের প্রচেষ্টা বিশেষ সফল হয়নি। রাহুলের ঐতিহাসিক দৃষ্টির কাছে তিব্বতের গুরুত্ব ধরা পড়েছিল। অভারতীয় গবেষকরা এই অমূল্য গ্রন্থরাজির আশা ত্যাগ করেছিলেন। চারবার তিব্বত অভিযানের পর অনেক ভূর্জপত্রের ও তালপত্রের সংস্কৃত পুঁথি তিনি নিয়ে এসেছিলেন। এই অমূল্য রত্নরাজির মধ্যে ছিল ভারতের বৌদ্ধ দার্শনিক শান্তরক্ষিত কৃত *বাদনায়* ও ধর্মকীর্তির *প্রমাণবর্তিক*।

তিব্বত থেকে যে গ্রন্থ তিনি নিয়ে এসেছিলেন তার মধ্যে মূল্যবান কিছু গ্রন্থের সম্পাদনা তিব্বতি ও অভারতীয় ইউরোপীয় পণ্ডিতের সহায়তায় রাহুল স্বয়ং করেছিলেন। বেশকিছু গ্রন্থের সম্পাদনা ভারতে ও অন্যান্য দেশে আজও হচ্ছে।

রাহুল যে সব গ্রন্থ নিয়ে এসেছিলেন তাকে ভিত্তি করে বেশ কিছু ঐতিহাসিক গ্রন্থ ইতিমধ্যেই লেখা হয়েছে। কাশীপ্রসাদ জয়সওয়াল 'মঞ্জুশ্রী কল্পের' ভিত্তির ওপর ভারতের ইতিহাস লিখেছেন। তার একাংশের সঙ্গে রাহুলও যুক্ত ছিলেন। রাহুলের *বৌদ্ধচর্যা*-র মতো গবেষণা গ্রন্থ ইতিহাসের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু রাহুলের যে-সব বইকে বিশুদ্ধ ইতিহাস বলা চলে, *মধ্য-এশিয়ার ইতিহাস* তার কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত। মধ্য-এশিয়ার ইতিহাস এতকাল ইউরোপীয় ঐতিহাসিকেরা লিখেছেন নানা জাতির বিচরণ ক্ষেত্র হিসেবে। প্রকৃত ইতিহাস বলা যেতে পারে রাহুলের। পূর্ব, মধ্য-এশিয়া সম্পর্কে এমন কোনো বই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকদের মধ্যে কেউ লেখেননি। রাহুলই প্রথম এই ভূখণ্ডের সামাজিক ইতিহাস রচনা করেছেন। এই ইতিহাসের ভিত্তিস্থানীয় উপাদান তিনি সংগ্রহ করেছেন তোলস্তাফের মতো রুশ পুরাতাত্ত্বিকের উৎখননের রিপোর্ট পরীক্ষা করে। তোলস্তাফ তাঁর উৎখননলব্ধ সামগ্রী থেকে নিজে মধ্য-এশিয়ার ইতিহাস লিখে যেতে পারেননি।

রাহুল মধ্য-এশিয়ার ইতিহাসে যে তথ্য সন্নিবেশিত করেছেন, তা ইতিপূর্বে আর কেউ করেননি। এমনকি অনেক তথ্য যা অয়েলস্টাইন সংগ্রহ করেছিলেন, তাও লোকে ভুলে গিয়েছিল। অধিকাংশ পুরাতাত্ত্বিক সামগ্রীর প্রাপ্তিস্থান সোভিয়েত রাশিয়ায়। কিন্তু আমাদের দেশের প্রত্নতাত্ত্বিকদের রুশ ভাষার সঙ্গে পরিচয় না থাকায় সোভিয়েত প্রত্নতাত্ত্বিকরা উৎখননের দ্বারা মাটির নীচ থেকে যে প্রত্নতাত্ত্বিক ভাণ্ডার তুলে এনেছেন, তার বিশেষ ধারণা তাঁদের ছিল না। যা তাঁরা করতে পারেননি, রাহুল তা-ই মধ্য-এশিয়ার দুই খণ্ডে করেছেন।

কেন তিনি *মধ্য-এশিয়ার ইতিহাস* লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তা তিনি এ বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন। তার কারণ, ভারতের ইতিহাস লেখার লোক অনেক আছে। মধ্য-এশিয়ার ইতিহাস লেখার কোনো লোক নেই। তাঁর ভ্রাম্যমান জীবনে তিনি রাশিয়া ও মধ্য-এশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসেছেন। এই অঞ্চল নিয়ে অনেক বই লিখেছেন, অনেক বইয়ের অনুবাদ করেছেন। এই সময়ে তাঁর মনে হয়েছিল যে, আধুনিক ঐতিহাসিক ঘটনার পশ্চাদভূমি সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। তা ছাড়া মধ্য-এশিয়ার নানা দেশের সঙ্গে ভারতের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সাধারণভাবে অনেকে মনে করেন দ্রাবিড় জাতিই হরপ্পা সভ্যতার স্রষ্টা। তাদের মধ্য-এশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। হরপ্পা সভ্যতাকে আর্যরাই ধ্বংস করেছিল বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন। রাহুলের মতে, আর্যদের সঙ্গে দ্রাবিড়দের প্রথম সংঘাত ভারতে হয়নি। আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান থেকে মনে হয়, আর্যরা দ্রাবিড়দের মুখোমুখি হয়েছিল খারেজম-এ। তারপর আর্যদের অনেক তরঙ্গ এসে ভারতে আছড়ে পড়ে। গ্রিকরা ব্যাকট্রিয়ায় আসে এবং তাদের একটি

অংশ ভারতে চলে আসে। ভারতের কোনো কোনো অংশে গ্রিক শাসন প্রবর্তিত হয়। মধ্য-এশিয়া থেকে শক-হুনদল, পাঠান, মোগল, ভারতে আসে এবং ভারতের শাসক-সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। এইসব জাতি ভারতে এলেও তাদের সবাই মধ্য-এশিয়া থেকে চলে আসেনি। এইসব জাতিরই কিছু অংশ মধ্য-এশিয়ায় থেকে যায়। অতএব মধ্য-এশিয়ার ইতিহাস জানা না থাকলে ভারতের ইতিহাসও সঠিকভাবে জানা সম্ভব নয়।

কিন্তু মধ্য-এশিয়ার ভৌগোলিক সংজ্ঞা কী? রাহুল লিখছেন, 'মুখ্য-চীন, ভারত, আফগানিস্তান, ইরান, কাস্পিয়ান সমুদ্র ও রাশিয়া দ্বারা পরিবেষ্টিত ভূমির মধ্যে আমি মধ্য-এশিয়াকে সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছি। কিন্তু ইতিহাসের নদী বয় আঁকাবাঁকা পথে। তাই এই সীমার বাইরেও আমাকে কিছুটা ঘোরাফেরা করতে হয়েছে। তা না করলে এই ইতিহাস বোঝা কঠিন হত। এই বই লেখার সময় যে তথ্যের ওপর আমি নির্ভর করেছিলাম তার অধিকাংশই আমি সংগ্রহ করেছি পঁচিশ মাস রাশিয়ায় অবস্থানের সময়। মধ্য-এশিয়ার ইতিহাসের যে উপাদান রাশিয়ায় পাওয়া যায় তা অন্য কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়। আমার আপশোশ ১৯৪৭-এর পর রাশিয়ায যে সব প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান পাওয়া গেছে, তা আমি ব্যবহার করতে পারিনি। ....দুই বছর রাশিয়ায় থেকে ভারতে চলে আসার এক বড় কারণ হল মধ্য-এশিয়ার ইতিহাসের জন্য সংগৃহীত উপাদান ও তার অধ্যয়নকে আমি পুস্তকে পরিণত করতে চেয়েছিলাম। আমি রাশিয়াতে চাঁর-পাঁচ মন গ্রন্থ সংগ্রহ করেছিলাম এবং দুবছরে আমি সেই সব বই পড়েছিলাম, তার নোটও ছিল। আমার পুরোনো অভিজ্ঞতা বলছিল যে মধ্য-এশিয়ার ইতিহাস লিখলে তা ছাপাবার জন্য প্রেস পাওয়া যেত না রাশিয়ায়।'

পাটনার রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতি বিপুলায়তন *মধ্য-এশিয়া কা ইতিহাস*-কে দুই খণ্ডে প্রকাশ করে। এই বইয়ের জন্য সাহিত্য আকাদেমি তাঁকে পুরস্কৃত করে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই বই প্রথম শ্রেণির গবেষণার ফলশ্রুতি। রাহুলের magmum opus।

যুগপৎ মধ্য-এশিয়ার প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস এই বইয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই বই লেখার জন্য যে উপাদান তিনি সংগ্রহ করেছেন, সেজন্য ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকেরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন। হাজার হাজার বছর, প্রায় নিরবধি কালকে তিনি এই বইয়ের মধ্যে নিয়ে এসেছেন। এই বইয়ের পাতা ওলটালে ভিন্ন ভিন্ন বিচিত্র মানবগোষ্ঠীর মিছিল আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এক একটা মনুষ্যগোষ্ঠী তাদের উপনিবেশ গড়ে তোলে. উপনিবেশ ভেঙে যায়, আবার তাদের যাত্রা শুরু হয়। নতুন মনুষ্যগোষ্ঠীর মিছিল আসে, নতুন উপনিবেশ গড়ে ওঠে, ভেঙে যায়, এভাবেই উত্থান পতন চলে হাজার বছর ধরে, বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মিশ্রণ ঘটে। কার্পেথীয় ও ককেশাস, উরাল ও পামির এবং তিয়েনশান পর্বতমালার নদীসেবিত উপত্যকাকে ঘিরে রাখে। সেখানে পর পর নানা জাতির উপনিবেশ গড়ে ওঠে. ভেঙে যায় এবং ক্রমশ একটি নানান রঙের মিশ্রিত সংস্কৃতির মোজেইক সৃষ্টি হয়। মধ্য-এশিয়ার সেমাইট জাতি, আর্য, পারসিক, শক, ইউ-চি, শ্বেত-হুন, তুর্কি, মোঙ্গল, চীনা, আফগান, হিন্দু প্রভৃতি জাতি পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ

করে। কেউ হারে, কেউ জেতে। অসংখ্য মনুষ্যগোষ্ঠীর আসায় এই মধ্য-এশিয়াকে প্রায় সমুদ্রের মতো মনে হয়। ভগবত শরণ উপাধ্যায় লিখেছেন, 'উর ও নিনেওের ধ্বংসাবশেষের উপর না দাঁড়ালে ভারতের ইতিহাস বোঝা যাবে না। নিনেঙ থেকে ব্যাবিলনে প্রবেশে উদ্যত ক্যামাইটদের পদধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। সিন্ধুকুশ পেরিয়ে সপ্তসিন্ধুর সমতল ক্ষেত্রে যে আর্যরা ঢুকেছে, তাদেরও পদধ্বনি কানে আসে।'

মধ্য-এশিয়া কা ইতিহাস মৃত অতীতকে প্রাণ দেয় এবং ইতিহাসের অনেক জটিল গ্রন্থি উন্মোচন করে; ভারতের ইতিহাস বোঝা অনেক সহজসাধ্য হয়। এই গ্রন্থ রচনার জন্য রাহুল যে তথ্য ও প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন তা প্রায় ইতিহাসকারকে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো। রাহুলের পক্ষেও এই তথ্য ও উপাদানের সংকলন ও ব্যাখ্যা অত্যন্ত দুরূহ ছিল। এই দুরূহ কাজ তিনি সম্পন্ন করেছিলেন। দেশ-বিদেশের কোন ভাষায়ই এই ধরনের পূর্ণাঙ্গ মধ্য-এশিয়ার ইতিহাস লেখা হয়নি। *মধ্য-এশিয়া কা ইতিহাস* হিন্দি জগতের গর্বের বস্তু।

রাহুলের বহুমুখী প্রতিভা তাঁকে বিচিত্র পথে নিয়ে গিয়েছে, এনে দিয়েছে বিচিত্র উপলব্ধি। এই উপলব্ধির মূলে ছিল তাঁর ইতিহাস চেতনা। তিনি শুধু দার্শনিক চিন্তার বিমূর্ত প্রত্যয়ের বায়বীয় বিশ্লেষণ করেননি, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তাঁর ধারণাকে তিনি বাস্তব ঐতিহাসিক নিরিখে পরীক্ষা করেছেন।

রাহুল ইতিহাসের ক্ষেত্রে সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন ও অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা ও বিশ্লেষণ করে নিজের পাণ্ডিত্যের পরিচয় শুধু দেননি, ঐতিহাসিকদের নতুন পথও দেখিয়েছেন। তিনি দেশ ও বিদেশের চিন্তাধারার সামগ্রিক রূপের ও ঐতিহাসিক ক্রমের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর নিজস্ব সিদ্ধান্তে পৌঁছোতেন। এই কাজ রাহুলের মতো অনন্য-সাধারণ প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব ছিল। স্বীয় যাযাবর বৃত্তির দ্বারা তিনি প্রাচীন ও মধ্যযুগের যুগানুরূপ প্রতিকৃতি রচনা করে ইতিহাসের গঠনমূলক ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন।

রাহুলের ইতস্তত ছড়ানো লেখা বাদ দিলে তথ্য-নির্ভর বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থের মধ্যে আছে *ঋগ্বেদিক আর্য, আকবর, পুরাতত্ত্ব নিবন্ধাবলী, মধ্য-এশিয়া কা ইতিহাস* ও আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। মূল *ত্রিপিটক* ও *জাতক* নির্ভর বুদ্ধপূর্ব ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস তিনি রচনা করেছিলেন। যদিও প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রিজ ডেভিডস প্রায় এই কাজই সম্পন্ন করেছিলেন, তবু রাহুলের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায় এই কাজকে আরো এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। জম্মুর পাঁচ হাজার বছরের পুরোনো শিব মন্দির এবং মিশরের পিরামিডে প্রাপ্ত ভারতীয় কাঠে গীতার শ্লোকখোদিত প্রতিমার সাক্ষ্য উপস্থিত করে ভারতীয় ইতিহাস পুনর্লিখনের যে নতুন উপাদান রাহুল সংযোজন করেছিলেন, তার প্রশংসা করেছেন ডঃ কাশীপ্রসাদ জয়সওয়াল। আজও ইতিহাসের ক্ষেত্রে এমন লোকের সংখ্যাই বেশি যারা ঘরে বসেই দেশ-বিদেশের ইতিহাস রচনা করেন। কিন্তু এই ভিক্ষু যাত্রীর অনুসন্ধানের ফলে ভারতীয় হস্তলিখিত পুঁথির ইতিহাস যে খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে আরম্ভ হয়েছিল তা প্রমাণিত হয়। বাইশটি খচ্চরে

বোঝাই হয়ে কয়েক হাজার পুঁথি ভারতে এসেছিল। ভারতীয় জীবন ও ভারতীয়ত্বের বহুদূর ব্যাপী সম্প্রসারণের ইতিহাসের উপর তা নতুন আলোকপাত করে।

কিন্তু রাহুল নামে টাইটেনিক তাঁর জীবনব্যাপী সাধনা ও অমানুষিক পরিশ্রমে ভারতীয় ইতিহাস চর্চার যে নতুন দিক নির্দেশ করেছিলেন, যে নতুন ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করে নতুনভাবে ইতিহাস রচনার মডেল রেখে গিয়েছিলেন, ভারতীয় ইতিহাসের সঙ্গে এশিয়ার ইতিহাসকে গ্রথিত করে যে নতুনপথে ভারতীয় ইতিহাসকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, পাশ্চাত্য সভ্যতার চোখ-ধাঁধানো আলোয় প্রায় অন্ধ আমাদের দেশের ঐতিহাসিকেরা সেদিকে দৃষ্টিপাত করেননি। করার কারণও নেই। পাশ্চাত্য-বিদ্যা ও পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের উচ্ছিষ্টের চর্বিতচর্বণ করে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরামপ্রদ কুরসি পেয়েছেন। বিমানে দেশে বিদেশে সেমিনার করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ইতিহাস চর্চার তুঙ্গে পৌঁছে গেছেন। তাদের ইষ্টলাভ হয়েছে। এখন অন্যদিকে মুখ ফেরালেই অনিষ্ট।

একথা বললে হয়তো অন্যায় হবে না যে, এমন বিষয় নেই যার ওপরে রাহুল লেখেননি। ইতিহাস, দর্শন, ভাষাতত্ত্ব, বিজ্ঞান, ধর্ম, সাহিত্যের ওপর অনেক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লিখেছেন তিনি। দেশি, বিদেশি ছত্রিশটি ভাষার জ্ঞান ছিল তাঁর। তাছাড়া তিনি উপন্যাসিক, গল্পলেখক ও নাট্যকার, জীবনীকারও ছিলেন। ভ্রমণবৃত্তান্তের লেখক হিসাবে ভারতীয় ভাষায় লেখকের কোনো তুলনা নেই।

রাহুল তাঁর জীবনী ও লেখনীকে উৎসর্গ করেছিলেন শুধু 'হিন্দি সনসার'কেই (হিন্দি জগতকেই) নয়, সমগ্র ভারতে সমাজতান্ত্রিক চেতনার প্রসারের জন্য। 'ভারতীয় জীবন মে বুদ্ধিবাদ' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, 'আমাদের উদ্ধারের একমাত্র উপায় বুদ্ধিবাদ ও বাস্তববাদকে দৃঢ়ভাবে ধরে থাকা। এই পথে যে বাধা আছে তার সঙ্গে লড়তে হবে।' অবশ্য এখানে একথা মনে রাখতে হবে যে রাহুলের কাছে বুদ্ধিবাদ ও মার্কসবাদ প্রায় সমার্থক ছিল। সন্দেহ নেই, মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ, ইতিহাস-চেতনা রাহুলের সাহিত্যকর্মকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। বস্তুত রাহুলের সাহিত্যে কর্মকে প্রায় মার্কসবাদ প্রচারের মাধ্যম বলে মনে করা যেতে পারে। এই মার্কসবাদী সাহিত্যের সঙ্গে প্রগতিশীলতার প্রশ্ন জড়িত। যে সময়ে রাহুল লিখেছিলেন তখন প্রগতিশীলতার প্রশ্নটি নিয়ে ঘোর বিতর্ক চলছিল। অনেক প্রগতিশীল অর্থাৎ মার্কসবাদী সাহিত্যিকই প্রগতিশীলতার অর্থ খুঁজে পেয়েছিলেন অতীত ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্ক ছিঁড়ে ফেলে জনমুখী সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে। অতএব রাহুলের সাহিত্য কর্মের আলোচনার আগে তাঁর কাছে প্রগতিশীলতা কথাটির অর্থ কী ছিল তা জানা দরকার।

'প্রগতিশীলতা কা প্রশ্ন' শীর্ষক প্রবন্ধে রাহুল লিখছেন, 'আজকের সাহিত্যিক, শিল্পী ও সমালোচকের লক্ষ্যবিন্দু হওয়া উচিত জনতা।' তাদের লক্ষ্যের 'প্রথমেও জনতা শেষেও জনতা'। রাহুল মনে করতেন যে এর জন্য লেখককে যদি কেউ প্রচারক আখ্যা দেয়, সেজন্য তাঁর লজ্জিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। তিনি লিখছেন, 'আমার উপন্যাস ও গল্পে প্রোপাগাণ্ডার তত্ত্ব খুঁজে বেড়ানোর কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ আমার

উপন্যাস লেখার উদ্দেশ্যই হল কিছু মানুষ ও পাঠককে অনুপ্রাণিত করা। এই উদ্দেশ্য যদি আমার সামনে না থাকতো তাহলে হয়তো আমি গল্প বা উপন্যাস লিখতামই না। তাই যাকে আমার বন্ধুরা প্রোপাগাণ্ডা বলেন তাকে আমি বাধ্যতামূলক বলে মনে করি।'

হিন্দির art for art's sake সমালোচকেরা সমাজিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত জনতার জন্য সাহিত্যের নিন্দা করেন। এই জাতীয় সমালোচকেরা প্রেমচন্দের মতো কথা সাহিত্যিককেও প্রচারবাদী সাহিত্যিক বলে মনে করেন। শেষপর্যন্ত জনতার জন্য উদ্দেশ্যমূলক সাহিত্য রচনার অর্থ প্রগতিশীল সাহিত্য রচনা। প্রগতিশীল সাহিত্যের কী অর্থ তা নিয়ে এখনো বিতর্ক চলেছে।

রাহুলের মতে, প্রগতিশীল সাহিত্যেরই অতীতের মহান সাহিত্যের উত্তরাধিকারের দায়িত্ব বহন করার শক্তি আছে। প্রগতিশীলতার উপরে যারা সর্বদা নবীন এই ছাপ মেরে দিতে চায় তারা ঐতিহ্যদ্রোহী আধুনিকতাবাদী। ঐতিহ্যবিরোধী আধুনিকতাবাদীরা ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দিয়ে সম্পূর্ণ নতুনভাবে শুরু করতে চায়। রাহুল মনে করতেন এই ধরনের সাহিত্যিক আধুনিকতাবাদ প্রকৃত প্রগতিশীলতা বিরোধী।

রাহুল লিখেছেন যে, প্রগতিশীলতা কখনো তার পূর্বগামী সংস্কৃতির ধারাকে বাতিল করে দিতে চায় না। যদি কেউ প্রগতিশীলতার নামে ভারতের পুরোনো অমর লেখকদের—বাল্মীকি, অশ্বঘোষ, কালিদাস, ভবভূতি, বান, সরহপা, জায়সী, সুর, তুলসী থেকে প্রেমচন্দ ও প্রসাদ পর্যন্ত বাতিল করে দেওয়া কর্তব্য বলে মনে করেন, তবে তা প্রগতিশীলতা নয়। অতীতের মানবতাবাদী লেখকদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে দেওয়া প্রগতিশীল লেখকদের কর্তব্য নয়। বরং প্রগতিশীলতার কাজ হল জনতাকে গরিবি ও অশিক্ষা দূর করে এমন স্তরে উন্নীত করা যাতে তারা ঐতিহ্যাগত সাহিত্যের রস ও সৌন্দর্য আস্বাদন করে নিজেদের সুসংস্কৃত ও বিকশিত করে তুলতে পারে। কিন্তু রাহুল পুরোনো ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে পুরোপুরি স্বীকার করে নেওয়াকেও উচিত বলে মনে করতেন না। এই ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে মানবতাবাদী ও বুদ্ধিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কষ্টিপাথরে বিচার করতে হবে, যার ফলে অতীতের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটি দিকই আমাদের কাছে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। এই সাহিত্যকে এভাবে গ্রহণ করলে তা আমাদের নতুন সাহিত্যে শক্তি সঞ্চার করবে। এ বিষয়ে রাহুল লিখছেন, 'যেমন আমাদের শরীরের এক একটি বীজকোষ তার ক্রোমোজোমের ভেতর হাজার প্রজন্মের বংশানুক্রমকে কার্যক্ষমতাকে ধরে রাখে এবং এগিয়ে নিয়ে যায়, তেমনি আমাদের সব মানসিক ক্ষমতা আমাদের পুরোনো সংস্কৃতি ও শিল্পীর কাছে ঋণী। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, বংশানুক্রমের মধ্যে আমাদের যে দুর্বলতা ও ব্যাধি থাকে, তাকে দূর করার কোনো চেষ্টা করব না আমরা। জীবনের জন্য, গতিময়তার জন্য আমাদের তা করতে হবে।' পুরোনো ঐতিহ্যের মধ্যে আমাদের প্রয়োজনীয় যে অংশ আছে, রাহুল তা আত্মসাৎ করার উপরে জোর দিয়েছিলেন এবং প্রগতিশীলতারও এই ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, সে তার উত্তরাধিকারকে আরো বিকশিত করবে। তাঁর বক্তব্য ছিল এই ঃ আমাদের প্রগতিশীলতা দর্শনকে শংকর

থেকে গঙ্গেস পর্যন্ত এনে খতম করে দিতে পারে না। তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। উপযুক্ত পুত্রের কর্তব্য হল পৈতৃক উত্তরাধিকারকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, আরো সমৃদ্ধ করা।

ঐতিহ্য ও প্রগতিশীলতা সম্পর্কে রাহুলের আলোচনার বৈশিষ্ট্য হল এই যে, তিনি শুধু অতীত ও বর্তমানের সম্বন্ধ নিয়েই আলোচনা করেননি—বরং তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে যুক্ত করে এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'আমাদের সামনে যে পথ তার অনেকটা আমরা পেরিয়ে এসেছি, তার কিছুটা আমাদের সামনে আছে এবং তার বেশির ভাগই রয়েছে দূরে। যে পথ আমরা পেরিয়ে এসেছি সেখানে ফিরে যাওয়া প্রগতি নয়, কেননা অতীতকে বর্তমানে পরিণত করার ক্ষমতা প্রকৃতি আমাদের হতে দেয়নি। কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের সামনে যে কর্মপথ আছে, সেখানে স্থির হয়ে বসে থাকা প্রতিগতি নয় একথা ঠিক, কিন্তু তা প্রগতিও নয়। তাকে সহগতি বলা যেতে পারে; কিন্তু তা জীবনের চিহ্ন নয়। তরঙ্গের আঘাত খেয়ে যে আগে চলে তাকে শুকনো কাঠ বলা যেতে পারে। কিন্তু আমরা মানুষ, আমাদের সমাজ চৈতন্যময়। তাই আমাদের শুকনো কাঠের মতো ভেসে যাওয়ার খেয়াল ছেড়ে দিতে হবে এবং আমাদের অতীত ও বর্তমানের দিকে লক্ষ রেখে ভবিষ্যতের পথ প্রশস্ত করতে হবে, যাতে আমাদের রাস্তা অধিকতর সুগম হবে।'

শিল্পকলা ও সাহিত্য সৃষ্টি সম্পর্কে এ কথা সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে যে দুইই সৃষ্ট হয়, জনতার অন্তর্গত কোনো মানুষের দ্বারা। উচ্চতর বর্গের মানুষের মধ্যে থেকেই সৃজনশীল শিল্পী অথবা সাহিত্যিক জন্ম নেয়। তবু এদের সৃষ্টিতেও জনতার হাত আছে। জনতার কাছ থেকেই এরা শিল্প ও সাহিত্যের ভিত্তিস্থানীয় উপকরণ সংগ্রহ করে। এই উপকরণের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাই প্রকৃত প্রগতিশীল আন্দোলনের কাজ। এ বিষয়ে রাহুলের যুক্তি হল এই যে, জীবন্ত ভাষা জনতার কারখানায়ই ঢালাই হয়। জনতার মুখের কথা বাদ দিয়ে যদি সাহিত্য রচনা করা হয় তবে সেই সাহিত্য প্রাণহীন। এ বিষয়ে মতভেদ হওয়ার কথা নয়। লেখক যদি চান তাঁর ভাষা অচেনা হবে না, তাঁর ভাষায় বিদ্যুৎ তরঙ্গ থাকবে তাহলে তাঁকে জনতার মুখের ভাষার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হবে।

হিন্দির বিকাশে রাহুলের এক মাহাত্ম্যপূর্ণ দান হল এই যে, অপভ্রংশ রচিত বৌদ্ধ সিদ্ধ সাহিত্যকে তিনি সুলভ করে দিয়েছিলেন। তিনি একটি প্রবন্ধে লিখেছেন যে, যদি দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে চতুর্দশ শতকের শেষ পর্যন্ত কবিতা প্রবাহকে যুক্ত করা যায়, তাহলে সিদ্ধ ও খণ্ড কবিতা প্রবাহকে একই প্রবাহ বলে মনে করায় কোনো আপত্তি হতে পারে না। এদের যুক্ত করার শৃঙ্খল নাথপন্থের কবিতায় আছে। কিন্তু সিদ্ধরা যে ধরনের কবিতা লিখেছেন, তার প্রতি তাঁদের আলোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। ধর্ম, আচার, দর্শন ইত্যাদি সব বিষয়েই তাঁদের বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। তাঁরা সব ভালো মন্দ প্রথারই মূলোৎপাটন করতে চেয়েছিলেন, যদিও সেখানে মিথ্যা বিশ্বাসের ব্যাপার ছিল, তা তাঁরা কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। বজ্রযানে বিশ্বাসী জনতার ওপর আধিপত্য লাভের জন্য

তাঁরা কবিতার ভাষার সাহায্য নিয়েছিলেন। আদি সিদ্ধ সরহপাদ থেকেই আমরা লক্ষ করি যে, সিদ্ধ হওয়ার জন্য অপভ্রংশ ভাষার কবি হওয়ার আবশ্যকতা ছিল। কবিতার ভাষার সহায়তায় তাঁদের মতবাদ যাতে জনতা বুঝতে পারে সিদ্ধরা তার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু তবু তাঁদের ভয় ছিল যে, তাঁদের প্রচলিত আচার-বিরোধী কার্যকলাপের বিরোধীরা সাধারণ মানুষের মনে তাঁদের বিরুদ্ধে বিতৃষ্ণার ভাব জন্মাতে পারে। তাই একমাত্র যোগ্য মানুষকে তাঁরা তাঁদের কবিতা শোনার সুযোগ দিতেন এবং কবিতার ভাষাও দ্ব্যর্থবোধকভাবে রচিত হত। ফলে তার অর্থ বামাচার ও যোগাচার দুয়েরই কাজে লাগত।

এখানে হিন্দি সাহিত্যের প্রারম্ভিক কাল সম্পর্কে রাহুলের অভিমত উল্লেখ করা যেতে পারে। রামচন্দ্র, শুক্ল, শ্যামসুন্দর দাস, হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী প্রভৃতি হিন্দী সাহিত্যসেবী মনে করেন যে এগারো শতক হল হিন্দি সাহিত্যের প্রারম্ভিক যুগ। অপভ্রংশ হিন্দির সবচেয়ে পুরোনো চিহ্ন পাওয়া যায় তান্ত্রিক ও বৌদ্ধ সাম্প্রদায়িক রচনায়। মুঞ্জ ও ভোজের (১০৫০ সম্বৎ-এর কাছাকাছি) সময় তো পুরোনো হিন্দির প্রচার শুদ্ধ সাহিত্যের কাব্য রচনায় পাওয়া যায়। অতএব হিন্দি সাহিত্যের আদিকাল ১০৫০ সম্বৎ থেকে ১৩৭৫ পর্যন্ত অর্থাৎ ভোজের সময় থেকে হাম্মীরদেবের সময়ের কিছুটা পর পর্যন্ত ধরে নেওয়া যেতে পারে।

কিন্তু রাহুল হিন্দির প্রারম্ভিক কালকে আরো পেছনে ঠেলে দিতে চান। তাঁর মতে হিন্দি সাহিত্যের প্রারম্ভিক যুগ শুরু হয়েছিল ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে। সিদ্ধ সরহপাদের দোহাকোষে রাহুল সুস্পষ্ট ভাবে লিখেছেন যে তালপত্রের উপরে তিব্বতিতে লেখা (খ্রিঃ অষ্টম শতাব্দী) এই দোহাকোষ তিনি কী কঠিন পরিশ্রম করে তিব্বতের এক ঐতিহাসিক বই থেকে ১৯৩৪-এ উদ্ধার করেছিলেন। সিদ্ধ সরহপাদ ছাড়াও শবরপা ও অন্যান্য চৌরাশি সিদ্ধের বাণীও তিনি উদ্ধার করেছিলেন।

রাহুল তাঁর *পুরাতত্ত্ব নিবন্ধাবলী*-তে লিখেছেন, 'রামানন্দ, কবির, নানক, দাদূ প্রভৃতি থেকে রাধাস্বামী দয়াল পর্যন্ত সব সিদ্ধই এই সিদ্ধের টাকশালের টাকা ....নাথপন্থ চৌরাশি সিদ্ধদের থেকেই বেরিয়ে এসেছে। যদিও এখন নাথপন্থ নিরীশ্বরবাদ ছেড়ে ঈশ্বরবাদী হয়ে গেছে। তথাপি আজও তাঁদের বাণীতে নির্বাণ, শূন্যবাদ ও বজ্রযানের বীজ মিলবে। নাথপন্থ চৌরাশি সিদ্ধের উত্তরাধিকারী সিদ্ধ হলে কবিরের সঙ্গে যুক্ত করার কোনো অসুবিধা নেই। কবির স্বয়ং চৌরাশি সিদ্ধকে ভুলে যাননি তা তাঁর দোঁহা থেকে জানা যায়।

"ধরিতী অরু আসমানকে বিচঁ, দোই তুংবড়া অবধ।
ষট দর্শন সংগে পড়্যা, অরু চৌরাশি সিদ্ধ।"

কবীর এখানে চৌরাশি সিদ্ধের বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সিদ্ধদের টাকশালের টাকা ছিলেন না তা বলা চলে না।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

ঐতিহাসিক উপন্যাস

রাহুলের ঐতিহাসিক চেতনা তাঁর সমগ্র রচনা সম্ভারের মধ্যে অন্তর্লীন হয়ে ছিল একথা বললেও অত্যুক্তি হয় না। ধর্ম, দর্শন, যাত্রাবৃত্তান্ত, উপন্যাস, গল্প যা কিছু তিনি লিখেছেন সব কিছুর মধ্যেই তাঁর ইতিহাস চেতনা সংক্রামিত। একটি ঐতিহাসিক আবেগ তাঁর সমগ্র রচনাকে প্রায় আচ্ছন্ন করেছে। এমনকি কথাসাহিত্য, যেখানে ইতিহাসকে অনুক্ত রাখা যেত সেখানেও ইতিহাসের প্রাধান্য। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত ও আলোচিত গ্রন্থ *ভোলগা সে গঙ্গা*তে বিশটি গল্পের মাধ্যমে আদিম যুগে দক্ষিণ এশিয়ার স্তেপ অঞ্চল থেকে আর্যদের ভারতে আগমনের ও বিশ শতক পর্যন্ত সেখানে অবস্থানের কাহিনি বিবৃত। স্তেপ অঞ্চল থেকে আর্যদের অভিযানের কাহিনি রচনার জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক গবেষণার শ্রম তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছিল। *ভোলগা সে গঙ্গা* প্রকাশিত হওয়ার পর কোনো কোনো সমালোচক রাহুলকে এই চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন যে তিনি *ভোলগা সে গঙ্গা*-র কাহিনীর ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ দিন। *ভোলগা সে গঙ্গা*-র দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় তিনি লেখেন যে তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান, ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য পর্যাপ্ত পরিমাণে তাঁর কাছে আছে। তিনি এই বিপুল তথ্য পরিশিষ্ট হিসেবে বইয়ে সংযোজিত করতে চেয়েছিলেন; সময়াভাবের জন্য তা সম্ভব হয়নি। তবে তিনি কয়েকটি গ্রন্থ লিখেছেন, যাতে কিছু কিছু কাহিনির ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক প্রমাণ দিয়েছেন। 'অঙ্গিরা ও সুদাস' কাহিনির জন্য *ঋগ্বৈদিক আর্য*-এ ও সুরেয়া কাহিনির জন্য *আকবর*-এ তথ্য প্রমাণ পাওয়া যাবে। অন্য কিছু কাহিনির তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর অন্য কয়েকটি গ্রন্থে।

অবশ্য একথা ঠিক যে *ভোলগা সে গঙ্গা*-র প্রথম কয়েকটি কাহিনিতে বাস্তব তথ্য প্রমাণের অভাব আছে। তা স্বাভাবিক; কারণ যে সময়ে আর্যরা ভারতের প্রত্যন্ত প্রদেশে পৌঁছোয় সে সময়টা প্রাগৈতিহাসিক। মহাদেবপ্রসাদ সাহু লিখেছেন যে, গ্রন্থের এই পর্যায়ের কাহিনিগুলি যথা, 'নিশা', 'দিবা', 'অমৃতাস্ব', 'পুরুহুত' প্রভৃতি রচনায় রাহুল প্রধানত লুইস মর্গানের *এনসেন্ট, সোসাইটি* এঙ্গেলসের *পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি*, রবার্ট ব্রিফল্টের *দি মাদার্স* প্রভৃতি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ খ্যাতনামা সমাজবিজ্ঞানীদের অনুমোদিত তত্ত্বের ওপরে নির্ভর করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাহুলের স্বকীয়তা মেনে নিতেই হয়।

গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাহিনিগুলি প্রাচীন ঐতিহাসিক যুগের—পুরুধান থেকে প্রবাহন পর্যন্ত কাহিনিগুলিতে রাহুল বেদ, মহাভারত, পুরাণ ও বৌদ্ধভাষ্য অট্‌ঠ কথার সাহায্য নিয়েছেন। তারপর পাঁচশো খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে গুপ্তযুগের প্রাক্কাল অবধি

কাহিনিগুলির মোটামুটি আধার হচ্ছে বৌদ্ধশাস্ত্র। কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র*, অশ্বঘোষের *বুদ্ধচরিত* এবং *সৌন্দরানন্দ* এই কটি গ্রন্থ। তাছাড়া গ্রিক পর্যটকদের ভ্রমণকথা, জয়সওয়ালের *হিন্দু পলিটি* ও অন্যান্য ইতিহাস। তদুপরি প্রায় সমস্ত সংস্কৃত নাটক, উইন্টারনিটজের *ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস*, রিজ ডেভিডস-এর *বৌদ্ধ ভারত* এই পর্যায়ের কাহিনি রচনায় বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছে। এরপর 'সুপর্ণ যৌধেয়' কাহিনিতে গুপ্তযুগের বিবরণ গুপ্তযুগের লেখা থেকে আহৃত হয়েছে। অবশ্য *রঘুবংশ*, *কুমারসম্ভব*, *অভিজ্ঞান শকুন্তলম* ছিল তাঁর গুপ্তযুগের বিবরণের প্রধান উৎস। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের বিবরণও তাঁর কাজে লেগেছে।

পরবর্তী অধ্যায় 'দুর্মুখ' মূলতঃ *হর্ষচরিত*, *কাদম্বরী* এবং হিউয়েন-সাঙ, ইত্-সিঙ-এর বিবরণের ওপর নির্ভরশীল। 'চক্রপাণির' ঐতিহাসিকতার প্রমাণ পাওয়া যায় নৈষধ, খণ্ডনখণ্ড খাদ্য এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত লেখমালায়। তারপর 'নুরদীন' থেকে গ্রন্থের শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ ত্রয়োদশ থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত রাহুল এই যুগের ঐতিহাসিক গ্রন্থের ওপর নির্ভর করেছেন। সন্দেহ নেই, *ভোলগা সে গঙ্গা* লেখার জন্য রাহুল প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছেন। এমন কোনো কথা লেখেননি যা যখন তিনি এই বই লিখছেন তখন অনৈতিহাসিক বলে গণ্য করা হত। *ভোলগা সে গঙ্গা*-র বিশেষ সংস্করণের ভূমিকায় রাহুল লিখেছেন যে *মানবসমাজ* গ্রন্থে তাঁর মানবসমাজের প্রগতির ধারার বিশ্লেষণাত্মক সিদ্ধান্ত যাতে সাধারণ মানুষ অনায়াসে বুঝতে পারে সেজন্য তিনি *ভোলগা সে গঙ্গা* লিখেছিলেন। ভারতীয় পাঠকদের সুবিধার জন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি ইউরোপীয় জ্ঞাতিগোষ্ঠীকে বেছে নিয়েছিলেন।

মানবসমাজের যুগ থেকে যুগান্তরে প্রগতির ইতিহাসকে এক একটি কাহিনির মধ্যে চিত্রায়িত করেছেন। তাছাড়া *কনৈলা কী কথা* মানবসমাজের প্রগতির একই ছক অনুসরণ করে। উত্তরপ্রদেশের জন-জীবনের ক্রম-বিবর্তনের ধারার ইতিহাস তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন *কনৈলা কী কথা*-য়। *কনৈলা কী কথা*-কে তাই *ভোলগা সে গঙ্গা*-র পরিশিষ্ট বললে হয়তো অন্যায় হবে না। কেন তিনি স্বল্পপরিসরের মধ্যে এই বিবর্তনের ধারার ইতিহাস লিখেছিলেন তার কারণ সম্ভবত এই যে, *ভোলগা সে গঙ্গা* লেখার পর ভারতের সব হিন্দিভাষী অঞ্চল থেকে যে সব বিষয় নিয়ে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল তারই উত্তর হিসেবে তিনি *কনৈলা কী কথা* লিখেছিলেন।

ভোলগা সে গঙ্গা বইয়ে সবশুদ্ধ বিশটি গল্পে খ্রিস্টপূর্ব ৬০০০ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত প্রায় আট হাজার বছরের মানবেতিহাস চিত্রিত হয়েছে। এই ইতিহাস লেখার জন্য তিনি ইন্দো-ইউরোপীয় মানবগোষ্ঠীকে বেছে নিয়েছিলেন। এরা ভোলগা উপত্যকা পামির প্রদেশ ও বক্ষু উপত্যকা হয়ে উত্তর পশ্চিম ভারতে পৌঁছোয়। লেখক যে পুরোপুরি ইন্দো-ইউরোপীয়-ভাষীদের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন, তাও নয়। পঞ্চম গল্পের *পুরুধাম* ও ষষ্ঠ গল্পের অঙ্গিরার সঙ্গে অনার্য সিন্ধু উপত্যকাবাসীদের মধ্যে সংঘর্ষের কথাও লিখেছেন। শুধু তাই নয় রাহুল তাঁর একটি গল্পের নায়ক নাগদত্তকে পর্শুপুরী

(ইরান) থেকে এ্যাথেন্সে পাঠিয়েছিলেন এবং দার্শনিক এ্যারিস্টেটলের সঙ্গে সাক্ষাৎও করিয়ে দিয়েছিলেন।

ভোলগা সে গঙ্গা-র প্রথম গল্প 'নিশা' শুরু হয় খ্রিস্টপূর্ব ৬০০০-এর কাছাকাছি সময়ে। তখনও ইন্দো-ইউরোপীয় মনুষ্যগোষ্ঠী কৃষিকার্যের যুগে পৌঁছোয়নি। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে মানবসমাজের বিকাশের চিত্রণের জন্য তিনি ইন্দো-ইউরোপীয়দেরই বেছে নিলেন কেন? তিনি তো মিশর, মেসোপোটেমিয়ার অথবা সিন্ধু সভ্যতার মানুষের বিকাশের ক্রমের বর্ণনাও করতে পারতেন? কিন্তু রাহুল নিজেই তার উত্তর দিয়েছেন। তা করলে লেখক ও পাঠকের—দুয়ের পক্ষেই বিষয়টা কঠিনতর হত। ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির বিকাশক্রম বর্ণনা করার মতো প্রচুর প্রত্নতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক উপাদান লেখকের কাছে ছিল। আর ভারতীয় পাঠকের পক্ষেও তা অনায়াসবোধ্য।

ভোলগা সে গঙ্গা-র প্রথম দুটি গল্পের নাম 'নিশা' ও 'দিবা'। নাম থেকেই বোঝা যায় যে গল্প দুটি নায়িকা প্রধান। যুগটি মাতৃতান্ত্রিক। দুটি গল্পই ভোলগা-তটের। প্রথম গল্পের পরিবারের কর্ত্রী নিশা। পর্বত গুহাবাসী শিকারি পরিবার। বয়স অন্তত পঞ্চাশ। স্বামী, পুত্র, ভাই প্রত্যেকের সঙ্গে তার যৌন সম্পর্ক। অবশ্য সেই যুগে এই ধরনের সম্পর্কের কোনো মানেই ছিল না। রাহুলের ভাষায় সেই যুগে রাজ্যভার ছিল মার হাতে। কিন্তু এই রাজ্য অন্যায় ও অসাম্যের রাজ্য ছিল না। সব পুরুষের ওপর ওর সমান ও প্রথম অধিকার ছিল। এই পরিস্থিতিতে মা ও মেয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল। বর্তমান যুগে অদ্ভুত মনে হবে। এই দ্বন্দ্বের অসামান্য চিত্রণ করেছেন রাহুল। মা ও মেয়ের মধ্যে ঈর্ষা ও দ্বন্দ্ব স্বাভাবিক ছিল। তারই পরিণতি দুজনের মধ্যে সংঘর্ষ ও ভোলগার গর্ভে নিমজ্জন।

দ্বিতীয় গল্পের মধ্যে ভোলগা-তটবাসী নিশা উপজাতি ও উষা উপজাতির মধ্যে সংঘর্ষের কাহিনি চিত্রিত। সময়—খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০০। দিবা নিশা উপজাতির নায়িকা। সমাজ এখনো মাতৃতান্ত্রিক। কিন্তু এখন আর একজন মাতার শাসন নয়। মাতাদের এক সমিতির হাতে শাসনভার। প্রথম গল্পের মতো দ্বিতীয় গল্পেও অগম্যাগমন স্বীকৃত। এই গল্পে তিনি প্রথমবার অগ্নিপূজা ও নগ্ন হয়ে সুরাপানের চিত্র এঁকেছেন। অগ্নিতে মাংস, মধু, ফল ঢালা হচ্ছে। ফলমূল ও শিকারের প্রাচুর্য। তাই পূর্ণিমার রাত্রিতে অগ্নিদেবকে পূজা করে কৃতজ্ঞতা জানানো হচ্ছে। সম্ভবত কালান্তরে যা যজ্ঞ নামে পরিচিত হয়, এই তার আরম্ভ।

তৃতীয় গল্প 'অমৃতাশ্ব'-এর কাল খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০। স্থান—মধ্য-এশিয়ার পামির প্রদেশ। পরে এই স্থান উত্তর কুরু নামে পরিচিত হয়। এই গল্প এক আর্য উপজাতির। পশুপালন ছিল এই জাতির জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপায়।

গল্পের নায়ক কুরুকুলের অমৃতাশ্ব নিপুণ ঘোড়সওয়ার। এই সময়ে অশ্ব মাংস রান্না করা হত। শুধু ধনই নয়, কন্যাও লুণ্ঠিত হত। সোমরস (রাহুলের মতে—ভাঙ) পান করা হত। কুরুরা পুরুদের পরাজিত করে শিশু ও পুরুষদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়। শুধু পুরুনারীদের তারা সঙ্গে নিয়ে যায়।

চতুর্থ গল্প 'পুরুত'-এ লক্ষ করা যায় যে, আর্য জাতি বক্ষু উপত্যকা অর্থাৎ তাজিকিস্থান পৌঁছে গেছে। কাল—খ্রিঃপূঃ ২৫০০। বক্ষুর দক্ষিণ তীরে পৌরব পুরুহুতের সঙ্গে মাদ্রী রোচনার দেখা হয়। সময়টা নব পাষাণ বিপ্লবের যুগ অর্থাৎ কৃষিকার্যের যুগ। এই যুগের জীবনচর্যাকে রোচনার বাবা স্বীকার করে নিতে পারেননি। তিনি দুঃখ করে বলেছেন, তামা ও খেত দেখে আমার বুক জ্বলে যায়। যখন থেকে এইসব কিছু 'বক্ষু নদীর তীরে এসেছে, তখন থেকেই চারিদিক পাপ ও অধর্মে ভরে গেছে। দেবতাও মুখ ফিরিয়েছেন। ....কৃষিকার্য চলছে। মানুষ খেতে কাজ করছে, গম, ধান, যব বপন করা হচ্ছে। আজ পর্যন্ত কেউ এসব কথা শুনেছে? আমাদের পূর্বপুরুষেরা কেউ ধরিত্রীমাতার বুক চিরে খানখান করেনি, দেবীর অপমান করেনি। এও শোনা যাচ্ছে যে, মেয়েরা কানে ও গলায় হলুদ ও সাদা (সোনা ও রূপার) অলংকার পরছে।'

এই গল্পের মূল কথা হল, দক্ষিণ মদ্র ও পর্শুদের দমন করার জন্য পুরুহুতকে উত্তর মদ্র ও পুরুদের সম্মিলিত নেতা নির্বাচিত করা হয় এবং তাঁকে ইন্দ্র উপাধি দেওয়া হয়। ইন্দ্র পুরুহুত, দক্ষিণ মদ্র ও পর্শুদের পরাজিত করে। কিছু মদ্র ও পর্শু স্ত্রী-পুরুষ বক্ষু উপত্যকা ছেড়ে পশ্চিমদিকে চলে যায়। তাদের সন্তানরা পরে ইরানের পর্শু (পার্সিয়ান) ও মদ্র (মিডিয়ন) নামে পরিচিত হয়। সেই থেকে ইরানিরা ইন্দ্রকে তাদের সবচেয়ে বড়ো শত্রু বলে মনে করত।

পরের দুটি গল্প—পুরুধান ও অঙ্গিরার। এই দুটি গল্পে দেবাসুরের সংগ্রাম অর্থাৎ নবাগত আর্য ও সিন্ধু সভ্যতার মানুষের মধ্যে সংগ্রাম চিত্রিত। প্রথম গল্পে অসুরদের সম্পর্কে তিনি যা লিখেছেন, তার ভিত্তি হরপ্পা সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ। সিন্ধু উপত্যকার মানুষদের পাকা ইটের বাড়ি, তাদের অনেক সুন্দর শহর। তারা সুতিবস্ত্র পরত। দাসপ্রথার প্রচলন ছিল তাদের মধ্যে। শাসন ছিল রাজা ও সামন্তদের। পুরুধান এই সিন্ধু উপত্যকার অসুরদের নগরী পুষ্কলাবতী জয় করেন।

গল্পে ইন্দ্রোৎসবের চমৎকার বর্ণনা করা হয়েছে। এইদিন সবচেয়ে হৃষ্টপুষ্ট অশ্বের মাংস খাওয়া হত ....মধু ক্ষীর মিশ্রিত সোমরসের (ভাঙের) নদী বয়ে যেত। যুবক-যুবতী উৎসবের দিন সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যেত।

অঙ্গিরা গল্পের স্থান তক্ষশীলা (গান্ধার)। কাল—খ্রিঃ পূঃ ১৮০০। ঋষি অঙ্গিরা আর্য সংস্কৃতির সংরক্ষক। তাঁর বক্তব্য হল ঃ যা কিছু নবীন তা ত্যাজ্য, যা কিছু পুরোনো তা গ্রাহ্য—একথা ভুল। বক্ষুতটের প্রাচীন আর্যদের গ্রাহ্য অনেক কিছু আমরা ত্যাগ করেছি। কিন্তু কিছু কিছু জিনিস আছে যা বিষবৎ ত্যাজ্য; যেমন—অসুরদের লিঙ্গপূজা, জাতিবিভাগ, শাসনব্যবস্থা, পুরোহিত-প্রথা। এক্ষেত্রে আমাদের পুরোনো প্রথাকেই মেনে নিতে হবে। আর্যদের অসুরদের থেকে আলাদা রাখার জন্য অঙ্গিরার প্রিয় শিষ্য বরুণ একটি নতুন রাজ্য স্থাপন করেন।

এরপর দিবোদাস-পুত্র সুদাসের গল্প। স্থান—কুরু পঞ্চাল অর্থাৎ পশ্চিম উত্তর প্রদেশ। কাল-খ্রিঃ পূঃ ১৫০০। রাহুল লিখছেন যে, এসময়েই পুরাতনতম ঋষি বশিষ্ঠ,

বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ ঋগ্বেদের মন্ত্র রচনা করেছিলেন। এই সময়েই আর্য-পুরোহিতের সহায়তায় কুরু-পঞ্চালের আর্য সামন্তরা জনতার অধিকারের ওপর শেষ জবরদস্ত আঘাত করেছিল। এরপর রাহুল *ঋগ্বেদিক আর্য* লেখেন এবং *দিবোদাস* নামে ছোট উপন্যাস লেখেন।

এই গল্পে সুদাস ও অপালার প্রেমের কাহিনি বিবৃত। মাতার সঙ্গে দেখা করে ফিরে আসবেন অপালার কাছে এই প্রতিজ্ঞা করে সুদাস পাঞ্চাল যান। কিন্তু যখন তিনি ফিরে আসেন, তখন অপালা আর বেঁচে ছিলেন না।

অষ্টম কাহিনীর ভিত্তি ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদ। স্থান—পঞ্চাল (উত্তরপ্রদেশ), কাল—খ্রিঃ পূঃ ৭০০। পাত্র—প্রবাহন। জেবলী প্রবাহনের স্ত্রী, লোপা তাঁর মামাতো বোন। ব্রহ্মবাদিনী গার্গী লোপার পিসিমা। প্রবাহন গার্গ্যার কাছে বেদাধ্যয়নের জন্য এসেছিলেন। পরে তিনি পঞ্চালের রাজা হন। রানি হল লোপা। রাহুল প্রবাহনকে ব্রহ্মবাদ ও পুনর্জন্মবাদের উদ্ভাবক হিসেবে চিত্রিত করেছেন। প্রবাহন লোপাকে বলেছিলেন যে, ব্রহ্মের কল্পনা তিনি এমনভাবে করেছেন যে তাঁকে দেখার প্রশ্নই উঠবে না। দেবতারা সাকার; কিন্তু তাঁর কল্পিত ব্রহ্ম নিরাকার। নিরাকারকে দেখার প্রশ্নই ওঠে না। রাজশক্তিকে হাতে রাখার জন্যই এর প্রয়োজন। ব্রহ্মের দর্শন পেতে হলে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় দ্বারাই সেটা সম্ভব এবং সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় লাভের জন্য চাই সাধনা। এই সাধনা এমন কঠিন করা হয়েছে যে কারো পক্ষেই এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব নয়। রাজার ক্ষমতা, ব্রাহ্মণের ক্ষমতা দৃঢ় করার জন্য এর প্রয়োজন। প্রজারা সচেতন না হলে এই ফাঁদ থেকে তাদের কেউ বাঁচাতে পারবে না।

নবম গল্পের পাত্র বন্ধুল মল্ল। কাল—খ্রিঃ পূঃ ৪৯০। এই গল্পের উপাদান বৌদ্ধগ্রন্থ থেকে আহৃত। আহৃত উপাদান এত বেশি যে তা ব্যবহার করে তিনি *সিংহ সেনাপতি* নামে উপন্যাস লিখেছিলেন। রাহুলের মতে বন্ধুল মল্লের যুগে সামাজিক বৈষম্য বেড়ে গিয়েছিল। ধনী ব্যবসায়ীরা সমাজে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। পরলোকের পথনির্দেশ করার, নরক থেকে উদ্ধার করার অনেক পথপ্রদর্শক ইতিমধ্যে চোখে পড়ছিল। কিন্তু গ্রামে গ্রামে দাসত্বের নরক থাকা সত্ত্বেও সেদিকে কারো চোখ পড়ছিল না। এই গল্পে *বৌদ্ধচর্যা*-র লেখক ত্রিপিটকাচার্য রাহুল বুদ্ধকেও ছেড়ে কথা বলেননি। তিনি লিখেছেন যে, গৌতম বুদ্ধের আত্মবাদে প্রবাহনের আবিষ্কৃত অস্ত্র পুনর্জন্মের ব্যবহার করা হয়েছে। যদি গৌতম পুরোপুরি জড়বাদ প্রচার করতেন তাহলে নিশ্চয় শ্রাবস্তী, সাকেত, কৌশাম্বী, রাজগৃহের শ্রেষ্ঠীরা তাদের টাকার থলি বুদ্ধের পায়ে ঢেলে দিত না এবং ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় সামন্ত ও রাজারা তাঁর পায়ে মাথা নোয়ানোর জন্য হুড়োহুড়ি করত না।

দশম গল্পের স্থান—তক্ষশীলা, কাল—খ্রিঃ পূঃ ৩৩৫। পাত্র—নাগদত্ত। অর্থশাস্ত্র রচয়িতা বিষ্ণুগুপ্ত চাণক্য তাঁর সহপাঠী। নাগদত্ত গণতন্ত্রের সমর্থক; বিষ্ণুগুপ্ত রাজতন্ত্রের। দুজনের মধ্যে এ নিয়ে অনেক তর্ক - বিতর্কের পর দুজনে আলাদা পথে চলে যায়।

নাগদত্ত পর্শুপুরীর (ইরান) সম্রাটের ভগ্নীর সফল চিকিৎসা করে যবনদাসী সোফিয়াকে লাভ করে। পর্শুপুরীর রাজবৈভব দেখে গণরাজ্য সমর্থক নাগদত্ত সোফিয়াকে বলে, 'মাটি থেকে যারা সোনা তৈরি করে তারা ক্ষুধার্ত ও নগ্ন থাকে; আর সোনাকে যারা মাটিতে পরিণত করে তারা আরামে থাকে। আমি তিনবার শাহানশাহের সামনে গেছি। প্রত্যেক বারই ফেরার সময় আমার মাথায় যন্ত্রণা হয়েছে। পর্শুপুরী আমার ভালো লাগছে না। আমি এখান থেকে শিগগিরই চলে যেতে চাই।'

নাগদত্ত সোফিয়াকে নিয়ে ম্যাসিদোনিয়ার শাসক ফিলিপের দরবারে পৌঁছোন এবং এ্যারিস্টটলের সঙ্গে দেখা করেন। এ্যারিস্টটলের রাজতন্ত্রের সমর্থন নাগদত্ত মেনে নিতে পারেননি। কিন্তু এ্যারিস্টটলের যে কথা তাঁর অত্যন্ত সারগর্ভ বলে মনে হয়েছিল তা হল, সত্যের কষ্টিপাথর মস্তিষ্ক নয়, জাগতিক পদার্থ, প্রকৃতি। তিনি প্রয়োগ অভিজ্ঞতাকে অতি উচ্চস্থান দিয়েছিলেন। নাগদত্তের আপশোশ ছিল যে, ভারতীয় দার্শনিকেরা দার্শনিক সত্যের উদ্ভাবন করতেন মন থেকে।

সমুদ্রে জাহাজ ডুবির ফলে নাগদত্ত ও সোফিয়ার জল সমাধি হয়। কিন্তু তার আগেই নাগদত্ত এই ভবিষদ্বাণী করেছিলেন যে সিন্ধুতটে গ্রিক ও হিন্দু রাজাদের অবশ্যই দেখা হবে। রাহুলের এই কাহিনির সময়কাল ৩৩৫ খ্রিঃ পূঃ। আলেকজান্ডার ভাবতে এসেছিলেন ৩২৬ খ্রিঃ পূর্বাব্দে।

একাদশতম গল্পের কাল—খ্রিঃ পূঃ ৫০০ স্থান—সাকেত, নায়িকা—প্রভা। যবন কুলের প্রভা ও মহাকবি অশ্বঘোষের প্রেমের কাহিনি এতে বিবৃত। এই কাহিনিকে *ভোলগা সে গঙ্গা*-র শ্রেষ্ঠ কাহিনি বলে মনে করা হয়। রাহুল লিখেছেন যে, *ভোলগা সে গঙ্গা*-র এটিই শ্রেষ্ঠ গল্প, একথা শুনে শুনে আমারও এই ধারণা হয়ে যায়। নয়তো নাগদত্ত, প্রভা ও সুরেইয়ার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই।

বুদ্ধচরিত, *সৌন্দরানন্দ* মহাকাব্য ও *সারিপুত্তা প্রকরণ* নাটক যিনি রচনা করেছিলেন তিনি অযোধ্যানিবাসী অশ্বঘোষ। বজ্রসূচি নামে আর একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন অশ্বঘোষ। বর্ণব্যবস্থার সমর্থকদের সূচের মতো বিদ্ধ করেছিল এই বই। এই গ্রন্থের উপর নির্ভর করে রাহুল অশ্বঘোষের মুখ দিয়ে যা বলান তা পুরোপুরি তাঁর নিজের কথা। অশ্বঘোষ বলেছেন, 'আমার ব্রাহ্মণ পাষণ্ডদের ওপর অপার ঘৃণা। ঘৃণায় আমার সারা দেহ জ্বলে যায়। একদিকে ওরা বলে যে, ওরা বেদশাস্ত্র মানে। আমি অনেক পরিশ্রম করে ও সশ্রদ্ধভাবে সব শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি। কিন্তু ওর কী মানে তা তো আমার মাথায় আসছে না। হয়তো ওরা কেবল নিজেদের স্বার্থই মানে। যখনই ব্রাহ্মণদের পুরোনো ঋষির বচন উদ্ধার করে দেখিয়েছে, তখনই তারা বলেছে আজকাল এই ব্যবস্থা নেই। পুরোনো বেদের মর্যাদা ভাঙলেই তো নতুন ব্যবস্থা চলতে পারে? এরই নাম কাপুরুষতা ও স্বার্থপরতা। হৃষ্টপুষ্ট গো-বৎসের মাংস ও প্রচুর দক্ষিণা পেলেই এরা তাদের আশ্রয়দাতা রাজা ও সামন্তদের প্রসন্ন করার জন্য সব কিছু করতে প্রস্তুত ছিল। যে ধর্মে মানুষের হৃদয়ের জাগরণ হয় না, যে ধর্মে মানুষের স্থান নির্ধারিত অর্থ ও শক্তির নিরিখে,

সেই ধর্মকে কলঙ্ক বলে মনে করা যেতে পারে। জগৎ পরিবর্তিত হচ্ছে, ব্রাহ্মণদের পুরাণ থেকে আজ পর্যন্ত অনেক গ্রন্থে তাদের আচার-অনুষ্ঠানের কথা পড়ে, তাতে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। কিন্তু ব্রাহ্মণদের সঙ্গে কথা বলুন, দেখবেন এঁরা বলবেন—সব সনাতন, সব স্থির। এই সবই জড়তা.... কিন্তু আজ আমি জানি যে জ্ঞান ব্রাহ্মণদের শ্রুতি, তাঁদের তালপত্রের অথবা ভূর্জপত্রের পুঁথির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।'

এই গল্পে যবন ও ভারতীয়দের মধ্যে যে আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মিশ্রণ ঘটেছিল, তা চোখে পড়ে। এই গল্পের রচনাশৈলীও অত্যন্ত প্রভাবশালী।

দ্বাদশতম গল্পের স্থান—অবন্তী। কাল—৪২০ খ্রিস্টাব্দ, পাত্র—সুপর্ণ যৌধেয়। এই কাহিনি গুপ্তযুগের। সুপর্ণ যৌধেয়কুলে জন্মগ্রহণ করেন। বেদবিদ্যা আয়ত্ত করে সুপর্ণ গুপ্তসাম্রাজ্যের অধীনতা থেকে যৌধেয় ভূমিকে উদ্ধার করার চেষ্টা করেন। এই যৌধেয় ভূমি শতদ্রু ও যমুনা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল বা হিমালয় থেকে মরুভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

এই গল্পে সুপর্ণ স্বয়ং নিজের কথা বলছেন। এই কাহিনিতে সুপর্ণের মুখ দিয়ে এমন অনেক কথা রাহুল বলিয়েছেন যা বিতর্কিত। সুপর্ণ উজ্জয়িনীতে গিয়ে কালিদাসের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁর মুখের উপরেই তাঁকে গুপ্তদের চাটুকার বলেন। সুপর্ণের মতে নন্দ, মৌর্য, যবন, শক ও হুনেরা যে পাপ করেনি, তার অনেক বেশি পাপ করেছে গুপ্তবংশ। ভারতবর্ষ থেকে এই বংশ গণরাজ্যের নাম মুছে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত রাহুল সুপর্ণকে বৌদ্ধ দার্শনিক দিঙ্‌নাগের শিষ্য বানিয়ে দেন। দিঙ্‌নাগের আশীর্বাদ নিয়ে সুপর্ণ প্রতিজ্ঞা করেন, 'হয় আমি আমার যৌধেয় ভূমিকে উদ্ধার করব নয়তো আমি বালিতে পদচিহ্নের মতো মিলিয়ে যাব।'

ত্রয়োদশতম গল্পের নায়ক—দুর্মুখ। কাল—৬৩০ খ্রিস্টাব্দ। রাজা হর্ষ ও কবি বানভট্টের চরিত্রকে একেবারে নতুনভাবে দেখা হয়েছে এই গল্পে। এই দুটি চরিত্রের নতুন ব্যাখ্যার তথ্য আহৃত হয়েছে বাণের *কাদম্বরী* ও *হর্ষচরিত* এবং হর্ষ লিখেছেন বলে প্রচারিত *নাগনন্দ*, *রত্নাবলী* ও *প্রিয়দর্শিকা* নাটক থেকে। এই গল্পে বৌদ্ধ দার্শনিক ধর্মকীর্তিরও দর্শন মেলে। দুমুর্খ ধর্মকীর্তিকেও ছেড়ে কথা বলেননি। তিনি ধর্মকীর্তিকে বলেছিলেন যে, আচার্য আপনার অস্ত্র তীক্ষ্ণ হলেও এত বেশি সূক্ষ্ম যে লোকের নজরেই পড়বে না। রাজার বিরুদ্ধে কঠিনতর শব্দ প্রয়োগ করেন দুর্মুখ। 'যতদিন রাজা থাকবে, যতদিন ধর্ম ও তার দানপূণ্যে জীবনধারণকারী ব্রাহ্মণ শ্রমণেরা থাকবে, ততদিন পৃথিবী স্বর্গ হতে পারবে না।' দুর্মুখের এই বাক্য দিয়েই গল্প শেষ করেছেন রাহুল।

চতুর্দশতম কাহিনীর স্থান—কনৌজ ; কাল—১২০০ খ্রিস্টাব্দ। পাত্র—চক্রপাণি। এই গল্পে গাঢ়োয়ার সম্রাট জয়চন্দ্রের বিলাসিতা ও পৃথ্বীরাজের প্রতি তার শত্রুতা চিত্রিত। জয়চন্দ্রের দরবারে কবি শ্রীহর্ষের *নৈষধীয়চরিত* ও *খণ্ডনখণ্ডখাদ্য* থেকে এই গল্পের উপাদান আহরণ করেছেন রাহুল।

সম্ভবত গল্পের নায়ক বৈদ্যরাজ চক্রপাণি রাহুলের এক পূর্বপুরুষ। রাহুল তাঁর *মেরী জীবনযাত্রা*-র (১) পরিশিষ্টে লিখেছেন, 'চক্রপাণি (১২১১ খ্রিস্টাব্দ) মলাঁও সাংকৃত্যবংশের

অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। চক্রপাণি সম্পর্কে অনেক অদ্ভুত গল্প প্রচলিত আছে। গাঢ়োয়ার রাজবংশের অন্তিম সময়ে তিনি ছিলেন।'

গল্পের শেষে জয়চন্দ্রের পুত্র হরিশচন্দ্র তুর্কিদের সঙ্গে যুদ্ধে আহত হন। চক্রপাণি তাঁর চিকিৎসাই শুধু নয়, তাঁর পথনির্দেশও করেন। সাংকৃতাগোত্রীয় চক্রপাণির স্বপ্ন ছিল চণ্ডাল ও ব্রাহ্মণের মধ্যে ভেদ মিটিয়ে দেওয়া। আলবহন, মাধব (মাহব), গাগা (গার্গ), মোগে (য়োগে) ও সলখু নামে যেসব সেনানায়ক তুর্কিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল, তারাও সাংকৃত্যাগোত্রীয়।

পঞ্চদশতম গল্পের স্থান—হিলসা (পাটনা), কাল—১৩০০ খ্রিঃ। পাত্র—বাবা নূরদীন। গল্পের শুরুতেই আলাউদ্দীন খিলজী বলেছেন, 'সেই সময় চলে গেছে যখন আমরা হিন্দুস্থানকে দুধেল গাই ছাড়া আর কিছু মনে করতাম না। আমি হিন্দুস্থানের স্বতন্ত্র শাসক ....এখন তো আমাদের এই ঘরেই থাকতে হবে। তাই এখানকার লোক যাতে সুখে আর শান্তিতে থাকে, তার ব্যবস্থা করতে হবে।'

মগধের এক বড় গ্রাম হিলসাতে (পাটনা) থাকতেন বাবা নূরদীন। রাহুল বাবা নূরদীনের চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতির ভাব বৃদ্ধি করার জন্য।

ষোড়শতম গল্পের সময়—আকবরের রাজত্বকাল। এতে হিন্দু-মুসলমানের একতা, এমনকি তাদের রক্তের মিশ্রণের কথাও আছে। আবুল ফজলের মেয়ে সুরৈইয়া ও টোডরমলের ছেলে কমল সুরাট থেকে সমুদ্রযাত্রা করে ফ্লোরেন্স ও ভেনিস পর্যন্ত চলে যায়। কিন্তু ফেরার পথে জলদস্যুদের আক্রমণে তাদের জাহাজ ডুবে যায়। দুজনেরই জলে ডুবে মৃত্যু হয়। রাহুল *আকবর* নামে যে গ্রন্থ লেখেন তা সুরেইয়া গল্পের ওপর আলোকপাত করে।

সপ্তদশতম কাহিনীর কাল—১৮০০ খ্রিস্টাব্দ। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বকাল। নায়ক—রেখাভগত। এই গল্পে কোম্পানির অফিসারদের লুঠতরাজ ও অত্যাচারের বর্ণনা আছে। রেখাভগতের স্ত্রীকে অপমান করা হয়েছিল; সে তার প্রতিশোধ নিয়েছিল জমিদার ও তার দেওয়ানকে হত্যা করে। গল্পের শেষে রাহুল লিখেছেন, 'কসাই কর্নওয়ালিস অনেক রেখাভগতকে জন্ম দিয়েছে।'

অষ্টাদশতম গল্প—'মঙ্গল সিংহ'; ১৮৫৭-র স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত। মঙ্গল সিং রামনগরের রাজা চেত সিংহের প্রপৌত্র। সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়ে তিনি চেত সিংহের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা প্রকাশ করেননি। তিনি ইংলন্ডে গিয়ে মার্কস ও এঙ্গেলস-এর সঙ্গে দেখা করেন। ভারতে ফিরে এসে তিনি স্বাধীনতার যুদ্ধে যোগ দিয়ে শহীদ হন।

উনবিংশতিতম গল্প—'সফদর'-এর পটভূমিকা ১৯২২-এর রাজনৈতিক পরিস্থিতি। ১৯২২-এ রাহুল ছয়মাস ছাপরা জেলে কাটিয়েছিলেন, গয়া কংগ্রেসে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং গান্ধিজির সংস্পর্শেও এসেছিলেন। 'সফদর' গল্পে রাহুল গান্ধিবাদের

তিক্ত সমালোচনা করেছেন। ব্যারিস্টার সফদর বলেছেন, 'গান্ধির সব কথা ও মত আমি বৈপ্লবিক বলে মনে করি না, শংকর। যখন তিনি সাধারণ মানুষের স্রোতকে ক্রান্তিকারী স্রোত হিসেবে আবাহন করেন তখন তাঁকে আমি বিপ্লবী বলে মনে করি। কিন্তু তাঁর ধর্মের দোহাই, বিশেষ করে খিলাফতকে আমি সরাসরি বিপ্লববিরোধী চাল বলে মনে করি। যন্ত্রকে ছেড়ে পেছনের দিকে চলে যাওয়ার কথাও একই ধরনের ব্যাপার। শিক্ষাপ্রণালী দোষদুষ্ট। কিন্তু আজকের স্কুলে-কলেজে আমাদের বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় হয়। বিজ্ঞানীকে বাদ দিলে আজ মানুষ আর মানুষ থাকে না। আমাদের যে মুক্তি আসবে তাতে বিজ্ঞানের হাত থাকবে। প্রতিদিন যে মানবজাতি বেড়ে চলেছে, তার সমৃদ্ধি নির্ভর করছে বিজ্ঞানের উপর। তাই বিজ্ঞানকে ছেড়ে পিছে হঠার অর্থ আত্মহত্যা। স্কুল-কলেজ বন্ধ করে চারপাশে পাঠশালা কায়েম করার অর্থ অন্ধকার যুগের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া।'

বিংশতিতম গল্প—'সুমের' *ভোলগা সে গঙ্গা*-র শেষ কাহিনি। কাল—১৯৪২। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছিল। রাহুল তখন হাজারিবাগ জেলে বসে *ভোলগা সে গঙ্গা* লিখছিলেন। সুমের লেখাপড়া শিখেছে। কিন্তু সে সাধারণ কামারের ছেলে। সে বলছে, 'আমি হরিজন নামকে ঘৃণা করি। আমি '*হরিজন*' কাগজকেও পুরানোপন্থী কাগজ বলে মনে করি। হরিজন এমন কাগজ যা ভারতকে অন্ধকার যুগের দিকে টেনে নিয়ে যায়। গান্ধিজি আমাদের জাতির শত্রু। ডঃ আম্বেদকর ভুক্তভোগী। আমাকেও প্রথম ও দ্বিতীয় বছর হিন্দু ছাত্ররা হোস্টেলে থাকতে দেয়নি। তথাপি আমি আম্বেদকরের রাস্তা ও অচ্ছুতদের সম্পর্কে কংগ্রেসি নেতাদের পথের মধ্যে পার্থক্য খুঁজে পাই না।'

এই সময় পাকিস্তানের জোরালো দাবি শুরু হয়ে গিয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টি এই দাবিকে যুক্তিসংগত বলে মেনে নিয়েছিল। মনে হয় রাহুলেরও তাই অভিমত ছিল। সুমের বলেছেন, পাকিস্তানের সিদ্ধান্ত হিন্দুরা নেবে না। পাকিস্তানের সিদ্ধান্ত নেবে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের জনতা।

ভোলগা সে গঙ্গা রাহুলের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যকৃতি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এই বইয়ের গল্পগুলি রাহুলের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের গভীর অধ্যয়নের ফলশ্রুতি। রাহুল আরো অনেক গল্প ও উপন্যাস লিখেছেন। কিন্তু *ভোলগা সে গঙ্গা*-য় হাজার বছর ধরে ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির সমগ্র দক্ষিণ এশীয় স্তেপ অঞ্চল থেকে ভারতে অভিপ্রয়াণ ও তাদের সভ্যতা সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের কাহিনি বিশটি গল্পের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। আর্যদের এই অভিপ্রয়াণের মধ্যে রাহুল নিজেকেও দেখেছেন বলে মনে হয়। তাঁর বর্ণনায় এই আট হাজার বছরের ইতিহাস সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে পাঠকের চোখের সামনে ফুটে ওঠে। প্রায় সব গল্পই রচিত হয়েছে মার্কসের মানবেতিহাসের বস্তুবাদী ছক অনুসরণ করে। তাছাড়া কিছু গল্পে তিনি সামন্ততন্ত্রের প্রবর্তন ও ভাঙন সম্পর্কে যে মতবাদ লিপিবদ্ধ করেছেন তা ভুল বলে গোঁড়া মার্কসবাদীদের পক্ষেও মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু রাহুল তাঁর সব কাজই তড়িঘড়ি শেষ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর কোনো সময় ছিল না। *ভোলগা সে গঙ্গা*-র বিশটি গল্প লিখেছিলেন

বিশ দিনে। যদি তাঁর রচনায় কোনো ভুল থেকে যায়, পরে তা সংশোধন করে দেখার দায়িত্ব সম্পাদকের। কেন তাঁর সময় ছিল না, সে কথায় আমরা পরে আসছি।

রাহুল তাঁর উপন্যাসে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ছাড়াও গণরাজ্যের আদর্শকে তুলে ধরেছেন। ভারতে গণরাজ্যের অস্তিত্ব খ্রিঃ পূঃ ষষ্ঠ শতক থেকেই। লিচ্ছবি, শাক্য ও মল্ল এবং আরো অনেক উপজাতির মধ্যে তা লক্ষ করা যায়। এদের মধ্যে কয়েকটি গণরাজ্য, বিশেষ করে লিচ্ছবিরা অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। প্রাচীন ভারতে এই রাজ্যের বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল। এইসব রাজ্যে বিত্তশালী অভিজাতদের শাসন (oligarchy) অথবা প্রজাতান্ত্রিক শাসন প্রচলিত ছিল। প্রাচীন সাহিত্যে, মুদ্রায় ও লেখ-এ গণরাজ্যের উল্লেখ আছে। এইসব রাজ্য বিশেষভাবে গ্রিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং তাদের শাসনতন্ত্র সম্পর্কেও গ্রিকরা বিশেষভাবে অবহিত ছিলেন।

দুর্ভাগ্যবশতঃ এদের শাসনতন্ত্র সম্পর্কে কোনো বিস্তৃত তথ্য নেই যার ফলে সুনিশ্চিতভাবে কিছু বলা যেতে পারে। মনে হয় এই সব গণরাজ্য ছোটো ছোটো প্রশাসনিক খণ্ডে বিভক্ত ছিল, যার প্রত্যেকটিকেই অতিশয় ক্ষুদ্রায়তন রাজ্য বলে মনে হয়। এদের স্থানীয় শাসন পরিচালনার উপযুক্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছিল। সমগ্র গণরাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল একটি বিধানসভার ওপর যার সদস্য ছিলেন এই সব প্রশাসনিক খণ্ডের প্রধানরা। প্রধানতঃ তাঁদের নেতৃত্ব দিতেন একজন রাষ্ট্রপতি অথবা প্রেসিডেন্ট যিনি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত হতেন। বিধানসভার আয়তন বড় হলে একটি কার্যনির্বাহী সমিতি থাকত, যার সদস্যরা নির্বাচিত হতেন বিধানসভার সদস্যদের মধ্য থেকে। এথেন্সে ক্লিস্থেনিসের সংস্কারের পর যে শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার সঙ্গে গণরাজ্যের শাসনতন্ত্রের মিল সহজেই চোখে পড়ে।

বৃদ্ধ ও যুবকদের নিয়ে বিধানসভা গঠিত হত। যে সভাগৃহে বিধানসভার অধিবেশন হত তাকে বলা হত সন্থাগার। লিচ্ছবি শাসনতন্ত্রকে বুদ্ধ বিশেষ প্রশংসা করেছেন। লিচ্ছবি শাসনতন্ত্রের অন্তর্নিহিত শক্তিও তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। অজাতশত্রু লিচ্ছবি রাজ্য জয় করার জন্য যখন বুদ্ধের পরামর্শ চেয়ে মন্ত্রীকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন, তখন বুদ্ধ বলেছিলেন যে, যতদিন তাদের শাসনতন্ত্র অটুট থাকবে ততদিন লিচ্ছবিরা অজেয়। একথা মনে করার কারণ আছে যে, বৌদ্ধ সঙ্ঘের গণতান্ত্রিক সংগঠনের মডেল ছিল লিচ্ছবি শাসনতন্ত্র।

খ্রিঃ পূঃ চতুর্থ শতকে ভারতে বহুসংখ্যক গণতান্ত্রিক রাজ্য ছিল। মেগাস্থিনিস বলেছেন, অধিকাংশ নগর-রাষ্ট্রই এ সময়ে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। অন্যান্য গ্রিক লেখকরাও মেগাস্থিনিসের বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন। কেন্দ্রীকৃত মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা এই জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহকে ধ্বংস করে। কৌটিল্য তাঁর *অর্থশাস্ত্র*-এ ন্যায় অন্যায় বিচার না করে এইসব গণরাজ্যকে ধ্বংস করার কথা বলেছেন। কিন্তু মৌর্য সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পর আবার কিছু গণরাজ্যের অভ্যুদয় ঘটে। তাদের মধ্যে যৌধেয়, মালব ও অর্জুনায়নদের নাম করা যেতে পারে। এইসব জাতিগোষ্ঠীর গণতান্ত্রিক

শাসনতন্ত্র ছিল, এবং ভারতের ইতিহাসে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। পূর্ববর্তী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের মতো তারা ভারতের আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড যুদ্ধ করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী গুপ্ত সাম্রাজ্যের কাছে পরাজিত হওয়ায় তাদেরও বিলুপ্তি ঘটে।

প্রাচীন ভারতের রাজনীতিবিদদের মধ্যে দুটি গোষ্ঠী ছিল যাঁরা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করতেন। *অর্থশাস্ত্র* একটি গোষ্ঠীর মুখপাত্র। এই গোষ্ঠী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহকে ধ্বংস করে একটি শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। অন্য গোষ্ঠীটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহকে রক্ষা করতে চেয়েছিল। এই গোষ্ঠী গণরাষ্ট্রের অন্তর্নিহিত ত্রুটির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে তা দূর করার উপযুক্ত ব্যবস্থার কথা বলেছিল। *মহাভারত*-এর শান্তিপর্বে (১০৭ অধ্যায়) এইসব গণরাজ্য সংরক্ষণের উপায় সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা আছে।

রাহুলের উপন্যাসের ও গল্পের আলোচনা করতে বসে গণরাজ্য সম্পর্কে এই দীর্ঘায়িত ভিন্নমুখী আলোচনার কারণ হল এই যে, মার্কসবাদ ও গণরাজ্য এই দুটি আদর্শ রাহুলের সব উপন্যাসের leit motif বলা যেতে পারে। রাহুলের যে কোনো উপন্যাস বিশ্লেষণ করলেই এই উক্তির সমর্থন মিলবে। *ভোলগা সে গঙ্গা*-তে এই দুটি আদর্শের অন্তর্ব্যাপ্তি চোখে পড়ে।

তাঁর *সিংহ সেনাপতি* এবং *জয় যৌধেয়* এই দুটি উপন্যাসে লিচ্ছবি ও যৌধেয়গণের সামাজ্যবাদী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে টিকে থাকার সংগ্রামের কাহিনি বিবৃত। অবশ্য একথা ঠিক যে, দুটি উপন্যাসেই দুটি লোকের জীবনের কথা বলা হয়েছে। *সিংহ সেনাপতি* লিচ্ছবি বীর সিংহের এবং *জয় যৌধেয়* যৌধেয় বীরের কাহিনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও দুটি উপন্যাসেই ব্যক্তির মাহাত্ম্যের কথা বলা হয়নি। বস্তুত সিংহ ও বীর এই দুই নায়ক যথাক্রমে লিচ্ছবি ও যৌধেয় জনজীবনের প্রতীক।

তরুণ লিচ্ছবিকুমার সিংহ তক্ষশীলায় গিয়ে শাস্ত্র ও গণতান্ত্রিকতা অধ্যয়ন করেন। স্বল্পকালের মধ্যেই তিনি গান্ধার গণরাজ্যের অন্তর্গত হয়ে যান এবং পারস্যের বাদশাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করে যশস্বী হন। আচার্যকন্যা রোহিনীকে তিনি ভালোবেসে বিয়ে করেন এবং কিছুকাল পরে বৈশালী ফিরে আসেন। যথাসময়ে তিনি সন্থাগারের সদস্য হন এবং মগধের রাজা বিম্বিসারকে যুদ্ধে পরাজিত করেন।

তিনি আচার্য মহাবীরের শিষ্য হন। কিন্তু তিনি মানসিক শান্তি পাননি। পরে তিনি বুদ্ধের শিষ্য হয়ে বহুজন হিতায় অনাত্মবাদী সিদ্ধান্তের মধ্যে তাঁর সকল প্রশ্নের সমাধান পেয়ে শান্তিলাভ করেন।

জয় যৌধেয়কুমার। সমুদ্রগুপ্ত যৌধেয়গণকে যুদ্ধে পরাজিত করে কিছু কর নিয়ে যৌধেয়রাজ্য যৌধেয়গণকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। যৌধেয় জয়ের ভগ্নীকে বিয়ে করে তিনি তাঁকে প্রধানা মহিষীর সম্মান দিয়েছিলেন।

জয়ের প্রাথমিক শিক্ষা-দীক্ষা পাটলিপুত্র রাজপরিবারের রাজসিক ঐশ্বর্য ও বৈভবের

মধ্যে হয়েছিল। কিন্তু তাঁর যৌধেয় সংস্কার এত প্রবল ছিল যে, তাঁর যৌধেয় ব্যক্তিত্ব এই ঐশ্বর্যের পরিমণ্ডলের মধ্যেও পরিবর্তিত হয়নি। আচার্য বসুবন্ধুর সংসর্গে আসার পর তাঁর নিজস্ব যৌধেয় অস্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ উপলব্ধি হয়। শাস্ত্রীয় শিক্ষা সম্পূর্ণ হওয়ার পরে তাঁর যাত্রা শুরু হয়। তক্ষশীলায় তো তিনি আগেই গিয়েছিলেন। এবার হিমালয় উৎসব ও তারপর সিংহলে তাঁর যাত্রা শুরু করেন। কিন্তু সিংহলে যাত্রার সময় জাহাজডুবি হয়। জয় ও তাঁর বন্ধু সিংহবর্মাকে শবরবল্লীতে আশ্রয় নিতে হয়। শবরপল্লীর জীবন আদিম মানবগোষ্ঠীর জীবন। এখানে আদিম মানবজীবন অধ্যয়নের সুযোগ পান জয়। শ্যামা নামে এক তরুণীর সঙ্গে তাঁর বিয়েও হয়। কিন্তু এখান থেকে তাঁকে চলে যেতে হয়। তিনি পিষ্টপুর ও কাঞ্চী হয়ে সিংহল পৌঁছোন। সেখানে তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষুর জীবন বরণ করেন। কিন্তু তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষু হয়েছিলেন ধর্মীয় জীবন-যাপনের জন্য নয়। তাঁর ধর্মান্তরণের উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক।

জয়ের স্রষ্টা জানতেন যে, বৌদ্ধ সঙ্ঘের ও গণতন্ত্রের সাংগঠনিক ব্যবস্থার ঘনিষ্ঠ অন্যোন্যাশ্রয় সম্বন্ধ ছিল। সুতরাং জয় যাতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পূর্ণ পরিচয় লাভ করে তাই রাহুল তাঁকে বৌদ্ধভিক্ষু বানিয়েছিলেন।

সিংহল থেকে চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় চলে আসেন। চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য ও তাঁর নবপরিণীতা মহারানি ধ্রুবস্বামিনীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়।

পরের অধ্যায়ে আমরা দেখছি জয় যৌধেয়গণকে সংগঠিত করছেন। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, চন্দ্রগুপ্ত যৌধেয়দের আক্রমণ করে তাদের রাজ্যকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে চাচ্ছেন। কিছুদিনের মধ্যেই চন্দ্রগুপ্ত যৌধেয় গণরাজ্য আক্রমণ করেন। কিন্তু যৌধেয় বাহিনী বিজয়ী হয়। যৌধেয় সেনাপতি জয় যৌধেয় গণরাজ্যকে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করেন। দীর্ঘদিন যৌধেয় গণরাজ্যের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রচণ্ড আক্রমণ যৌধেয় গণরাজ্যকে বিলুপ্ত করে দেয়।

রাহুলের গল্প ও উপন্যাস কলা সম্পর্কে প্রসিদ্ধ হিন্দি সাহিত্য সমালোচক ডঃ নগেন্দ্র লিখেছেন যে, রাহুলের ঐশ্বর্যময়ী কল্পনাশক্তি আছে, ঐতিহাসিক তথ্যের অমর ভাণ্ডার আছে, স্বচ্ছ ও অভ্রান্ত জীবনদর্শন আছে। সুদূর অতীতকে বিস্ময়করভাবে প্রাণবন্ত করে আমাদের চোখের সামনে তাকে উদঘাটিত করার অসামান্য ক্ষমতা আছে। কিন্তু কথাশিল্প বিশেষ নেই। ডঃ নগেন্দ্রের এই উক্তিকে অযৌক্তিক বলা চলে না। *সিংহ সেনাপতি* ও *জয় যৌধেয়* এই দুটি উপন্যাসেই ঘটনার বিন্যাস ও চরিত্রচিত্রণে অনেক কিছুরই অভাব আছে। উপন্যাসে কোনো নাটকীয় পরিস্থিতি নেই। নানা ঘটনার সমাপতনের ও দ্বন্দ্বের মধ্যে বিভিন্ন চরিত্র গড়ে ওঠে ও উপন্যাস তাঁর পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়। রাহুলের উপন্যাসে তা নেই। অথচ তাঁর উপন্যাসে নাটকীয় পরিস্থিতির এবং বিভিন্ন চরিত্রের সংঘাতের সম্ভাবনা ছিল না, তা নয়। কিন্তু রাহুল তা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারেননি। গল্প এবং উপন্যাসে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ একটি পূর্বনির্দিষ্ট ছক ও ইতিহাসের উপর

কেন্দ্রীভূত। গল্প বা উপন্যাসের চরিত্রের মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ধৈর্য ছিল না তাব। তিনি তার প্রয়োজন আছে বলেও মনে করতেন না। সিংহ ও জয়ের ব্যক্তিত্বের বিকাশ একটি পূর্বনির্দিষ্ট সরলরেখা ধরে; তাদের বহির্মুখী জীবন সর্বদা সুস্থ ও প্রাণবন্ত। মানুষের অন্তরের গভীরতম স্তরে এদের দুজনের একজনেরও প্রবেশ নেই। মনে হয়, বহির্মুখী ও অন্তরজীবনবিহীন রাহুলই লিচ্ছবি-কুমার সিংহ ও যৌধেয়-কুমার জয়। রাহুলের মতোই তাবা আদর্শতাড়িত হয়ে সমগ্র জীবন কাটিয়েছে, নানা ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তাদের জীবন অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু তাদের জীবনের পূর্বনির্দিষ্ট ছকের বাইরে তারা যেতে পারেনি। বস্তুতঃ রাহুলের উপন্যাসকে উপন্যাস বলেই মনে হয় না। মনে হয় ইতিহাস।

ঘটনা বর্ণনার বিস্ময়কর ক্ষমতা ছিল রাহুলের। অত্যন্ত সজীব ও বৈচিত্র্যপূর্ণ বর্ণনা। তার কাবণ দেশ-দেশান্তরের ভ্রমণেব বিস্তৃত অভিজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্য। তাঁর উপন্যাসে তিনি প্রাচীন ভারতেব অত্যন্ত সজীব ও বাস্তব চিত্র এঁকেছেন। অবশ্য সব সময় এই বাস্তব চিত্র প্রামাণিক হয়েছে তা বলা চলে না।

উপন্যাস-কলার নিরিখে বিচাব করলে রাহুলের উপন্যাস অথবা গল্প রসোত্তীর্ণ ও কালোত্তীর্ণ হয়েছে একথা বলা যাবে না। কিন্তু বৌদ্ধ সাহিত্য ও দর্শন সম্পর্কে তিনি যা লিখেছেন, তা বাদ দিলে আর যা লিখেছেন, তা সবই লিখেছেন 'হিন্দি সনসার' বা জগতের জন্য। সে কথা মনে রাখলে রাহুলের উপন্যাস হিন্দি সাহিত্যেব সম্পদ বলে গণ্য হতে পারে। আর একটি কথাও এখানে মনে রাখতে হবে যে, হিন্দি ভাষায় উপন্যাস-শৈলীব বিকাশে তাঁব উপন্যাসেব দান অনেক। অতীতের সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্য বর্ণনা করাব জন্য রাহুল যে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী শব্দের প্রয়োগ করেছেন তা হিন্দি ভাষার বিকাশের নতুন পথ খুলে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, অন্তত ছত্রিশটি ভাষাবিদ রাহুল বিভিন্ন ভাষা থেকে শব্দচয়ন করে তা নিখুঁতভাবে ব্যবহার করেছেন এবং ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন।

রাহুল সাংকৃত্যায়নকে আধুনিক হিন্দি লেখকদের মধ্যে যুগপুরুষ বলে ধরে নেওয়া যায়। কাবণ এই ধরনের লেখক বেশি জন্মায় না, অন্তত প্রত্যেক যুগে তো নয়ই। শ্যামসুন্দর ঘোষ লিখেছেন, 'আধুনিক যুগে ভারতেন্দুর পরেই রাহুলেব নাম করা যেতে পারে। দুজনের মধ্যে অনেক মিল, যদিও পার্থক্য বেশি। দুজনের রচনাশৈলীর মিল আছে। দুজনেরই ভাষা সহজ ও সরল। কিন্তু রাহুলের বিষয়বস্তু অনেক গুরুগম্ভীর।'

রাহুলেব লেখায় কোনো জটিল গ্রন্থি নেই, তিনি *হিন্দি কাব্যধারা*-র ভূমিকাই লিখুন, অথবা *দর্শন দিগ্‌দর্শন* বা *ঘুমক্কড় শাস্ত্র*-এর বিচার বিশ্লেষণই করুন, তিনি যাই লিখুন না কেন, বিষয়বস্তুর ভার তাঁর রচনাশৈলীকে গুরুভার করতে পারেনি। রাহুল জানতেন যে, তিনি হিন্দিতে একটি বিশেষ রচনাশৈলী প্রবর্তন করছেন যা সম্পূর্ণভাবে তাঁব নিজস্ব।

রাহুল অপেক্ষাকৃত গম্ভীর বিষয়কে জনপ্রিয় করতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি সরল ও সহজ ভাষা ব্যবহার করেছেন। রাহুল যদি তাঁর নিজস্ব এই বিশিষ্ট রচনাশৈলীর উদ্ভাবন না করতেন তাহলে হিন্দি ভাষার আজ কী অবস্থা হত! যে হিন্দি পাঠক শুধু কিসসা-

কহানী পড়ত, তিনি তাঁর নিজস্ব সরল রচনাশৈলীর দিকে তাদের রুচিকে আকৃষ্ট করে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়বস্তুর অধ্যয়নে তাদের অনুপ্রেরিত করেছিলেন। রাহুলের *ভোলগা সে গঙ্গা, দিবোদাস* প্রভৃতির কথা মনে রেখে বিচার করলে এই সরল সত্যটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ঠিক এই কারণেই রাহুল পাঠকের পক্ষে প্রীতিপ্রদ লেখক নয়। তিনি অনায়াসবোধ্য। ছোটোবড় সকলের কাছেই তিনি কাঙ্ক্ষিত লেখক। যে কোন বয়সের পাঠক রাহুলের কোনো না কোনো বই পছন্দ করবেই। কারো ভালো লাগবে *মধুর স্বপ্ন,* কারো *শয়তান কে আঁখ,* কেউ *বিস্মৃতি কা গর্ভ*-এ ডুবে যাবেন, কেউ *যাদুকা মুলক*-এ ঘুরে বেড়াবেন। কেউ চলে যাবেন *এশিয়া কা দুর্গম ভূখণ্ডমে,* কেউ *কিন্নরদেশ*-এ, *ইরান*-এ, *জাপান*-এ, *লঙ্কা*-য়। আবার কেউ *সতমী কী বাচ্চে, সিংহ সেনাপতি* ও *জয় যৌধেয়*-তে মত্ত হয়ে থাকবেন। বিভিন্ন রুচির মানুষকে বেঁধে রাখতে পারেন এমন লেখক কালেভদ্রে জন্মায়।

তার একটি কারণ অবশ্য রাহুলের রচিত বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য—দর্শন, ইতিহাস, গবেষণা, রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান, ধর্ম, অভিধান, লোকসাহিত্য, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনি, আত্মজীবনী ও জীবনীগ্রন্থ। তাঁর প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর অসাধারণ বৈচিত্র্য। *সাহিত্যিক নিবন্ধাবলী* থেকে চলে গেলেন *পুরাতাত্ত্বিক নিবন্ধাবলী*-তে। জীবনী গ্রন্থেরও অনুরূপ বৈচিত্র্য। মহামানব বুদ্ধ থেকে একেবারে চন্দ্রসিংহ গাঢ়োয়ালী, লেনিন, স্তালিন, কার্লমার্কস, মাও-সে-তুঙ এবং *নয়ে ভারত কে নয়ে নেতা, সরদার পৃথ্বিসিংহ*। রাহুলের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও একই কথা বলা চলে। *ঋগ্বেদিক আর্য* থেকে একেবারে লাফিয়ে চলে গেলেন *আকবর* রচনায় ঃ দুটি বইয়েরই প্রকাশন বর্ষ ১৯৫৬।

বিভিন্ন জনজাতিক সাহিত্যের (Literature of the different Indian nationalities) উদ্ধার ও সংরক্ষণের প্রবল প্রয়াস রাহুলের একটি মহান কীর্তি হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। তিনি জানতেন যে, লোকসাহিত্য সংরক্ষণের ফলে হিন্দি সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হবে। লোকগীতি, লোকনাট্য, সাধারণ মানুষের মুখের কথা ইত্যাদির সংকলন, সম্পাদনা ও প্রকাশনের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলতেন, আমাদের সব গ্রামে লোকসাহিত্যের অক্ষয় ভাণ্ডার ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে আছে। এই ভাণ্ডার যত শীঘ্র সংগ্রহ করা যায়, ততই আমাদের সাহিত্যের পক্ষে মঙ্গল।

গবেষক ছাত্র ও পণ্ডিতদের যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব এই কাজ সম্পন্ন করার পরামর্শ দিতেন। জনপদীয় ভাষা অথবা লোকসাহিত্য সংকলন ও সংরক্ষণ সম্পর্কে তাঁর সবচেয়ে বড় কাজ—নাগরী প্রচারিণী সভা (কাশী) থেকে প্রকাশিত হিন্দি সাহিত্যের বৃহৎ ইতিহাসের ষোড়শ খণ্ড, যাতে তিনি হিন্দি লোকসাহিত্যের আলোচনা করেছেন।

লোকসাহিত্যের এই ইতিহাস রাহুলের মহান কৃতি হিসেবে স্বীকৃত। এই গ্রন্থে রাহুল হিন্দির বিভিন্ন বুলির, যার সংখ্যা পনেরোর চেয়েও বেশি, প্রামানিক ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করেছেন। ডঃ প্রভাকর মাচওয়ে লিখেছেন, 'লোকগীতি, লোককথা ও লোকনাট্য রাহুলের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তিনি ভোজপুরী লোকগায়ক বিসরামের ওপর

একটি লেখা লিখেছিলেন। বিসরামের অল্প বয়সে মৃত্যু হয়েছিল। তাঁর গীত সংকলন করে রাহুল তা ছাপিয়েছিলেন। বুন্দেলখণ্ডি লোককবি ইসুরীর ওপরও তিনি একটা লেখা লিখেছিলেন। রাহুল মনে করতেন, ভোজপুরি, ব্রজ, মৈথিলি ও মালবি ইত্যাদি হিন্দির বুলি প্রারম্ভিক শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত।'

রাহুল পালি, প্রাকৃত, সংস্কৃত ও অন্যান্য ভাষায় অনেক গ্রন্থ রচনা করে তাঁর মহাপণ্ডিত উপাধিকে সার্থক করেছিলেন। কিন্তু তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব ছিল এই যে, তিনি নিজের মাতৃভাষা ভোজপুরিকে কখনো বিস্মৃত হননি। ভোজপুরি ভাষায় তিনি একটি দুটি নয়, আটটি নাটক রচনা করেছিলেন।

মধুর স্বপ্ন রাহুলের তৃতীয় ঐতিহাসিক উপন্যাস। এই উপন্যাসে রাহুল ভারতীয় ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে এশীয় জীবনের রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করেন। উপন্যাসের বিষয়বস্তু মধ্য-এশিয়ার জীবন। কিন্তু সেখানেও তিনি তাঁর মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরে যাননি। এই উপন্যাসেও তিনি এমন নায়ক খুঁজে বার করেছেন যার জীবনদর্শনের সঙ্গে মার্কসবাদ মিলে যায়।

এই উপন্যাসের প্রেরণা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, 'যখন তেহরানে ছিলাম তখন এই উপন্যাস লেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। ....আমি উপন্যাসে ইতিহাসের এক বিস্মৃত পৃষ্ঠা পাঠকের কাছে উন্মোচিত করতে চেয়েছিলাম। এই উপন্যাসের নায়ক ন্যায় চেয়েছিল, তাই আমাকে এই গ্রন্থ লিখতে বাধ্য করেছিল।'

এই উপন্যাসের স্থান—হিক্সা থেকে বক্ষু নদী পর্যন্ত (মধ্য-এশিয়া) পর্যন্ত অঞ্চল। কাল—৪৯২ খ্রিঃ পূঃ থেকে ৫২৯ খ্রিঃ পূঃ পর্যন্ত। এ সময় শাসনীয় বংশের ফিরোজপুত্র করীত শাষন করছিলেন। *মধুর স্বপ্ন*-এ রাহুল আদর্শ সাম্যবাদী সমাজের রূপ দিয়েছিলেন। এই উপন্যাসের মজদক কাল্পনিক নন, ঐতিহাসিক পাত্র। উপন্যাসে তার সম্পর্কে যা লেখা হয়েছে, তাও পুরোপুরি কাল্পনিক নয়। মজদকের চরিত্রের উপাদান সংগ্রহ করেছেন খ্রিস্টিয়, পারসিক ও মুসলমান লেখকদের কাছ থেকে। মানবপ্রেমিক মজদক সংযম শিক্ষা দিয়েছেন। নরহত্যা, রক্তক্ষয় তিনি নিষিদ্ধ করেছিলেন। দেশ জাতি নির্বিশেষে অতিথি সেবা তিনি কর্তব্য বলে মনে করতেন।

এই উপন্যাসে সামন্ত শাসনের বৈভব বিলাস, ধর্মাচার্যের অনাচার ও দুর্নীতি এবং দীনদুঃখীর করুণ চিৎকারের যে চিত্র রাহুল বর্ণনা করেছেন, তা দেশকাল নির্বিশেষে সব দেশে একই রকম। ধনী-নির্ধন, শাসক-শাসিতের বৈষম্যের চিত্রণ করে রাহুল তাঁর মধ্যেই জনমুক্তির 'মধুর স্বপ্ন' দেখেছেন।

উপন্যাসের দ্বাদশ অধ্যায়ে রাহুল এক সাম্যবাদী দেশের বর্ণনা করেছেন। তিনি একটি গ্রামকে আদর্শ গ্রাম হিসেবে কল্পনা করেছেন। এই গ্রামে স্ত্রী-পুরুষ, ছোটোবড়র মধ্যে কোনো ভেদাভেদ ছিল না। আহারাদির ব্যবস্থা করত গ্রামের পঞ্চায়েত। চাষের জমি, বাগান, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি গ্রামের সব লোকের সম্মিলিত সম্পত্তি। আমার-তোমার এই ভাবনা মানুষের মাথায় ছিল না। 'বসুধৈব কুটুম্বকম' ছিল সর্বরোগের ঔষধ।

রাহুল তাঁর উপন্যাসের নিহিতার্থ এভাবে বর্ণনা করেছেন—যা তাঁর ধ্যেয়, শেষ পর্যন্ত মানুষ সেখানে নিশ্চয়ই পৌঁছোবে। এই ধ্যেয় ছিল সমতা সম্পন্ন মানবজাতির সমাজ, পারস্পরিক প্রেম ও সুখ-সমৃদ্ধি।

রাহুল তাঁর সব ঐতিহাসিক উপন্যাসেই সাম্যবাদী বিচারদর্শন ও বৌদ্ধদর্শনের সমত্বকে সম্যক রূপ দিতে চেয়েছেন। *সিংহ সেনাপতি* ও *জয় যৌধেয়*-তে গণরাজ্যের গণতান্ত্রিকতাকে উপস্থাপিত করতে চেষ্টা করেছেন। *মধুর স্বপ্ন*-এ সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং মজদকী সিদ্ধান্তের সংঘর্ষ চিত্রিত। রাহুলের উপন্যাস পুরুষ-প্রধান। সব উপন্যাসই প্রায় নায়িকাশূন্য বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না।

ডঃ হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীর মতে রাহুল তাঁর উপন্যাস লিখেছিলেন বিশেষ উদ্দেশ্যের অনুপ্রেরণায়। এই উদ্দেশ্য হল : (১) মানুষের মন থেকে রক্ষণশীলতার মিথ্যা জঞ্জাল দূর করা, (২) যে শ্রেণি জনতাকে শোষণ করছে তাদের বিলুপ্ত করে দেওয়া, (৩) সমস্ত মনুষ্যজাতিকে ন্যায়, সমতা, অন্ন-বস্ত্র ও জ্ঞানার্জনের সুযোগ দেওয়া। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাও রাহুলের আর একটি প্রতিপাদ্য বিষয়।

রাহুল লিখিত গল্পের কথা *ভোলগা সে গঙ্গা*-য় আগেই আলোচিত হয়েছে। আরো অনেক গল্প তিনি লিখেছিলেন; যেমন *সতমী কে বচ্চে*-তে সংকলিত গল্পগুচ্ছ। *সতমী কে বচ্চে*-র সব গল্পই রাহুলের জীবন ও তার পটভূমিকা থেকে উঠে এসেছে। তিনি গল্পের স্থান ও পাত্রের নামও অপরিবর্তিত রেখে দিয়েছেন। সব গল্পই সাচ্চা কাহিনি। যে পাত্র অথবা পাত্রী যে-রকম তা ঠিক সেইভাবেই চিত্রিত। অন্যভাবে বলা চলে যে, রাহুলের গল্প অর্থাৎ 'সতমী কে বচ্চে', 'বহুরূপী মধুপুরী' সম্পর্কে একথা বলা যায় না যে, 'ঘটে যা সব সত্য নহে, সেই সত্য যা রচিবে তুমি।' তাঁর গল্পে অযোধ্যাই রামের জন্মস্থান, তাঁর মনোভূমি নয়। রাহুলের *মেরী জীবনযাত্রা* (১) পড়ে যদি কেউ তার *সতমী কে বাচ্চে* পড়েন, তবে এই বইকে তাঁর আর গল্পের বই বলে মনে হবে না। কারণ সব কাহিনিই প্রায় একই ভাষায় *মেরী জীবনযাত্রা*-য় বর্ণিত। এই বইয়ের দুয়েকটি কাহিনির তুলনাত্মক বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে।

প্রথমতঃ রাহুলের *মেরী জীবনযাত্রা* (১) থেকে দুয়েকটি কাহিনির কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি। 'ছেলেবেলার বন্ধুদের মধ্যে দুজনেরই কথা আমার মনে আছে। দুজনেই আমার সমবয়স্ক ছিল। একজন হল আমার দাদু নরসিংহের ছেলে, আর একজন গরিব সতমীর ছেলে মদ্‌ধু। একা (পাঠশালায়) যেতে হবে তাই দাদু মদ্‌ধুকে সঙ্গী হিসেবে (রাহুলের সঙ্গে) পাঠানোর কথা বলেছিলেন।'

'সত্‌মীর বাড়িরও কোনো চিহ্ন নেই। সত্‌মীর চার ছেলে ম্যালেরিয়া দারিদ্র্যে ভুগে মরেছে—তা আমি আমার এক গল্পে লিখেছি। সতমীর ছোটো ছেলে এখনো কোথাও বেঁচে আছে।' 'সতমী পন্দহা গ্রামের গোয়ালিনী। সীমাহীন দারিদ্র্য তার। চার ছেলে বুদ্ধু, শুদ্ধু, মদধু ও সন্তু। মেয়ে সুখিয়া। তার চার ছেলেই ম্যালেরিয়ায় মরে যায়। চার ছেলেকে হারিয়েও বুড়ি নিজে বেঁচে আছে।' সতমীর নাম, গ্রাম ও কাহিনি সবই জীবন

থেকে নেওয়া। শুধু সামান্য পার্থক্য আছে। কিন্তু তা রাহুলের কল্পনার জন্য নয়। সন্তু সম্পর্কে রাহুলের ভুল ধারণা ছিল, তার জন্য। গল্পে রাহুল সতমীর চতুর্থ ছেলের মৃত্যুর কথা লিখেছেন। কিন্তু *মেরী জীবনযাত্রা*-য় লিখেছেন, ৩৪ বছর পরে গ্রামে ফিরে তিনি সন্তুকে জীবিত দেখেছেন।

সতমী কে বাচ্চে-র 'পাঠকজী' ও 'পূজারী' এই দুটি কাহিনিতে তিনি তাঁর বাবা গোবর্ধন পাণ্ডে ও মাতামহ রামশরণ পাঠকের কথা লিখেছেন। এই দুটি কাহিনিই *মেরী জীবনযাত্রা*-য় একইভাবে লেখা হয়েছে। তাঁর *সতমী-কে বাচ্চে*-তে তারা অধিকতর সজীব। *মেরী জীবনযাত্রা*-য় (১) পরিশিষ্টতে এই দুটি কাহিনিই কিছু শব্দ অদলবদল করে জুড়ে দিয়েছেন তিনি। তাছাড়া অন্যান্য কাহিনি—'রাজবলী', 'জৈগিরী', 'দলসিংগার', 'স্মৃতিজ্ঞান কীর্তি' প্রমুখ ব্যক্তিরা *মেরী জীবনযাত্রা*-য় বর্ণিত হয়েছে।

হয়তো *সতমী কে বাচ্চে*-কে গল্প সংগ্রহ না বলে স্মৃতিকথা বলাই সঙ্গত। স্মৃতিকথাও সংবেদনশীল হলে হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারে এবং সত্য ঘটনাও শক্তিশালী লেখকের হাতে রসোত্তীর্ণ হতে পারে। কিন্তু রাহুলের এমন সাহিত্যকর্ম নেই যা কালোত্তীর্ণ ও রসোত্তীর্ণ। এই সংকলনকে 'অতীতের চলচ্চিত্র' বলা যেতে পারে।

বহুরঙ্গী মধুপুরী-ও রাহুলের মুসৌরি বাসের সময়ের কিছু গল্পের সংগ্রহ। এই বইতে তিনি মুসৌরির সমাজ জীবনের বহুস্তরীয় বিবরণ দিয়েছেন। তিনি *কনৈলা কী কথা ভোলগা সে গঙ্গা*-র দ্বিতীয় খণ্ড বলে অভিহিত করেছেন। তবে কোনো গল্পই রসোত্তীর্ণ হয়েছে বলে মনে হয় না। রাহুলের গল্পের সমালোচনা করে ভদন্ত আনন্দ কৌশল্যায়ন লিখেছিলেন যে, তাঁর গল্পে গল্প কম, ইতিহাস বেশি। রাহুল এই সমালোচনার উত্তরে লিখেছিলেন, 'যদি কেউ এই গল্পগুলিকে মনোরম ভঙ্গিতে লেখা ইতিহাস বলে মনে করে তবে তাতেও আমি খুশি হব।' তাঁর অধিকাংশ গল্পই মনোরম ভঙ্গিতে লেখা ইতিহাস। তবে তাঁর গল্পের ভাষা ও প্রসাদগুণ সজীব ও শিল্পসম্মত। ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে শিল্পসৃষ্টির সমন্বয়ের যে প্রয়াস রাহুল করেছেন, তাও প্রশংসার যোগ্য।

রাহুল রাজনৈতিক, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক অনেক প্রবন্ধ ও গ্রন্থ লিখেছেন। তা তাঁর অধ্যয়নশীলতার ও মননশীলতার নিদর্শন। *দর্শন দিগ্‌দর্শন*, *আজ কে রাজনীতি*, *দিমাগী গোলামী*, *তুমহারী ক্ষয়*, *বাইসবী সদী*, *সাহিত্য নিবন্ধাবলী*, *পুরাতত্ত্ব নিবন্ধাবলী*, *বৈজ্ঞানিক ভৌতিকবাদ* এবং জীবনী গ্রন্থগুলিকে তিনি মার্কসীয় সূত্রের মতো গেঁথেছেন।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে রাহুলের সবচেয়ে বড় কীর্তি হয়তো তাঁর ভ্রমণ কাহিনি। এই একটি ক্ষেত্রেই তিনি শুধু হিন্দি সংসারের জন্য লেখেননি। অবশ্য *ভোলগা সে গঙ্গা* বিশ্ব সংসারের জন্য লেখা। রাহুল রচিত গ্রন্থের মধ্যে ভ্রমণ সংক্রান্ত কাহিনির সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। তাঁর মহত্তম গ্রন্থ *মেরী জীবনযাত্রা*-ও শেষ পর্যন্ত ভ্রমণ বৃত্তান্তই। কিন্তু তাঁর *মেরী জীবনযাত্রা*-র স্থান সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। শুধু হিন্দিতেই নয়, ভারতীয় সাহিত্যেই এই অনন্য গ্রন্থের কোনো তুলনা নেই। কোনো ভারতীয় সাহিত্যে পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত ২৭৭০ পৃষ্ঠার এমন অসামান্য জীবনযাত্রার কাহিনি এ পর্যন্ত লেখা হয়নি এবং ভবিষ্যতেও লেখা হবে

কিনা সন্দেহ। তাঁর জীবনের এই কাহিনিকে রাহুল আত্মজীবনী বলেননি। বলেছেন জীবনযাত্রা—তার কারণ তিনি তাঁর বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন। 'পথে পথে ঘুরে বেড়ানোর সময় আমার মনে হয়েছে যে যদি অন্য কোনো যাত্রী তাঁর পথের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতেন তবে আমি খুব লাভবান হতাম। যদিও এতে সন্দেহ নেই যে, প্রত্যেক মানুষকেই তার অন্তর ও বহির্বিশ্বের তরঙ্গে সাঁতরাতে হয়।'

তথাপি প্রশ্ন থেকে যায় 'কেন, জীবনী না লিখে জীবনযাত্রা লিখতে গেলাম। পাঠক তার উত্তর এই বই পড়লেই পেয়ে যাবেন। আমি আমার কলম দিয়ে এই জগতের গতি-প্রকৃতি ও বৈচিত্র্যকে আঁকতে চেয়েছি, যাকে জানা আমার পরবর্তী তৃতীয় প্রজন্মের পক্ষে হয়তো দুঃসাধ্য হবে।' তাছাড়া তাঁর এই ধারণা ছিল যে, আত্মজীবনী লেখার নৈপুণ্য তিনি আয়ত্ত করতে পারেননি। তার সময়ও ছিল না। নিজের চোখে তাকিয়ে দেখার ধৈর্য্যও ছিল না তাঁর। ১৯৪০-এ ১৮৯৩ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত তাঁর পদাতিক জীবনের স্মৃতি তিনি কাগজে তুলে নেন। কাগজে লিখেছিলেন না বলে কাগজে তুলে নিয়েছিলেন বলাই ভালো। ইংরেজিতে যাকে photographic memory বলে রাহুলের তাই ছিল। জেলে বসে তিনি যখন তাঁর বিগত ৪৩ বছরের ভ্রাম্যমান জীবনের কথা লেখেন, তখন তাঁর কাছে কোনো বই ছিল না, কোনো ম্যাপ ছিল না, এমন কোনো নির্ভরযোগ্য লোকও ছিল না যার সঙ্গে তিনি পরামর্শ করতে পারতেন। তবে সম্ভবত জীবনযাত্রার দিনলিপি তিনি রাখতেন। *মেরী জীবনযাত্রা* প্রথম খণ্ড পড়লে মনে হবে চলচ্চিত্রের ছবির মিছিলের মতো ৪৩ বছরের পুরোনো সব স্মৃতি সার বেঁধে এসেছে অথবা ঐন্দ্রজালিক রাহুল মৃতের জগৎ থেকে স্মৃতির সব খণ্ডচিত্রকে জীবন্ত করে আবাহন করেছেন, অনুগত ভৃত্যের মতো শব্দেরা এসেছে, কাগজের উপর এক বিচিত্র অপরিজ্ঞাত জগতের ছবি এঁকে দিয়ে গেছে।

রাহুলের জীবন ছিল বহমান নদীর মতো। তাঁর রচনাশৈলী স্বচ্ছন্দ, সাবলীল ও বহমান। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে লঘু বিদ্রূপ, যা প্রায় ভলতেয়ারীয়। হিন্দি গদ্যে এই রচনাশৈলী অভূতপূর্ব। হিন্দিতে তিনি একটি বিশিষ্ট রচনাশৈলীর প্রবর্তকই শুধু নন, তিনি হিন্দি গদ্যের স্রষ্টাদের অন্যতম। তাঁর লঘু বিদ্রূপের অন্তর্ব্যাপ্তি রাহুলের দৃষ্টিভঙ্গির একঘেয়েমি থেকে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থকে অনেকাংশে মুক্ত করেছে। তাছাড়া হিন্দি জগতের বদ্ধ জীবনে তিনি অনেক জানালা খুলে দিয়েছেন। সমগ্র বিশ্বের বিচিত্র জীবনের সঙ্গে তিনি হিন্দি জগতের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। গোপাল হালদার লিখেছেন 'তিনি (রাহুল) তাঁর বিশ্ববীক্ষা থেকে হিন্দি জগৎকে আলোকিত করার চেষ্টা করেছেন। ... মানুষটির কোথাও অস্থিরতা ছিল। dynamisim-এর মধ্যে দরকার স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে কোনো কিছু বিচার করার। তার অভাব দেখা যেত তাঁর জীবনযাত্রায়। তিনি খুব বেশি গতিমান হবার চেষ্টা করেছেন, সব সময় সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিকভাবে পেরেছেন, তা নয়।'

['রাহুল সাংকৃত্যায়ন : বুদ্ধ থেকে মার্কস'—গোপাল হালদার, *জলার্ক*]

পরিশিষ্ট ১

রাহুল সাংকৃত্যায়নের জীবনের ঘটনাবলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১৮৯৩ ঃ জন্ম ৯ এপ্রিল (বৈশাখ, কৃষ্ণাষ্টমী, রবিবার, বিক্রম সংবৎ ১৯৫০)। উত্তরপ্রদেশের আজমগড় জেলায় মাতামহের বাড়ি পন্দহা গ্রামে রাহুলের জন্ম হয়। পিতা পন্দহার কাছাকাছি আজমগড় জেলার কনৈলা গ্রামবাসী সাংকৃত্য গোত্রীয় সরযূপারীয়া ব্রাহ্মণ গোবর্ধন পাণ্ডে (১৮৭৫-১৯২০ খ্রিষ্টাব্দ)। মাতা কুলওয়ন্তী। তাঁদের চারপুত্র ও এক কন্যা। কেদারনাথ জ্যেষ্ঠ পুত্র। মাতামহ রামশরণ পাঠক। মাতামহী জগরানি। কেদারের বাল্যকাল কেটেছিল মাতামহের বাড়ি পন্দহাতে।

১৮৯৮-১৯০৫ ঃ কেদারনাথের লেখাপড়া শুরু হয় পন্দহার কাছাকাছি রানি কী সরাই শহরে। ১৯০২-এ বারাণসী-বিন্ধ্যাচলে তাঁর প্রথম যাত্রা। এগারো বছর বয়সে (১৯০৪) তাঁর বিয়ে দেওয়া হয়।

১৯০৬-১৯০৯ ঃ নিজামাবাদের মিডল স্কুলে তিনি পড়াশোনা করেন। ১৯০৭ ও ১৯০৯-এ কলকাতায় তাঁর প্রথম ও দ্বিতীয় উড়ান।

১৯১০ ঃ বৈরাগ্যের ভূত ঃ অযোধ্যা, হরিদ্বার, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, কেদারনাথ, বদরিনাথ যাত্রা। এ সময় থেকেই ঘুমক্কড়ী (ভবঘুরেমি) শুরু হল। উত্তরাখণ্ড থেকে ফিরে এসে কাশীতে সংস্কৃত পড়াশোনাও আরম্ভ হল।

১৯১১-১৯১২ ঃ কাশীতে সংস্কৃত পড়াশোনা, ইংরেজি শেখার জন্য স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি। নিজের প্রাণকে বাজী রেখে তন্ত্রসাধনা।

১৯১২-১৯১৩ ঃ ছাপরা জেলার পরসা মঠের মোহন্তের উত্তরাধিকারী হয়ে বৈরাগী সাধু। নতুন নাম ঃ রামউদার দাস।

১৯১৩ ঃ পরসা মঠ থেকে দক্ষিণ ভারতের দিকে পলায়ন। তিরুমিশীর উত্তরার্ধী মঠাধ্যক্ষের উত্তরাধিকারী শিষ্য। নতুন নাম ঃ দামোদরাচারী। তিরুমিশী থেকে রামেশ্বরম, বাঙ্গালোর, বিজয়নগর, পুনে, বোম্বাই, নাসিক, আহমদাবাদ ইত্যাদি তীর্থ ভ্রমণ।

১৯১৪ ঃ পরসা প্রত্যাবর্তন। পরসা থেকে আবার পলায়ন, অযোধ্যায় তিন মাস। আর্যসমাজের প্রতি আকর্ষণ।

১৯১৫ ঃ আগ্রার আর্যসমাজী বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তারপর আর্যসমাজী হয়ে যান। তাঁর প্রথম লেখার প্রকাশন।

১৯১৬ ঃ লাহোরে অধ্যয়ন। আর্যসমাজের প্রচারক হিসেবে ভ্রমণ। লখনৌ-এর প্রতি প্রথম তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। কাশীতে পিতার অন্তিম দর্শন। প্রতিজ্ঞা ঃ পঞ্চাশ বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আজমগড় জেলায় পা রাখবেন না।

১৯১৭-১৯২০ ঃ পাঞ্জাব থেকে বাঙলা পর্যন্ত ঘুমক্কড়ী। যুগপৎ লাহোর ও কাশীতে অধ্যয়ন। বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ। কুশীনগর, বুদ্ধগয়া, লুম্বিনী প্রভৃতি বৌদ্ধতীর্থে ভ্রমণ।

১৯২০-১৯২১ ঃ আবার তিরুমিশী মঠে শাস্ত্রাধ্যয়ন। কুর্গে চার মাস।

১৯২১ ঃ অসহযোগ আন্দোলনের সময় রাজনীতিতে প্রবেশ। ছাপরা জেলায় আন্দোলনের সংগঠন। বন্যাপীড়িতদের সেবা।

১৯২২ ঃ বক্সার জেলে ছমাস। সংস্কৃতে *বাইসবী সদী* ও *কুরানসার* রচনা। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর জেলা-কংগ্রেসের সেক্রেটারি। গয়া কংগ্রেসে যোগদান। কংগ্রেসের জেলা-কংগ্রেসের সেক্রেটারির পদ থেকে পদত্যাগ।

১৯২৩-১৯২৫ ঃ নেপালে দেড়মাস। নেপাল থেকে ফেরার পর আবার গ্রেপ্তার। কয়েকদিন বক্সার জেলে কাটানোর পর দু'বছর হাজারিবাগ জেলে বাস। জেলে লেখাপড়া করেন। হিন্দিতে *কুরানসার* ও *বাইসবী সদী* লেখেন। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর কানপুর কংগ্রেসের প্রতিনিধি।

১৯২৬ ঃ মীরাটে হরিনাম দাসের (পরে ভদন্ত আনন্দ কৌশল্যায়ন) সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ। খাইবার, কাশ্মীর, লাদাখ, পশ্চিম তিব্বতের সীমান্ত, ও কিন্নর দেশ ভ্রমণ। ছাপরায় রাজনৈতিক কাজ। গৌহাটি কংগ্রেসে প্রতিনিধি।

১৯২৭-১৯২৮ ঃ শ্রীলঙ্কার বিহার বিদ্যাপীঠ-এ প্রায় উনিশ মাস অধ্যাপনা ও পালি বৌদ্ধ সাহিত্যের গভীর অধ্যয়ন। বিদ্যালংকার বিহার বিদ্যাপীঠ থেকে তাঁকে ত্রিপিটকাচার্য উপাধি দান। আনন্দজি শ্রীলঙ্কায় এসে বৌদ্ধ ভিক্ষু হন।

১৯২৯-১৯৩০ ঃ ভারতে প্রত্যাবর্তন, নেপালে অজ্ঞাতবাস, প্রথম তিব্বত যাত্রা। কাশী পণ্ডিত সভা দ্বারা তাঁকে মহাপণ্ডিত উপাধি দান। শ্রীলঙ্কায় প্রত্যাবর্তন। বৌদ্ধ ভিক্ষু হন। নতুন নাম ঃ রাহুল সাংকৃত্যায়ন। *বুদ্ধচর্যা* গ্রন্থ রচনা।

১৯৩০-১৯৩১ ঃ সত্যাগ্রহে যোগ দেওয়ার জন্য ভারতে প্রত্যাবর্তন। করাচি কংগ্রেসে যোগদান ও ভ্রমণ। শ্রীলঙ্কা প্রত্যাবর্তন।

১৯৩২-১৯৩৩ ঃ ভদন্ত আনন্দ কৌশল্যায়নের সঙ্গে ইউরোপ যাত্রা। সেখান থেকে শ্রীলঙ্কা ফিরে আসেন এবং শ্রীলঙ্কা থেকে আবার ভারতে আসেন। দ্বিতীয়বার লাদাখ যাত্রা।

১৯৩৪ ঃ বিহারে ভূমিকম্প পীড়িতদের সেবা। দ্বিতীয়বার তিব্বত যাত্রা।

১৯৩৫ ঃ জাপান, কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া, সোভিয়েত দেশ ও ইরান যাত্রা। টাইফয়েডে মৃত্যুর মুখোমুখি।

১৯৩৬ ঃ নেপালে দুমাস। তৃতীয়বার তিব্বত যাত্রা। সাক্য বিহারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংস্কৃত তাল থর অন্বেষণ ও প্রাপ্তি।

১৯৩৭ ঃ পাটনা ও প্রয়াগে গ্র রচনা। লাহুল যাত্রা। প্রিয় বন্ধু কাশীপ্রসাদ জয়সওয়ালের দেহাবসান। ইরান ও সোভিয়েত ভূমিতে দ্বিতীয়বার। লেনিনগ্রাদে লোলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা।

১৯৩৮ ঃ আফগানিস্তানে। ভারতে প্রত্যাবর্তন। তিব্বতে চতুর্থবার।

১৯৩৯ ঃ বিহারে, কিষান শ্রমিকদের জন্য আন্দোলন। আমওয়ারী কিষান সত্যাগ্রহের সময় তাঁর মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করা হয়। ছাপরা ও হাজারিবাগ জেলে। 'তুমহারী ক্ষয়' (নিবন্ধ) ও *জিনে কি লিয়ে* উপন্যাস রচনা। পুত্র ঈগরের জন্মের সংবাদ। ভিক্ষুর বস্ত্রত্যাগ। জেল থেকে মুক্তি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আরম্ভ। বিহারের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।

১৯৪০-১৯৪২ ঃ মোতিহারিতে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক কিষান সম্মেলনের সভাপতি। অখিল ভারতীয় কিষান সম্মেলন ও সভার সভাপতি নির্বাচিত। গ্রেপ্তার। হাজারিবাগ জেল ও দেওলী ক্যামপ-এ ২৯ মাস। *বিশ্বাসী রূপরেখা, মানব-সমাজ, দর্শন দিগ্‌দর্শন, বৈজ্ঞানিক ভৌতিকবাদ, ভোলগা সে গঙ্গা* ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা।

১৯৪৩ ঃ পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হওয়ার পর ২৭ বছর পরে আজমগড় জেলায় পদার্পণ। উত্তরাখণ্ড যাত্রা। *নয়ে ভারতকে নয়ে নেতা* গ্রন্থ রচনা।

১৯৪৪ ঃ সোভিয়েত রাশিয়া যাত্রায় প্রস্তুতি। অন্ধ্রপ্রদেশ ও কেরল ভ্রমণ। *হিন্দী কাব্যধারা, জয় যৌধেয়* ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা। ইরান হয়ে সোভিয়েত রাশিয়া যাত্রা।

১৯৪৫ ঃ ইরানে। সোভিয়েত রাশিয়ায় পঁচিশ মাস। লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রোফেসর। লোলা ও পুত্র ঈগরের সঙ্গে গার্হস্থ্যজীবন। *মধ্য-এশিয়া কা ইতিহাস*-এর জন্য তথ্য সংগ্রহ। ইংল্যান্ড হয়ে ১৯৪৭-এর ১৭ অগস্ট স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। হিন্দি সাহিত্য সম্মেলনের বোম্বাই অধিবেশনের সভাপতি।

১৯৪৮ ঃ হিন্দি সাহিত্য সম্মেলনের কাজ। পরিভাষা নির্মাণের কাজ। কিন্নর দেশ ভ্রমণের সময় *কিন্নর দেশ মে* পুস্তক রচনা।

১৯৪৯ ঃ সারনাথ ও শান্তিনিকেতনে *বৌদ্ধ সংস্কৃতি* গ্রন্থ রচনা। কালিম্পঙ-এ *ঘুমক্কড় শাস্ত্র, আজ কী রাজনীতি* গ্রন্থ রচনা ও পরিভাষা তৈরির কাজ। হায়দরাবাদ সম্মেলনে।

১৯৫০ ঃ নতুন গৃহস্থালি। নীড়ের খোঁজ। মুসৌরিতে বাড়ি ক্রয়। কমলার সঙ্গে বিবাহ।

১৯৫১ ঃ রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতির (ওয়ার্ধা) সাহিত্য পরিকল্পনার কাজ। গাঢ়ওয়াল ভ্রমণ।

১৯৫২ ঃ মুসৌরি শ্রমিক সঙ্ঘের সেক্রেটারি। *গাঢ়ওয়াল, মধ্য-এশিয়াকা ইতিহাস* (দুই খণ্ডে রচনা)

১৯৫৩ ঃ নেপাল ভ্রমণ। *নেপাল, স্তালিন, লেনিন, কার্লমার্কস, বহুরঙ্গী মধুপুরী* ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা। কন্যা জয়ার জন্ম।

১৯৫৪ ঃ হিমাচল প্রদেশ যাত্রা। *শরহপাদের দোহাকোষ* সম্পাদনা ও ভাবানুবাদ।

১৯৫৫ ঃ পুত্র জেতার জন্ম। মুসৌরিতে আর ভালো লাগছিল না। প্রয়াগ ও ওয়ার্ধা যাত্রা। *সংস্কৃত কাব্যধারা, চন্দ্রোসিংহ 'গাঢ়ওয়ালী'* ইত্যাদি রচনা।

১৯৫৬ ঃ প্রয়াগ, পাটনা, ছাপরা, কলকাতা ভ্রমণ। ত্রিশ বছর পর আবার পরসাতে। ৯ এপ্রিল পর্যন্ত *মেরী জীবনযাত্রা*-র পরিসমাপ্তি। *ঋগ্বেদিক আর্য, আকবর, জিনকহ্যায় কৃতজ্ঞ* ইত্যাদি রচনা। বছর শেষে নেপাল যাত্রা ও পন্দহা ভ্রমণ।

১৯৫৮ ঃ মুসৌরিতে নিজের বাড়ি বেচে কিছু দিন ভাড়া বাড়িতে। *মধ্য-এশিয়া কা ইতিহাস*-এর জন্য সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার। আবার পন্দহা, কনৈলা ভ্রমণ, নেপাল ও কাশ্মীর ভ্রমণ। সাড়ে চার মাস চীন ভ্রমণ। দেহ্‌রাদুনে প্রত্যাবর্তন।

১৯৫৯ ঃ দেহ্‌রাদুনে *চীন সে ক্যা দেখা* রচনা। শ্রীলঙ্কার বিদ্যালংকার বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপক (প্রোফেসর)। দার্জিলিঙে বাড়ি কিনে কমলা, পুত্র, কন্যা নিয়ে দার্জিলিঙে থেকে যান।